Janmabl

১২৯৭ সা

জন্মভূমি

২২০
২ম

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত

২৯শ, বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩০. [১ম, সংখ্যা

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সমস্যা	শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	১
২।	বীণার তার	শ্রীযুক্ত জীবঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩
৩।	কে তুমি	শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস	৩০
৪।	সমালোচনা	শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন	৩১

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত

5-8-23

Tele. Phone 388 Barabazar.

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

মূল্য ॥৴, ডজন ৫৲, গ্রোস ৫০৲, পাইকারী দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

...র, গোভিন এণ্ড কোং, হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার

...কুলার রোড ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

elegram:—GERMALINE. Telephone N

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
[illegible]
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তৈল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা : "ফিজীশিয়ান"
টেলিফোন নং ২৭১৫ কলি :
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

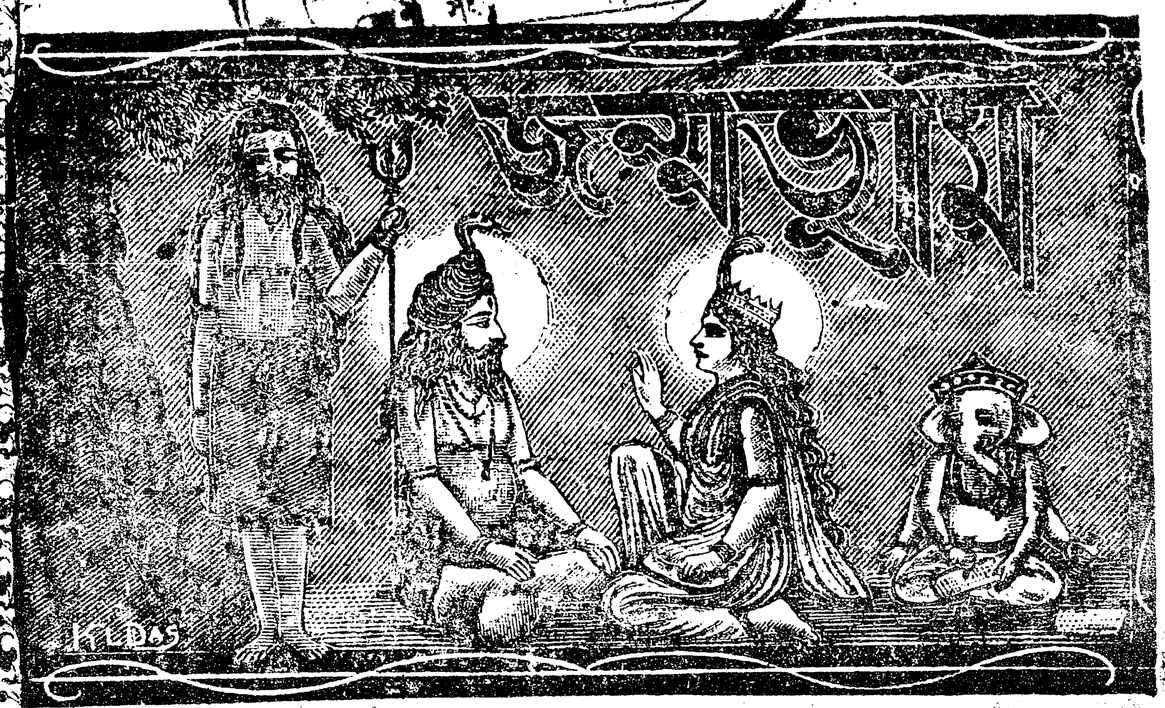

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৯শ, বর্ষ। | ১৩৩০ সাল, বৈশাখ। | ১ম, সংখ্যা।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সমস্যা।

লেখক,—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

আমাদের হিন্দু-সমাজে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা-ব্যাপার লইয়া বহুতর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে স্ত্রীলোক-দিগকে সর্ব্ব-প্রযত্নে শিক্ষিতা করা উচিত, স্ত্রীলোক পুরুষের অর্দ্ধ-অঙ্গ স্বরূপিণী, ইহাদিগকে অশিক্ষিত করিয়া রাখায় পুরুষ নিজেরই অর্দ্ধঅঙ্গ শোচনীয়রূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছেন। স্কুল-কলেজের সাহায্যে যদ্যপি নারী-জাতি রীতিমত বিদ্যাচর্চ্চার সুযোগ পায় এ॰ সভ্য সমাজে মেলা-মেশা করিবার অধিকার পায়, তাহা হইলে তাহাদে: মানসিক বৃত্তিগুলি বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে, সুতরাং পুরুষের মত তাহাদের দ্বারাও সমাজের বহুতর কল্যাণ সাধিত হইতে

পারে। স্ত্রীলোকদিগের প্রতিভা পুরুষাপেক্ষা কিছুমাত্রও হীন নহে, রমণীগণকে আজ জীব মাত্রেরই প্রকৃতি সিদ্ধ স্বাধীনতা হইতেও বঞ্চি করিয়া ঘরের কোণে একটা খাঁচার পাখীর মত আবদ্ধ করিয়া রাখ হইয়াছে, আজ সমাজের অকরুণ ব্যবহারে যাহার শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলি নিতান্তই পঙ্গুর মত জড় ভাবাপন্ন, নিজের ভারটীও নিজে বহ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, একমুষ্টি উদরান্নের জন্যও যাহারা আজ সতত পর মুখাপেক্ষী রীতিমত শিক্ষা পাইলে নিখিল কল্যাণের একমাত্র বীজ স্বরূ স্বাধীনতার বিমল আলোকে তাহাদের হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠি তাহারাই যে, আজ সর্ব্ববিষয়ে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া পুরুষের তুল সহযোগিনীরূপে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারিত না— একথা কে বলিতে পারে। পুরুষেরাও যে মানুষ, স্ত্রীলোকেরাও তাহা শিক্ষা বিষয়ে সকলেরই সমান অধিকার, তবে তাহাদিগকে এই ন্যায্য বি হইতে বঞ্চিত করিয়া সমাজকে পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ করিবার প্রয়োজন কি ?"

অপর ইহার প্রতিবাদকারীগণ বলেন যে, "আমাদের বহুকাল প্রচলি প্রথা যাহা, তাহা ধ্বংস করিবার প্রয়োজন কি? তাহাতে স্ত্রী ও পুরু উভয়েই নিজ নিজ বৈশিষ্টতা হারাইয়া ফেলিবে, সমাজের পক্ষে ইহা বড় অশুভ জনক। স্ত্রীলোকের পুরুষোচিত শিক্ষা কখনই উচিত নহে, তাঁহারা সমাজ নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব কর্ত্তব্য যাহা তাহাই রীতিমত পালন করুন। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে রন্ধনাদি কার্য্যে তত্ত্বাবধান করুন, জগদ্ধাত্রীরূপে সন্তান পালন, আত্মীয়-স্বজন অতিথি আতুরগণের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকুন, রামায়ণ মহাভারতাদি নীতিপূর্ণ সহজ ও সরল ধর্ম্মগ্রন্থাদির অবসর মত আলোচনা দ্বারা আত্মার উন্নতির চেষ্টা করুন। এ সকল শিক্ষা কি শিক্ষা নহে? এই সকল বিষয়ে রীতিমত সুশিক্ষিতা হইলেই রমণীগণের দ্বারা সমাজের প্রকৃত এবং প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, যাহা পুরুষ হইতে—এক প্রকার অসম্ভব।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে কাহারই কোনও আপত্য থাকিতে পারে না, কেবল শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচন লইয়াই মতভেদ।

বস্তুতঃ শিক্ষার বিষয় সকলগুলিই যে উৎকৃষ্ট, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; তথাপি স্থান কাল পাত্র ভেদে বিশেষ সুবিবেচনার সহিত শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচন করা উচিত। তাহার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে পাত্রটীর

ভাব কিরূপ। সে কোন বিষয়ে প্রকৃতি হইতে কতখানি সাহায্য পাইতে পারে, তারপর শিক্ষার্থীর দৈহিক এবং মানসিক শক্তি উক্ত শিক্ষার উপযুক্ত কি না? এবং ঐ শিক্ষার দ্বারা তাহার নিজের ও সমাজের কাহার কতখানি লাভ লোকসান আছে তাহাও খতাইয়া দেখিতে হইবে, ইত্যাদি সকল বিষয় বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া তবেই শিক্ষার বিষয় ও পাত্র নির্ব্বাচন করিতে হয়, নচেৎ অযোগ্য পাত্রে খেয়াল মত যথেচ্ছ শিক্ষা প্রদত্ত হইলে তাহার ফল প্রায়শঃই বিপরীত হইয়া দাঁড়ায় অথবা তাহা নিস্ফল হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও তাহারা কিরূপভাবে শিক্ষিতা হইবার উপযুক্তা তাহা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত।"

লেখা পড়া শিক্ষা।—যাহা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি,—বঙ্গভাষা, তাহার শিক্ষা বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সমাজের কোনই আপত্য নাই তবে কুরুচি বা তুর্নীতি পূর্ণ পুস্তকাদির আলোচনা সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ। যাহাতে তাহারা মাতৃভাষায় মোটামুটি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণাদি নীতিপূর্ণ সরল ও সহজ ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া মনের বিশুদ্ধতা আত্মার উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণরূপেই অনুমোদন করেন, কিন্তু স্কুল কলেজের লেখা পড়া শিক্ষা বিষয়েই তাঁহাদের আপত্তি—কারণ তাহার কোন প্রয়োজন নাই; অধিকন্তু নানাপ্রকার অনিষ্ট পাতেরও আশঙ্কা আছে। স্কুল কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, শিক্ষার্থীগণ অত্যন্ত আত্মাভিমানী এবং কুটীল প্রকৃতি হইয়া পড়েন। অভিভাবক গুরু প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিগণের যথোচিত মান সম্ভ্রম রক্ষা ব্যাপারেও তাঁহাদিগকে নিতান্তই উদাসীন দেখা যায় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যপদেশে তাঁহারা অনাবশ্যক রূপে বিলাস ব্যসনের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। অবশ্য স্কুল কলেজে এইরূপ শিক্ষা স্পষ্টতঃ দেওয়া না হইলেও, পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত শিক্ষকগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে আংশিকভাবে ইহার পোষকতা করা হয়, অন্ততঃ ছাত্রগণ যাহাতে এই সকল সংক্রামক দোষে দূষিত হইয়া না পড়েন তদুপযুক্ত শিক্ষায় কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয় না।

স্কুল কলেজে যে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা মাত্র ভাষা শিক্ষার হিসাবে, ধরিতে গেলে অস্মদ্দেশীয় স্ত্রী-পুরুষ কাহারও তাহা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না, কেননা, আমরা ভাষাহীন নহি, ইংরাজী

ভাষা বা আমাদের মাতৃভাষা উভয়ের দ্বারা সমান ভাবেই মনোভাব ব্যক্ত করা যায়, বরঞ্চ মনোভাব ব্যক্ত করিবার পক্ষে মাতৃভাষাই উৎকৃষ্টতম—।

বিদেশীয় ভাষাশিক্ষা দ্বারা তত্তৎ দেশীয়গণের সহিত মেলামেশা করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। ব্যবসায় বাণিজ্য রাজনীতি অর্থনীতি চর্চ্চা ইত্যাদির জন্য অস্মদ্দেশীয় পুরুষগণের সহিতই বিদেশীয়গণের মেলামেশার প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম বা সমাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন প্রয়োজন নাই, বরঞ্চ নিষিদ্ধ।

ঘরের বাহিরের সকল কর্ম্ম-কোলাহলের ভার যখন পুরুষগণের উপরন্যস্ত, তখন এজন্য স্ত্রীলোকদিগের ইংরাজীভাষাশিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই, আরও উক্ত ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যগণের দেশের ও সমাজের বহুতর আচার ব্যবহার রীতিনীতি ও শিক্ষার্থীগণকে আলোচনা করিতে হয়, যাহা আমাদের দেশের ও সমাজের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এবং মহা অনিষ্টকর, অথচ ঐ সকল বিষয় ব্যক্তিগত হিসাবে বড়ই আপাতঃ মনোরম বলিয়া মানবের স্বভাব দুর্ব্বল মন সহজেই সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, ইহাতে সমাজের বড়ই অনিষ্ট হয়। পাশ্চাত্য ভাষাশিক্ষিত পুরুষদিগের দ্বারা যে অল্লাধিক পরিমাণে তাহা না হইতেছে এমন নহে, কিন্তু নানা কারণে বিদেশীয়গণের সংস্রব পুরুষদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সম্ভব মত বিদেশীয় রীতিনীতির আলোচনা ও পুরুষদিগের পক্ষে আবশ্যক।

মানব মনের দৃঢ়তা অতি অল্প এবং ইহা নদীর স্রোতের মত স্বভাবতঃই নীচগামী, মহা অনর্থের হেতুভূত কাম ক্রোধ লোভাদি দুর্ব্বার প্রবৃত্তিগণের অত্যন্ত বশীভূত কারণ ঐ সকল ব্যাপারের অনুশীলন বড়ই আপাতঃ মধুর ও সহজ সাধ্য যাহাতে ঐ সকল অসৎবৃত্তির সংযোগের ও সদ্বৃত্তির পরিস্ফুরণ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা, কিন্তু মানব মন এতই দুর্ব্বল যে যদ্যপি সে দেখিতে পায় যে, তাহার ঈপ্সিত বিষয়ের একতম শাস্ত্র বা সমাজ নিষেধ করিতেছেন, আর অন্যতম সমাজ বা শাস্ত্র তাহার সমর্থন করিতেছেন, তবে সুবিধা পাইলেই যে স্থান কাল পাত্রাদির বিষয় কিছুই বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই সমর্থকের দোহাই দিয়া নিজের প্রবৃত্তির বশে ভাসিয়া যাইবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠে, ইহা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং

দুর্ব্বল চিত্তপুরুষ বা রমণীগণের পক্ষে আপাতঃ মধুর সমাজ বিরুদ্ধ রীতিনীতি আলোচনার পথ যাহাতে বন্ধ থাকে সেইরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত।

গণিত বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি উচ্চতম বিষয় সমূহ সকল ভাষার সকল ধর্ম্মেই উত্তম বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতি এই সব শিক্ষায় অনুপযুক্তা, কারণ এই সকল বিষয়ের আলোচনায় যে প্রকার ঐকান্তিক অধ্যবসায় অপিচ প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার প্রয়োজন, স্বভাবতঃ চঞ্চল মতি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে প্রকার একান্ত অধ্যবসায় ও ধারণা শক্তির বিকাশ বা বিচার শক্তির প্রাচুর্য্য খুব কমই দেখা যায়, স্বভাব দুর্ব্বলা স্ত্রীজাতির প্রগাঢ় চিন্তার ক্ষমতাও কম, আর চিন্তাশক্তির অত্যধিক—অনুশীলন তাহাদিগের করাও উচিত নহে, অতিরিক্ত মস্তিষ্ক পরিচালনা তাহাদেরই সহ্য হয়, যাহারা বেশ—সুস্থ ও সবল। চিন্তাক্ষয়করী যে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, সে যদি অত্যধিক চিন্তার অনুশীলন করে, তবে তাহার স্বাস্থ্য কখনই নিরাপদ হইতে পারে না। ক্ষীণ স্বাস্থ্যের দ্বারায় কি উচ্চ শিক্ষার সাফল্যের আশা করা যাইতে পারে? পরন্তু ভবিষ্যতে তদ্ভূত বংশের ধারাও ক্রমশঃ দুর্ব্বলতর ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এই শিক্ষা অবলা নারীজাতির স্বভাব বিরুদ্ধ এবং শিক্ষার্থী বা সমাজ কাহারই হিতজনক নহে। তবে যদিই বা কদাচিৎ কোন কোন স্ত্রীলোক এই সকল বিষয়ের উপযুক্ত বিবেচিত হয় তবে তাহার জন্য পৃথক্ শিক্ষার বন্দোবস্ত করাই সঙ্গত। তজ্জন্য স্ত্রীজাতি মাত্রেরই স্কুল কলেজের ব্যবস্থা করিয়া সমাজ শৃঙ্খলায় একটা জড়ীপট্টি আনিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

কোন একটা ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অর্থ বা অন্ন সমস্যার সমাধানের কারণ হইতে পারে না, তবে স্থান কাল পাত্রাদি অনুসারে আংশিকভাবে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে, বহু ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুকৌশলে বিবিধ প্রকার উপায় নিজ নিজ প্রয়োজনীয় অর্থ বা অন্নের সংস্থান করিতেছেন। কৃষি বাণিজ্য এবং অপরাপর বহুবিধ শিল্পকার্য্য প্রভৃতি ব্যাপারই এ বিষয়ের জন্য অবলম্বনীয়। কিন্তু এই সকল বিষয়ের মধ্যে অধিকাংশই অতি কঠিন শ্রমসাধ্য এবং ইহাতে অত্যন্ত স্থির মস্তিষ্কের প্রয়োজন ইত্যাদি কারণে নারীজাতি এই সকল ব্যাপারের অনুপযুক্তা।

কতকগুলি সহজ সাধ্য শিল্প চর্চ্চা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, তথাপি স্ত্রীলোকেরা এ বিষয় যথার্থতঃ পুরুষের মুখাপেক্ষিনী ইহা সত্য,

কিন্তু ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই—আমার মনে হয় স্ত্রীলোকের এই পরমুখাপেক্ষিতা ভগবৎ কৃত। নারীজাতির গর্ভধারণ ব্যাপারটীও তাহাদের স্বাবলম্বনের পথে একটি স্বাভাবিক কঠিনতম অন্তরায়—।

কিন্তু হিন্দু সমাজ স্ত্রীলোকদিগের যে সকল কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া দিয়াছেন, যদ্যপি তাঁহারা সেই সকল বিষয়ে প্রকৃত সুশিক্ষিতা হয়েন, তবে অবশ্যই তাহাদের কোন কষ্ট পাইতে হয় না। অভিভাবকের অভাব হইলেও আত্মীয়-স্বজনগণের নিকট তিনি যথেষ্টই সমাদৃত হইয়া থাকেন। যদ্যপি অদৃষ্ট ক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহা পুরুষেরই কর্ত্তব্য শিক্ষার অভাবের পরিচয়। সুতরাং সে স্থলে স্ত্রী-শিক্ষা সংস্কারের পরিবর্ত্তে পুরুষেরই—শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন।

এ কথাটী বোধ হয় খুবই সত্য যে, স্ত্রী বা পুরুষ কেহই একাকী উভয়েই শিক্ষণীয় সমস্ত ব্যাপার রীতিমত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না বা পারিলেও তদনুযায়ী কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে পারে না, যে শিক্ষা বাস্তবজীবনে কেবল শিক্ষামাত্রই সার হয় তাহার আলোচনা কেবল বৃথা সময় নষ্ট মাত্র। এই জন্যই সমাজ স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যাহার পক্ষে যেটী স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন, তদনুযায়ী করণীয় বা শিক্ষণীয় বিষয় সকল উভয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

উপস্থিত রমণীগণ যে রন্ধন সন্তান পালন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্তা আছেন, জীবনধারণ করিয়া পৃথিবীতে বাস করিতে হইলে সকলের পক্ষেই তাহার নিতান্ত আবশ্যক। প্রাচীন মতের বিপক্ষে যাঁহারা পুরুষদিগের সমান অধিকারে স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে চান, তাহাদের মতই যদি অভ্রান্ত ধরিয়া লওয়া যায় এবং তদনুসারে কার্য্য করা যায়, তবে সকল স্ত্রীলোকদিগকেই শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করা হইবে, ক্রমশঃ রমণীগণ যতই শিক্ষিতা হইতে থাকিবেন—ততই তাহারা পূর্ব্বাবস্থায় বিরক্ত এবং বিদ্যাচর্চ্চা অর্থনীতি রাজনীতি বিজ্ঞানানুশীলন প্রভৃতি বিষয়ে অনুরক্ত হইতে থাকিবেন। শিক্ষার কৃতকার্য্যতা বুঝা যায়, শিক্ষিত বিষয়ের প্রতি আসক্তি দেখিলে। ফলে তাঁহার রন্ধন সন্তান সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে কুশলতা হারাইয়া ক্রমশঃ ঐ সকল বিষয়ে এক প্রকার অপটুই হইয়া পড়িবেন। ইহা স্বাভাবিক হইয়াই থাকে। দেখা যায়, আমাদের দেশে অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক সম্পর্কীয় সংসারের অবস্থা খারাপ হইলেও প্রায়ই ঐ

সকল সংসারে স্ত্রী-কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য রাঁধুনী চাকর-চাকরাণী ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন হয়, ইউরোপীয় সুশিক্ষিতা মহিলাগণের গর্ভজাত সন্তান-গুলিকে পর্য্যন্ত অপরকে প্রতিপালন করিতে হয়। এইরূপে যে সকল কর্ম্মের ভার এখন আমাদের স্ত্রীলোকদের উপর ন্যস্ত আছে, তাঁহারা শিক্ষিতা হইলে ঐ সকল কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য অপর একশ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হইবেই হইবে।

কথিত প্রকার শিক্ষিতাগণ অবশ্যই সন্তান পালন রন্ধন গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য সমূহের ভার লইতে কখনই সম্মতা হইবেন না। কারণ এই সকল ব্যাপার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতগণের চক্ষে উত্তম কর্ত্তব্য নহে, অর্থাৎ হীন কার্য্য বলিয়াই গণ্য অন্ততঃ—(সাধারণ সমাজ উপস্থিত "শিক্ষিত" বলিতে যাহা বুঝেন) সেইরূপ সুসভ্য বা সুসভ্যা বিদ্বান বা বিদুষীগণের মধ্যে কাহাকেও স্বেচ্ছায় উক্তরূপ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে বা মনোযোগী হইতে দেখা যায় না, তাহা হইলেও সাময়িক অতি অল্প সময়ের জন্য, তাহাতে সংসারের কোন স্থায়ী উপকার হয় না বা ইহা দ্বারা সংসার সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে না। কোন অপরিহার্য্য কারণে যদি বা কাহাকেও ঐ সকল ব্যাপারে জড়িত থাকিতে হয়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে, তাহা দ্বারা ঐ সকল কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয় না; আর কর্ত্তারও অশান্তির অবধি থাকে না। অধিকন্তু তিনি এই সকল বিষয়ের সমাধান করিতে গিয়া যে সকল বিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন, সময় এবং চর্চ্চা সুযোগ সুবিধার অভাব হেতু সে সকল বিষয়ে কিছুই সুফল লাভ করিতে পারেন না। উক্ত শিক্ষা এইরূপে একরূপ বৃথাই হইয়া পড়ে, লাভের মধ্যে সকল বিষয়েই নানাবিধ অসুবিধা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। মানুষ সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত হইলেও একাকী স্ত্রী-পুরুষের সকল কর্ত্তব্য কেহই কখনও সম্পন্ন করিতে পারে না, একটি দিক অবলম্বন করিয়া তাহাকে চলিতে হয়, অতএব যে বিষয়টী অবলম্বনীয় সেই বিষয়েই উপযুক্ত শিক্ষা লাভে যত্নবান হওয়া উচিত।

যদি এরূপ ব্যবস্থা হয় যে, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উত্তমরূপে সকল বিষয়ে শিক্ষিত হইবেন, পরে কেহ বা সাংসারিক কার্য্যে কেহ বা অপরাপর কার্য্যের ভার লইবেন। ইহাতেই বা লাভ কি? প্রথমতঃ বহু বিষয়ে শিক্ষা করিতে গেলে কোনটিই সম্পূর্ণ হয় না, তারপর ব্যবহারিক জীবনে

যিনি যে, বিষয়ের ভার লইবেন, তাঁহার সেই বিষয় ভিন্ন অপরাপর শিক্ষা গুলি কোনই কাজে আসিল না, কিম্বা সকল বিষয়েই যদি পরস্পর পরস্পরের সাহায্য লইয়া কার্য্য করিতে চাহেন তাহাতেও বেশ একটা সংসারের প্রতি মমত্ব বোধ থাকাতেই তাহাদের উপর লাভের মধ্যে হয় ত বিষয়গুলি একত্রীভূত হইয়া একটাকিম্ভুত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা কি সমাজের পক্ষে সুবিধাজনক? কিন্তু দুইটি বিভিন্ন বিষয়ে দুইজনে যদি উত্তমরূপ শিক্ষিত হইয়া তত্তৎ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তাহাতে সমাজের সবিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা আছে। শিক্ষার দ্বার সকলের পক্ষে সমানভাবে উন্মুক্ত থাকিলেই যে, সকলেই সমানভাবে সুশিক্ষিত হইবে, তাহা হইতে পারে না। সুতরাং নানাকারণে যাহারা শিক্ষিত হইতে পারিবে না, তাহারাই শিক্ষিতগণের সাংসারিক কার্য্যে নিয়োজিত হইবে এ বিষয়ে কিন্তু অর্দ্ধ শিক্ষিতগণকেও উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে, কারণ অর্দ্ধ শিক্ষিতগণ প্রায়ই উচ্চ শিক্ষিতগণের আচার ব্যবহারাদির অনুকরণ করিয়া থাকেন, দুঃখের বিষয় তাঁহাদের গুণ গুলি অনুকরণ করা ইহাদের সামর্থ্যে কুলায় না, কিন্তু দোষগুলির অনুকরণ রীতিমতভাবেই করিয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকদিগের সম্পাদনীয় ব্যাপার সকল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ! শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও যাহারা অক্ষমতা প্রযুক্ত শিক্ষিত হইতে পারে না, এরূপ বাছা বাছা জড়ত পিণ্ডস্বরূপ অশিক্ষিত ব্যক্তির ঐ সকল বিষয়ে নিয়োগ কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পরে না, আরও সাংসারিক ব্যাপারে তাহাদের দক্ষতা থাকিলেও তাহারা বেতনভুক্ কর্ম্মচারীমাত্র হইবে, "ইহা আমার সংসার" এবম্প্রকার আন্তরিক টানের উপযুক্ত কোনও সমন্ধ তাহার সহিত থাকিবে না, সুতরাং এই সকল কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন লোকদের দ্বারা সুচারুরূপে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার আশা খুবই অল্প, বিশেষতঃ খাদ্য প্রভৃতি প্রস্তুত বা বংশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল, সন্তানসন্ততি লালন পালন প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের ভার এই সকল লোকের উপর কখনই দেওয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু স্ত্রীলোক অন্যান্য বিষয়ে অশিক্ষিতা হইলেও একপ্রকার রীতিমত শৃঙ্খলা স্থাপন কষ্টসাধ্য হইয়া পরে সংসারের ভার নিঃশঙ্কচিত্তে দেওয়া যায়, ঐ মমত্ব বোধ থাকাতে তাঁহারা সংসারের অকৃত্রিম কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া থাকেন এবং যাহাতে সংসারের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়, তজ্জন্য নানাপ্রকারে বিধিমত চেষ্টা করিয়া অনতিকাল মধ্যেই মোটামুটি উপযুক্ততা অর্জ্জন করিয়া লয়েন

এইজন্য সমাজ সংসারের সকল ব্যাপারই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সংসারের ভিতরের দিকে স্ত্রী-জাতির এবং বাহিরের দিকে পুরুষের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে যেখানে স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাব নিতান্ত বেশী সেখানে তো বেশ সুশৃঙ্খলায় কার্য্য সকল নির্ব্বাহ হয়, কোনও অসুবিধাই হয় না? এ কথা সত্য। কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক প্রভেদ দেশ, কাল, পাত্র, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সুবিধা, অসুবিধা, এমন কি সুখ দুঃখের অনুভূতিতে পর্য্যন্ত বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় আমাদের কোনও কোনও বিধি ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে অথবা তাহাদের কোনও কোনও সামাজিক আচার ব্যবহার যে, আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বা অনিষ্ট কর হইতে পারে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? তবে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্টতা সকলগুলি বিসর্জ্জন দিয়া যদি সকল বিষয়েই তাহাদের অনুকরণ করিতে পারি, তাহা হইলে হয় ত তাহাদের স্ত্রী-শিক্ষার অনুকরণ আমাদের পক্ষেও তাদৃশ অসুবিধা জনক না হইতে পারে, কিন্তু এইরূপভাবে সমস্ত পরিবর্ত্তন করিয়া যদি সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হয়, তবে তাহাকে কি—আমাদের সমাজে স্ত্রীশিক্ষার সংস্করণ বলিব? না আমাদের সমাজের বিসর্জ্জন সাদা কথায় জাত হারান বলা উচিত। শিক্ষার প্রয়োজন সর্ব্বত্রই বটে, তবে এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণ কখনই যুক্তিযুক্ত নহে, আমাদেরই সমাজ নির্দ্দিষ্ট স্ত্রী কর্ত্তব্যের বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

আমাদের আচার ব্যবহার সম্বলিত সমাজটী যেভাবে গঠিত তাহা দেখিলেই বোধ হয়, যেন পুরুষ ঐ সমাজ দেহের মস্তক এবং রমণী ইহার হৃদয় স্বরূপ উভয়ই তুল্য ভাবেই প্রয়োজন, কাহাকেও বাদ দিয়া কেহ দাঁড়াইতে পারে না অথচ একের কর্ত্তব্যে অন্যে নিতান্তই অনভিজ্ঞ উভয়েরই একটা বৈশিষ্টতা আছে! আর ইউরোপ প্রভৃতি দেশে পুরুষ সমাজের দক্ষিণ হস্ত এবং রমণী বাম হস্ত স্বরূপ উভয়েই অনেকটা স্বতন্ত্র, একের কর্ত্তব্যেও অপরে অল্পাধিক সাহায্য করিতে পারে।

ইউরোপ প্রভৃতি দেশে এই প্রকার স্ত্রীশিক্ষা অমানুষিক উদার স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত থাকাতেই আমার মনে হয় যে, সামাজিক ব্যাপারে বিশেষ কোন ক্ষতি না হইলেও উহাদের সাংসারিক বন্ধনটা তেমন বেশ নিবিড়তর হইতে পারে না, যাহা আমাদের নিতান্তই আকাঙ্ক্ষার বস্তু এবং প্রায়শঃই

যাহা আমারের ভাগ্যে দুর্ল্লভ নহে। ঐ সকল স্বাধীনতার দেশে কোন কোন জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে ঐক্য সত্য বা স্বজাতি প্রীতির চরম উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অন্যের পক্ষে আদর্শ স্থল, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও স্বাধীনতার আধিক্য বশতঃই পারিবারিক প্রীতির দাম্পত্য-প্রেমের মূল কিছু শিথিল, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কিছু অতিরিক্ত আত্মসুখ পরায়ণ; সংসারে তেমন আপন ভোলা ভাবটী পরের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া নিজের সুখ দুঃখের অনুভূতি ভাবটী যাহা আমাদের সমাজের অস্থি-মজ্জাগত এই দুঃখ দারিদ্র্য ঈশ্বরীভূত হিন্দু সমাজের যাহা জীবনী শক্তি স্বরূপ (অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাবল্যেই ক্রমশঃ ইহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংসার হইতে শান্তিও তিরোহিত হইতেছে) সেই অতুলনীয় অনির্ব্বচনীয় অমৃত ধারার সহিত পাশ্চাত্য জগতের বড় একটা সম্পর্ক নাই, এজন্য অবশ্য তাহাদের সমাজের অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহযোগে বিশেষ ক্ষতি জনক না হইলেও আমাদের পক্ষে উহা মোটেই কল্যাণ জনক নহে।

তথাপি আমাদের সমাজ রমণীদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছেন, একথা বলিলে সমাজকে নিতান্তই মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। অবশ্য যে সকল বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা থাকিলে সমাজের অনিষ্টের সম্ভাবনা, সেই সকল স্থানে আবশ্যক মত স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই স্বাধীন বৃত্তির সমান ভাবে সঙ্কোচ সাধন করিয়াছেন, ইহাই সমাজের কর্ত্তব্য।

স্ত্রী এবং পুরুষ দুইটি জাতি, তন্মধ্যে স্ত্রীজাতি স্ত্রীজাতীর সহিত এবং পুরুষ পুরুষ জাতির সহিত অবাধেই মেলা মেশা করিতে পারে, ইহাতে সামাজিক কোন বাধাই নাই, তবে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহিত অবাধে মেলা মেশা করিতে পারে না, এ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্বাধীন বৃত্তি সমাজ কর্ত্তৃক সমানভাবে নিয়মিত কারণ এই প্রকার স্ত্রী পুরুষ অবাধ মিলন চারিদিক্ বল হ্রাসের একটি প্রধানতম কারণ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে নারী জাতি পুরুষদিগের সহিত শিক্ষা ব্যাপারে সকল বিষয়ে সমান অধিকার পাইলে কর্ম্মক্ষেত্রে ও পুরুষদিগের সহিত সকল বিষয়েই সমব্যবসায়ী হইয়া পড়িত, এরূপ ক্ষেত্রে কর্ম্মানুরোধে পরস্পরের অবাধ মিলন অবশ্যম্ভাবী, এবং তাহাতে স্বেচ্ছাচারিতার আশঙ্কাও অত্যন্ত প্রবল এজন্য ও শিক্ষা ব্যাপারে স্ত্রীলোকদিগের পাশ্চাত্য আদর্শ অনুপযুক্ত।

শিক্ষিত বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে নিজের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা কিছুই কঠিন ব্যাপার নহে, এ প্রকার অভিমতের মূলে অতি কঠিন সত্য নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু এরূপ শিক্ষাও এতই কঠিন যে, জগতের মধ্যে এরূপ শিক্ষিত ব্যক্তি কদাচিৎ দু একটি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রী পুরুষ যে পরস্পর পরস্পরের নিকট স্বতই লোভনীয় ইহাই সুনিশ্চিত; লোভনীয় বস্তু লইয়া খেলা করিতে করিতে সংযম শিক্ষার পরীক্ষা করা অপেক্ষা তাহা হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়স্কর, ইহাই প্রকৃত শিক্ষিতগণের অভিমত একখানি জল সিক্ত বস্ত্র প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্দে ফেলিয়া দিলে তাহা সিক্ত থাকিতে থাকিতেই পুড়িয়া যায়, কিন্তু অগ্নির সংস্পর্শে না থাকিলে সিক্ত বা অসিক্ত কোন বস্ত্রই পুড়িতে পারে না, এই জন্যই স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলনের স্বাধীনতা সৎ সমাজে নিষিদ্ধ। অবৈধ অনিষ্টকর ব্যাপারের পরিবর্জ্জনই যুক্তিযুক্ত।

পল্লীগ্রামই দেশের সর্ব্বস্ব। যাঁহারা পল্লীগ্রামের খবর রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন সেখানকার অবলাগণ কিরূপ গৃহকোণে আবদ্ধ। সেখানে সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য সমাপনান্তে স্ব স্ব সঙ্গিনীগণের সহিত যথেচ্ছ মিলিত হইয়া তাঁহাদের শান্ত এবং স্বভাবের অনুকূলজনক ক্রীড়া কৌতুক হাস্য পরিহাসাদির দ্বারা সময়াতিপাত করিয়া থাকেন, যেমন আমরা পুরুষেরা করিয়া থাকি। সত্য বটে, তাঁহারা সকালে সন্ধ্যায় খোলা মাঠ বা নদীর তীরে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাওয়া খাইয়া বেড়াইতে পারেন না ইহা আমিও স্বীকার করি যে,—পুরুষের কর্ম্মজীবন ঘরের বাহিরে বলিয়াই—বাহিরেই তাহার অধিকার একটু বেশী এবং স্ত্রীলোকদিগের কর্ম্মজীবনী অন্দর মহলে বলিয়া সেইখানেই তাহার অধিকার বেশী, এজন্য তাহাদের খাঁচায় বদ্ধ পাখীটির মত অবস্থা বলিয়া সমাজের প্রতি হীন কটাক্ষপাত করা সুবিবেচকের কার্য্য নহে।

নব্যতান্ত্রিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত, ইহা অবশ্যই অতি উত্তম সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহাদের শিক্ষার একটা সংস্কার করা এবং যাহাতে শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্তই প্রয়োজন, কিন্তু তাঁহারা যে, শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচন ব্যাপারে নিতান্ত ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন, একথাও শত সহস্রবার বলিব।

স্ত্রীলোকদিগের যে কিরূপভাবে শিক্ষার সংস্কার হওয়া প্রয়োজন, তাহার নির্দ্ধারণ অবশ্য আমার মত ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সম্ভবে না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমাদের প্রাচীন সমাজ স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে সকল বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বস্তুতই তাহাদের পক্ষে যোগ্যতর এই সকল বিষয়ের শিক্ষার অধিক কষ্টসাধ্য নহে। ইহাতে অতিরিক্ত মাস্তষ্ক চালনারও প্রয়োজন হয় না, এবং এই সকল কর্ত্তব্য সাধনে যে পরিশ্রম হয়, তাহা দুর্বলা স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যের পক্ষেও অননুকুল নহে, পরন্তু এই সকল কর্ত্তব্য সম্পাদনের দ্বারা ক্রমশঃ তাহাদের মন বেশ পবিত্র সরল উদার হইয়া উঠিতে থাকে, কারণ স্ত্রী কর্ত্তব্যের অধিকাংশই স্বার্থত্যাগের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে শরীরের বা মনের কোন অঙ্গহানি হইবার সম্ভাবনা নাই, আরও সমাজেরও ইহাতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

পরন্তু এই সকল ব্যাপার স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতিরও সম্পূর্ণ উপযুক্ত! ভগবান আপন বক্ষরক্ত দিয়া সংসারের সেবা করিবার জন্যই এই কোমলা প্রকৃতি নারী মূর্ত্তির গঠন করিয়াছেন, সাক্ষাত—সর্ব্বং সহা ধরিত্রীর মত ধৈর্য্যশীলা করুণায় প্রস্রবণ স্বরূপিণী—এই নারী জাতি যদি আজ ভগ্নিরূপে, কন্যারূপে, পত্নীরূপে বা মাতৃরূপে এই তাপিত আর্ত্ত সংসারের ভার না লইতেন—যাহা স্বভাব কঠিন অসহিষ্ণু পুরুষ জাতির দ্বারা কিছুতেই সম্ভবে না, তবে আজ সংসারের যে, কি শোচনীয় পরিণাম হইত—তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না; এই সারা বিশ্বখানির প্রতিপালনের ভার গ্রহণ, ইহা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কি লজ্জার বিষয়; না অতি বড় গৌরবের বিষয়?

স্বভাবগত অধিকার থাকিলেও সকল বিষয়েই শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা না পাইলে কোন বৃত্তিরই সমাকরূপে পরিস্ফুরণ হয় না, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপার প্রাচীনবাদী বা পাশ্চাত্যবাদী সকলেই নিজ নিজ খেয়াল লইয়াই বিভোর, এ বিষয়ে প্রকৃত মনোযোগী কেহই নহেন।

এমতাবস্থায় নারীজাতির প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে উন্নতির আশা কিরূপে করা যায়। বরঞ্চ এই উভয়দলের বিভিন্নমতের বশীভূত হইয়া অবলাগণের একটা জগাখিচুড়ীর মত অবস্থা ক্রমশঃই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে, এ অবস্থায় উন্নতির আশা অপেক্ষা অবনতির আশঙ্কাই অধিক। এখন ঈশ্বরানুগ্রহে যদি ভ্রান্ত মুগ্ধ নেতৃগণের বিকৃত ধারণা অপসৃত হইয়া প্রকৃত স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তবেই সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বীণার তার।

লেখক,—শ্রীযুত জীবঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(১)

তাহার নামটী ছিল মোহন; সে আগে ছিল না, পরে হইয়াছিল বোবা। মোহন নামটী তাহার উপযুক্তই ছিল। চাঁপার মত তাহার রংটি সুন্দর, ফুলের মত তাহার দেহটি নধর, কামের ধনুকের মত যুগ্ম ভ্রূ, আর সব চেয়ে সুন্দর ছিল তাহার মুখের স্বর্গীয় সরলতা। মোহন পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবক।

পাটলীপুত্র নগরের নির্জ্জন প্রান্তে তটিনীতটে সে একখানি ভগ্ন কুঁড়েতে বাস করিত। তাহার পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন কেহই নাই। পাঁচ বৎসর ধরিয়া পাটলীপুত্রবাসীরা তাহাকে এই কুঁড়েতে বাস করিতে ও দুই বেলা মহারাজ অশোকের অতিথিশালায় ভোজন করিতে দেখিতেছে। সে কি জাতি বা তাহার আদি বাসস্থান কোথায়, তাহা কেহই জানিত না। কেবল তাহার গলদেশের শুভ্রউপবীতগুচ্ছ তাহাকে ব্রাহ্মণতনয় বলিয়া জানাইয়া দিত। ছন্নছাড়া জীবনটাকে সে এইরূপ ভাবেই কাটাইয়া দিতেছিল।

কি জানি কি এক দুঃখের করুণ ছবি তাহার ভাসাভাসা চোখ দুটীতে সর্ব্বদাই ভাসিয়া বেড়াইত। যেন মনে হইত, সারা জীবনটা তাহার একটা দীর্ঘশ্বাসে নির্ম্মিত যেন সে একটা কক্ষভ্রষ্ট উল্কা—কেন্দ্রচ্যুত হইয়া দুনিয়ার ব্যথা বক্ষে পুরিয়া—আপনার আগুনে আপনিই জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতে হইতে মহাশূন্যের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথায় যে তাহার বিরতি তাহা যেন সে জানে না। কিন্তু আর সে পারে না—ছন্নছাড়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট একঘেয়ে জীবনটা আর ত সে বহন কর্ত্তে পারে না। তাই মাঝে মাঝে সে আকাশের দিকে তাকাইয়া উপরওয়ালার চরণে বোধ হয় তাহার নীরব প্রার্থনা জানাইত।

তাহার এই আত্মীয়স্বজন বিহীন ব্যর্থজীবনটার একমাত্র অবলম্বন ছিল

একটী ভগ্ন বীণা! বৃদ্ধ বয়সের পুত্রের ন্যায়, অন্ধের যষ্টির ন্যায় এটাকে সে সর্ব্বদা বুকে বুকে লইয়া বেড়াইত। প্রভাতে যখন পাখীরা প্রভাতী গাহিয়া তাহাকে জাগাইত, তখন সে ভগ্ন বীণাটীকে লইয়া নদীতীরে গিয়া বসিত। প্রভাতের নূতন সৌন্দর্য্যে সে মুগ্ধ হইয়া যাইত। সবুজ মখমলের মত ঘাসগুলিতে শিশির মাখান; নদীর ধারের রক্তজবার গাছ হইতে হয়ত গোটাকতক জবা খসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। মোহন তাহাই দেখিত, আর ভাবিত, বুঝি কোন নৈশ অভিসারিণী ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, তাই তাহার অশ্রুজলে ঘাসগুলি ভিজিয়া গিয়াছে, বুঝি তাহার চরণকমলস্পর্শে স্থলপদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে, কল্লোলিনীর কুলু কুলু ধ্বনি যেন তাহার বিলাপগাথা; প্রভাতী পবন যেন তাহারই প্রসাধনের সুরভিগন্ধে ভারাক্রান্ত। তখন বাজিয়া উঠিত, মোহনের বীণা হইতে একটা করুণ সুরের হাহাকার ধ্বনি।

সন্ধ্যার ঘন আবরণ যখন পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়িত—মন্দিরে মন্দিরে আরত্রিকের গম্ভীর ওঙ্কারময়ধ্বনি যখন ব্যোমপথে বিলীন হইয়া যাইত, মোহন তখন বীণাখানি লইয়া নদীতীরে গিয়া বসিত। দিনের চিতা বহুক্ষণ হইল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অস্তগামী সূর্য্যের শেষরশ্মিমচ্ছটা বহুক্ষণ পূর্ব্বেই নদীর ছোট ঢেউ গুলিকে বিদায় চুম্বনে রঙিয়া দিয়াছে। সন্ধ্যারাণী একরাশ অন্ধকারের চুল উড়াইয়া তারকাখচিত নীলাম্বরী পরিয়া নীলাম্বরে উদিত হইয়াছেন। পাখীদের প্রত্যাবর্ত্তন গীতি শেষ হইয়া গিয়াছে, শুধু দুটা চক্রবাক্ চক্রবাকীর বিরহগীতি সেই সন্ধ্যাসমীরণে বিষাদ ঢালিয়া দিতে ছিল। কি করুণ গান সে! সেই গীত যেন বলিয়া দিতেছিল, "ওগো কোথায় তুমি? তুমি আছ, কিন্তু কতদূরে? মাঝে যে এক বিশাল তটিনী ফেণিলাক্ত হইয়া উঠিতেছে। ওগো কোন্ নিষ্ঠুর আমাদের মাঝে এই ব্যবধান সৃজন করিল?"

মোহনের স্বভাব কাতর প্রাণ, এই করুণ গীতিতে কাতর হইয়া উঠিত, আর সেই কাতরতা সে প্রকাশ করিত সুর লয়ে। বীণা বাদনকালে সে তন্ময় হইয়া যাইত। দারা উদারা ছাড়াইয়া তাহার বীণা তারা গ্রামে খেলিত। সে শুধু বাজাইয়াই যাইত; সম্মুখে তটিনীর আনন্দের অস্ফুট কাকলী, পাখীদের স্তোত্রগান, পিকবধূর মধুর তান, চাঁদের সোহাগ মাখিয়া ফুলের নৃত্য;—আর এই আনন্দের হাটে মোহন একটীর পর আর একটি

করিয়া ছড়াইত বিষাদের সুর। অবশেষে অতিথিশালা হইতে যখন আহার সূচক ঘণ্টানাদিত হইত, মহারাজ অশোকের নহবৎখানায় যখন মধ্যরজনী আলাপন আসিয়া যাইত, ধীরে ধীরে মোহন তখন উঠিয়া দাঁড়াইত। বেদনা মথিত বক্ষপঞ্জর কাঁপাইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস নৈশপবনস্বননে মিলাইয়া যাইত; তারপর মুক্তহস্তে উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া সে বলিত, "আর কতদিন প্রভু এ মূক জীবনের বোঝাটা টেনে বেড়াব? কতদিন,—আর কতদিনে দয়াময়?" তারপর সে কুটীরে বীণাখানি রাখিয়া, অতিথিশালায় আহারাদি শেষ করিয়া আসিয়া শয়ন করিত। জীবনের এক ঘেয়ে দিন গুলা তাহার এমন ভাবেই কাটিতেছিল।

* * * *

নীরব নিশার স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বড় করুণসুরে বীণা বাজিতেছিল। সে সুর যেন রোদনের বুকফাটা ধ্বনি—যেন মূর্ত্ত বিষাদের মৌন দীর্ঘশ্বাস।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দজীউর প্রধানা নর্ত্তকী ললিতা তখন গাত্রধৌত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল; সহসা দূরে বীণা কাঁদিয়া উঠিল। ললিতা থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রায় আট বৎসর হইতে চলিল সে গোবিন্দজীউর মন্দিরে আছে, কত বিখ্যাত বাদকের সহিত সে গাহিয়াছে, কিন্তু এমন প্রাণমাতান বাদ্য সে ত আর কখনও শোনে নাই। বীণা অনেকেই বাজাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের বীণা ত কাঁদিয়া কাঁদাইতে পারে না। সর্প যেরূপ সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়, ললিতাও তদ্রূপ বাদ্যে মুগ্ধা হইয়া বাদকের অনুসন্ধানে চলিল।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, পৃথিবী রূপার পিচকারী গায়ে মাখিয়া হাস্যময়ী, লাস্যময়ী সম্মুখে তরঙ্গিনী অশ্রান্ত তানে গাহিয়া চলিয়াছে উপরে পাপিয়া দোয়েলের সপ্তম তানে গগন প্লাবিত। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া ললিতা দেখিল, এক প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দর তরুণ যুবক বীণা বাজাইতেছে। সম্মুখে লোকালয় নাই, তটিনী ও বনরাজি ব্যতীত অপর শ্রোতাও নাই, বাদকের কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য নাই, আপনার বাদ্যে আপনিই সে বিভোর। তাহার চক্ষু দুইটি মুদ্রিত; সেই মুদ্রিত চক্ষুর প্রান্তদেশ হইতে একটির পর আর একটি শুভ্রমুক্তাফল বাদকের ছিন্ন বস্ত্রটী সিক্ত করিতেছিল। ললিতা বিস্মিতা হইয়া এই অদ্ভুত বাদ্য শুনিতে লাগিল। সে যে সিক্ত বস্ত্রে আছে, তাহাকে যে মন্দিরে ফিরিতে হইবে, ইত্যাদি প্রশ্ন তাহার

মনে একবারও আসিল না। বহুক্ষণ পরে বাদ্য থামিয়া গেল, বীণার সুর অনন্ত হইতে অনন্তেই মিলাইয়া গেল, রহিল শুধু রেশটী, শুধু ঝঙ্কারটী। বাদ্য শেষে মোহন বীণাটিকে একপার্শ্বে রাখিয়া উত্তরীয় প্রান্তে চক্ষুদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া দেখিল, সম্মুখে এক দেবীমূর্ত্তি। বিস্ময়ে মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল। পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ সে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় এই নির্জ্জন নদীতটে বসিয়া আলাপচারী করিতেছে, একদিনও ত কেহ আসে না, তবে এই দেবীবিনিন্দিতা সৌন্দর্য্যের প্রতিমা স্বরূপ এই অদৃষ্টপূর্ব্বা নারী কোথা হইতে আসিল। মোহন শুধু চাহিয়াই রহিল, সহসা ললিতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই ললিতার চক্ষুর সহিত তাহার চক্ষুদ্বয় সম্মিলিত হইল। উভয়েরই দেহে শিহরণ খেলিয়া গেল, উভয়েই তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত করিল। অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি উভয়েই নীরব। বহুক্ষণ পরে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ললিতা বলিল, "মশাই ত বড় সুন্দর বাজাতে পারেন; আপনার নিবাস কি এই সহরেই?"

মোহনের কর্ণে যেন শত বেণুবীণা ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, উত্তর দিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল; কিন্তু কি করিয়া সে উত্তর দিবে? সে যে মূক, ইহা যে তাহার দারুণ পরাজয়। শুধু সে তাহার আয়ত লোচনদ্বয় ললিতার দৃষ্টিতে ব্যাকুলভাবে স্থাপন করিয়া চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি যেন বলিয়া দিতেছিল, "ওগো আমি না যে আমি—কথা কহিতে আমি যে পারি না, আমি যে মূক; সমস্ত জীবনটাই যে, আমার ব্যর্থতায় ভরা।" উত্তর না পাইয়া ললিতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের নিবাস কি এই সহরেই?"

এইবার মোহন ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে সে মূক!

বোবা! এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবকটী বোবা!! প্রাণ যাহার এমন গানে ভরা, হাত যাহার এমন মিষ্ট, দৃষ্টি যাহার এমন প্রশান্ত, সে বোবা!!! বিধাতার কি কোনই বিধান নাই? মঙ্গলময় তাঁহার কোন মঙ্গলসাধনের জন্য এনন কিশোর প্রাণকে বিষাদময়, এমন তরুণ জীবনকে হাহাকারে পরিণত করিয়াছেন? ললিতা এই অজ্ঞাত মূক যুবকের জন্য প্রাণে কেমন একটা ব্যথা অনুভব করিল। সহানুভূতিপূর্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার বাড়ী কোথায়? মোহন অঙ্গুলি সঙ্কেতে আপনার কুটীরখানা দেখাইয়া দিল।

'গৃহে কে কে আছেন?'

মোহন শিরসঞ্চালন পূর্ব্বক জানাইল, কেহ নাই।

'আপনি কি আত্মীয়স্বজন ছেড়ে এই সহরে একা বাস কচ্ছেন?'

মোহন জানাইল তাহার কেহই নাই।

ললিতা ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার আত্মীয়-পরিজন কোথায়?'

একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া মোহন হাত তুলিয়া আকাশের দিকে দেখাইল।

কেহ নাই। এই মূক জীবনে শান্তি প্রদান করিতে, হতভাগ্যের অভিশপ্ত অধরে একটু হাসির রেখা ফুটাইবার কেহই নাই রে! হায় রে বেচারা। ব্যথাভরা চক্ষু দুটী নত করিয়া ললিতা ভাবিতে লাগিল। সহসা মাথার উপর পেচক ডাকিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া ললিতার চমক ভাঙ্গিল। রাত্রি বেশী হইয়াছে বুঝিয়া সে দ্রুতপদে মন্দিরের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আসিবার সময় লইয়া আসিল হৃদয়ভরা পুঞ্জীকৃত বেদনা আর মোহনকে দিয়া আসিল আবেশময় একদৃষ্টি।

(২)

সেইদিন হইতে প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কাহার নূপুরের রিনিঝিনি শুনিবার জন্য মোহন উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। প্রত্যহ ললিতা এই দুই সময় গাত্র ধৌত করিবার জন্য নদীতীরে আসিত। মোহন সব ভুলিয়া ব্যাকুল আগ্রহের সহিত এই সময়টুকুর জন্য অপেক্ষা করিত। যথা সময়েই ললিতা আসিত, মোহনের নিকট কিছুক্ষণ বসিত, তাহার পর চলিয়া যাইত। প্রভাতে যখন গাত্র মার্জ্জনীটী স্কন্ধে ফেলিয়া বামকক্ষে কলস লইয়া দক্ষিণ হস্তে দন্ত মার্জ্জনা করিতে করিতে ললিতা গজেন্দ্র গমনে স্নান করিতে আসিত, মোহন তখন মুগ্ধ ভক্ত যেরূপে তাহার উপাস্যদেবীকে দেখে সেইরূপ ভাবেই চাহিয়া থাকিত। স্নানের পর সে সিক্ত কেশ-রাশি পৃষ্ঠে এলাইয়া পূর্ণ কলস কক্ষে বনের আঁকা বাঁকা পথে যে জলের রেখাটি আঁকিয়া যাইত, মোহন মৌনপ্রশংস দৃষ্টিতে তাহা চাহিয়া দেখিত। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মোহন কি ভাবিত; তাহার মনোদর্পণে ঠিক এইরূপই একখানা ছবি ভাসিয়া উঠিত। সেটা—সেটা যে কি মোহন তাহাই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না, তবে যদি তাহার এই হৃদয়ের রক্তে আঁকা

ছবিটি বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়া যায় তবে বুঝি সে বড়ই আনন্দিত হয়। সেই হতভাগা মূক যুবক ইহার বেশী আর কিছুই ভাবিতে পারিত না। ললিতাই যে তাহার মানসীবধু বুঝি বুঝি করিয়াও সে তাহা বুঝিতে পারিত না। না পারিলেও ললিতার আগমনে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, ললিতা কথা কহিলে সে হাঁ করিয়া তাহা শুনিত, ললিতা নিকটে থাকিলে সে ভূত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া যাইত; ললিতা চলিয়া গেলেই যেন জগতের আলো তাহার চক্ষে নিভিয়া যাইত, আবার তাহার মুখে সেই স্বভাব সিদ্ধ বিষাদের ছবি ফুটিয়া উঠিত।

ললিতারও একটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে। সেই যে রাত্রে সে বীণাধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া নগরোপকণ্ঠে গিয়াছিল আর কিছুতেই সে পথ সে আর ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। প্রত্যহই সে মনে করিত যে ও পথ দিয়া সে আর যাইবে না কিন্তু প্রত্যহই সে পুনরায় যাইতে বাধ্য হইত। মনে পড়িত তাহার, 'দুখানা টানা চোখে' ব্যাকুল দৃষ্টি পুরিয়া একজন তাহার আগমন প্রতীক্ষায় বনপথে চাহিয়া রহিয়াছে। সে কি না যাইয়া তাহার কিশোর প্রাণটা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে? প্রভাতে ও সন্ধ্যায় যখন সে চক্ষু মুদিয়া গোবিন্দজীউর ধ্যানে নিমগ্ন হইত তখন সে আর পূর্ব্বকার মত মনোমধ্যে গোবিন্দজীউর দর্শন পাইত না, ভাসিয়া উঠিত তৎপরিবর্ত্তে সেই আত্মীয় পরিজনচ্যুত মূক যুবকটীর ছবি। ললিতা অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিত; কঠিন প্রস্তরাবৃত গোবিন্দজীউর মন্দির গৃহতলে মাথা কুটীয়া বলিত, 'ঠাকুর, ঠাকুর কি সর্ব্বনাশ কল্লে? আর যে আমি তোমায় খুঁজে পাচ্ছি না; আমি যে তোমার দাসী প্রভু! দেবকার্য্যে যে এ দেহ উৎসৃষ্ট! রমণীর সর্ব্বনাশ কোর না; দয়া কর প্রভু—রক্ষা কর প্রভু—ক্ষমা কর প্রভু! ললিতা কাঁদিত আর মাথা কুটিত, কিন্তু কিছুতেই যে ছবিখানা তাহার মন যুড়িয়া রহিয়াছে সেটাকে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না।

উভয়ের এই ভাবের বিরতি যে কোথায় হইত, তাহা বলিতে পারি না। সহসা একদিনের ঘটনায় সমস্ত উল্‌টাইয়া গেল। সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা। অশোকফুলের মুখ চুম্বন করিয়া, বকুল গাছের শাখা দোলাইয়া 'ফাগুনের আগুন হাওয়া' বাহিয়া যাইতেছিল। পূর্ণিমার সুধাপান করিয়া কোকিলগুলা যেন পাগল হইয়া গিয়াছিল। বকুল গাছে একটা পাপিয়া

একটা দাধিয়াল যেন উভয়ের মধ্যে কাহার গলার জোর বেশী তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অদ্য গোবিন্দজীউর বসন্তোৎসব। কল্য বৈকালে গাত্রধৌত করিতে আসিয়া মোহনকে ললিতা বলিয়াছে যে, আজ সন্ধ্যার তাহাকে গোবিন্দজীউর মন্দিরে যাইতে হইবে। গোবিন্দজীউর বসন্তোৎসবে পাটলী পুত্রবাসীরা সকলেই প্রধানা দেবদাসী ললিতার নৃত্য গীত শুনিতে আসিবে। পরম ভট্টারক, পরম বৈষ্ণব, রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজাধিরাজ বৃহদ্রথ ও পট্টদেবী বিদ্যুৎবরণী অদ্য দেবদর্শনে আসিবেন। ললিতা মোহনকে বলিয়াছে অদ্য তাহার গীতের সহিত মোহনকে বাজাইতে হইবে মোহনও তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছে।

বৈকাল হইতেই রাজপথে জনস্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তরুণীরা প্রসাধনান্তে দেবমন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে। ক্ষীণকটি বেষ্টন করিয়া কাহারও নীলাম্বরী শাটী কাহারও অঙ্গে ফিরোজরঙ্গের ওড়ণা কাহারও কেশরাজি অগুরু সংস্কৃত। তাহারা ঠমকে ঠমকে, হেলিয়া দুলিয়া পথ আলো করিতে করিতে দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। এমনই রাতে এমনই বেশে গোপকুমারীরা না যমুনাতটে অভিসারে যাইত? হায় রে, সেই রাত, আর এই রাত!!

সন্ধ্যা হইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মোহনও সেই চঞ্চল জনস্রোতের সহিত যোগদান করিয়া গোবিন্দজীউর মন্দিরে চলিল।

(৩)

বিস্তীর্ণ আসর। মন্দির মধ্যে বসন্তোৎসবের অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত গোবিন্দজীউ। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে দুইখানি উচ্চ কিংখাব কার্পেট মণ্ডিত সিংহাসনে মহারাজাধিরাজ বৃহদ্রথ ও মহাদেবী বিদ্যুৎবরণী আসীনা। মহারাজের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রধান প্রধান অমাত্য ও পাটলীপুত্রবাসীরা উপবিষ্ট। তাঁহাদের পশ্চাতে সাধারণ ভদ্রবৃন্দের ও তাঁহাদের পশ্চাতে অন্যান্য সকলের আসন। মহারাণীর দক্ষিণে সম্ভ্রান্ত মহিলারা, তাঁহাদের পশ্চাতে অন্যান্য ভদ্র ঘরনীরা ও তাঁহাদের পশ্চাতে সাধারণ নারীরা আসীনা। সমস্ত সভাটী সুগন্ধি চন্দন তৈলের আলোকে উদ্ভাসিত। সকলই প্রস্তুত, কেবল বিগ্রহের আরত্রিক হইয়া গেলেই নৃত্য গীত আরম্ভ হইবে।

ধীরে ধীরে মোহন সভাস্থলে উপনীত হইল। তাহার সুপ্রশস্ত ... চন্দন চর্চ্চিত, পরিধানে একখানি জরাজীর্ণ কৌষেয় বাস, সুঠাম ... সে রাঙ্গা জরাজীর্ণ, এক কৌষেয় উত্তরীয়কে আবৃত। বামহস্তে

ভগ্নবীণাটী, তাহাকে দেখিয়াই বোধ হইতেছিল যেন এই আনন্দের মেলায় সে বিষাদ ছড়াইতে আসিয়াছে, যেন এ সভায় তাহার স্থান নাই; যেন সে অনধিকার প্রবেশকারী। কুণ্ঠিত মোহন ধীরে ধীরে জনসাধারণের পশ্চাতে একটু স্থান করিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

যথাসময়ে দেবতার আরত্রিক সমাপ্ত হইল। দুইজন বন্দী মহারাজের যশোগাথা গান করিলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

একে একে গোবিন্দজীউর দ্বাদশ বাসী সভা মধ্যে প্রবেশ করিল। মহারাজ নৃত্য গীত আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন। তখন দুইজন দেব-দাসী নৃত্য গীত আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহা কাহারও মনোরঞ্জনে সমর্থ হইল না! মহারাজ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "না:—কিছুই হ'ল না। কৈ ললিতা কৈ? গোবিন্দজীউর প্রধানা দাসী কৈ?"

ধীরে ধীরে ললিতা সভার মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়া অগ্রে বিগ্রহকে তৎপরে রাজদম্পতীকে করযোড়ে প্রণাম করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অলোক সামান্যরূপ সভাস্থ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পরিধানে তাহার একখানি 'নয়নতারা' শাটী, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার ঝল্‌মল্ করিতেছিল। তাহার রূপের প্রভা সভাস্থ স্ফটিকাধার বিকীর্ণ উজ্জ্বল আলোককেও ম্লান করিয়া দিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন বিধাতার সযত্নসৃষ্ট আদর্শ সৌন্দর্য্যের একটী মূর্ত্তি। মহারাজ প্রশংসমান্ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ললিতা, নাচ্‌বে না গাইবে?"

বীণানন্দিতস্বরে ললিতা উত্তর দিল, 'মহারাজের যা আদেশ হয়।"

'তবে তুমি গাও; আমার সভাকবি তোমায় গানে বাজাবে।'

রাজকবি বিনায়ক বীণাহস্তে সভার মধ্যস্থলে আসিয়া বসিলেন।

ললিতা গাহিল, বিনায়ক বাজাইলেন, গান কিন্তু জমিল না। জনতার মধ্যে বিরক্তিসূচক অস্ফুট কোলাহল হইতে লাগিল। মহারাজ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ললিতা একি হ'ল? লোকের দিন দিন উন্নতিই হয়, তোমার কিন্তু দিন দিন অবনতিই হচ্চে। ছিঃ—একি গান! বৃথাই আমি বিনায়ককে কষ্ট দিলুম।'

না। সহসা ভরে বীণাটী বাজাইতে বাজাইতে বিনায়ক উত্তর করিলেন, পূর্ণিমা। অমে সকলকেই ভাল গাইয়ে বলে জানেন। কিন্তু তা কি হয়

'ফাগুনের আগুন সবাই যদি হবে দেব ত এঁটোপাত কুড়ুবে কে?

কোকিলগুলা যেন

গাইয়েদের মধ্যে ভাল গাইয়েও আছে, আবার রামা-শ্যামা-যোদোর মত গাইয়ে-ও আছে।' কথা শেষে বিনায়ক বক্রকটাক্ষে ললিতার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

বিনায়কের এই শ্লেষবাক্যে ললিতার সারা দেহখানি লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল, বাদ্যের জন্যই তাঁহার গীত জমিল না। বিনায়কের বাদ্যে যেন প্রাণ নাই—যেন তিনি শুধু নিজের বাদ্যকৌশল দেখাইতেই ব্যস্ত। আজ ললিতা মোহনের উপর অন্তরে অন্তরে চটিয়া উঠিল। মোহন ত ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে অপমানিত করিল। মোহন বাজাইলে কখনই ত তাহার গান খারাপ হইত না। সেই জন্যই ত সে মোহনকে সন্ধ্যা হইতেই আসিতে বলিয়াছিল। জনতার মধ্যে লুক্কায়িত মোহনকে দেখিতে না পাইয়া ললিতা মনে করিতেছিল, মোহন বুঝি আসে নাই। মোহন মনে করিয়াছিল, ললিতা নিশ্চয়ই তাহাকে খুঁজিয়া লইবে। কিন্তু যখন বিনায়ক বীণা ধরিলেন ও ললিতা গাহিল তখন কি জানি কি এক ভাবে মোহনের ভিতরখানা পুড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল ললিতা তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া অপমানিত করিয়াছে; নচেৎ তাহার কথামত যথাসময়ে আগমন সত্ত্বেও কেন সে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিল? ললিতা যে তাহাকে দেখিতে পায় নাই ইহা তাহার একবারও মনে হইল না, বরং তাহার মনে হইল রাজকবি তাহার গানে বাজাইবেন, এই আশায় গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া ললিতা মূক, ভিক্ষুক বাদককে অবহেলা করিয়াছে। ক্ষোভে, দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া মোহন কোনটীতেই বসিয়া রহিল। কিন্তু যখন গান শেষ হইল তখন প্রশংসার পরিবর্ত্তে ললিতা অপমানিতা হইল দেখিয়া আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয়দেবীর অপমান হইবে আর সে নীরবে তাহাই দেখিবে? মোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়া ললিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ললিতা সভাস্থলেই দাঁড়াইয়া ছিল, মোহনের চক্ষুর সহিত তাহার দৃষ্টি সম্মিলিত হইতেই আনন্দে ললিতার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বৃহদ্‌রথের দিকে চাহিয়া করযোড়ে বলিল, "মহারাজ' যদি আমায় আর একবার ভিক্ষা দেন তাহলে আমি রাজ-দম্পতীর ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জনের একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।" উত্তরের প্রতীক্ষায় সে রাজ-দম্পতীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

বিনায়ক বীণাটী উত্তরীয় প্রান্তে মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আমি কিন্তু তোমার গানে আর বীণা ধরব না।"

কতকটা ব্যঙ্গ ভরেই ললিতা উত্তর করিল, "না দেব, আপনাকে আমি আর কষ্ট দেব না। আমার গানের উপযুক্ত বাদক আমি পেয়েছি।" মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে?"

ললিতা বলিল, "মহারাজ, সে একটা বোবা, তার নাম মোহন। আপনি বোধ হয় তাকে দেখে থাকবেন। সে ছবেলাই স্বর্গীয় সম্রাট অশোকের অতিথিশালায় খায়।"

হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বিনায়ক বলিলেন, "হাঁ এতক্ষণে তুমি ঠিক বাজিয়ে পেয়েছ। মোহনের মত লোক তোমার গানে বেশ বাজাতে পারবে।"

এই বোবা লোকটী কে ও, কিরূপ বাদক তাহা জানিতে পট্টমহাদেবী বিদ্যুৎবরণীয় কৌতূহল হইল। তিনি ললিতাকে আদেশ প্রদান করিলেন। হাসিমুখে ললিতা মোহনকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল। ভগ্ন বীণাখানি হস্তে সঙ্কুচিত-চিত্তে মোহন সভার মধ্যস্থলে প্রবেশ করিল। মোহনের মোহন-শ্রী-মণ্ডিত অথচ কান্নার ছাপ দেওয়া ছবিখানি দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া নীরব হইল। ললিতা তাহার ললিত-কাকলী সপ্তমে তুলিয়া 'বসন্তবাহারে' তান ধরিল, মোহনের বীণাও ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। কিন্তু বসন্তোৎসবের বাসন্তী রাতে 'বসন্তবাহারের' বাসন্তী-কতার মধ্য হইতে বাজিয়া উঠিতে লাগিল বীণা হইতে একটা চাপা কান্নার সুর। বীণা যেন বাদকের হৃদয়ের গোপন কোনে লুকান অশ্রুরাশি চাপিয়া রাখিতে অক্ষম হইয়া সুরের আকারে চারিদিকে ছড়াইতেছিল। এ কি হইল! বসন্তোৎসবের মিলন রাতে এ কি বিচ্ছেদের করুন তান! ওগো কে সে, যে এমন রাতে সর্ব্বস্ব হারাইয়া কাঁদিতেছে? এই পরিপূর্ণতার মধ্যে কে সে এমন রিক্ত? গান চলিতে লাগিল, কিন্তু সকলেই শুনিতে লাগিল সেই অপূর্ব্ব বীণাবাদন, সকলেরই দৃষ্টি সেই অপূর্ব্ব বীণা বাদকের চক্ষে নিবদ্ধ।

গান থামিয়া গেল। সভার লোক সকলেই নীরব। ব্যাকুল আগ্রহে মহারাজ বৃহদ্রথ ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ললিতা, আর একখানা—আর একখানা।"

ললিতা মোহনের দিকে চাহিল। মোহন উত্তরীয় প্রান্তে ললাটের ঘর্ম্মরাজি মুছিয়া পুনরায় বীণা ধরিল। ললিতা বুঝিতে পারিতেছিল। কিসের উপর তাহার গানের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। মোহনের হৃদয়-বীণার তারে যে সুরটী চিরকাল বাজিতেছে, সেই সুরের অনুরূপে ললিতা গাহিল.—

'কাঁহা সৈঠত মেরে পিয়া। . .
বরথ বরথ হাম্ তুয়া লাগি রোওয়ত
কাঁহা মেরে কালা নিঠুরিয়া॥'

করুণ হইতে করুণতর সুরে বীণা বাজিতে লাগিল—উচ্চ হইতে উচ্চতর কণ্ঠে ললিতা গাহিতে লাগিল। তাহার গীত যেন অতীতের যবনিকা তুলিয়া দ্বাপরের একখানি বড় করুণ ছবি তাহাদের চক্ষের সমক্ষে ধরিল। সেই কুঞ্জবন, বিরহিনী রাধিকা কুঞ্জ সাজাইয়া, স্বহস্তে বকুল ফুলের মালা গাঁথিয়া সখীসহ সোৎকণ্ঠায় কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন—এই আসে এই আসে করিয়া কৃষ্ণ আর আসিলেন না। রাত্রি ক্রমে ক্রমে গভীর হইতে গভীতর হইতে লাগিল, অষ্টমীর ক্ষীণচন্দ্র যমুনার কাল জলকে আরও কাল করিয়া ওপারের বৃক্ষরাজির মধ্যে লুকাইলেন, সমীরণ নব প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধ লইয়া বিরহিনীর চিত্তবিনোদন করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেল—এই আসে এই আসে করিয়া কৃষ্ণ আর আসিলেন না। তখন বাজিয়া উঠিতে লাগিল চারিদিক হইতে 'কৃষ্ণ আসিলেন না।' উষার পাণ্ডুর ললাটে শোভমান্ শুকতারাটা ঝিক্ মিক্ করিতে করিতে বলিল, 'কৃষ্ণ আসিলেন না; সুপ্তোত্থিত পক্ষীগণের নূতন গীতি যেন বলিতে লাগিল, 'কৃষ্ণ আসিলেন না, কৃষ্ণ আসিলেন না।' বিরহিনী তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; নিশিশেষে সযত্নে স্বহস্তে গ্রথিত সাধের বকুল মালা ছিঁড়িয়া মাটীতে ফেলিয়া দিলেন। সাধের কুঞ্জে লুটাইয়া পড়িয়া রাই তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি প্রাণাধিক, কোথায় তুমি জীবনসর্ব্বস্ব, কোথায় আমার ইহকাল-পরকাল, আমার ভাগ্য গগণের নষ্টচন্দ্র, আমার স্বপ্নে হারান ছবি,—ওগো একবার এস গো। 'নারীজনমে হাম্ না করিয় ভাগি,' কিন্তু তাই বলিয়া কি তুমি দেখা দিবে না? ওগো, একবার ফিরে এস। কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ গিয়াছে তোমার নয়নাভিরাম মূর্ত্তি দেখি নাই, তোমার সহাস্য

মুখখানি দেখিয়া আমার চক্ষু শীতল করি নাই—তোমার সেবা করিয়া আমার নারীজীবন সার্থক করি নাই ; একবার তুমি এস, একবার তোমায় দেখি—একবার তোমার সেবা করি। এস গো—ওগো এস গো। বসন্ত আসিল,—ফুল ফুটিল—কোকিল গাহিল, তবু তুমি আসিলে না। তবে কি তুমি আসিবে না? তবে কি দিবানিশি মরমে মরিয়া এমনি করিয়া তোমার আশাপথ চাহিয়াই থাকিতে হইবে? ব্যর্থতায় শূন্য বুকখানা ভরাইতে হইবে? না-না—তুমি ত অত নিষ্ঠুর নও ; তুমি আসিবেই আসিবে। তবে হে আমার মূর্ত্তদেবতা এস গো। "আমার তৃষিত তাপিত হৃদয়ের ধন হৃদয়েতে ফিরে এস গো।"

দুইবার তিনবার গীত হইয়া গানখানি থামিয়া গেল। তখন সমস্ত সভাই নীরব, সকলের চক্ষুই যেন জলভরাক্রান্ত। সকলেই যেন প্রিয়জন বিরহবিধুর, সকলেরই মনের মধ্যে যেন একই সুর বাজিয়া উঠিতেছিল।

"আমার তৃষিত তাপিত হৃদয়ের ধন
হৃদয়েতে ফিরে এস।"

বহুক্ষণ পরে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মহারাজ বলিলেন, "ললিতা, আজ তুমি আমাদের বড় সন্তুষ্ট করেছ। জীবনে এমন গান আমি কখনও শুনিনি।"

সার্থকতাদীপ্ত-আস্যে ললিতা এক মুখ হাসিয়া করযোড়ে বলিল, "না মহারাজ, আমার গানের গুণ নয়, আপনার কানের গুণ আমার প্রথম গান আপনার কাণে লাগেনি তাই নিন্দা করেছিলেন।"

"তোমার প্রথম গান ভাল না লাগার কারণ আমি এতক্ষণে বুঝেছি, এই বলিয়া মোহনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মোহন! আমার সভায় অনেক বড় বড় কবি বাজিয়ে গেছেন কিন্তু তোমার মত বাজাতে কেউ পারে নি, এমন কি রাজকবি বিনায়কও নয়। আমার বড় ইচ্ছা যে তুমি আমার সভায় থাক—? এতে তোমার কি অমত আছে?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া বিনায়কের স্বভাব-গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইল। পেচকের মত মুখখানা করিয়া বিনায়ক, মোহন কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য সেইদিকে চাহিলেন।

মোহন শিশুর মত একগাল সরলহাস্য করিয়া ইঙ্গিতে মহারাজকে জানাইয়া দিল, যে সে মহারাজের মুখের কথাতেই যথেষ্ট অনুগৃহীত

হইয়াছে ; রাজসভায় সে থাকিতে চাহে না, থাকিতে পারিবেও না। মহারাজ যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন।

উত্তর শুনিয়া বিনায়ক একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

মহারাজ দুঃখিতভাবে বলিলেন, "থাকিলেও না, থাকিলে আমি সুখী হতুম। যা হোক্ মাঝে মাঝে আমায় তোমার বাজনা শুনোতে হবে, এতে কিন্তু রাজী না হলে চল্‌বে না।"

মোহন সানন্দে মহারাজের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল।

মহারাজ তখন সিংহাসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "ললিতা, আজ তুমি তোমার মধুর সঙ্গীতে আমাকে ও সমবেত পাটলীপুত্রবাসীকে যে আনন্দ প্রদান করেছ, এই তার পুরস্কার ;" এই বলিয়া মহারাজ স্বীয় কর্ণস্থ মণিময় কুণ্ডল তাহাকে দান করিলেন। ললিতা নত জানু হইয়া গ্রহণ করিল।

মহাদেবী বিদ্যুৎবরণী তখন সিংহাসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "মোহন, আজ তুমি এই সভায় মহারাজ ও সমবেত পাটলীপুত্রবাসীরা সাম্‌নে যে অপূর্ব্ব বীণাবাদন কৌশল দেখিয়েছ, এই তার সামান্য পুরস্কার ;" এই বলিয়া মহারাণী আপনার গলদেশ হইতে বহুমূল্য হীরকহার খুলিয়া মোহনের গলদেশে অর্পণ করিলেন। মোহন নতশিরে তাহা গ্রহণ করিল।

সভাস্থ নরনারী রাজ দম্পতীর জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

এই কোলাহলের মধ্যে ললিতা মোহনকে একপার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "মোহন, আজ তুমি আমার বড় মুখ রক্ষা করেছ। কিন্তু আমার কি আছে যে, তোমায় দেব? শুধু আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভরে এই এই মালা গাছটী দিচ্ছি ; গ্রহণ করে আমায় ধন্য কর্ব্বে কি?" এই বলিয়া ললিতা স্বীয় গলদেশ হইতে চম্পকফুলের মালাটী খুলিয়া মোহনকে দিল।

নির্ব্বাক আনন্দে মোহনের চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সাগ্রহে মালাছড়াটী গলায় পরিল।

সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

(৪)

সভাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই বিনায়ক সভা হইতে উঠিয়াছেন। অপমানের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় তিনি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। কি করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। ভাবিতেছিলেন, "আজ

আমার অপমানের চূড়ান্ত হ'ল। মৌর্য্য সম্রাট বৃহদরথের সভা কবি থেকে অদ্বিতীয় গায়ক ও বাদক বলে এতদিন জনসমাজে যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলুম, এখন থেকে ত তা' মোহনই পাবে! শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদকের নাম কর্ত্তে গেলে লোকে মোহনের নামই ত আগে কর্ব্বে। মহারাজ তাকে ত সভায় ডেকেছেন, আজ যেন সে অস্বীকৃত হয়েচে, কিন্তু কাল যে দারিদ্রবশতঃ রাজসভায় গিয়া সভা কবির পদপ্রার্থী হবে না তার ঠিক কি? তখন আমি কি কর্ব্ব? এক নভায় কখন বিনায়ক ভিন্ন অন্য কবি থাকতে পারে না। কি করি? কি করে মোহনের সভা গমনে প্রতিবন্ধক হই? আচ্ছা, এক কাজ কল্লে হয় না? মোহনের নাম যদি পৃথিবী থেকে একেবারে মুছে দেই? হাঁ, তাই কর্ব্ব, আমি ত কিছুই তার করিনি; তবে কেন সে অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত দেখা দিয়ে আমার সৌভাগ্য ও যশের তুঙ্গী রবি চন্দ্রকে গ্রাস কলে? নাঃ—এ ধৃষ্টতার প্রতিফল তাকেই পেতে হবে।" ভাবিতে ভাবিতে বিনায়ক গৃহে পৌঁছাইলেন; তখন তাঁহার সংকল্প ঠিক হইয়া গিয়াছে।

বাড়ী গিয়া তিনি বহুপ্রাচীন ভৃত্য রঘুনাথকে থাকিয়া সমস্ত ব্যাপারটী ও তাঁহার সাধু সংকল্পের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ এ কাজ যদি কর্ত্তে হয়, তবে আজ কল্লে খুবই ভাল হয়। মহারাণীর দেওয়া সেই হীরার হারটা এখনও তার গলায় আছে। কাজ শেষ কর্ত্তে পাল্লেই সেই বহুমূল্য হারটী তোমার হবে। আর লোকেও মনে কর্ব্বে যে হীরের হারের লোভে কোনও তস্কর তাকে হত্যা করেচে। যাও, এক্ষুনি যাও—আজ রাত্রে সে গোবিন্দজীর মন্দিরে খাওয়া দাওয়া সেরে আস্‌বে। তুমি পথের ধারে কোনও গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাক গে। তারপর কি কর্ত্তে হবে, তা তোমার নত চতুরকে বলা নিষ্প্রয়োজন; যাও কার্য্য শেষ করে এলেই সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের নামাঙ্কিত একশ' চকচকে সোনার মোহর তোমায় গুণে দেব।"

রঘুনাথ প্রভুর উপযুক্ত ভৃত্য। তাহার যাহাও একটু দ্বিধা বোধ ছিল তাহা এই হীরকহার ও পুরস্কারের লোভে কাটিয়া গেল। সে প্রভুর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহির্গত হইল।

* * * *

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মোহন দেবমন্দিরে আহারাদি

সমাপ্ত করিয়া কুটীরাভিমুখে ফিরিতেছিল। আজ তাহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ, আজ সে তাহার আরাধ্যা দেবীকে অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছে—তাহার কৃপালাভ করিয়াছে—তাহারই সাদর প্রদত্ত পুষ্পমালা তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—রাজ অনুগ্রহ অযাচিতভাবে প্রচুর পরিমাণে তাহার শিরে বর্ষিত হইয়াছে। মনের আনন্দে সে পথ চলিতেছিল। রাত্রি কত দেখিবার জন্য একবার আকাশের দিকে তাকাইল, দেখিল, শুক তারাটা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। রাত্রি আর অধিক নাই বুঝিয়া সে গতি বেগ বৃদ্ধি করিল, আর একটা মোড় ফিরিলেই তাহার কুটীর, ঐ যে আমগাছটীর ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাইতেছে। মোড়টার নিকটস্থ হইতেই পত্রবহুল সেই আমগাছের পিছন হইতে দুখানা বজ্র কঠোর হস্ত সবলে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল। মোহন চমকাইয়া উঠিল, সে এই আক্রমণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাহার হস্ত হইতে বীণাটী খসিয়া পড়িল; দুইখানা ক্ষীণ হস্তের সাহায্যে সে সেই বজ্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বৃথাই তাহার প্রয়াস। সেই কঠোর নিষ্পেষণে মোহনের শরীর ক্রমশঃই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল—দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল—চক্ষের সম্মুখে যেন একখানা কালোপর্দ্দা ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে সংসারের সকল দ্রব্যই তাহার চক্ষে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মোহনের অবশ দেহখানি মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

(৫)

অভ্যাসমত ঊষার আগমনের পূর্ব্বেই ললিতার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। দেবচরণে প্রণাম করিয়া কলসীটা তুলিয়া লইয়া ললিতা স্নানে চলিল। মন্দির সোপান হইতে নামিতেই কোথা হইতে একটা শৃগাল তাহার বাম পদ ঘেঁসিয়া বিকট চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পলাইল। ললিতা শিহরিয়া উঠিল, কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় ললিতার বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। সে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া চলিল। পথে যাইতে যাইতে ললিতা ভাবিতে লাগিল, 'ছিঃ—আমি কি অকৃতজ্ঞ। কাল সমস্ত পাটলীপুত্রবাসী ও রাজদম্পতীর সাম্‌নে মোহন আমার মান রক্ষা কল্লে, আর তার বিনিময়ে তাকে আমি কি দিয়েছি? ছিঃ—ছিঃ, দুটো মুখের কথাতেও তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় নি।' "মুখের কথা"টী তাহার মনে

আসিতেই ললিতার হাসি আসিল। মুখের কথা ভিন্ন ললিতা ত তাকে আর কিছু দিতে পারিবে না, মুখের কথাতেও ত সে একবারও সে বলিতে পারিবে না, "ওগো আমি তোমায় ভালবাসি।" আর মোহন? ভগবান ত তাহার কথা কওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ললিতার প্রতি ভালবাসায় তাহার সারা অন্তরটা পরিপূর্ণ থাকিলেও প্রকাশ করিবার কোনই উপায় ছিল না। 'না:—আজ ভাষায় যতটা সম্ভব মোহনকে বুঝাইয়া দিবে যে, সেও মোহনকে কতটা ভালবাসে।

তখনও ভালরূপ ফর্সা হয় নাই। ঊষার অস্পষ্ট আলোকে আম্র বৃক্ষতলে শ্বেত বসনাবৃত মনুষ্যাকৃতি ললিতা কি একটা দেখিতে পাইল। ভয় কাহাকে বলে ললিতা তাহা জানিত না। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, মানুষই বটে। এরূপস্থানে এরূপ অবস্থায় মানুষ কি নিমিত্ত পড়িয়া থাকিতে পারে ললিতা তাহা বুঝিতে পারিল না। শেষে মনে করিল, বোধ হয়, বসন্তোৎসবমত্ত কোনও নাগরিক মদিরাপানে হৃতচৈতন্য হইয়া এখানে পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক লোকটাকে তাহা দেখিবার জন্য ললিতা বৃক্ষতলে অগ্রসর হইয়া সেখানে যাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে ললিতার মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিল, বৃক্ষতলে মোহন পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার বেশভূষা অসংযত, মুখমণ্ডল কালীমাবৃত, বড় আদরের চিরসাথী বীণাটী হতাদরে তাহার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। মোহন যে মরিয়া গিয়াছে, একথা ললিতার বিশ্বাস হইল না। মোহনের গা নাড়া দিয়া ডাকিল, কোনই উত্তর নাই—অঙ্গে হস্ত দিয়া দেখিল, অঙ্গ হিমশীতল—নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখিল, নিশ্বাস বহিতেছে না। তখন প্রকৃত সত্য সে আর অবিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিল না। মাথায় হাত দিয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। কে এ সর্ব্বনাশ করিল, সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, মোহনের গলায় হীরকহারটী নাই, কিন্তু তাহার দেওয়া চম্পক মাল্যটী তখনও মোহনের গলায় শোভা পাইতেছে। নিশ্চয় কোনও তস্কর হীরকহার লোভে এই নরহত্যা করিয়াছে। ললিতা নির্নিমেষ নয়নে মৃত মোহনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মোহন মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডল একটুও বিকৃত হয় নাই, ওষ্ঠে তেমনই মৃদু হাসির রেখা লাগিয়া আছে, নয়নে তেমনই প্রশান্ত দৃষ্টি, কিন্তু মিশান আছে তাহার নিষ্ফল প্রেমের দারুণ অন্তর্যাতনা; সে দৃষ্টি যেন বলিয়া দিতেছিল,—

"যদি জীবনে না পাই তোমারে গো আমি
পাইব তোমায় মরণে।"

ললিতা আর স্থির থাকিতে পারিল না; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "মোহন, জীবনসর্ব্বস্ব আমার—দয়িত আমার প্রাণাধিক আমার! নিষ্ঠুর আমায় ফেলে কোথায় যাও, একবার চেয়ে দেখ। আমায় অপরাধিনী করে যেও না। একবার দেখে যাও যে, শুধু তুমিই আমায় ভালবাসতে না, আমিও তোমায় ভালবাসতুম। শুনতে পাচ্ছ না? মৃত্যুর পরপারে গিয়ে মানুষ যদি দিব্য কর্ণ ফিরে পায় ত শোন মোহন; আমি তোমায় প্রাণভরে ভালবাসি, এতভাল মানুষ বোধ হয় মানুষকে বাস্‌তে পারে না। তুমি আমার ধ্যান, জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছিলে; ধ্যানে আমি ইষ্ট দেবতাকে খুঁজে না পেয়ে তোমারই ছবি কেবল দেখ্‌তুম্। সব তোমায় দিয়েছিলুম্ দেব! কেবল এই দেহখানাই দিতে পার্লুম না। রাগ করে কি চলে গিয়েছ নাথ? যাও প্রভু, পদাশ্রিত দাসীর জন্যে একটু স্থান করে রেখ, দাসী সত্বর চরণে গিয়ে মিলিত হবে।"

ললিতা আর বলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে তাহার অবশ তনুখানি মোহনের হিমশীতল বক্ষে ঢলিয়া পড়িল। তাহার দেওয়া মোহনের গলশোভী চম্পক মাল্যের ভিতর দিয়া যেন সে অজ্ঞাতভাবে তাহার মাথা গলাইয়া দিয়া মোহনকে জড়াইয়া রহিল। মালা দুটী গলাই বেড়িয়া রহিল।

তখন ধীরে ধীরে ললিতার দুই চক্ষুর তারা ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। অবশ চক্ষে সে দেখিতে লাগিল, যেন সেই নগরতলবাহী নদীযমুনায় পরিণত হইয়াছে। চাঁদ যেন গলিত হইয়া গলা সোনায় তাহাদের দেহ প্লাবিয়া দিতেছে, নক্ষত্র সকল যেন তাহাদের গায়ে ফুটিয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে, মেঘে চন্দ্রকরে মিশিয়া হেন তথায় এক অদ্ভুত বর্ণের অদ্ভুত স্বপ্নকুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছে;—সেখানে যেন কত মাধবী লতা কত কদম্ব তরু, অলিঝঙ্কৃত কতই না চূত মুকুল শোভা পাইতেছে, আর সেই স্বপ্নকুঞ্জ হইতে কি এক কোমল করুণসুর বাঁশীতে কেবলই বাজিতেছে—

"মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং।
মধুরাধিপতেঃ সকলং মধুরং॥"

ললিতা আত্মহারা হইয়া সে বাঁশী শুনিতে লাগিল। আর শুনিল, কে যেন ডাকিতেছে, "এস এস আমার সেবিকা, আমার সহচরি, এস

যুগল প্রেমিক এই স্বপ্নরাজ্যে। ইহা স্বর্গ নয়, বৈকুণ্ঠ নয়, মর্ত্ত্য নয় এ প্রেম রাজ্য। এস 'তোমরা এখানে এস, মর্ত্ত্যের বাধা এখানে তোমাদের মিলনে বাধা ঘটাবে না। আমার ভক্তগণ অমর; এ অমর রাজ্য—এ নিত্য বৃন্দাবন তাদেরই জন্যে। এস তোমরা, আবাহনের জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি।"

শুনিতে শুনিতে ললিতার শেষ নিশ্বাস পড়িয়া গেল।

তখন তরুণ অরুণের কনককান্তিতে জলস্থল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া দূরে গৃহস্থবাড়ী এক ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতেছিল,—

'হাম্ হরিলালসে প্রাণ তেজব পাওব আর জনমে।'

"কে তুমি ?"

লেখক—শ্রীযুত গোপীনাথ দাস।

প্রাণের আবেগ ভরা,
কাহার অঙ্কিত করা,
জানায়েছে লিপিযোগে এত ভালবাসা।
কেন সে প্রকাশে,
মূর্খের সকাশে,
সাহিত্য জড়িত হেন মধুময় ভাষা॥
ভালবাসা রীতি নীতি,
প্রতি ছন্দে ছন্দে গাঁথি,
সাজায়েছে লিপিখানি অতি সুশোভন।
কেন ওগো মোর লাগি,
হও তুমি স্বার্থত্যাগী,
মনে রেখো সত্য সেই অতীত স্বপন॥
আজি কেন মনে পড়ে,
হৃদয় আকুল করে,
দুরাগত অতীতের সে মধুর কথা।
সেই সে সজল আঁখি,
অধরে অধর রাখি,
বিষাদ পুরিত বুকে কত আকুলতা॥
কে তুমি পরীক্ষাদাতা,
জ্বালিয়ে হৃদয়ে চিতা,
প্রচণ্ড অনল কুন্দে দিতেছ ইন্ধন।
তুমি কি গোপীর প্রভাস,
কেন গো প্রবাসে বাস,
পুরাও প্রাণের আশ জীবন রতন॥

সমালোচনা।

লেখক,—শ্রীযুত যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

পরলোক-তত্ত্ব।—(প্রথম খণ্ড) শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত। ৺কাশীধাম ব্রাহ্মণ যক্ষ সভার আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল ছয় আনা মাত্র। এই পুস্তক খানি সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় জন্মভূমির জন্য যে সমালোচনাটি লিখিয়াছেন, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

তাহিরপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর "পরকাল তত্ত্ব" নামে আবার একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি তাঁহার অক্লান্তহস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার অদম্য লেখনী পুস্তকের পর পুস্তক সৃষ্টি করিতেছে। যেমন একদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়নের জন্য, হিন্দুয়ানী ভাঙ্গিবার জন্য, পাতিব্রত্যে জলাঞ্জলি দিবার জন্য, নগ্ন অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ নানাভাবের প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, ছোট ও বড় উপন্যাসে, নাটকে সেই সকল কুভাবের প্রচার করিতে একদল ঐহিক-সর্ব্বস্ব মহাপুরুষ কোমর বান্ধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন; রাজা শশিশেখরেশ্বরও সেইরূপ কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া, আবার পুস্তকে আমাদিগের শাস্ত্রীয় তত্ত্বগুলিকে বুঝাইবার জন্য একশেষ যত্ন করিতেছেন। ঋষিরা যেমন বিজন অরণ্যে বাস করিয়া জগতের কল্যাণ কামনায় সমস্ত তত্ত্বকথা তাঁহাদিগের অমর বাণীতে প্রচার করিয়াছিলেন, রাজাও সেইরূপ গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমকল্প নির্জ্জন প্রাসাদে বাস করিয়া পুস্তকে পুস্তকে শাস্ত্রের রহস্য প্রকাশ করিতেছেন। ইহাঁরই লিখিত "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী" ইহাঁরই লিখিত শ্রাদ্ধতত্ত্ব, ইহাঁরই লিখিত আবার "পরকালতত্ত্ব"। মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ লিখিয়া সেই সেই পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে আলোচিত হয় নাই মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন ও সেই অভাব দূর করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছিলেন। রাজাও সেইরূপ শ্রাদ্ধতত্ত্বে পরকালতত্ত্ব থাকিলেও তাহাতে : পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই, লেখনী ধারণ করিয়া আবার পরকালতত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত

হইয়াছেন। পরকালতত্ত্বে আছে কি? পরকালতত্ত্বে আছে অনেক। যাহা জানিবার জন্য মানুষ নিয়ত ব্যাকুল, তাহাই আছে। মৃত্যুর পরে সমস্ত নিবিয়া যাইবে না, কিছু থাকিবে তাহাই আছে। নিশ্চয় কিছু থাকিবে,—যাহা যাইবার তাহা চলিয়া যাইবে, যাহা যাইবার নহে, তাহাই থাকিবে। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণের ফলে তাপ বা অগ্নির উৎপত্তির ন্যায় শুক্র-শোণিত সংযোগে দেহে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় নাই, শুক্র কীটাণু ও আর্ত্তব ডিম্বের মিলনেও আত্মার উৎপত্তি হয় নাই, এ শরীরের উৎপত্তির পূর্ব্বেও আত্মা ছিল, পরেও থাকিবে। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ইহার জন্মও হয় নাই, মৃত্যুও হইবে না। জন্ম আছে, মৃত্যু হইবে না, এইরূপ অপসিদ্ধান্তের ও অবতারণা করিতে পারা যায় না। মৃত্যুর পরে প্রত্যেক আত্মা গোরের ভিতরে মহাবিচারের প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিবে না। একদিন দেবদূতের গম্ভীর ভেরীধ্বনিতে উত্থিত হইয়া, ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে বিচারার্থী হইয়া দাঁড়াইবে না ও সেই একদিনের বিচারেই কেহ বা অনন্ত স্বর্গে কেহ বা অনন্ত নরকে যাইবে না। তাহাদের বিচার প্রতি মুহূর্ত্তে আছে, এই ভঙ্গুর দেহের অবসানের পরে আছে। মৃত্যুর পরে স্বর্গ নরক ভোগ করিয়া আবার কর্ম্মানুসারে প্রত্যেকেরই দেহধারণ করিতে হইবে। এই সমস্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় পরকালতত্ত্বে আছে। অখণ্ডনীয় যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি কবিত্বের ভাষায় দার্শনিকভাবে পরকালতত্ত্বে ভারতের নরনারীদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা পরকীয় নগরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া নিজের পর্ণকুটীর পরিত্যাগ করিয়া সেই পরকীয় নগরে প্রধাবিত হয়, তাহাদিগকে ফিরাইতে হইলে, ফল-পুষ্প-শস্যসম্ভার-সম্পন্ন জন্মভূমি দেখাইলে হইবে না, অগ্নিবর্দ্ধক, স্বাস্থ্যবর্দ্ধক মধুর শীতল জলপূর্ণ জলাশয় দেখাইলে হইবে না, সেই পর্ণকুটীরে প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতে হইবে। প্রতিভাশালী বুদ্ধিমান্ রাজা ইহা সম্যক্ অবগত রহিয়াছেন, সেইজন্য তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, সুধাস্যন্দী ভাষার সৌন্দর্য্য, রচনার মাধুর্য্য দেখাইয়া অবিশ্বাসীদিগকে আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আকর্ষণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। আমরা পরিশেষে বিশ্বনাথের চরণে প্রার্থনা করি,—রাজা বাহাদুর স্বাস্থ্যের সহিত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইরূপ কার্য্যে নিরত নিজের প্রতিভাকে নিয়োজিত করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থা...
ক্রমিক সং

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৸০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৵, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৮০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৸০ মাত্র।

গোল্‌ড নার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Foamula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রতিমাখান
সুন্দর সুখখানি

কিসে হয় ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৶০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী-ব্যাধিতে-অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ৷৶০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

২৯শ, বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০. [২য়, সংখ্যা

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ফুলরা	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৩৩
২।	আবেশ	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-বি	৫২
৩।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৪
৪।	আবাহনী	... ...	৬৩
৫।	সমালোচনা	... ...	৬৪

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত

Tele. Phone 388 Barabazar. 8-5-23

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

মূল্য ৷৷০, ডজন ৫৲, গ্রোস ৫০৲, পাইকারী দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

আর, গোভিন এণ্ড কোং, হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড, ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Telegram:—GERMALINE. Telephone No. 138

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর যখন চখের সামনে লেখাগুলি

উল্টে পাল্টে যাবে

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

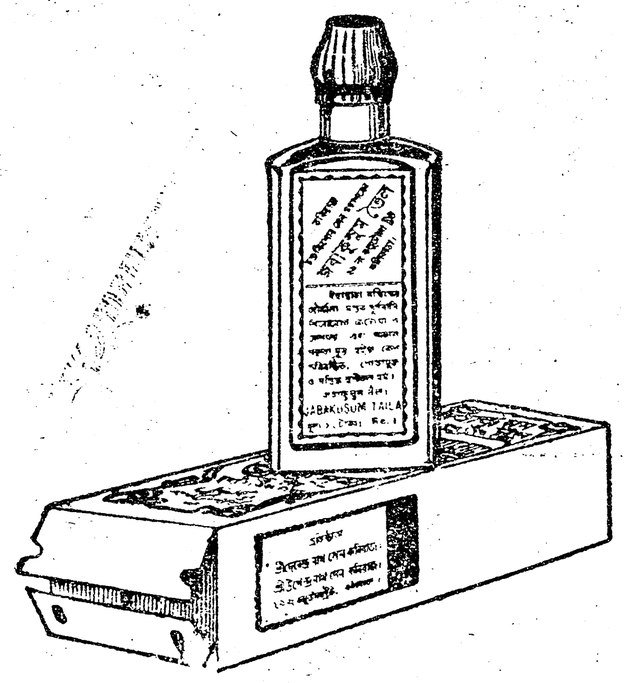

জবাকুসুম তৈল

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "ফিজীশিয়ান"

টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

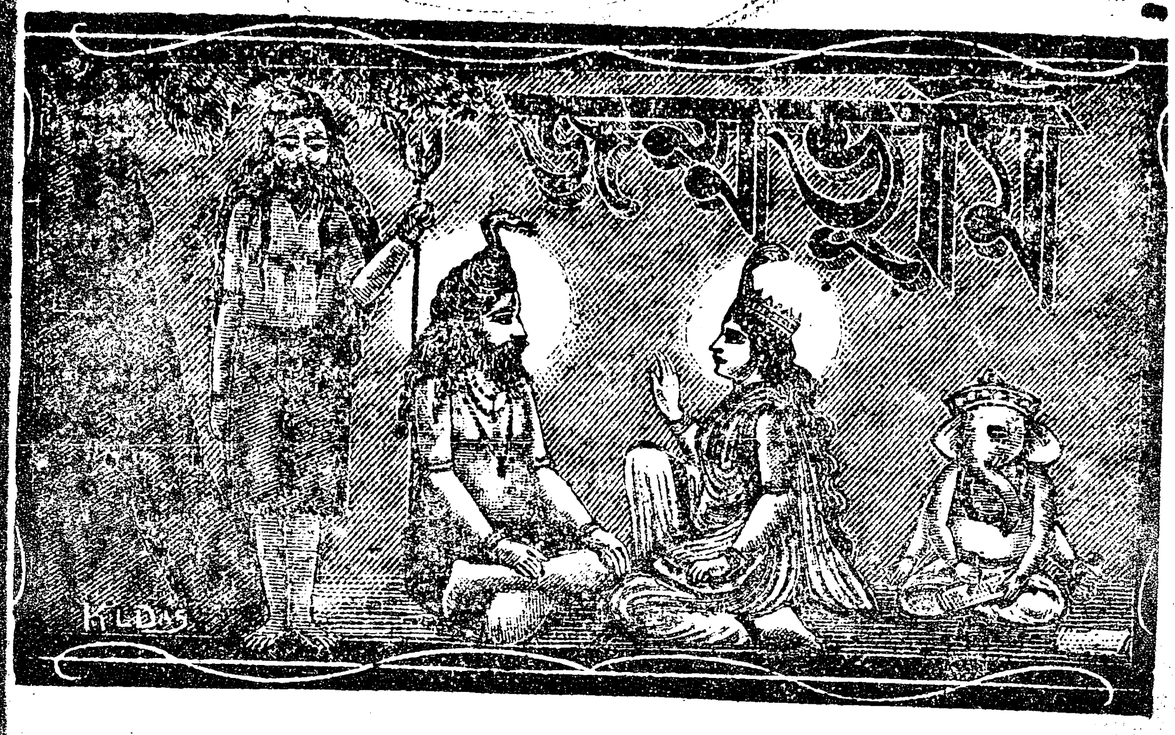

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৯শ, বর্ষ। | ১৩৩০ সাল, জ্যৈষ্ঠ | ২য়, সংখ্যা।

ফুল্লরা।

(পৌরাণিক কাহিনী)

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

গুজরাটের এক অরণ্য প্রান্তে ক্ষুদ্র একখানি ভগ্ন কুটীরে জয়কেতু নামে একজন দরিদ্র ব্যাধ সস্ত্রীক বাস করিত। জয়কেতুর পত্নীর নাম মায়াবতীর কালক্রমে তাহাদের একটি পুত্র জন্মে; জয়কেতু সেই পুত্রের নাম রাখিয়াছিল,—কালকেতু। গরীবের সন্তান হইলেও কালকেতুটি দিব্য হৃষ্ট পুষ্ট ছিল, শিশু-কালে তাহার চক্ষের দীপ্তি ও অঙ্গ চালনা দেখিয়া লোকে বলা-বলি করিত, বয়স হইলে এই শিশু বিলক্ষণ বলবান হইবে। জয়কেতুর জীবিকা ছিল মৃগয়া; ধনুর্ব্বাণ সন্ধানে মৃগ বধ করিয়া, সেই মৃগমাংস নিকটবর্ত্তী হাটে বিক্রয় করিয়া তাহাদের দিন গুজরাণ হইত।

কালকেতুর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, জয়কেতু সেই সময় তাহার হস্তে তীর ধনু দিয়া শর সন্ধান শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল. কালকেতু ক্রমে ক্রমে পশুবধ কৌশল শিক্ষা করিয়া বাল্য ক্রীড়াচ্ছলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কদলী বৃক্ষ বিদ্ধ কর, এক একদিন দু একটা পাখীও মারে ; ঐরূপ অভ্যাস করিতে করিতে তাহার ধনুর্ব্বাণ পরিচালনের অনেকটা ক্ষমতা জন্মিল. জয়কেতু এক একদিন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন মধ্যে মৃগয়া করিতে যাইত, দশ বৎসর বয়সে কালকেতু ছোট ছোট মৃগ শাবক শীকার করিতে শিখিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিদ্যায় পরিপক্ক।

কালকেতু যখন গৃহে থাকিত, তখন অঙ্গে ধুলা মাখিয়া নিকটস্থ পল্লীর সমবয়স্ক বালকগণের সহিত মল্লযুদ্ধ করিত, তাহার সহিত যুদ্ধে বলবান বালকেরাও হারিয়া যাইত. কেহই তাহাকে পরাজয় করিতে পারিত না। সেই রঙ্গ দেখিয়া পাড়ার বৃদ্ধ লোকেরা তাহার উপাধি দিয়াছিল, "মহাবীর।" মায়াবতী স্বযত্নে ছেলেটির কর্ণে রাম কড়ি ও কণ্ঠে কাঁটিমালা পরাইয়া দিয়াছিল, মস্তকে দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ রাখিয়া কপালের উপর চূড়ার আকারে খোঁপা বাঁধিয়া দিত, সেই বেশে কালকেতুকে সত্য সত্যই মহাবীরের মত দেখাইত।

কালকেতুর বয়স ষোড়শবর্ষ ; অনেক সন্ধান করিয়া সঞ্জয়কেতু দূরবর্ত্তী এক গ্রামের আর একজন দরিদ্র ব্যাধের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিল, বধূটির নাম ফুল্লরা। দ্বাদশবর্ষ বয়সে ফুল্লরা সামান্য সামান্য গৃহকার্য্যে নিপুণা হইয়া রন্ধন করিতে শিখিল, গরীব লোক, নিত্য নিত্য শীকার জুটিত না, নিত্য নিত্য চাউল কিনিতে পারিত না. সুতরাং ক্ষুদের জাউ রন্ধন করিয়া তিনজনে তাহাতেই কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত, কালকেতু কিছু বেশী খাইত, তাহার পিতা মাতা ও স্ত্রীর অংশে কম পড়িত। ফুল্লরা পতিসেবা জানিত. স্বভাবতঃ বুদ্ধিমতীও ছিল, পতির পরিতোষের জন্য যত্ন করিয়া অন্ন পাক করিত, পুষ্করিণীর কলমী শাক তুলিয়া ভাজিয়া ভাজিয়া দিত, অবিকৃত বাসী হরিণ মাংসের অস্থি মিশ্রিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাংসও রন্ধন করিত, যে দিন অন্ন জুটিত না, সে দিন ক্ষুদের জাউ রাধিয়া দিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়. কালকেতুর বয়স বিংশতি বৎসর, ফুল্লরা ষোড়শী। সেই সময় জয়কেতুর মৃত্যু হইল, নীচ বংশীয়া হইলেও পতিব্রতা মায়াবতী সহমৃতা হইয়া গেল, কালকেতুর মস্তকে সংসারের ভার পড়িল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে পানতা খাইয়া (কিংবা কিছু না খাইয়াই) জাল দড়া লইয়া ও

তীর ধনুক লইয়া কালকেতু মৃগয়া করিতে যায়, বৈকালে এক আধটি হরিণ মারিয়া আনে, পরদিন স্বামীকে কিছু খাওয়াইয়া, নিজে কিছু প্রসাদ পাইয়া, স্বামীর মৃগয়া যাত্রার পর সেই বাসি মাংসগুলি হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। গ্রামের নিকটেই একটা হাট ছিল, হাটের নাম গোলাহাট। সেই হাটে জয়কেতুর বেশ পশার ছিল, প্রায় সকলেই তাহার দোকানে মাংস কিনিত ; তাহার নবীনা পুত্রবধু হাটে আইসে, দেখিতেও বিশ্রী নয়, মুখখানি সর্ব্বদা ম্লান, পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, মস্তকের কেশে তৈলাভাব, অতএব পূর্ব্বের খরিদ্দাররা দুঃখিনী ফুল্লরার নিকটে মাংস কিনিতে আসিত, কালকেতু যেদিন হরিণ মারিতে পারিত না, ফুল্লরা তৎপর দিন হাটে যাইত না, খরিদ্দারেরা চিন্তাযুক্ত হইত।

ফুল্লরার পতিভক্তি অটল। পতি যেদিন শীকার করিয়া আনিত, সেদিনও যেমন যত্ন, যেদিন যেদিন শীকার করিতে পারিত না. সেদিনও সেইরূপ যত্ন ; সব দিন সমভাব। বনভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে স্বামী কুটীরে আসিলে সতী একটা মাটির ভাঁড়ে জল লইয়া স্বহস্তে পা ধুয়াইয়া দিত, কাণাভাঙ্গা ছোট একটী কলিকাতে দোক্তা তামাক সাজিয়া দিত, স্বামী শয়ন করিলে দুই হস্তে পদসেবা করিত, গরীবের ঘরে তেমন পতিসেবা অতি অল্পই দেখা যায়। আরও শুনুন,—বৎসরের যে ঋতুর যে ফল, অন্য লোকের বাগানে সেই সকল ফল হইলে, বাগানের মালিকের কাছে অনুমতি লইয়া ফুল্লরা সেই সকল ফলের দুই একটি পাড়িয়া আনিত, যে সকল ফল পাকিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়, তাহা কুড়াইয়া আনিত, কুড়াইয়া আনিবার সময়েও মালিকের অনুমতি চাহিতে ভুলিত না, সেইরূপে সংগৃহীত ফলগুলি যত্নপূর্ব্বক স্বামীকে আহার করাইত, পতির আদেশ পাইলে নিজে একটু তফাতে গিয়া দু'টি একটি ভক্ষণ করিয়া আসিত। তাহার পর রাত্রের আহরোপযোগী অন্ন ব্যঞ্জন অথবা ক্ষুদের জাউ, যাহা কিছু ঘরে থাকিত, অগ্রে পতিকে ভোজন করাইয়া তাহার পর নিজে কিছু প্রসাদ পাইত ; অন্নতা প্রযুক্ত যেরাত্রে প্রসাদ থাকিত না, ফুল্লরা সে রাত্রে উপবাসিনী থাকিত। সে সতী সাধ্বী ব্যাধ পত্নীর ঐরূপ উপবাসের কথা অপর জনপ্রাণীও জানিতে পারিত না। ফুল্লরা একদিনও স্বামীকে একটি কটুকথা বলিত না। আজ কাল আমাদের ভদ্র সমাজে সংসারে কিছু অভাব হইলে কলহ প্রিয়া বধূরা নির্ধন পতির যেরূপ লাঞ্ছনা করেন, দরিদ্রা ব্যাধ পত্নী তাহা আসলেই জানিত না, ভ্রমেও ঝঙ্কার করিত না ; নিতান্ত কষ্ট

হইলে বরং বিরলে অশ্রুবর্ষণ করিত, তথাপি পতির সম্মুখে একটিও অপ্রিয় কথা কহিত না; বিরলে অশ্রু বর্ষণও পতির কষ্টের জন্য, নিজের জন্য নহে।

এক বৎসর অতীত। একদিন গৃহে খাদ্য সামগ্রী কিছুই ছিল না, গত দিবসের শীকারের অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট ছিল, দিনমানে ফুল্লরা তাহা বিক্রয় করিতে যাইবে, যাহা পায়, তাহাতে রাত্রের আহাদের বন্দোবস্ত করিবে, এইমাত্র ভরসা; কালকেতু সুতরাং বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বে অনাহারে জাল দড়ী লইয়া শীকারে বাহির হইল, অনাহারে ফুল্লরাও হাটে গেল।

কালকেতু বনসীমায় প্রবেশ করিয়াই বামদিকে দেখিল, একটা স্বর্ণ বর্ণ গোধিকা ঝোপের মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে। গোধিকা দর্শনে কালকেতু কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; আপন মনে বলিল, "হা অদৃষ্ট! প্রভাতেই অযাত্রা দর্শন! আজ হয়ত কিছুই পাইব না," গোধিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "থাক বেটি, থাক্! বনে যদি আজ কিছু না পাই, তবে তোকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া পুড়াইয়া খাইব।"

নিতান্ত ভগ্ন হৃদয়ে কালকেতু বনমধ্যে প্রবেশ করিল, প্রায় সমস্ত দিন বন ঠেঙ্গাইল, ঝোপে ঝাঁপে তাড়া করিল, জঙ্গলের মুখে জাল পাতিয়া রাখিল, একটি হরিণ বাহির হইল না, ক্ষুদ্র একটি শশক পর্য্যন্ত না। মহাবীর ভাবিল, এই বটে ঠিক! অযাত্রা দর্শনের এই ফল!

বেলাও প্রায় শেষ হয়, সুতরাং হতাশ হইয়া নানাখানা ভাবিতে ভাবিতে মহাবীর জাল দড়ী গুটাইয়া ফিরিয়া চলিল; যেখানে গোধিকা দেখিয়াছিল, সেইখানে আসিয়া দেখিল, যেখানকার গোধিকা ঠিক সেই খানেই শুইয়া আছে। বনের লতা দিয়া গোধিকাটিকে বন্ধন করিয়া, তাহার গাত্রে জাল জড়াইয়া, ধনুকের হুলে ঝুলাইয়া লইয়া কালকেতু গৃহে আসিল; কুটীরের মধ্য স্থলে একটা ঝুড়ী ঢাকা দিয়া গোধিকা রাখিয়া, ঝুড়ীর উপর খান কতক বড় বড় ইট চাপাইয়া, নিরাপদ ভাবিয়া দ্রুতপদে হাটের দিকে ছুটিয়া চলিল। ফুল্লরা সেখানে মাংস বেচিতে ছিল, বিষণ্ণ বদনে কালকেতু তাহাকে বলিল, "তুই ঘরে যা, আমি দোকান রাখি, অযাত্রা দেখিয়া ছিলাম, কিছুই পাই নাই, অযাত্রাটা বাঁধিয়া আনিয়াছি, ঘরের ভিতর ঝুড়ী চাপা দিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, তুই গিয়া সেইটাকে কাটিয়া কুটীয়া পোড়াইয়া রাখিস, সন্ধ্যা হইলেই আমি যাইব।"

কুটীরে গিয়া ফুল্লরা দেখিল, চৌকাটের উপর পা ঝুলাইয়া অষ্টালঙ্কার ভূষিতা একটি পরমা সুন্দরী যুবতী কামিনী বসিয়া রহিয়াছে; কুটীর মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল, একটা ঝুড়ী উল্টাইয়া পড়িয়া আছে, সেখানে আর কিছুই নাই। দুঃখিনীর মনে মহাবিস্ময়। সে তখন সেই সুন্দরীর পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া সজল নয়নে করযোড়ে বলিতে লাগিল, "কে তুমি মা? এই গরীবের ঘরে কেন তুমি এসেছ? কাদের মেয়ে, কাদের বৌ? দেখিতেছি কোন রাজকন্যা; পথ ভুলে এসেছ কি? ঘর ছেড়ে একলাটি পায়ে হেঁটে কেন বেরিয়েছ মা? চল চল, খানিক দূর সঙ্গে গিয়ে আমি তোমাকে বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে আসি। এটা বন পথ, এ পথে চোর ডাকাতের বড় ভয়, তোমার গায়ে এত গহনা রয়েছে, তোমার এমন চমৎকার রূপ, এখানে তোমার দেরি করা হবে না; সন্ধ্যা হয়ে এলো, চলো মা চলো, এই বেলা"——

কামিনী বলিলেন, "আমি যাব না। তোমার স্বামী আমাকে এনেছে, কেন আমি যাব? মহাবীরকে আমি ভাল বেসেছি, এই খানেই আমি থাকব।"

পুনরায় করযোড়ে মিনতি করিয়া ফুল্লরা বলিতে লাগিল, "এখানে তুমি কোথায় থাকবে মা? এই দেখ, আমাদের ভাঙ্গা কুঁড়ে, ভেরেণ্ডার খুঁটি, তালপাতার চাল, বৈশাখ মাসের একটু জোর বাতাসে রোজ রোজ পোড়ে, আর বর্ষকালে এক বিন্দু জল বাহিরে পড়ে না, শীতকালে হিমে শীতে বুকে হাত বেধে পোড়ে থাকি। রোজ আমাদের ভাত জোটে না, বাসী আমানী খাই, আমানী খাবার জন্য মেটে পাথরের একটি বাটী পর্য্যন্ত নাই, ঘরের মেজেতে গর্ত্ত খুঁড়ে রেখে, সেই গর্ত্তে আমানী ঢালি, শিয়াল কুকুরের মত হেঁট হয়ে হয়ে চুমুক দিয়ে খাই। এখানে তুমি কোথায় থাকবে মা? এখানে তুমি কি খাবে মা? থাকা হবে না, চল, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি, বাড়ী যদি কাছে হয়, তবে তোমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত রেখে আসি।"

সুন্দরী হাস্য করিলেন, কিছুতেই উঠিতে চাহিলেন না; ফুল্লরা কাঁদিতে কাঁদিতে গোলাহাটে ছুটিয়া গেল।

হাট প্রায় তখন ভাঙ্গা হাট। ফুল্লরার মুখ চক্ষু দেখিয়া সবিস্ময়ে কালকেতু জিজ্ঞাসা করিল, "একি! শাশুড়ী নাই, ননদী নাই, সতীন নাই, কার সঙ্গে ঝগড়া কোরে কেঁদে কেঁদে চক্ষু রাঙ্গা করে এলি?"

ফুল্লরা বলিল, "শাশুড়ী ননদ নেই, সতাসতীন নেই, তুমিই আমার সতা এনেছ। কোন্ বড় লোকের বাড়ীর রূপসী সমর্থ মেয়েকে ঘরে এনেছ?"

আরও বিস্ময়ে চাহিয়া কালকেতু বলিল, "ও আবার কি কথা? আম
সঙ্গেও ঐরূপ ঠাট্টা? সত্য কি হয়েছে বল। যে জন্তুটা পুড়িয়ে রাখ
বলেছিলাম, তার কি হল?"

ফুল্লরা উত্তর করিল, "কোথায় তোমার জন্তু? ঘরের ভিতর একটা
কান্ত হয়ে পড়ে আছে, কোথাও কিছু নাই, চৌকাটের উপর পদ্ম ফুলের ম
একটি সুন্দরী মেয়ে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে রয়েছে; গায়ে তার কত ব
দামী দামী গয়না, কেমন সুন্দর কাপড় পরা, মুখে হাসি ধরে না। কে সে
ভয়ে ভয়ে কত সাধ্যি সাধনা করে তাড়াবার চেষ্টা পেলেম, আপনাদের
জানিয়ে কত রকম হিত কথা বুঝালেম, চোর ডাকাতের ভয় দেখালেম,
গিয়ে বাড়ী পর্য্যন্ত রেখে আস্‌তে চাইলেম, কিছুতেই গেল না, কিছুতেই উঠ
না। সে বলে, "তোমার স্বামী আমাকে এনেছে, আমি যাব না, এই খা
থাকব।" আমার মাথা খেয়ে কুড়ে ঘরে কি উৎপাত জুটিয়েছ? এই দেখ
কুড়ের দোর আলো করে বসে রয়েছে। দুর্দ্দান্ত কলিঙ্গ রাজার রাজ্যে ব
শুনিলে এখনি সর্ব্বনাশ করবে।"

কালকেতুর মনে যে তখন কত প্রকার সন্দেহের উদয় হইল, কালকে
তাহা জানিতে পারিল, মনের সন্দেহ মনে রাখিয়া, তাড়াতাড়ি দোকান গুট
ফুল্লরার সঙ্গে ঘরে চলিল, বৃথা তর্ক করিয়া আর কথা বাড়াইল না।

উভয়ে কুটীরে আসিয়া পৌছিল। কালকেতু দেখিল, অপরূপ রূপ!
শুনিল, তাহাই সত্য। পূর্ব্বেই বিস্ময় জন্মিয়াছিল, তাহার উপর আবার
গুণ বিস্ময় বাড়িল। দরিদ্র ব্যাধের কুমার গলায় কাপড় দিয়া, সুন্দরীকে প্র
করিয়া, ছল ছল চক্ষে মুখপানে চাহিয়া, স্তম্ভিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,
মা তুমি? কোথা থেকে এসেছ? কেমন কোরে এলে? কোথায় তো
বাড়ী? চলমা, এখনো অন্ধকার হয় নি, চল, আমি তোমাকে
আসি। আমরা বনে থাকি, ভয়ানক বন, অনেক রকম ভয়, বিশেষ নি
কলিঙ্গ রাজা, ভারি দুরন্ত, তোমার এই চমৎকার রূপ দেখ্‌তে পেলে
উপদ্রব ঘটাবে। চল, এই বেলা ফাঁকে ফাঁকে তোমাকে রেখে আসি।"

সুন্দরী মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন, অনেক রকম বাক চাতুরী খেলিলেন,
না যাব না, বলিয়া বারম্বার অস্বীকার করিলেন। কালকেতু কিছু প্র
মানিল না, তখন তাঁহার ভয় হইল, পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁ
বলিল, "এ গরীবকে কেন মজাও মা? কলিঙ্গ রাজ জান্‌তে পার্‌লে তো

রে নিয়ে যাবেই যাবে, আমাকেও দেশ ছাড়া হতে হবে। চল মা, চল মা,
ছলনা কোরো না, চল তোমাকে রেখে আসি।"

মা তখন হাস্য করিয়া বলিলেন, "মহাবীর! বোসো, তোমার সঙ্গে
মার কথা আছে। পা ছাড়ো, কথা শোনো।"

কম্পিত স্বরে কালকেতু বলিল, "তুমি বড় ঘরের মেয়ে, এ গরীবের সঙ্গে
মার কি কথা? কোন কথা আমি শুন্‌ব না, তুমি চল।"

সুন্দরী তখন ছলনা ছাড়িয়া মিষ্ট বচনে বলিলেন, "মহাবীর!
মার ভাল হবে; এ কষ্ট তোমাদের থাকবে না। তোমাদের কষ্ট দেখে
খে আমার বড় কষ্ট হয়েছিল, আমিই আজ বনের সব পশু পক্ষী হরণ করে,
জ গোধিকা রূপিণী হয়ে বনের ধারে পড়ে ছিলাম, অযাত্রা মনে কোরে
মি আমাকে বেধে এনে ছিলে, এখানে এসে আমি নিজ মূর্ত্তি ধরেছি।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে, পা দু'খানি ছাড়িয়া দিয়া, একটু তফাতে বসিয়া,
স্ফারিত নেত্রে চাহিয়া অর্দ্ধ স্ফুট স্বরে কালকেতু তখন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে
তুমি কে?"

সুন্দরী বলিলেন, "আমি মঙ্গল-চণ্ডী, তোমাদের দুঃখ মোচনের জন্য
াধিকা রূপে আমি তোমায় ছলনা কোরে ছিলেম, আমাকে ঝুড়া চাপা দিয়ে
খে তুমি তাড়াতাড়ি গোলাহাটের দিকে চলে গেলে, সেই অবসরে আমি এই
রূপ ধারণ কোরে এইখানে বসে আছি।"

কালকেতুর দু চক্ষে জলধারা বহিল। ফুল্লরার মুখে বাক্য নাই, চক্ষে
জল নাই, পলক নাই, এককালে যেন পাষাণ পুতলী।

অবিলম্বে নেত্রজল মার্জ্জনা করিয়া কিঞ্চিৎ সতেজ স্বরে কালকেতু বলিল,
"প্রত্যয় হয় না। মা, মঙ্গল চণ্ডীর কি এই রূপ? সত্যই যদি তুমি মঙ্গল
চণ্ডী, ছলনা ছাড়ো, তবে তোমার নিজ মূর্ত্তি দেখাও।"

হাস্য করিয়া দেবী কহিলেন, "তবে গৃহ মধ্যে চল"—এই বলিয়া গাত্রো
খান করিয়া সুধীর গজেন্দ্র গমনে মা মঙ্গল চণ্ডী কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সভয়ে কম্পিত হৃদয়ে কালকেতু অনুবর্ত্তী; কলের পুত্তলিকার ন্যায়
ফুল্লরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ব্যাধের ভগ্ন কুটীর সহসা পদ্ম সৌরভে আমোদিত, কুটীরের মধ্যস্থলে অষ্ট
হাসিনী চতুর্ভূজা দেবী মূর্ত্তি। অঙ্গ সৌরভে অঙ্গ জ্যোতিতে কুটীরখানি সুবাসে
আলোকিত। দর্শন মাত্র কালকেতু ও ফুল্লরা দেবীর পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িল। চকিতে রূপ সম্বরণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব রূপ নারী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দয়াময়ী দেবী পদ্মহস্ত স্পর্শে অজ্ঞান দম্পতির চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া দম্পতি নির্ব্বাকে করজোড়ে পুনঃ পুনঃ দেবীর চরণ তলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, উভয়ের চারি চক্ষে অবিরল পুলকাশ্রু প্রবাহিত, সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ নির্ব্বাক অভিনয়ের পর আশ্বাস বচনে দেবী কহিলেন, "মহাবীর ভার বহন করিবার রজ্জু দণ্ড যদি তোমার থাকে, তাহা সংগ্রহ করিয়া লও, মৃত্তিকা খননের একখানি কোদালী লও, আমার সঙ্গে এসো অগ্রে তোমার দুঃখ মোচন করি, তাহার পর অন্য কথা কহিব।"

সন্ধ্যা হইয়াছিল, শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি. আকাশে অর্দ্ধচন্দ্রের উদয়, বনস্থলী চন্দ্রালোকে প্রভাসিত। পূর্ণ ষোড়শী সৌন্দর্য্যময়ী রমণী মৃদু মন্থর পদে অগ্রে অগ্রে চলিলেন, কোদালী ও দণ্ড রজ্জু হস্তে পশ্চাতে পশ্চাতে কালকেতু। রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড।

প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অপ্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ ; সুন্দরী সেই বৃক্ষতলে গিয়া দাঁড়াইলেন ; তলস্থ একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কালকেতুকে আদেশ করিলেন, "কালু! কোদালী দ্বারা এই স্থানের মৃত্তিকা খনন কর।"

কালু তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল। গহ্বর হইতে উত্তোলিত হইল কি? চাকচিক্য ময় স্বর্ণ মুদ্রা পরিপূর্ণ সাতটি স্বর্ণ কুম্ভ।

স্বর্ণপূর্ণ সপ্ত কুম্ভ দর্শনে কালকেতু আনন্দে অবসাদ। দেবী তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "আমি এইখানে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি তোমার ভারে করিয়া দুটি দুটি কুম্ভ তোমাদের কুটীরে রাখিয়া আইস।"

আজ্ঞা পালন করিতে কালকেতুর বিলম্ব হইল না ; দুটি দু'টি করিয়া দুই ক্ষেপে চারিটি কুম্ভ কুটীরে রাখিয়া আসিল ; তৃতীয় ক্ষেপে কিছু গোলযোগ বাঁধিল। তিনটি কুম্ভ অবশিষ্ট। এক ভারে তিন কুম্ভ যাইতে পারে না ; কি হয়—কটিদেশে হস্তার্পণ করিয়া কালকেতু ভাবিতে লাগিল। দেবী কহিলেন, "এক ভারে দুই কুম্ভ তুমি লও, শেষের কুম্ভটি আমি স্বয়ং কক্ষে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

কালকেতুর আহ্লাদ হইল ; ভারে করিয়া দুই কুম্ভ তুলিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল, কুম্ভ কক্ষে দেবী চলিলেন পশ্চাতে!

কালকেতু যায়, মাঝে মাঝে এক একবার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিয়া ফিরিয়া চায় ; মনে মনে আশঙ্কা—পার্ব্বতী পাছে কুম্ভটি লইয়া পলায়ন করেন।

অজ্ঞান মানুষের মন এইরূপ সন্দিগ্ধই বটে! যিনি সপ্তকুম্ভ স্বর্ণ দিলেন, তিনি একটি কুম্ভ লইয়া পলায়ণ করিবেন, কালকেতুর সেই আশঙ্কা!

মহাবীরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, অট্ট অট্ট হাসিয়া পার্ব্বতী কহিলেন, "ভয় নাই কালু! আমি পলাইব না তুমি চল।"

সজ্জিত হইয়া কালকেতু চলিল, আর একবারও ফিরিয়া চাহিল না। উভয়ে কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আহ্লাদে ফুল্লমুখী ফুল্লরা চারিটি কুম্ভ চৌকি দিতে ছিল, এইবার সপ্ত কুম্ভ পূর্ণ হইল।

অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর দেবী কহিলেল, "তোমরা বলিয়াছ, এখানে দুস্যু তস্করের ভয় ; এই ভগ্ন কুটীরে এই ধন গুলি থাকিলে, কি জানি, কেহ যদি আসিয়া চুরি করে ; তোমরা এক কাজ কর, ঘরের মেজেতে গর্ত্ত করিয়া এই কুম্ভগুলি পুতিয়া রাখ, আবশ্যক মত অল্প অল্প বাহির করিয়া আমার আদেশ মত কার্য্য করিও। আমি এখানে থাকিতে পারিব না,—কল্য প্রাতঃকাল হইতে বহুলোক নিযুক্ত করিয়া তোমরা এই গুজরাটের বন কাটাইতে আরম্ভ কর, জঙ্গল পরিস্কার হইলে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাও, হাট বাজার বসাও, নগর পত্তন কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, কালু, তুমি এই গুজরাটের রাজা হইবে ; যত ধন চাও, আমারে স্মরণ করিলেই তাহা পাইবে। পৃথিবীর রাজাদের যেরূপ ঐশ্বর্য্য থাকে, যেরূপ হস্তি অশ্ব প্রহরি দাস দাসী ও সৈন্য সামন্ত থাকে, তোমারাও সেইরূপ রাখিও; কোন প্রতিদ্বন্দী যদি তোমাদের সুখ সম্পদে ঈর্ষা প্রকাশ করিয়া বিরোধি হয়, আমারে স্মরণ করিও।"

কালকেতুকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, ফুল্লরার দিকে চাহিয়া সহাস্য বদনে দেবী পুনর্ব্বার কহিলেন "ফুল্লরা! তোমার পতি ভক্তি নিষ্ঠা আমি জানি, সম্পদের অধিকারিণী হইয়া গর্ব্বিতা হইও না, পতির প্রতি অবহেলা করিও না, সমান যত্নে পতি সেবা করিও ; যাহা আমি দিলাম তাহা তোমার অকপট পতি ভক্তির পুরস্কার। ফুল্লরা! তুমি আর একটি কাজ করিও। প্রতি মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে একটী গৃহে ঘটস্থাপন করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিও ; তোমরা এতদিন দরিদ্র ছিলে,—কেহ তোমাদের তত্ত্ব লইত না, এক্ষণে ধন সম্পদ প্রাপ্ত হইলে, অতঃপর বনের নারী তোমাদের আলয়ে আসিবে ; মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিলে সংসারে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়, নারীগণকে এইরূপ

উপদেশ দিয়া মঙ্গল চণ্ডীর পূজা শিক্ষা দিও। তন্ত্র মন্ত্র প্রয়োজন হইবে না, কেবল ভক্তি পাইলেই মঙ্গলচণ্ডী তুষ্ট থাকেন, সকলকে এই কথা বলিয়া নিজের গৌরব রক্ষা করিও; নিজেও ভক্তিমতী হইয়া কেবল ভক্তি পুষ্পে পূজা করিও।"

বাণী নিস্তব্ধ। দেখিতে দেখিতে দেবী মঙ্গলচণ্ডী সেইখানেই অদৃশ্য হইলেন। ফুল্লরা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল; মায়ামুগ্ধ কালকেতু তখন কি ভাবনায় অন্যমনস্ক ছিল. দেবীর অন্তর্ধান ঠিক সময়ে জানিতে পারে নাই, ফুল্লরা যখন রোদন করিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মা কোথায় গেল" তখন তাহার চৈতন্য হইল; পতি পত্নী উভয়েই ধুলায় বিলুণ্ঠিত হইয়া মা—মা বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

ভক্তের প্রতি ভক্ত বৎসলা অপার করুণা; ভক্তের রোদন তিনি অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না, অবিলম্বেই দৈববাণী হইল, "রোদন সম্বরন কর; আমার অদর্শনে কাতর হইও না, মনে মনে স্মরণ করিলেই. হৃদয়ে দৃষ্টিপাত করিলেই, আমারে দেখিতে পাইবে। যাহা আদেশ করিয়াছি, তাহা পালন কর; গুজরাটের বন কাটাও, অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাও, নূতন নগর পত্তন কর, গুজরাট রাজ্যের রাজা হও। যে ধন প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা অক্ষয় হইবে।"

দৈববাণী শ্রবণে ব্যাধ দম্পতি উঠিয়া বসিল, রোদন সম্বরণ করিল, ক্ষণ পূর্ব্বে কুটীর অন্ধকার দেখিয়াছিল, পুনর্ব্বার অপরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিল।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত। দুঃখের চিন্তায় উপবাসী দরিদ্রের নিদ্রা হয় না, রোগ শোক সন্তপ্ত অভাগার নিদ্রা হয় না; প্রবাসগত আত্মীয়জনের উৎকট পীড়ার সংবাদে স্নেহ কাতর দুশ্চিন্তা শীলের নিদ্রা হয় না, বিপদে অভিভূত গৃহস্থ লোকের প্রতি নিদ্রার যেরূপ অকৃপা, সম্পদে আনন্দ প্রফুল্ল ব্যক্তি ব্যুহের সহিতও নিদ্রাদেবীর সেইরূপ সাক্ষাত হয় না; সে রাত্রে কালকেতুর ও ফুল্লরার নিদ্রা হইল না, বিপুল আনন্দে তাহারা সমস্ত রজনী জাগরণ করিল।

পরদিন প্রভাতে দেবীর আদেশ পালনের সূত্রপাত। সহস্র সহস্র শ্রমজীবী কাঠুরে আহুত হইল, বিবিধ অস্ত্র সস্ত্র প্রয়োগে তাহারা বন কাটিতে আরম্ভ করিল, দুই মাস ব্যাপিয়া বন কাটা হইল. তাহার পর স্থপতি নিয়োগ। শত শত স্থপতি অট্টালিকা নির্ম্মাণের বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সত্বর কার্য্য

আরম্ভ করিয়া দিল, সম্ভাবিত সময়ের মধ্যে মনোহরা রাজপুরী নির্ম্মিত হইল। নিকেতনের উপযুক্ত দাস দাসী দ্বারপাল হস্তী অশ্ব গাভী ও তাহাদিগের রক্ষক প্রভৃতি নিযুক্ত হইল।

ইহার পর নগর পত্তনের ঘোষণা। ডঙ্কা বাজাইয়া কালকেতু বহুক্রোশ দূর পর্য্যন্ত জনস্থানে ঘোষণা প্রচার করিল, "গুজরাটে নূতন নগর বসিবে, নূতন নূতন হাট বাজার দোকান পসার বসিবে, এখানে বাস করণেচ্ছু প্রজাগণ তাহাদের গৃহ নির্ম্মাণের সরঞ্জাম ও খরচ পত্র এই স্থানেই প্রাপ্ত হইবে, বসত বাটী ও কৃষি ক্ষেত্রাদির কর দিতে হইবে না, ব্যবসায়ী লোকেরা বিনাব্যয়ে এখানে আসিয়া ইচ্ছামত বিপণী ইত্যাদি স্থাপন করিতে পারিবে, জমীর অথবা বিপণীর খাজনা দিতে হইবে না।"

ঘোষণা প্রচারের ফলে নিত্য নিত্য দলে দলে লোক আসিয়া নূতন নগরে বাস করিতে আরম্ভ করিল, প্রজালোকের বাসের জন্য এবং বাজারের দোকানের জন্য নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল, কালকেতুর ভাণ্ডার হইতে সমস্ত ব্যয় বিতরিত হইল; এক মাসের মধ্যে নূতন নগর নূতন নূতন লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বাসিন্দালোকের বাস ভবন ও বাজারের বিপণী ভবন গুলি সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ করা হইল; শৃঙ্খলার গুণে নগরের শোভাও দর্শক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগিনী হইয়া উঠিল।

মঙ্গলচণ্ডীর আদেশানুসারে কালকেতু সেই নূতন রাজ্যের রাজা হইলেন, পতিব্রতা ফুল্লরা সুন্দরী রাজ মহিষী হইয়া তাঁহার বাম ভাগ শোভিত করিলেন। এই স্থলে প্রসঙ্গাধীন দুটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক, মঙ্গলচণ্ডীর আদেশ ছিল—ফুল্লরা ভক্তি ভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিবেন, নগরবাসিনীগণকেও সেইরূপ পূজা শিখাইবেন; ব্রতবতী ফুল্লরারাণী পরম যত্নে সেই আদেশ পালন করিতে লাগিলেন, নবাগত প্রজালোকের স্ত্রী কন্যারাও মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতে শিখিল। দ্বিতীয় কথায় মঙ্গলচণ্ডীর নূতন মহিমা প্রকাশ। দৈববাণী হইয়াছিল, "প্রাপ্ত ধন অক্ষয় হইবে।" বাস্তবিক তাহাই হইল। বৃক্ষতল হইতে আনিত সপ্ত স্বর্ণ কুম্ভের স্বর্ণ মুদ্রা যতই ব্যয় হয়, ততই বৃদ্ধি পায়, ফুরায় না। দেবীদত্ত ধন চিরদিন অক্ষয়।

গুজরাট প্রদেশ তৎকালীন কলিঙ্গ রাজের অধিকারভুক্ত ছিল, কলিঙ্গ-রাজধানীর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের বিস্তর লোক পূর্ব্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া গুজরাটের নূতন নগরে আসিয়া বাস করিতেছে, অল্প দিনের মধ্যে কলিঙ্গ রাজ

সেই অদ্ভুত সমাচার প্রাপ্ত হইলেন; পাত্র মিত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি আশ্চর্য্য ব্যাপার? হঠাৎ আমার গুজরাট রাজ্যের কে রাজা হইল? কে অকস্মাৎ সেখানে নূতন নগর পত্তন করিল?"

অমাত্যেরা প্রথম হইতেই অনুসন্ধান রাখিতে ছিলেন, রাজার প্রশ্নে প্রধান মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "মহারাজ! গুজরাটের অরণ্য প্রান্তে সঞ্জয়কেতু নামে যে এক দরিদ্র ব্যাধ একখানা ভগ্ন কুটীরে বাস করিত, তাহার পুত্র কালকেতু, কে জানে কোন দেবতার বরে সেই কালকেতু অকস্মাৎ রাজা হইয়া নূতন নগর বসাইয়াছে. আমাদের প্রজাগণ দিন দিন দলে দলে সেই নগরে উঠিয়া যাইতেছে।"

শুষ্ক তালপত্রে অগ্নি প্রদান করিলে যেমন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, বার্ত্তা শ্রবণে কলিঙ্গ রাজের ক্রোধানল সেইরূপ প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল; গর্জ্জন করিয়া তিনি আজ্ঞা দিলেন, "এককালে সহস্র সৈন্য প্রেরণ কর, কালকেতুর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তাহাকে বন্ধন করিয়া আনুক।"

শক্তিশালী রাজাদের আজ্ঞা পালনে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না, রাজাজ্ঞা ধ্বনিত হইবামাত্র রাজ-সেনাদলের সেনাপতিগণ সহস্র সৈন্য সাজাইয়া গজ বাজী আরোহণে রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে গুজরাটে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

কালকেতু রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে নগর গড় বন্দী হইয়া উঠে নাই; নিরাপদ দুর্গ নির্ম্মিত হয় নাই, উপযুক্ত সেনানিবেশ সংস্থাপিত হয় নাই, সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, এ অবস্থায় পরাক্রম তুলনায় কলিঙ্গ রাজ অপেক্ষা কালকেতু দুর্ব্বল, কলিঙ্গের অস্ত্রধারী সেনাগণ সহসা অতর্কিতে কালকেতুর নগর আক্রমণ করিল, দুই দলে ঘোর যুদ্ধ বাঁধিল; অল্প সৈন্য হইলেও তাহারা বহুক্ষণ কলিঙ্গ রাজের বহু সৈন্যের সহিত অসম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিল। বাল্য কাল হইতে লোকমুখে কালকেতুর উপাধি হইয়াছিল, মহাবীর, যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীর কালকেতু স্বয়ং সেনাপতি হইয়াছিলেন; মৃগয়াজীবী ব্যাধ পুত্র হইলেও ধনুর্ব্বেদে তিনি সুশিক্ষিত, সর সন্ধানে ও তরবারি চালনে তিনি একাকী শতাধিক রাজসৈন্য নিপাত করেন; রাজার সুযোগ্য সেনাপতিগণ কালকেতুর বিক্রম দর্শনে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকেন; পরিশেষে বহু সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে কালকেতুর সেনাগণ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সেই সময় কলিঙ্গের একজন সাহসী সেনাপতি দ্বন্দযুদ্ধের অভিলাষে কালকেতুর সম্মুখীন হন, উভয়ে খানিক্ষণ দ্বন্দযুদ্ধ হয়; কালকেতুর সুশানিত অসি প্রহারে

কলিঙ্গ সেনাপতি রক্তাক্ত কলেবরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন; দ্বন্দযুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যায়, কলিঙ্গের শত শত সেনা হুহুঙ্কার গর্জ্জনে এককালে কালকেতুকে বেষ্টন করে; আপনাকে অরক্ষিত দেখিয়া কালকেতু অত্যন্ত অপূর্ব্ব কৌশলে বৈরী সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া তীর বেগে রণক্ষেত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

রাজ সেনাগণ পশ্চাৎধাবন করিয়া ছিলেন, কিন্তু কালকেতুকে ধরিতে পারে নাই। তাহারা প্রত্যাবৃত হইলে সেনাপতিগণের আদেশে কালকেতুর হতাবশিষ্ট জীবিত সেনাগণকে বন্দী করা হয়, রাজপুরী লুণ্ঠনের চেষ্টা হইতে থাকে। একজন সেনাপতি হুকুম দিলেন, "অগ্রে কালকেতুকে ধর, তৎপরে লুণ্ঠনের অনেক সময় পাওয়া যাইবে।"

অন্তঃপুর প্রবেশে বিজয়ী সেনাগণ ইতস্ততঃ করিতেছিল, ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য একজন বিক্রান্ত সেনাপতি অসি সঞ্চালন পূর্ব্বক হুঙ্কার স্বরে বলিলেন, 'পলাতক বৈরীকে ভূগর্ত্ত হইতে টানিয়া বাহির করা রণনীতি সঙ্গত, তোমরা নির্ভয়ে অশঙ্কোচে অন্তঃপুরে প্রবেশ কর, নরাধম রাজ বিদ্রোহীকে বাঁধিয়া আনো।"

অন্যূন পাঁচিশজন রাজসেনা তরবারি আস্ফালন করিয়া হুহুঙ্কার শব্দে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ফুল্লরা তখন পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া কম্পিত কলেবরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতে ছিলেন, অস্ত্রধারী সেনাগণ নিকটবর্ত্তী হইলে নারী স্বভাব সুলভ চাঞ্চল্যে পূজা করিতে করিতে তিনি সভয়ে সজল নয়নে পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষের দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। একজন সতর্ক সেনানী সেই দৃষ্টি পাতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল, অনুমান করিয়া সে ব্যক্তি বুঝিয়া লইল, ঐ ঘরে কালকেতু লুকাইয়া আছে; ইঙ্গিতে সহচরগণকে গূঢ় তত্ত্ব জানাইয়া দিল, চারিজন বলবান সেনা সেই গৃহের দ্বার ভঙ্গ করিয়া কালকেতুকে ধরিয়া বাহির করিল, মঙ্গলচণ্ডীর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া কালকেতু তখন কিছু মাত্র বলপ্রকাশ করিলেন না। ফুল্লরার সম্মুখেই রাঙ্গ সেনাগণ কালকেতুকে লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধন করিল, ধাক্কা মারিতে মারিতে বাহির করিয়া লইয়া গেল।

"মা মঙ্গল চণ্ডি! কি করিলে মা! দিয়ে নিধি হরে নিলে মা! দয়াময়ী নামে কলঙ্ক রাখিলে মা!" এইরূপ করুণা করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ফুল্লরার সতী ধুলায়গড়া গড়ি দিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল মধ্যেই মুর্চ্ছা তাঁহার বাকশক্তি হরণ করিল।

* * * *

ওদিকে রণজয়ী কলিঙ্গ সেনাদল বন্দীগণকে লইয়া জয়বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে নিশান উড়াইয়া কলিঙ্গনগরে যাত্রা করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে বিজয়ী সেনাপতিগণ কালকেতুকে লইয়া কলিঙ্গরাজ সমীপে ভেট দিল। রাজা ভ্রুকুটী ভঙ্গিতে কালকেতুর দিকে একবার চাহিয়া সহাস্য আস্যে শ্লেষ ব্যঞ্জক স্বরে উচ্চারণ করিলেন, "হুঃ! এই বেটা মহাবীর! ইহাকে নির্জ্জন কারাগারে নিক্ষেপ কর।"

শৃঙ্খলাবদ্ধ কালকেতু নির্জ্জন কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইলেন, অপরাপর বন্দীগণ অপর এক অন্ধ কূপে রক্ষিত হইল।

রাত্রি দুই প্রহর। বিজয়ানন্দ গর্ব্বে পুলকিত, কলিঙ্গরাজ স্বর্ণ পর্য্যাঙ্কে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, ইত্যবসরে উৎকট স্বপ্ন দর্শন। এলোকেশী উগ্রচণ্ডা বেশে দেবী মঙ্গলচণ্ডী তাঁহার শিহরে বসিয়া গম্ভির স্বরে বলিতেছেন, "কলিঙ্গরাজ! কি কার্য্য করিয়াছ? কালকেতু আমার বর পুত্র, বিনাদোষে তাহাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছ। প্রায়শ্চিত্ত কর। প্রভাত হইবামাত্র কালকেতুকে মুক্তি দিয়া, রাজবেশে সাজাইয়া, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া, স্বয়ং তাহার মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া পদব্রজে সঙ্গে সঙ্গে গিয়া, গুজরাটের রাজ সিংহাসনে স্থাপন করিও; নতুবা তোমার রাজ্য নাশ বংশ নাশ অখণ্ডনীয়।"

স্বপ্ন দর্শন করিবামাত্র কলিঙ্গরাজের নিদ্রাভঙ্গ। গৃহে স্বর্ণ দীপাধারে সুগন্ধি বর্ত্তিকা জ্বলিতে ছিল, রাজা শঙ্কিত নয়নে গৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত, ঘন ঘন কম্প, উষা আগমনের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি উন্মত্তের ন্যায় কম্পিত পদে কারাগারে ছুটিয়া গেলেন, কারা রক্ষিকে দ্বার মুক্ত করিবার আদেশ করিলেন; প্রহরী তৎক্ষণাৎ দ্বার মুক্ত করিয়া, বিনা অনুমতিতেই বাতী জ্বালিয়া আনিল, রাজা কারামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কালকেতু বন্ধন মুক্ত হইয়া মুদিত নয়নে করজোড়ে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। রাজার বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রহিল না; তিনি গলল্গ্নী কৃতবাসে যুক্তকরপুটে কালকেতুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কালকেতু কথা কহিলেন না।

কলিঙ্গরাজ ও গুজরাটরাজ উভয়েই উষাকাল পর্য্যন্ত সেই গৃহে রহিলেন, প্রভাত হইবামাত্র রাজপুরী মধ্যে মহাজন কোলাহল সমুত্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে রাজার অনুমতি ক্রমে কারাধ্যক্ষ রাজপুরস্থ সমস্ত লোককে সংবাদ দিয়া

রাখিয়া ছিল, সকলেই প্রস্তুত। রাজা সম্ভ্রমে কালকেতুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কারাগৃহ হইতে সভাগৃহে আনয়ন করিলেন, রাজবেশ ও রাজমুকুট পরাইয়া কণ্ঠদেশে মুক্তাহার প্রদান করিলেন, সকলে তাহা অবলোকন করিয়া মহা বিস্মিত হইল। দ্বিতায় কারাকুপ হইতে কালকেতুর সেনাগণকে বাহির করিয়া আনিয়া বন্ধন মোচন করা হইল; প্রাঙ্গনে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল।

গগনে নব সূর্য্যের উদয়। কলিঙ্গরাজ স্বহস্তে কালকেতুকে সুসজ্জিত গজ পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া তাঁহার মুকুট শোভিত শিরে স্বর্ণছত্র ধারণ করিলেন, সৈন্য সামন্ত ও অমাত্যবর্গ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তুরী ভেরী ও বিজয় ডঙ্কা বাদিত হইতে লাগিল; কালকেতু হস্তি পৃষ্ঠে বসিয়া গুজরাট যাত্রা করিতেছেন, ছত্রধারি কলিঙ্গরাজ আজ্ঞাকারীদাসের ন্যায় পদব্রজে সঙ্গে যাইতেছেন, অনুচরবর্গ অগ্র পশ্চাতে সারিবন্দী হইয়া চলিয়াছে, সেই এক অপরূপ শোভা।

* * * *

সূর্য্যদেব মধ্য গগন হইতে প্রখর কর বর্ষণ করিতেছেন, সেই সময় রাজা ও রাজ অনুচর বেষ্টিত গজারোহী গুজরাটরাজ কালকেতু আপন প্রাসাদে উপনীত হইলেন। দূর হইতে বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া ফুল্লরা সুন্দরী অভিনব কৌতূহলে প্রাসাদ শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, স্বামীর মুক্তি লাভ ও রাজসম্মান দর্শনে ফুল্লমুখী হইয়া উদ্দেশ্যে মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করিলেন। রাজপুরী মঙ্গল উৎসবে আনন্দময়। হস্তী হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক রাজা কালকেতু প্রসন্ন বদনে পুনঃ প্রবেশ করিলেন, যে সুরম্য মন্দিরে তাঁহার উপবেশনের সিংহাসন, সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সিংহাসন সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন, অনুবর্ত্তি রহিলেন স্ব পারিষদ কলিঙ্গরাজ।

করুণাময়ী মঙ্গলচণ্ডীর বরে কালকেতু রাজা হইয়া ছিলেন, রাজ রীত্যানুসারে অবশ্য অভিষেক হইয়া ছিল, এই দিন আবার নূতন অভিষেক। কলিঙ্গ রাজ তাঁহাকে কোলে করিয়া রাজ সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন, সুসজ্জিতা মহিষী ফুল্লরা লজ্জাবিনম্র বচনে সভায় আগিয়া সিংহাসনে পতির বাম পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, কালকেতুর ললাটে রাজটীকা দিয়া কলিঙ্গরাজ পশ্চাত ভাগে ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইলেন, মধুর তালে মঙ্গল বাদিত্র বাদিত হইল, সৈন্যগণ ও সমবেত জনগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিল। রাজাসনে রাজা কালকেতুর পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সকলেই মহানন্দে পুলকিত।

কলিঙ্গরাজ সে দিন সে রাত্রি গুজরাটের রাজ ভবনেই অবস্থিতি করিলেন, কালকেতু ও ফুল্লরা তাঁহার সমাদরের ও যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। নূতন নগরটি কিরূপ সজ্জিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া কলিঙ্গরাজ তাহা দর্শন করিলেন, প্রজাগণকে ও ব্যবসায়ীগণকে পরিতুষ্ট করিয়া নবরাজ কালকেতুর আনুগত্য করিবার উপদেশ দিলেন; "আমিও রাজা কালকেতুর মিত্ররাজা হইলাম।" বলিয়া স্বীয় ঔদার্য্য প্রদর্শন করিলেন, সখ্যভাবে কালকেতুকে বলিলেন, "রাজন! মিত্রবর! গুজরাটের রাজ্য তোমার হইল, কলিঙ্গ রাজ্যেও তুমি অদ্যাবধি আমার ন্যায় প্রভুত্ব করিবে, আমি তোমার অনুগত সখা হইয়া রহিব।

নিশাকালে রাজান্তঃপুরে ফুল্লরার সহিত কলিঙ্গরাজের বিশ্রব্ধ কথোপকথন। সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া ফুল্লরা বলিলেন, "মহারাজ! আপনার লোকেরা আমার স্বামীকে বিনাদোষে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দান করিয়াছেন, মা মঙ্গলচণ্ডী আপনার মঙ্গল করিবেন। মহারাজ! প্রথমাবধি আমরা দীন হীন কাঙ্গালী ছিলাম, দিনান্তে উদরান্ন জুটিত না, মা মঙ্গল চণ্ডীর কৃপায়,—আমাদের এই সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। এক্ষণে দয়া করিয়া দাসীকে ক্ষমা করিবেন, নিবেদন করি, আমার স্বামীর মুক্তিদান করিবার সময় আপনার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল?"

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া রাজা উত্তর করিলেন, "কোন ভাবের উদয় হয় নাই। গত রজনীতে নিদ্রাবেশে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলাম। লোল রসনা, রক্ত বসনা, মুক্তকেশী এক উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি আমার শিহরে বসিয়া, ভয় দেখাইয়া কালকেতুকে মুক্ত করিবার আদেশ করিলেন, তাঁহারই আদেশে কালকেতুকে রাজবেশ ধারণ করাইয়া, ভৃত্যের ন্যায় ছত্রধারণ পূর্ব্বক আমি স্বয়ং পদব্রজে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাঁহাকে গুজরাটের রাজ সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছি।

শিহরিয়া উঠিয়া ফুল্লরা বলিলেন, "মহারাজ! উগ্রচণ্ডাবেশে যাহাকে আপনি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছেন, তিনি আমার মা মঙ্গলচণ্ডী।"

চমকিত হইয়া রাজা কহিলেন, "মা তুমি পরম ভাগ্যবতী। ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি মঙ্গলচণ্ডীকে চিনিয়াছ, নিশ্চয়ই ইহা পরম ভাগ্যের কথা; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বুঝাইয়া দাও, মঙ্গলচণ্ডী কে?"

বিদ্রূপ অথবা সত্য, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া, ফুল্লরা সুন্দরী সঙ্কুচিত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! আপনি পরম পণ্ডিত, আপনি মঙ্গলচণ্ডীকে জানেন না? আমার তো ইহা বিশ্বাস হয় না। মা মঙ্গলচণ্ডী ত্রিজগজ্জননী ত্রিতাপ হারিণী হর সুন্দরী মা দুর্গা।"

রাজা মহা বিস্ময়াপন্ন। উদ্দেশে মঙ্গলচণ্ডীর নামে প্রণিপাত করিয়া ফুল্লরাকে তিনি কহিলেন, "ফুল্লরা! তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, জ্ঞানেরও সীমা নাই, ভক্তিরও সীমা নাই। আশীর্ব্বাদ করি, পুত্রবতী হইয়া পতিপুত্র সহ চির সুখে রাজ্য সুখ সম্ভোগ কর।"

করপুটে ফুল্লরা বলিলেন, "মহারাজের আশীর্ব্বাদ আমি মাথা পাতিয়া লইলাম। আপনার চরণে আমার আর একটি নিবেদন আছে। মঙ্গলচণ্ডীর বরে এই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়া, মঙ্গলচণ্ডীর আজ্ঞায় আমি এই রাজ্যের সমস্ত পুরনারীকে মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় রত করিয়াছি, ঘরে ঘরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হয়; আপনি কলিঙ্গরাজ্যে ঘোষণা দিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে ঘট স্থাপন করিয়া, গৃহস্থ রমণীগণ যাহাতে মঙ্গলচণ্ডী পূজায় ভক্তিমতী হন, তাহার বিধান করিয়া দিবেন।

গদ্‌গদ্ বচনে রাজা কহিলেন, "ফুল্লরা! এটি তোমার প্রার্থনা নহে, অনুজ্ঞা! তোমার অনুজ্ঞাকে আমি মঙ্গলচণ্ডীর অনুজ্ঞা বলিয়া জ্ঞান করিব। তুমি গুণবতী, জ্ঞানবতী, ভক্তিমতী স্বাধ্বিসতী; তোমার কাছে আমি নিতান্ত অজ্ঞান, তোমার কাছে আমি জ্ঞানশিক্ষা পাইলাম। কল্যই আমি কলিঙ্গ রাজ্যের সমস্ত রমণীকে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতে দীক্ষিত করিব।"

ফুল্লরা করজোড়ে পুনরায় নমস্কার করিলেন। তদনন্তর সাময়িক ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য প্রসঙ্গে আরও কিয়ৎক্ষণ পরস্পর কথোপকথন হইল। এই সময় কালকেতু বিনীত ভাবে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অভিবাদন প্রত্যভিবাদনান্তে কলিঙ্গ রাজের অনুমতি ক্রমে কালকেতু একখানি ক্ষুদ্র আসনে উপবেশন করিলেন। একবার কালকেতুর, একবার ফুল্লরার মুখের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রিয় সম্ভাষণে কালকেতুকে সম্বোধন পূর্ব্বক রাজা কহিলেন, "কালকেতু! সখে! যেটিকে তুমি গৃহলক্ষ্মী পাইয়াছ, এটি সত্যই সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; এই লক্ষ্মীর মুখে আজ আমি মঙ্গলচণ্ডীর মহিমা শুনিলাম, স্বীয় রাজ্যের প্রত্যেক গৃহেই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করাইব, অঙ্গীকার করিলাম। তুমি মঙ্গলচণ্ডীর বর পুত্র, স্বপ্নে আমি সেই কথা শুনিয়াছি, ফুল্লরা সুন্দরীর সহিত বিশুদ্ধ বাক্যালাপে মনে মনে সেই স্বপ্ন বৃত্তান্তের উপর আমি

একটু টীকা করিয়াছি। পতিব্রতা ফুল্লরা সুন্দরীর পুণ্য বলেই তুমি হরসুন্দরীর বরপুত্র হইয়াছ, এই আমার টীকা। সহধর্ম্মিণীকে লইয়া পবিত্র প্রেমে নিত্য নিত্য তুমি ধর্ম্মাচরণ কর, ঈশ্বরের নিকটে এই আমার প্রার্থনা।"

পতিপত্নী উভয়েই পুনর্ব্বার রাজাকে নমস্কার করিলেন! রাত্রি অধিক হইয়া ছিল, রাজাকে উপযুক্ত শয্যায় শয়ন করাইয়া অভিনব রাজ দম্পতি আপনাদের নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

প্রভাত সমীরণের সহিত বনবিহঙ্গকুল সুস্বরে কূজন করিয়া উঠিল, রাজ তোরণে প্রভাতী বাদ্য বাজিল, প্রভাতের প্রভার পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বেই সকলের নিদ্রাভঙ্গ। সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরে নব রাজ দম্পতিকে অভিনন্দন করিয়া কলিঙ্গরাজ গজারোহনে সেনাগণ সমভিব্যবহারে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন; সহচর অমাত্যগণ স্ব স্ব বাহনে আরূঢ় হইয়া রাজার অনুবর্ত্তি হইলেন।

অভিনব গুজরাট রাজ্য আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ। সেই দিন রাণী ফুল্লরা সুন্দরী পূত সলিলে স্নান করিয়া পট্টবাস পরিধান পূর্ব্বক একখানি শিবিকারোহণে নগরে ভ্রমণ করিয়া নগরবাসিনী কামিনীগণকে রাজ প্রাসাদে লইয়া আসিলেন, সকলে একত্রে সমবেত হইয় নানা উপচারে ভক্তিভাবে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিলেন। পূজা অবসানে পূজ্য দেবতার স্তব করিতে হয়, ফুল্লরা সুন্দরী স্তব স্তুতি জানিতেন না, একান্ত ভক্তিই তাঁহার পুষ্প চন্দন, আন্তরিক ভক্তিই তাঁহার স্তব স্তুতি; কিন্তু এই দিন স্তব করিবার ইচ্ছা হইল। কি হয়? কে শিখাইয়া দেয়? নূতন নগর পত্তনের সময় কর্ণাটের একটি বিদ্যাবতী মহিলা গুজরাটে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ফুল্লরার সানুনয় আগ্রহে তিনিই ভক্তিপূর্ণ স্তবমালা শিখাইয়া দিলেন, ব্রতবতী রমণীগণ করজোড়ে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সেই মন্ত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। পুরবর্ত্তিনী রহিলেন, কর্ণাটি বিদুষীর পার্শ্বে ফুল্লরা।

স্তব।

নমস্ত্বহি নমস্ত্বহি নমস্তে দেবী চণ্ডীকে।
মা তুমি সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতাঃ॥
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশায়া নমস্তে শিব সুন্দরী।
মা তুমি সর্ব্বভূতেষু সত্যরূপেণ সংস্থিতাঃ॥

ভব সিন্ধু পার কর্ত্রী নমস্তে শিব দায়িনী!
মা তুমি সর্ব্ব ভূতেষু ছায়া রূপেণ সংস্থিতাঃ?
ফুল্লরণা ফুল্লকান্তি ফুল্ল কমল বাসিনী।
মা তুমি সর্ব্ব ভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতাঃ॥
ফুল্লনেত্রা স্মিতবক্ত্রা নমস্তে গিরি নন্দিনী।
মা তুমি সর্ব্ব ভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতাঃ॥
সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে নমস্তে বরদে শুভে!
মা তুমি সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বরূপেণ সংস্থিতাঃ॥
মঙ্গলদায়িনী ভদ্রে নমস্তে সর্ব্বমঙ্গলে।
প্রসীদ মঙ্গলাচণ্ডী পাদপদ্মে নমস্তুতে॥

স্তবপাঠ সমাপনান্তে সকলে গলবস্ত্রা হইয়া মঙ্গল ঘট সন্নিধানে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। মধ্যাহ্ন কালে বিবিধ সুস্বাদু উপচারে রাণী ফুল্লরা সুন্দরী সমাগতা রমণী মণ্ডলীকে পরিতোষ রূপে ভোজন করাইলেন। ব্রাহ্মণিরা সমস্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিলেন, ব্রাহ্মণিরা পরিবেশন করিলেন, সুশৃঙ্খলায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

সাধ্বী ফুল্লরা পূর্ব্বের দৈন্যের অবস্থায় যেরূপ ভক্তি যত্নে পতিসেবা করিতেন, রাণী হইয়াও সেই ভক্তি অঙ্গের কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না।

প্রথম অবস্থায় ফুল্লরা সুন্দরী যতপ্রকার কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, সমস্তই তাঁহার স্মরণ ছিল, সেই স্মৃতি তাঁহাকে গরীবের প্রতি দয়া করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। দয়া, মমতা, স্নেহ ও ক্ষমা গুণে তিনি অলঙ্কৃতা হইয়া ছিলেন। প্রকৃতিতত্ত্ব ঐ গুণগুলি তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল, অবস্থা গতিকে পরিস্ফোটন হয় নাই, সুখের অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত। দ্বারে ভিখারী উপস্থিত হইলে, সংবাদ পাইবামাত্র পরমাদরে তিনি তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দানে পরিতুষ্ট করিতেন; মঙ্গলচণ্ডীর বার্ষিক অর্চ্চনা উপলক্ষে শত শত কাঙ্গালীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নগদ মুদ্রা ও অন্ন বস্ত্র দান করিতেন; তাঁহার দান শীলতায় নূতন নগরের দরিদ্র পরিবারেরা অন্নবস্ত্র অভাবে কষ্ট পাইত না।

কালক্রমে ফুল্লরা একটি পরম সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। সেই পুত্রের জন্মোৎসবে তিনি এক প্রকার কল্পতরু হইয়া পতির সম্মতিক্রমে সহস্র

সহস্র দরিদ্র নর-নারীকে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন ; যে যাহা চাহিয়াছে, তাহার আশার অতিরিক্ত দান করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুত্রের অন্ন প্রাশনের সময় প্রাসাদের নিকটে তিনি একটী সুপ্রশস্ত অতিথি-শালা ও অনাথাশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, কালকেতুর অনুমতি পাইয়া ভাস্করেরা সেই অট্টালিকার প্রবেশ দ্বারের খিলানের মাথার উপর একখানি শ্বেত প্রস্তরে খুদীয়া দিয়াছিল,—

"মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতদাসী ফুল্লরা।"

ইতাগ্রে যে বিদ্যাবতী কণাট মহিলার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি বিপ্রকন্যা, চিরকুমারী, ফুল্লরা তাঁহাকে নিজ ভবনে নিত্য নিত্য নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকটে গুজরাটী ভাষার বর্ণ পরিচয় করিয়া, ধর্ম্ম পুস্তকের পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন, ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম পুস্তক পাঠে যথা সম্ভব অধিকার জন্মিয়াছিল, পাঠা-ভ্যাস হইয়াছিল, কিন্তু লিপি কার্য্যে পটুতা জন্মে নাই।

পুত্রটির অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ হইয়াছিল চন্দ্রকেতু। নগরবাসীরা শিশুকালে সেটিকে সোনার চাঁদ বলিয়া আদর করিতেন। চন্দ্রকেতু ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলে কালকেতু বহুচেষ্টায় একটি সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার পরিণয় সম্বন্ধ করেন, ব্যাধের কুলে ধনবান কুটম্ব দুর্ল্লভ, সুতরাং একজন দরিদ্র ব্যাধের সুন্দরী কুমারীর সহিত চন্দ্রকেতুর বিবাহ হয়। পুত্রের বিবাহে মহাসমারোহ করিয়া মুক্ত হস্তে সহস্র সহস্র দানার্থী দরিদ্র লোককে ধনদান করিয়া ছিলেন। পতি পুত্র ও পুত্র বধু লইয়া পতিব্রতা ফুল্লরা সুন্দরী পরম সুখে বহুদিন রাজ সম্পদ উপভোগ করিয়া ছিলেন, মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় দিন দিন তাঁহার অধিকতর ভক্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল। লোকের মুখে জয় কীর্ত্তন—জয় মা মঙ্গলচণ্ডী, জয় রাণী ফুল্লরা সতী, জয় রাজা ধর্ম্মশীল কালকেতু

আবেশ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

আজি রহিয়া রহিয়া রহিয়া
শূন্য রিক্ত হৃদয় তন্ত্র
উঠিছে কেনরে কাঁপিয়া
কাহার চরণ লাগিয়া ?

পরশ কাহার লাগিয়াছে তায়
চঞ্চল সম কাঁপিয়া বেড়ায়
পরশ আবেশে পাগলের প্রায়
কাহার চরণ লাগিয়া ?

আজি রহিয়া রহিয়া রহিয়া
শূন্য রিক্ত হৃদয় তন্ত্র
উঠিছে কেনরে কাঁপিয়া ?

আজি রহিয়া রহিয়া রহিয়া
নীরব যন্ত্রী হৃদয় তন্ত্রী
উঠিতেছে কেন রণিয়া ?
কাহার পরশ যাচিয়া ?

কাহার সিদ্ধ অঙ্গুলি পরশে
ঝঙ্কারি উঠিছে বিপুল হরষে
মুরছি পড়িছে হরষ বিবশে
কাহার পরশ যাচিয়া ?

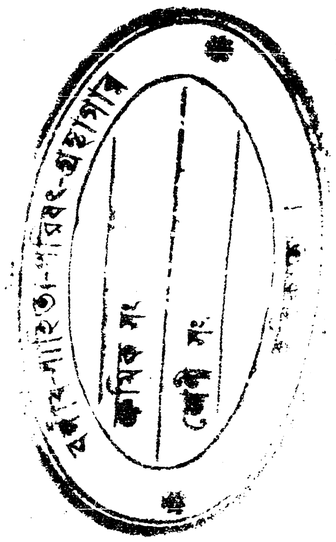

আজি রহিয়া রহিয়া রহিয়া
নীরব যন্ত্রী হৃদয় তন্ত্রী
উঠিতেছে কেন রণিয়া ?

আজি রহিয়া রহিয়া রহিয়া
কণ্ঠ ছাপিয়া হৃদয় মোহিয়া
সঙ্গীত উঠিছে ধ্বনিয়া ?

কেন তার এই দুরন্ত দুরাশা
মিটাইতে চাহে জ্ঞান সুধা তৃষা
কেমন এমন ভাষা
সহসা উঠিল জাগিয়া ?

আজি রহিয়া রহিয়া রহিয়া
কেন কণ্ঠ ছাপিয়া হৃদয় মোহিয়া
সঙ্গীত উঠিছে ধ্বনিয়া ?

আজি রহিয়া রহিয়া রাহয়া
নীরব লেখনী আচায়ে ধমনী
উঠিছে কেনরে কাঁপিয়া ?
কি যে লেখা লেখে উন্মাদ লিখনী
কলের পুতুল সেজেছি আপনি
চলেছে লেখনী পাগল পরাণী
কাহার কাহিনী লিখিয়া ?
আজি রহিয়া রহিয়া রহিয়া
নীরব লেখনী নাচায়ে ধমনী
উঠিছে কেনরে কাঁপিয়া ?

প্রভো !

যদি হৃদয় আসন উঠেছে কাঁপিয়া
কাঁপে যেন সে তোমারি তরে
যদি হৃদয় তন্ত্রী উঠেছে রণিয়া
বাজে যেন সে তোমারি সুরে।
যদি সঙ্গীত উঠেছে কণ্ঠ ছাপিয়া
গাহে যেন সে তোমারি গান
যদি লেখনী উঠেছে স্পন্দিত হইয়া
লেখে যেন সে তোমারি নাম।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অগ্রহায়ণ মাস। দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সূর্য্যদেব ক্ষীণ দীপ্তিতে পশ্চিম গগন উজ্জ্বল করিতেছেন। শীতল কনক-

কান্তি কিরণ মালা মহিরুহগণের শিরোদেশে দৃষ্ট হইতেছে। গগন প্রান্তে মেঘমালা তপণ কিরণ সংযোগে বিশাল লোহিত পটের শোভা ধারণ করিয়াছে। সাধক বিশুর সহিত সঙ্গাতীরে গমন করিতেছেন। সন্ধ্যা সমাগত দর্শন করিয়া সাধক কহিলেন, "বিশু ! ভুবন মণ্ডলের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন আসিতেছে ? দিবসে জীবগণের চেষ্টা, কোলাহল, উন্মাদ ভাব, রাত্রে নিবীড় অন্ধকার, নীরব, সমুদয় জগৎ নিশ্চেষ্ট, ইহা দেখিয়া কি তোমার ভব ভাবিনীর ঐন্দ্রজালিক শক্তির বিষয় মনে হয় না ? সূর্য্যাস্ত, সূর্য্যোদয়, দিবস রজনীকে বোধ হয় তুমি সাধারণ ব্যাপার মনে করিয়া থাক, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, বিশ্বের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন, বিশ্বেশ্বরীর আজ্ঞা ও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালনের কি সুন্দর দৃষ্টান্ত। বিশু ! ওই শোন বিহঙ্গমগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া আনন্দে কোলাহল করিতেছে, দিবসের কোলাহল এখন অন্য সময় অপেক্ষা অধিক বোধ হইতেছে, ইহার কারণ কি জান ? সমুদয় জগৎ সত্বর নিশ্চেষ্ট ও শান্তি ভাব অবলম্বন করিবে তাহার পূর্ব্ব সূচনামাত্র, আতিশয্য হইতে সমস্ত শান্তি ভাব আইসে।" এমন সময় কাল্‌নার দেবালয় সমূহের ঘণ্টা ও কাঁশর শব্দে সমুদয় নগর প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সাধক ও বিশু জগদম্বার ধ্যান করিতে করিতে জাহ্নবীর তীরে উপস্থিত হইলেন।

বিশু গঙ্গাবারি স্পর্শ করিয়া কহিল, "মা গঙ্গা আমার পাপের ক্ষয় কর মা।" সাধক কহিলেন, "মা আমার সদ্য পাতক সংহন্ত্রী।" এই কথা শুনিয়া বিশু কহিল, "ঠাকুর ! আমি যে পুরাণ পাপী !" সাধক কহিলেন, "না হে সদ্য অর্থে টাট্‌কা নহে, গঙ্গাবারি স্পর্শ করিবামাত্র সকল পাপের বিনাশ হয়। বিশু ! তুমি বিশ্বাস কর, কেবল পাপ পাপ করিয়া অমূল্য ধীশক্তি সম্পন্ন জীবন অতিবাহিত করিও না। যখন তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হইবে দেখিবে তখন তুমি কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছ। বিশু ! তুমি জান না সন্দেহই মানুষের দুঃখ, যে ব্যক্তি সকল কার্য্যে সন্দিগ্ধ তাহার সকল কার্য্যই নিস্ফল হয়, তুমি তাহাকে দুঃখী বলিয়া জানিবে।" বিশু কহিল, "ঠাকুর ! পাপের কথা উঠাতেই আমার মন যেমন কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। মা গঙ্গার উপর ফেণা গুলাকে আমার মারা মানুষ পড়ে আছে বলে বোধ হচ্ছে। জলের ঢেউ লেগে কল কল শব্দ হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে আমার শড়্‌কীর আঘাতে মানুষ পড়ে চীৎকার কচ্ছে, ওই শুনুন ঠাকুর শাঁখ ঘণ্টা বাজ্ছে, আমার মনে হচ্ছে ওরা বল্‌ছে, "বিশে বেটা পাপী।" বিশুর এই সকল কথা

শুনিয়া ও বিশুর দুঃখিত বদন নিরীক্ষণ করিয়া সাধক কহিলেন, "বিশু! তুমি গঙ্গা মাহাত্ম্য জান না, তাই বারি স্পর্শে তোমার কিছু মাত্র পাপ থাকিবে না, এই বিশ্বাস আসিতেছে না। ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা প্রভৃতি পাপ করে—কুশাগ্রে পর্শিলে জল সর্ব্ব পাপে তরে। বিশু! তুমি গঙ্গার মর্ত্তলোকে আসিবার ইতিহাস শোন, পূর্ব্বে অযোধ্যা নগরে সগর নামে একজন নরপতি ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। ইন্দ্র সংসারের হিতের জন্য তাঁহার যজ্ঞের ঘোড়াটী লইয়া পাতালে যেখানে কপিল মুনি তপস্যা করিতে ছিলেন, তথায় লুকাইয়া রাখেন। সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান ছিল। তাঁহার সন্তানগণ ক্ষুত্রাপি অশ্বের সন্ধান না পাইয়া পৃথিবী খনন করিয়া পাতালে গমন করেন। কপিল মুনির নিকট অশ্বের সন্ধান পাইয়া সগর সন্তানগণ তাঁহাকে অশ্বচোর বিবেচনা করিয়া খনিত্র দ্বারা আঘাত করেন। কপিল মুনি কুপিত হইয়া শাপ প্রদান পূর্ব্বক সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। সগর রাজার পৌত্র সন্ধান করিয়া পাতালে গমন পূর্ব্বক কপিল মুনিকে স্তবে সন্তুষ্ট করেন। মহর্ষি কপিল বলেন, গঙ্গা ব্রহ্মলোকে আছেন, যদি তুমি পাপী তাপী তরাইবার জন্য তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোকে আনিতে পার তাহা হইলে তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণ জীবিত হইবেন। সগরও তাঁহার পৌত্র অনেক তপস্যা করিয়াও গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিতে পারেন নাই, পরে সগর রাজার প্রপৌত্র বহু তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্তে আনিয়া নিজ বংশের উদ্ধার করেন। সাধক পুনশ্চ কহিলেন, বিশু! গঙ্গা স্বর্গের নদী ইনি স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভগীরথ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া এই সুরেশ্বরী ভাগীরথীকে পৃথিবীতে আনিয়া ছিলেন। তোমার মা কালী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও আরাধ্যা। তোমার মা কালীর অসংখ্য রূপ। তাঁহার এই দ্রবময়ী রূপ।" সাধকের মুখে গঙ্গার মর্ত্তে আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিশু সজল নয়নে পরমা ভক্তির সহিত কালী, কালী বলিয়া গঙ্গাবারি স্পর্শ পূর্ব্বক ভূনিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

গঙ্গাতীর হইতে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সাধক বিশুর সহিত কালনায় মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের সভায় গমন করিতেছেন। সাধকের বয়ঃক্রম চল্লিশের অধিক। সূর্য্যরশ্মি সংবৃক্ত স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তাঁহার নয়ন যুগল উজ্জ্বল, হাস্যময় বদন, কেশ কলাপ দীর্ঘ ও গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত বিন্যস্ত, পরিধান গৌরিক বস্ত্র, অন্য এক মৃত্তিকা রঞ্জিত বস্ত্র খণ্ড দ্বারা শরীর আবৃত। রাজসভা

সুন্দর ভাবে সজ্জিত। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর মহার্ঘ আসনে উপবিষ্ট পার্শ্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র যুবরাজ প্রতাপচাঁদ, যুবা পুরুষ, বয়স ১৯ বৎসর। বাঙ্গালা ১১৯৭ সালে যুবরাজ প্রতাপচাঁদের জন্ম হয়। কথিত আছে ১২১৬ সালে মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের সহিত সাধকের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কালনার গণ্য মান্য, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ, পণ্ডিত মণ্ডলী ও অনুজীবিগণ অনেকেই রাজ সভায় উপস্থিত। সভাগৃহ প্রশস্ত, সুধাধবলিত, বিবিধ আলেখ্য পরিশোভিত। গৃহের পাদদেশ রঞ্জিত প্রস্তর গ্রথিত। স্ফটিক দীপদান মধ্যে লম্বমান স্নিগ্ধ আলোক মালা দিবস জ্যোতিকে অতিক্রম করিয়াছে। অগ্রে সাধক, পশ্চাৎ তাঁহার অধিকার ধনাঢ্য শিষ্য, তৎ পশ্চাৎ সাধকের সমবেশী বিশু সভা গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। সাধক মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের নয়ন পথে পতিত হইবামাত্র শুক্রসম সাধকের উজ্জ্বল চক্ষু রাজা বাহাদুরের নয়ন আকর্ষণ করিল। তিনি সাধকের মুখ মণ্ডলে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন কোন স্বর্গীয় মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিতেছেন। তিনি সসম্ভ্রমে আসন হইতে গাত্রোত্থান করাতে যুবরাজ প্রতাপচাঁদ ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ দণ্ডায়মান হইয়া সাধকের অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা বাহাদুর নতশিরে নমস্কার পূর্ব্বক সাধকের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। রাজা বাহাদুর ও যুবরাজ প্রতাপচাঁদ সাধকের মুখ মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে কি এক আনন্দের উদয় হইতে লাগিল। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ দর্শন লাভ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। প্রথম দর্শনেই তাঁহদের সাধকের প্রতি অপরিসীম ভক্তির সঞ্চার হইল। প্রথম দর্শন শুভভাবে হইলে নিশ্চয়ই সে দর্শন শুভফলদায়ী হয়। সাধক সভাস্থলে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, বিশু দূরে প্রবেশ দ্বারে এক প্রান্তে উপবেশন করিয়াছে। তিনি ইঙ্গিত দ্বারা বিশুকে নিকটস্থ হইতে বলিলেন। বিশু করযোড়ে নতবক্ষে আসিয়া সাধকের অনতিদূরে উপবেশন করিল। বিবিধ বাদ্য যন্ত্রের সহিত সুরের সামঞ্জস্য চলিতে লাগিল। সাধক জগদম্বাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া খাম্বাজ রাগিণীতে গাহিলেন,—

তারিণী আমার কেমন, কে জানে তাঁরে, যেমন তারা তেমনি ভাল।
দুটী অভয় চরণ, ভাব ওরে মন, অনুমানে তাঁর কাজ কি বল॥
প্রকৃতি পুরুষ, অথবা শূন্যা, সেই সে সকলি সকলে ভিন্ন,

ধন্য ধন্য, কে জানে অন্য, ভব যাঁরে ভেবে পাগল হল।
নীল পীত লোহিত বর্ণ, কি রূপ কি গুণ কে জানে মর্ম্ম,
সে সহজে প্রবীণা, অতি সুনবীণা, স্বভাব নির্ম্মল, কথার কাল॥
যেরূপে যেজনা, করয়ে ভাবনা, সেইরূপে তাঁয় পুরায় কামনা,
দ্বৈত ভাব ত্যজ, নিত্যানন্দে মজ, অনিত্য ভাবনায় কি আর ফল।
কমলাকান্ত কি ভাবনা আর, পেয়েছ যে ধন হেলে হবে পার,
ওপদে বঞ্চিত যে জনা তার, একুল ওকুল দুকুল গেল॥

তাল মান সহ সাধকের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইবামাত্র সঙ্গীত বিদ্যা পারদর্শী অনেকের মস্তক বিচলিত হইল। মহারাজা বাহাদুর, যুবরাজ প্রতাপচাঁদ ও অন্যান্য সকলে বিমুগ্ধ চিত্তে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সুরের মাধুর্য্য ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাহাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। অমিয় সদৃশ সঙ্গীতধারা প্রাসাদ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ সমুদয়কে প্লাবিত করিয়া সুরধনীর কল্লোলের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। প্রাসাদ মধ্যে পিঞ্জর বদ্ধ বিহঙ্গমগণ, প্রাসাদ উপরি তোরণস্থিত ময়ুর দম্পতি গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া নিঃশব্দে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিল। প্রবীণ ধার্ম্মিক মহারাজা ও অন্যান্য অনেকের নয়নে প্রেমাশ্রু পাত হইল। প্রেম ও ভক্তি যুবরাজ প্রতাপ চাঁদের প্রকৃতিগত ছিল. তিনি নবীন হইলেও তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নয়নে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সঙ্গীত শেষে সকলে সাধকের ভূয়োসি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, তিনি জীবনে এরূপ সুন্দর মনোমুগ্ধ কর সঙ্গীত শ্রবণ করেন নাই। যুবরাজ প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা অতি মধুর।" "আমার যেমন তারা তেমনি ভাল" রূপ গুণ অবিচারে ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। সন্তান সুরূপ হউক আর কুরূপ হউক বিদ্বান হউক আর মূর্খ হউক ধনবান হউক আর নির্ধন হউক জননী সন্তানকে ভালবাসিয়া থাকেন, সেই ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। পিতা মাতা কুটিল, কর্কশ ও স্নেহহীন হইলেও যে সন্তান সেরূপ পিতা মাতাকে ভালবাসে ভক্তি করেন, তাহারি যথার্থ ভক্তি। সভাস্থ জনৈক ভাবগ্রাহী ব্যক্তি কহিলেন, "আরও দেখুন, "অনুমানে তার কাজ কি বল" যেখানে অনুমান সেখানেই অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহ, অস্তিত্বে সন্দেহ থাকিলে দৃঢ়া ভক্তির অভাব হয়। দ্বৈত ভাব বা ভেদ জ্ঞান সন্দেহ প্রসূত। এ নয় সে নয় এরূপ চিন্তা, কল্পনা ও জল্পনায়, দৃঢ়া ভক্তি প্রসূত আনন্দের হানি হয়। সভাস্থ জনৈক পণ্ডিত

কহিলেন, "প্রকৃতি পুরুষ অথবা শূন্য ইত্যাদি কথা গুলিও অতি সারগর্ভ পরম ব্রহ্ম শাশ্বত, অব্যক্ত, অপরিবর্ত্তনীয়। যেমন সূর্য্য হইতে জ্যোতিঃ সকল বহির্গত হয়, তাহাতে সূর্য্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, তেমনি পূর্ণব্রহ্ম হইতে পুরুষ প্রকৃতি সৃজিত হইয়া সাকার রূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণত্বের নিরাকার চৈতন্য স্বরূপত্বের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না। অতএব তিনি লিপ্ত হইলেও নির্লিপ্ত। সেই অব্যক্ত পুরুষেরও রূপ নিরূপণও দুঃসাধ্য।" সভাস্থ অন্য এক ব্যক্তি কহিলেন, "একথা গুলিও অতি সুন্দর 'যেরূপে যেজনা করয়ে ভাবনা, সেই রূপে তার পূরয়ে কামনা।' ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তান্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

সাধক এতক্ষণ জগদম্বার ধ্যানে ছিলেন, তিনি ভাবিতে ছিলেন, "আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।" মহারাজা বাহাদুরও সভাস্থ ব্যক্তিগণের বিচার ও বাক্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। বিশুর নয়নে জল, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি গুরুতর। বিশু চারিদিকে মা কালীর আবির্ভাব দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আবার বাদ্য যন্ত্র সকলের সুমধুর ধ্বনি ধীরে ধীরে উঠিল। সাধক গাহিলেন,—

আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন মন কেউ না দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এস মনরে মাকে দেখি,
রসনারে বলে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে॥
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, নিকট হতে দিও নাক,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ সে যেন সাবধানে থাকে।
কমলা কান্তের মন, শোন মোর নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন সেকি অন্যান্তরে রাখে॥

সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকলের হৃদয় পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ রসে আপ্লুত হইল। সঙ্গীত শেষে সভাস্থ জনৈক ব্যক্তি কহিলেন, "ঠিক বাবা! কাম ক্রোধ, অজ্ঞান অহঙ্কার প্রভৃতি কতক গুলি মনের সঙ্গী মানুষের শত্রু। তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে না পারিলে চিত্তের বিশুদ্ধতা আইসে না, হৃদয় মাঝারে উপাস্য দেবতাতে স্থিরভাবে রাখা কঠিন। 'দরিদ্র পাইলে ধন সেকি অন্যান্তরে

রাখে' সুন্দর উদাহরণ। দরিদ্র ধন পাইলে সে নিজের কাছ ছাড়া করে না, নিজের নিকটে রাখিয়াও নিশ্চিন্ত থাকে না, মধ্যে মধ্যে হস্ত দ্বারা অর্থের অবস্থান অনুভব করিয়া সুখী হয়। নিজ উপাস্য দেবতাকে হৃদয় মধ্যে সেইরূপ ভাবে রাখিতে হইবে, যেন তিলার্দ্ধ কালের জন্য মন তাঁহার চরণ ছাড়া না হয়। এই অভ্যাস যোগে তন্ময় ভাব আইসে।

মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর সাধকের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার সঙ্গীত দ্বারা চিত্ত বিমোহনের অসাধারণ শক্তি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। সঙ্গীত শ্রবণ পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কাল আমি বর্দ্ধমান যাইব। আমার প্রার্থনা আপনি আমার সঙ্গে বর্দ্ধমান যাইবেন। আপনি যখন যাহা ইচ্ছা করিবেন, যথাসাধ্য তখনিই তাহা সম্পাদিত হইবে। সাধকের ধনাঢ্য শিষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "ইনি আপনার গুরুদেবের পুত্র আপনি সৎগুরুর শিষ্য। অদ্য হইতে আমি তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিব। দেখিতেছি আপনার গুরুপুত্র সংসার ত্যাগী। ইহার পিতা মাতা কি পত্নী বর্ত্তমান আছেন কি? শিষ্য নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "মহারাজ এখন ইহার একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছেন, ইহার সংসারে আরও দুই একজন উপজীবিও আছেন। আমি তাঁহাদের সমুদয় ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়া গুরুপুত্রকে সংসার চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত করিয়াছি। মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আপনি অনেক দিন গুরু ও গুরুপুত্রের সংসারের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আমি তাঁহাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। শিষ্য কহিলেন, "মহারাজ! আমরা সকলেই আপনার অন্নে প্রতিপালিত। ব্রাহ্মণ সংসার প্রতিপালন জন্য আমার সাহায্য আপনার সাহায্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা অবশ্যই সম্পন্ন হইবে। সাধক কহিলেন, "মহারাজ! আমার বর্দ্ধমানে আপনার নিকট অবস্থান করিবার আপত্তি কিছুই নাই, কিন্তু আমার মনের অবস্থা অন্যরূপ, যখন তখন যথা ইচ্ছা গমন. সকল অবস্থাপন্ন লোকের সহিত সমাগম রাজদ্বারে বদ্ধলোকের সর্ব্বদা ঘটেনা। তাঁহাদিগকে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য অনেক সময় সৎকর্ম্মেও সঙ্কুচিত হইতে হয়, সেই জন্য আমার প্রার্থনা আমাদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিবেন না।" রাজা বাহাদুর কহিলেন, "আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, দেশ ভ্রমণ. তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি সৎকর্ম্ম আপনার যখন যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। আমি আপনার

ইচ্ছার বশবর্ত্তী যথার্থ বন্ধুর ন্যায় আপনার সাহায্য করিব। আপনি সকল অবস্থায় লোকের সহিত ইচ্ছামত সহবাস করিবেন, সাধারণকে উপদেশ দিবেন, ইহা আপনার অমায়িকতা ও অহঙ্কার শূন্যতার পরিচয় দিবে। আমার পূজনীয় ব্যক্তির তাদৃশ ব্যবহার দেখিয়া বরং আমি সুখী হইব।,' সাধক মহারাজা বাহাদুরের সহিত বর্দ্ধমান গমনের স্বীকার করিলেন। সাধক কহিলেন, "আমার জননীর আদেশ আছে, আমি সন্ন্যাসী বেশে দেশ ত্যাগ করিব না। দেশে অবস্থান করিয়া জগদম্বার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিব।" মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "তাহাই হইবে। বর্দ্ধমানের মধ্যে আপনার যে, স্থানে অভিরুচি হয়, কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অবস্থান করিবেন। আমরা আপনার যখন তখন চরণ দর্শন করিতে পারিব। আপনার মধুময় সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সুখী হইব।" অনন্তর সাধক রাজা বাহাদুরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শিষ্যের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাজা বাহাদুর, যুবরাজ প্রতাপ ও তত্রস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ সুমধুর সঙ্গীত ও তাঁহার চিত্ত বিনোদনের অপূর্ব্ব শক্তির পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী হইতে লাগিলেন। সে রাত্রে নিদ্রাকর্ষণ পর্য্যন্ত কেহই সাধককে মন হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না।

উদ্দেশ্য ব্যতীত এ জগতে কোন পদার্থেরই সৃষ্টি হয় নাই। সমুদয় পদার্থের যথা সন্নিবেশ ও তাহাদের সামঞ্জস্য বিধাতার ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। মানবচক্ষে সকল পদার্থের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সহসা অনুভূত হয় না। যাহার অস্তিত্বে বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় ও যাহা দ্বারা মানব উপকৃত হয়, বুদ্ধিজীবি মানব তাহারও সৃষ্টীর উদ্দেশ্য অনুমান ও অনুভব করে। সকল পদার্থই ভগবৎ শক্তি বিদ্যমান আছে, যাহাতে সেই শক্তির আধিক্য উপলব্ধি হয়, মানব তাহাকে অসাধারণ বলিয়া গণ্য করে। মানব সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি বশত জীবের মহাকষ্ট উপস্থিত হইলে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ভক্তিমান মহাপুরুষ গণের জন্ম হয়। সেই সকল মহাপুরুষে ঐশী শক্তির আধিক্য বশত, কেহ অবতার, কেহ দেবতা কেহ সাধক কেহ বা মুক্ত পুরুষ বলিয়া পূজিত হন। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি হয় সেই খানেই আমার আবির্ভাব হইয়া থাকে। জগতে পাপ পুণ্য উভয়েই বর্ত্তমান আছে, ধর্ম্ম থাকিলেই তাহার গ্লানির সম্ভাবনা. সেই জন্য অবতারের সংখ্যাও অসংখ্য। বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা থাকিলেও তাহার মূলে একেশ্বর বাদিত্ব, ধর্ম্ম কর্ম্মের গূঢ়ত্ব ও সমুদয় কর্ম্ম ব্রাহ্মণগণের অধীন থাকায় অল্প শিক্ষিত অন্য জাতি ত্রয় সন্তোষ

লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্য সাধারণের জন্য বেদকে অবলম্বন করিয়া পুরাণোক্ত দেব দেবীর উপাসনা আরম্ভ হয়। পুরাণোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্মে সাধারণের কতক পরিমাণে স্বাধীনতা থাকিলেও বৈদিক কর্ম্মের বাহুল্য ও সেই কর্ম্ম ব্রাহ্মণগণের হস্তগত থাকায় পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রণালীতেও সাধারণ সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। পরে প্রকৃতির ইচ্ছায় বহু আড়ম্বর যুক্ত, বৈদিক ও পৌরাণিক দীক্ষাকে সংক্ষেপ করিয়া তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচার আরম্ভ হইল। গুরুমন্ত্র জপই একমাত্র মুক্তির উপায় বলিয়া গৃহীত হইল। ধর্ম্ম রাজ্যে "জপাৎ সিদ্ধি জগাৎ সিদ্ধি" এই বাক্যের জয় পতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল। তান্ত্রিক মতাবলম্বী গুরুগণ অনেক স্থলে কষ্ট সাধ্য ও সংসারীর চক্ষে বিভীৎস ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধির উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। তন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য অতিক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল। সেই গ্লানি নিবারণের জন্য ভারতের নানাস্থানে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল। নানক, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইল। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়ার বিরোধী। বঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া স্থলে ভগবৎ নাম সঙ্কীর্ত্তনই জীবের একমাত্র মুক্তির উপায় এই উপদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রকৃতির ইচ্ছায় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হেতু সাধারণ তাঁহার উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তান্ত্রিক ও বৈদিক ক্রিয়া সকল উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ও উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য শুদ্রদিগকে অবলম্বন করিয়া জীবিত রহিল। অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নাম সংকীর্ত্তন ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য ও মুক্তিদান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই উপদেশ নিজ শিষ্য ও অনুবর্ত্তী শক্তি সম্পন্ন পুরুষদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মতে সংসার ত্যাগ করিলে ভক্তি ও প্রেম পরিবর্দ্ধিত হয়, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের দম্পতীর ভাব থাকিবে না, তাহারা গুরু শিষ্যের ভাবে অবস্থান করিবে। তাঁহার উপদেশ—

"প্রকৃতি হইয়া করে পুরুষের সঙ্গ।
দিনে দিনে বাড়ে তার প্রেমের তরঙ্গ॥
প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি আলিঙ্গন।
রায় বলে আমি তার না দেখি বদন॥

যে পুরুষ প্রকৃতির বেশ ধারণ করিয়া অর্থাৎ প্রকৃতির মত বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক প্রকৃতি সাজিয়া কামাদি রিপুগণের দমন পূর্ব্বক ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, তাহার প্রেমের তরঙ্গ দিনে দিনে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যে পুরুষ বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রকৃতির বেশ ধারণ করিয়া প্রকৃতির দম্পতীর ভাবে অবস্থান করে রায় বলেন আমি তাহার মুখ দর্শন করি না।

ক্রমশঃ

আবাহনী।*

বঙ্কিম-স্মৃতি রক্ষার তরে, ক্ষুদ্র এ আয়োজন—
এসো বাঞ্ছিত! এসো—বরেণ্য বাণীর পুত্রগণ!
এযে, "চন্দ্রশেখর" "আনন্দ মঠ" "বিষ বৃক্ষের" দেশ,
এবে, বাঙালী জাতীর বিরাট তীর্থ কৈলাস-হৃষিকেশ,
বঙ্গ ভাষার মহা সাধনার পবিত্র তপোবন!!
হেথা—জন্মিল ঋষি, রচিল—মাতৃ পূজার পুণ্য বেদী,
হেথা—স্বদেশ প্রেমের ওঙ্কার ধ্বনি উঠিল গগন ভেদী,—
সুপ্তির মাঝে, তাই আমাদের—নিমেষের জাগরণ!!
আজ—তোমাদের মত অতিথি পাইয়া, জীবন মোদের ধন্য,
শুধু—কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি রেখেছি সেবার জন্য,
হর্ষে বিষাদে, সার্থক করো, এ মধুময় মিলন॥
ওগো! আমাদের প্রতি, এ সহানুভূতি, স্নিগ্ধ স্নেহের অমিয়ো,
মোরা—যোগ্য আদর জানি বা না জানি, নিজ গুণে ত্রুটী ক্ষমিয়ো;
"বিদুরের ক্ষুদে" তুষ্ট যেমন—গোলোকের নারায়ণ॥

---

* বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলন কাঁটালপাড়া, ১লা আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩০ সাল।

সমালোচনা।

শিবার্চ্চন তত্ত্ব।—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ লিখিত। (শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।) ৺কাশীধাম ব্রাহ্মণরক্ষা সভার আনুকুল্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত; মূল্য ছয় আনা মাত্র।

এই পুস্তকে বিবিধ শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শিবার্চ্চনতত্ত্ব শিবার্চ্চন মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। শিব কি? শিবার্চ্চনে লাভ কি? শিবপূজার বিশিষ্টতা কি? শিব পূজার অনুষ্ঠানে মানবের পারলৌকিক মঙ্গলের অতিরিক্ত ইহলৌকিক শান্তি লাভ করা যায় কি না? এই পুস্তকে ইত্যাকার বিষয়ের সুমীমাংসা করা হইয়াছে।

রোগশয্যার প্রলাপ।—শ্রীরোগাতুর শর্ম্মা ও স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রণীত। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত। কলিকাতা ৭।১নং জগন্নাথ সুরের গলি দর্জ্জিপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় দুরারোগ্য ব্যাধি প্রপীড়িত শয্যাগত অবস্থায় তিনি যে সার সার সন্দর্ভ রচনা করেন, তাহাই "রোগশয্যার প্রলাপ" নামে জন-সমাজে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একটি মহৎকার্য্য করিয়াছেন,—সাহিত্য সেবী ও সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই এই পুস্তক-খানি পাঠ করা কর্ত্তব্য। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কে এই রোগশয্যার প্রলাপ পুস্তক সম্পাদনের জন্য আমরা সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।

তুলসী মাহাত্ম্য।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সঙ্কলিত। ৺কাশীধামস্থ ব্রাহ্মণরক্ষা সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা মাত্র।

তুলসীপত্র হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই পরম পবিত্র বস্তু বলিয়া জ্ঞান করেন। এই তুলসীর পবিত্রতা কোন্ সূত্র ও কোন যুগ হইতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পদ্ম পুরাণ প্রভৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তুলসীর জন্ম বৃত্তান্ত এবং তুলসী-মাহাত্ম্য গ্রন্থকার এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই তুলসী-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বরোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্ড নার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সারসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধ পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ আফসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Foamula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রীতিমাখান

সুন্দর মুখখানি

কিসে হয়, ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৵০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী-ব্যাধিতে-অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১।।০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ।।৵০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

২৯শ, বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩০, [৩য়, সংখ্যা

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ন্যায় ও বৈশেষিক	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কতীর্থ	৬৫
২।	সুন্দর	শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস	৭৯
৩।	মৃত্যুর জন্য কবি	শ্রীমতী প্রতিভা দেবী	৮৩
৪।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৮৬
৫।	শ্যামা মা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	৯৩
৬।	সমালোচনা	... ...	৯৬

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত

Tele. Phone 388 Barabazar.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
5-11-23

জ্বরের যম জারমলীন [illegible]

মূল্য ।।০, ডজন ৫৲, গ্রোস ৫০৲, পাইকারী দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

আর, গোভিন এণ্ড কোং, হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Telegram:—GERMALINE. Telephone No. 138

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
[illegible] যাবে
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।
মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা : "জিজীবিষাব"
টেলিফোন নং : ২৭১৫ কাল :
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

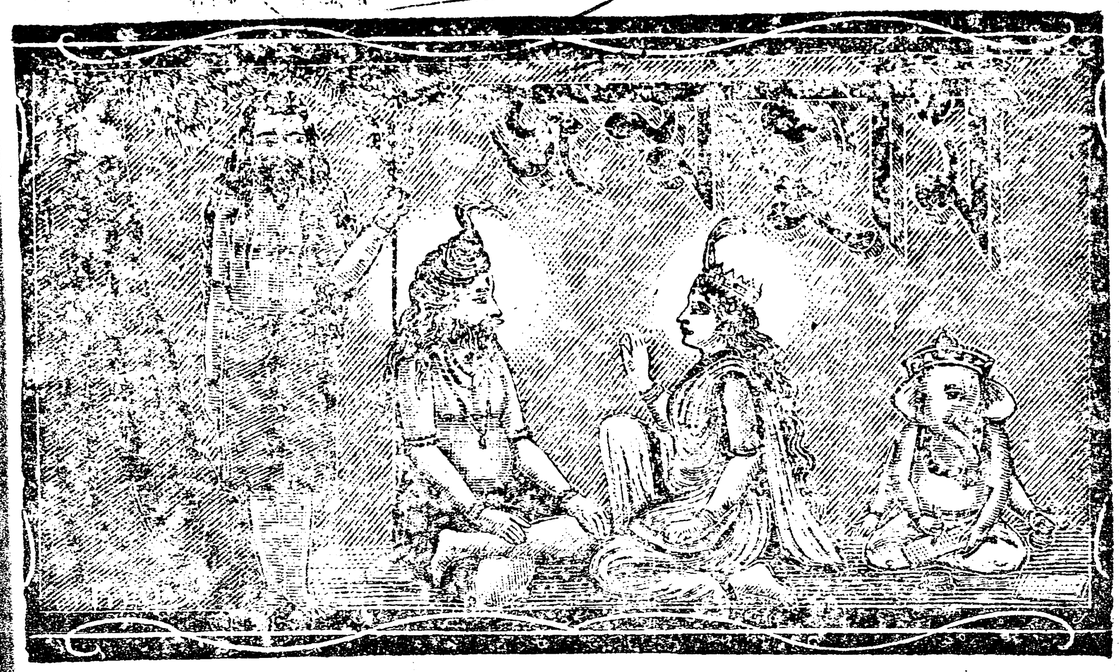

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৯শ, বর্ষ। | ১৩৩০ সাল, আষাঢ়। | ৩য়, সংখ্যা।

ন্যায় ও বৈশেষিক।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কতীর্থ।

বিজ্ঞানং কথয়ন্তি যং শ্রুতিবিদো ব্যাপি স্থিরং নির্গুণং
মায়ানির্ম্মিত বিশ্বদৃশ্য নিচয়ং শৈবাঃ শিবং ক্ষেমদম্।
ধৃত্বা মূর্ত্তি মনু গ্রহায় জগতঃ শিক্ষাপ্রদং যোগিনো
নিত্য জ্ঞান কৃতিঞ্চ তর্ক নিপুনা বন্দে বিভুং তং প্রভুম্॥

ন্যায় এবং বৈশেষিক সম্মত তত্ত্ব লইয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। বৈশেষিক ইহা বলিলে বৈশেষিক শাস্ত্র বুঝায় বলিয়া উল্লিখিত স্থানে

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে দর্শনশাখায় পঠিত বলিয়া গৃহীত।

বৈশেষিক পদের সহিত ন্যায় পদটী উচ্চারিত হওয়ায় উল্লিখিত ন্যায় পদটীর অর্থ এই স্থানে ন্যায় শাস্ত্র বুঝিতে হইবে।

অন্য প্রকার অর্থ থাকিলেও সেই অর্থ করা এই স্থানে চলিবে না।

সৈন্ধব পদের অশ্ব এবং লবণ দ্বিবিধ অর্থ থাকিলে ও ভোজন কালে উচ্চারিত সৈন্ধব পদের অর্থ লবণই বুঝিতে হয়। দেশ এবং কাল প্রভৃতি, বক্তা বা লেখকের তাৎপর্য্যের অনুমাপক। ঐ প্রকার তাৎপর্য্যের অনুমাপক হেতু বিশেষকে প্রকরণ বলে।

প্রকরণ, দ্বিবিধ বা বহুবিধ অর্থ স্থলে একবিধ অর্থের প্রকাশ করিয়া দিয়া বোদ্ধা বা শ্রোতাকে অর্থ সন্দেহ হইতে রক্ষা করে। উক্ত ন্যায়শাস্ত্রের প্রণেতা মহর্ষি অক্ষপাদ।

অক্ষপাদের অপর নাম গৌতম। উক্ত গৌতমই অহল্যাপতি নামে সুপ্রসিদ্ধ।

গৌতমের অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, গৌতমের শিষ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এক সময়ে গুরু গৌতমের মতের নিন্দা করায় তিনি কোপান্বিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর চক্ষুর দ্বারা ব্যাসের মুখ দর্শন করিব না।

অবশেষে গৌতম ব্যাসের স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট হইলে ও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া বিচলিত হইলেন। শেষে যোগবলে নিজ চরণে নেত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা ব্যাসকে দর্শন করিয়াছিলেন।

সেই সময় বেদব্যাস তাঁহার অক্ষপাদ নাম উল্লেখ করিয়া স্তুতি করায় সেই পর্য্যন্ত গৌতমের অক্ষপাদ নাম প্রচলিত হইয়াছে। ন্যায় শাস্ত্রকার মহর্ষি গৌতম, গোতম, এবং অক্ষপাদ এই তিনটী নামই প্রচলিত।

ইহার পক্ষে প্রমাণও আছে। প্রমাণ এই যে—

"গৌর্বাক্ তস্যৈব তমরন্ পরান্ গোতম উচ্যতে।
গোতমান্বয় জন্মোতি গৌতমোঽপি স চাক্ষ পাৎ॥"

শুম্ভ নিশুম্ভ মথন পাদ ১৩ অঃ।

"গবা বাবা তমরতি খেদয়তি" এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ লইয়া তাঁহার গোতম—এইনাম হইয়াছে।

এবং গোতমের বংশজাত বলিয়া ন্যায় সূত্রকার মহর্ষির গৌতম নাম ও

উক্ত মহর্ষি রচিত ন্যায় শাস্ত্রকে ন্যায় দর্শন বলে। এই ন্যায় দর্শনে ৫টী অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে ২টী করিয়া আহ্নিক আছে।

কেহ কেহ বলেন, একদিনে যতগুলি ন্যায়দর্শনে সূত্র রচিত হইয়াছিল। সেই সূত্রগুলিই আহ্নিক নামে আখ্যাত।

দশদিনে ন্যায় সূত্রগুলি সমাপ্ত হওয়ায় ন্যায় দর্শনে ১০টী আহ্নিক আছে।

প্রত্যেক আহ্নিকে অনেক গুলি করিয়া প্রকরণ আছে।

এখানকার প্রকরণ শব্দের অর্থ অভিমত বিভাগ।

প্রত্যেক প্রকরণে অনেকগুলি করিয়া সূত্র আছে। পূর্ব্বাপর ভাবে যোজিত কতিপয় পদকে সূত্র বলে। এই ন্যায় সূত্রের সংখ্যা ও পাঠ বিষয়ে নানা প্রকার মতভেদ থাকায় সর্ব্বদর্শন পরমাচার্য্য প্রতিভায় অবতার সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র সর্ব্ববিজয়িনী প্রতিভার বলে বিশ্ব-বিমোহন সংশয় অপনোদন করিবার জন্য তত্তদ্লিখিত বহু ন্যায় গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া শেষে ন্যায় সূত্রের সংখ্যা এবং পাঠ নির্দ্দেশ করিবার জন্য "ন্যায়সূচীবন্ধ" নামক একটী অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বাচস্পতি মিশ্র ঐ ন্যায় সূচীবন্ধে যে যে সূত্রের দ্বারা যে নামে যে প্রকরণ আছে, তাহা এবং ন্যায় সূত্রের সংখ্যা এমন কি সূত্রগত অক্ষর সংখ্যা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার নির্দ্দেশ এই যে, এই ন্যায় দর্শনে ৫টী অধ্যায়, ১০টী আহ্নিক, ৮৪টী প্রকরণ, ৫২৮টি সূত্র, ১৭৯৬টী পদ, এবং ৮৩৮৫টী অক্ষর আছে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহা ন্যূনতা বা আধিক্য দোষে দূষিত বলিয়া গণ্য হইবে।

এই ন্যায় দর্শনের মত প্রাচীনতম দর্শন আর দ্বিতীয় নাই। যদিও সাংখ্য দর্শন উক্ত ন্যায় দর্শন অপেক্ষা প্রাচীনতর এই প্রবাদ প্রসিদ্ধি আছে; তথাপি বর্ত্তমান সময়ে যে সাংখ্য দর্শন দেখা যায়, তাহা ন্যায় দর্শন অপেক্ষা নবীন।

কারণ বর্ত্তমান সাংখ্যদর্শন যদি প্রাচীনতর হইত; তাহা হইলে সর্ব্বজন পূজিত উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় প্রামাণিক মনীষীগণ নিজ নিজ রচিত গ্রন্থে সমর্থন বা প্রতিষেধ পক্ষে বর্ত্তমান সাংখ্য দর্শনের সূত্রের উল্লেখ করিতেন।

কিন্তু তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে কোন স্থানেই বর্ত্তমান সাংখ্যদর্শনের সূত্রের উল্লেখ নাই। বরং ঈশ্বর কৃষ্ণরচিত সাংখ্য কারিকার উল্লেখ দেখা যায়। মূলদর্শন থাকিলে কখনই নবীন সাংখ্য কারিকার উল্লেখ থাকিত না।

প্রাচীনতম বাৎস্যায়ন মুনি ন্যায়দর্শনের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি গভীর গবেষণা পূর্ণ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি মনীষীগণ ঐ বাৎস্যায়ন মুনিকে পক্ষিল স্বামী নামে বিভূষিত করিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক মহামান্য গবেষণা মুনিগণ পণ্ডিতগণ পক্ষিলস্বামী নাম দেখিয়া ন্যায়দর্শন ভাষ্যসারকে অর্থ শাস্ত্রকার কৌটিল্য বলিয়া স্থির করেন।

কৌটিল্য এবং চাণক্য একই ব্যক্তি। কেবল নাম ভেদ মাত্র।

ইহাদের পক্ষে হেমচন্দ্র মুরিকৃত অভিধান চিন্তামণি গ্রন্থ প্রমাণ।

হেমচন্দ্র মুরিকৃত অভিধান চিন্তামণি গ্রন্থে বাৎস্যায়ন মুনির আট প্রকার নাম লিখিয়া দেন যে,

"বাৎস্যায়নো মল্লগণঃ কৌটিল্যশ্চন কাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোহ তুলশ্চম।"

এই দেখিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ ন্যায়দর্শন ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে চানক্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার ভার পূজনীয় পণ্ডিতগণের হস্তে সমর্পিত।

ন্যায়দর্শনের প্রামান্য এবং প্রাচীনতমত্ব পক্ষে অধিক কথা আর কি লিখিব, যাহারা বিদ্বৎ সমাজে প্রমাণ বলিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহারাও প্রমাণ বলিয়া ন্যায়দর্শনের সূত্রকে নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার উদ্দেশে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যদিও পূজ্যাপদ কণাদমুনি রচিত বৈশেষিক দর্শনের সূত্রগুলিকেও বহু প্রাচীন পণ্ডিত নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার উদ্দেশে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি ন্যায় দর্শনের মত বৈশেষিক দর্শনের প্রাচীনত্বমত্ব উপপন্নহয় না।

বৈশেষিক দর্শন ন্যায় দর্শনের পরবর্ত্তী, এই পক্ষে উপস্থিত দ্বিবিধ যুক্তি দেখা যায়।

১ম যুক্তি এই যে, ন্যায়দর্শনকার পাঁচপ্রকার হেত্বা ভাস বলিয়াছেন। যে হেতু দ্বারা অনুমান করিতে গেলে অনুমান সিদ্ধ হয় না, তাহাকে হেত্বা ভাস বলা হয়।

(ধূমহেতু দ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করিতে গেলে অনুমান সিদ্ধ হয় বলিয়া ঐ হেতু দ্বারা হ্রদে বহ্নির অনুমান করিতে গেলে অনুমান সিদ্ধ হইবে না। কারণ ঐ ধূম হেতু হ্রদে নাই। এই জন্য ঐ স্থলে ঐ হেতু হেত্বা ভাস মধ্যে গণ্য হইবে।)

কিন্তু বৈশেষিক দর্শনকার ঐ হেত্বা ভাসকে ত্রিবিধ বলিয়া দেন, পাঁচ প্রকার বলেন নাই।

বৈশেষিক দর্শনকারের উক্ত সঙ্কেত পোক্তি দ্বারা মনে হয় যে, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারের পঞ্চবিধ হেত্বা ভাস কথনকে অধিক উক্তি মনে করিয়া সঙ্কেপ করিয়াছেন। ইহাই ১ম যুক্তি।

২য় যুক্তি এই যে ন্যায় দর্শনকার প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, এবং শব্দ এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়া বিচার পূর্ব্বক তাহা মীমাংসিত করিয়া গিয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনকার চতুর্ব্বিধ প্রমাণ স্বীকার করেন নি।

তিনি দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণ।

তাঁহার আবিষ্কৃত প্রমাণ সংখ্যা ও হেত্বা ভাস সংখ্যার লাঘব দর্শনে মনে হয় যে, তিনি পরবর্ত্তী গ্রন্থকার।

মূলে বিস্তার না দেখিলে লাঘব প্রদর্শনের সুযোগ ঘটে না, ইহাই আমার মনে হয়।

ন্যায়দর্শনকার অপেক্ষা বৈশেষিক দর্শনকারের পদার্থ বিভাগের পরিস্কৃত প্রণালী দেখিলেও মনে হয় যে, ন্যায়দর্শনকার অপেক্ষা বৈশেষিক দর্শনকার নবীন।

প্রাচীন অপেক্ষা নবীন সাজাইতে পটু, ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

তবে অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা বৈশেষিক দর্শন প্রাচীন। বৈশেষিক দর্শন প্রণেতার নাম কণাদ।

ইনি তণ্ডুল কণিকামাত্র ভক্ষণ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় ব্রতী হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন। এবং সেই পর্য্যন্ত কণাদ নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ন্যায় দর্শনকার ১৬টি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, এই জন্য তাহাকে ষোড়শ পদার্থবাদী বলা হয়।

তিনি প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহ স্থান এই ষোড়শটী পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন।

ন্যায় দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকে প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি নয়টী

পদার্থের, এবং ২য় আহ্নিকে বাদ, জল্প. বিতণ্ডা প্রভৃতি ৭টি পদার্থের নিরূপণ আছে, ২য় অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকে সংশয় সম্বন্ধে বিচার, এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণের মধ্যে কোনটীই দুর্ব্বল নহে—নিজ নিজ সমর্থন কার্য্যে স্ব স্ব প্রধান, এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত আছে।

২য় আহ্নিকে উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রমাণ ভিন্ন অর্থাপত্তি ঐতিহ্য প্রভৃতি নামক পৃথক প্রমাণ আছে, ইহা যাহারা স্বীকার করেন, তাহাদের মত খণ্ডন আছে।

৩য় অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় এবং রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ের ব্যবস্থা এবং ২য় আহ্নিকে বুদ্ধি এবং মনের সম্বন্ধে বিচার আছে।

৪র্থ অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রাগ, দ্বেষ, জন্মান্তর, দুঃখ এবং মোক্ষের বিচার ও ২য় আহ্নিকে সংসারের মূল কারণ—রাগ এবং দ্বেষ এই বিষয়ে বিচার ও অবয়ব অবয়বী লইয়া বিচার আছে।

৫ম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকে ষোড়শ পদার্থের অন্যতম জাতি সম্বন্ধে মীমাংসা এবং ষোড়শ পদার্থের অন্যান্য নিগ্রহ স্থান কয় প্রকার এই সম্বন্ধে বিচার আছে।

বৈশেষিক দর্শনে ১০টী অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে ২টী করিয়া আহ্নিক আছে।

বৈশেষিক দর্শনকার ছয় প্রকার ভাব পদার্থ মানিয়াছেন।

তাহার মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, (গোত্ব মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতি) সমবায় এবং বিশেষ এই ছয় প্রকার ভাব পদার্থ।

উক্ত ছয় প্রকার ভাব পদার্থের নির্ব্বাচনানুরোধে বৈশেষিক দর্শনকার ষট্ পদার্থবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বস্তুগত্যা তিনি যে অভাব পদার্থ মানেননি তাহা নহে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে এই সম্বন্ধে বেশী লিখিলাম না।

ন্যায় দর্শনকারের প্রতিপাদ্য পদার্থগুলি ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া শেষে বৈশেষিক দর্শনকার পদার্থ সংক্ষেপ করিবার সুযোগ পাইলেন। মূলে পদার্থ তত্ত্বের সহিত পরিচয় না থাকিলে কেবল মাত্র প্রতিভা রূপ আলোচনা দ্বারা সূক্ষ্মভাবে তাহার বিশ্বাস করা কঠিন হইত।

ধন্য মুনিবর গৌতম। জ্ঞানরত্ন ভাণ্ডার বেদ যে রত্ন নিজ ভাণ্ডারে রক্ষিত করিতে পারেন নি, তুমি জগতের পারলৌকিক ও ঐহিক সুখ সম্পাদনে তৎপর হইয়া তাহা সাধারণের আয়ত্ত করিয়া দিয়া আজও পৃথিবীতে অমর ও দেবের আরাধ্য হইয়া আছ।

বৈশেষিক দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ম আহ্নিকে দ্রব্য গুণ এবং বাক্যের পরিচয় ও ২য় আহ্নিকে গোত্ব মনুষত্ব প্রভৃতি জাতি এবং বিশেষ নামক পদার্থের পরিচয় আছে।

২য় অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকে পৃথিবী, জল, তেজ. বায়ু এবং আকাশের লক্ষণ ও অন্যান্য কথা আছে।

২য় আহ্নিকে দিক্ এবং কালের কথা আছে।

৩য় অধ্যায়ের ১ম এবং ২য় আহ্নিকে আত্মা এবং অন্তঃকরণের কথা আছে।

৪র্থ অধ্যায়ের ১ম ও ২য় আহ্নিকে শরীর এবং শরীরোপযোগী বস্তুর কথা আছে।

৫ম অধ্যায়ের ১ম ও ২য় আহ্নিকে শারীরিক এবং মানসিক কর্ম্মের কথা আছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম ও ২য় আহ্নিকে বেদ বিহিত দান ও প্রতিগ্রহ রূপ সাংসারিক ধর্ম্মের এবং সংসারাশ্রম বহির্ভূত ভিক্ষুকাশ্রমোপযোগী ধর্ম্মের কথা আছে।

৭ম অধ্যায়ের ১ম ২য় আহ্নিকে জ্ঞানসাধ্য গুণ ও জ্ঞান নিরপেক্ষ গুণের এবং সমবায় নামক সম্বন্ধে কথা আছে।

৮ম অধ্যায়ের ১ম ও ২য় আহ্নিকে নির্ব্বিকল্পক এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কথা আছে।

নাম জাতি এবং আকার যোজনা করিয়া যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। পশু পক্ষী মানুষ বলিয়া যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সবিকল্পক প্রত্যক্ষের উদাহরণ। এই সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষও বলে। উপবিশিষ্ট প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে নাম জাত্যাদি যোজনা করিয়া অব্যক্ত ভাবে যে, প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহাই নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ।

৯ম অধ্যায়ের দুই আহ্নিকেই জ্ঞান এবং জ্ঞান বিভাগ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

১০ম অধ্যায়ে তর্ক শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য অনুমান এবং অনুমান বিভাগ বিশদ ভাবে কথিত হইয়াছে।

উক্ত উভয় শাস্ত্রেই শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম সুরক্ষিত হইয়াছে; সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রথমে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সামান্য ভাবে পরিচয়। ২য় প্রতি-

পাদ্য বিষয়ের লক্ষণ, ৩য় বিচার দ্বারা তাহার স্থাপন ও আনুসঙ্গিক প্রতিবাদীর মত খণ্ডন।

বৈশেষিক দর্শনে ন্যায় দর্শন অপেক্ষা আর একটী বিশেষ মত-ভেদ আছে। উভয় দর্শনেই দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী, জল, এবং তেজের সাধারণ ধর্ম্ম মধ্যে রূপ একটী উল্লেখযোগ্য সাধারণ ধর্ম্ম। উভয় দর্শন মতে উক্ত রূপ ত্রিবিধ পাকজ, অপাকজ এবং নিত্য।

নিত্যরূপ জলীয় এবং তৈজস পরমাণুতে থাকে। অবয়ব রূপ জন্য অবয়বীর রূপ অপাকজ। তাহা অগ্নি সংযোগাদি জন্য নহে বলিয়া অপাকজ।

পাক শব্দের অর্থ অগ্নি প্রভৃতি তেজঃ সংযোগ।

কুম্ভকার কাঁচাঘট পোড়াইলে মৃত্তিকার কৃষ্ণরূপ পরিবর্ত্তনে যে রক্ত রূপান্তর উৎপন্ন হয়, তাহা পাকজ। ইহা পার্থিব দ্রব্যের অসাধারণ ধর্ম্ম।

ন্যায় দর্শন মতে ঐ পাক মূল কারণ পরমাণু এবং তন্নির্ম্মিত দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুক নির্ম্মিত ত্রাসরেণু এইরূপে স্থূলত স্থূলতর, এবং স্থূলতম ক্রমে কারণ হইতে কার্য্য পর্য্যন্ত পার্থিব সকল দ্রব্যে হয়। উক্ত সাধারণ পাককে পিঠর পাক বলে।

পিঠর শব্দের অর্থ স্থালী। স্থালী বলিতে অবয়বীর এবং ঐ সঙ্গে অবয়বের পাক বলিতে হইবে। অবয়বকে ছাড়িয়া কেবল অবয়বীর পাক হয় না। কিম্বা পিঠরে পাক অর্থাৎ স্থালীস্থিত তণ্ডুলাদির সহিত যেমন অগ্নির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলেও স্থালীর অব্যক্ত ছিদ্র পথ দ্বারা অগ্নির সম্বন্ধ ঘটে, এবং বিক্লিত্তি প্রভৃতি বিসার জন্মাইবার পর রূপান্তর জন্মায়। ঐ অগ্নি সংযোগ আশ্রয়ীভূত স্থালীর ধ্বংস বা অন্য স্থালীর উৎপত্তি হইল না, ইহা সর্ব্বজন স্বীকৃত। অগ্নি সংযুক্ত পার্থিব ঘটাদি দ্রব্যের ধ্বংস স্বীকার না করিয়া পূর্ব্বরূপ ধ্বংসও রূপান্তরের উৎপত্তি সুসঙ্গত।

এই ভাবটী প্রকাশ করিবার জন্য পিঠক পাক এই কথা বলা হইয়াছে। অগ্নি সংযুক্ত দ্রব্যের ধ্বংস হইল না ইহা দেখাইবার জন্য পিঠক শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। নচেৎ পার্থিব ঘটাদির উল্লেখ হইত।

সুতরাং ঐ পাকজ রূপান্তর সুক্ষ্মতম, সুক্ষ্মতর, সুক্ষ্ম, স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম সর্ব্বত্রই সংঘটিত হয়। ইহা ন্যায় মত।

বৈশেষিক মতে ঐ পাক সাধারণ হইলেও ঐ পাক দ্বারা পরমাণুর প্রথম কার্য্য দ্ব্যণুকাদির নাশ ক্রমে স্থূলতমের অর্থাৎ সেই কাঁচা ঘটের অংশ হয়।

পরে অবশিষ্ট নিত্য কেবল পরমাণুতে পাকজ রূপান্তর উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কুম্ভকার কর্ত্তৃক অগ্নিদগ্ধ সেই ঘটের মূলকারণ পরমাণুতে কেবল পাকজ রূপান্তর স্বাভাবিক কৃষ্ণরূপ ভিন্ন রক্তরূপ উৎপন্ন হয়। তাহার পর রক্তদ্ব্যণুক, রক্ত ত্র্যসরেণু এইরূপ ক্রমে শেষে রক্ত ঘটের উৎপত্তি হয়। সুতরাং অগ্নি সংযোগের পর ঘটগত রক্তরূপ, কারণের গুণ জন্য। পাক ঘটগত গুণ পারবর্ত্তন হেতু নহে।

ন্যায়মতে অগ্নি সংযোগাদি দ্বারা অগ্নি সংতপ্তমান ঘটের নাশ হয় না। কেবল মাত্র রূপের ধ্বংস ও রূপান্তরে উৎপত্তি হয়।

উক্ত বৈশেষিক সম্মত পাককে পীলু পাক বলে। পীলু শব্দের অর্থ পরমাণু উভয় সম্মত আলোচনার মধ্যে কোন্‌টী সাধু কোন্‌টী বা অসাধু, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ, ইহা উক্ত উভয় দার্শনিক সম্মত। আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান সাধক আত্মেত্তর সকল পদার্থের সামান্যরূপেও বিভাজ্য প্রতিষ্বিক রূপে জ্ঞান আত্মতত্ত্বজ্ঞান মধ্যে গণনীয়। আত্মাকে আত্মেত্তর সকল পদার্থ হইতে ভিন্নরূপে বুঝিতে হইলে আত্মা এবং আত্মেত্তর সকল পদার্থই বিশদরূপে জ্ঞাতব্য। এই বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিকের তুল্য মত। অনেক বিষয়ে সাম্য থাকায় উক্ত উভয় শাস্ত্রকে সমান তন্ত্র অর্থাৎ তুল্য শাস্ত্র বলা হয়।

"আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধাকিত্তব্য।"

এই শ্রুতি, এবং—

"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যানেরমেনচ।
ত্রিধা প্রকাল্পয়ন প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥"

এই স্মৃতি হইতে জানা যাইতেছে যে, আত্মার অনুমান মোক্ষ সাধক দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম মোক্ষ। ঐ অনুমান দ্বিবিধ। একটী স্বার্থ অপরটী পরার্থ। অপরের সহিত বিচার না করিয়া নিজে নিজে যে অনুমান করা হয়, তাহা স্বার্থ। অপরের সহিত বিচার করিয়া যে অনুমান সিদ্ধ হয়, তাহা পরার্থ।

বৈশেষিক দর্শনে উক্ত স্বার্থানুমানেরই প্রাধান্য। ন্যায় দর্শনে উক্ত পরার্থানুমানের প্রাধান্য। কারণ ন্যায় দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় গুলি বিচার পূর্ব্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে। ন্যায় মতে পদার্থ প্রতিপাদনের মূলমন্ত্র বিচার।

যাহারা সাংসারিক দলাদলি বাক্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি সামাজিক প্রাধান্য বর্দ্ধক ব্যবহার উপেক্ষা করিয়া অনিত্য সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সংসার মুলকারণ আত্ম বিষয়ক অজ্ঞান বিনাশ করিবার জন্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানে ব্রতী। আত্মানুমান তাঁহাদেরই কার্য্য। তাঁহাদের প্রাণ উৎকট বৈরাগ্যের শান্তিময়ী মাধুরী সেবায় নিয়োজিত। বিষয় তৃষ্ণা তিরোহিত। বিষয় তৃষ্ণ অথচ বিদ্বান সংসারীর প্রধান বৃত্তি বিচার মগ্নতা তখন তাঁহাদের অস্তমিত। ঐরূপ অবস্থায় আত্মা-নুমান স্বার্থ অর্থাৎ স্বগত্ত ভিন্ন বলা যায় না। সুতরাং ন্যায় দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মতত্ত্বজ্ঞান সাধক আত্মানুমান স্বার্থ হইয়া পড়িলেও বিচারপ্রাণিত পরার্থানুমানের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইবে না। কারণ ঐ আত্মতত্ত্বের আবরক বহুবিধ কুতর্ক জালরূপ অন্ধকার দূর করিবার জন্য নানাবিধ যুক্তি তর্ক রূপ আলোক অপেক্ষিত হইয়াছিল।

এই কারণে পরার্থানুমানের প্রধান উপজীবা বিচার অপেক্ষিত হওয়ায় ন্যায় শাস্ত্র মুখ্যরূপে আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদক হইলেও ন্যায়শাস্ত্রের নিজস্ব পরার্থানুমানও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

স্বার্থানুমান সিদ্ধ করিতে গেলে যাহাকে অপেক্ষা করিতে হয়, পরার্থানু-মানেও সেই গুলিকে অপেক্ষা করিতে হইবে; বরং তদতিরিক্ত অনেক পদার্থকে অপেক্ষা করিতে হইবে। স্বার্থানুমানে কেবল সংসার ও হেত্বাভাবের উপযোগিতা। কিন্তু পরার্থানুমানে ন্যায়দর্শনের অনুমোদিত প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি সকল পদার্থের অপেক্ষা এই জন্য সকলেই ন্যায় দর্শনের পক্ষপাতী।

ন্যায় দর্শনের অনুমোদিত ষোড়শ পদার্থের শরণাগত না হইলে অন্য উপায়ে অপরের অজ্ঞাত পদার্থ সাধারণ্যে স্থাপন করা অসম্ভব। ন্যায়শাস্ত্র, বেদ, কৃষি বাণিজ্য পক্ষে প্রমাণীভূত শাস্ত্র বার্ত্তা এবং প্রজাপালন ও দুষ্ট শাসন পক্ষে প্রমাণীভূত শাস্ত্র দণ্ডনীতি, (যাহা আমাদের প্রাচ্য রাজকীয় আইন শাস্ত্র) সকল শাস্ত্রেই ন্যায় দর্শনকারের অনুমোদিত উক্ত ষোড়শ পদার্থকে বিশেষ রূপে না বুঝিলে এবং বুঝিয়া তদবলম্বনে না চলিলে নিজ নিজ অভিমত শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি ঘটে না।

অতএব ন্যায়শাস্ত্র, ব্যবহারজীবী, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মী, রাজা এবং তত্ত্বজ্ঞ সকলেরই অবলম্বনীয়। ন্যায় শাস্ত্রের অনুমোদিত পদার্থ গুলি নির্ব্বিশেষে সকলেরই সাহায্যকারী বলিয়া ন্যায় দর্শনের ১ম সূত্রে "প্রমাণ,—প্রমেয়—

সংশয়—প্রয়োজন—ইত্যাদি—নিগ্রহ স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানা ন্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ লিখি-বার উদ্দেশ্য এই যে, নিঃশ্রেয়স শব্দের অর্থ অভিমত শুভ। যিনি কর্ম্মী তাঁহার অভিমত শুভ স্বর্গ। যিনি রাজা তাঁহার অভিমত শুভ রাজ্য বৃদ্ধি এবং শত্রু জয়। যিনি আইনজ্ঞ তাঁহার অভিমত শুভ নির্দ্দোষীকে রক্ষা ও দোষীর দণ্ড প্রদান। যিনি কৃষি বাণিজ্য পরায়ণ, তাঁহার অভিমত শুভ কৃষি বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং যিনি তত্ত্বজ্ঞ তাঁহার অভিমত শুভ মুক্তি।

উক্ত ন্যায় দর্শনের প্রতিপাদিত পদার্থ গুলি পরিজ্ঞাত হইয়া বিভিন্ন প্রস্থান উক্ত চতুর্ব্বিধ বিদ্যার উপকারক হয় বলিয়া সকল প্রকার শুভ বাচক নিঃশ্রেয়স শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কেবল ন্যায় শাস্ত্রের উপযোগী হইলে এই স্থানে ন্যায় শাস্ত্রের প্রতিপাদিত অভিমত শুভ বলিয়া প্রচারিত মুক্তির বাচক মোক্ষ শব্দের প্রয়োগ থাকিত।

সর্ব্ববিধ শুভ বাচক নিঃশ্রেয়স শব্দের প্রয়োগ থাকিত না। এই জন্য ন্যায় দর্শন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মুনি ১ম সূত্রের স্বরচিত ভাষ্যে ন্যায় শাস্ত্রকে সকল শাস্ত্রের সহায় বলিবার উদ্দেশে—

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানা মুপায়ঃ সর্ব্ব কর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥"

এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ন্যায় বিদ্যা সকল ধর্ম্মের নির্ণায়ক বলিয়া সকল ধর্ম্মের আশ্রয়। ইহা ভগবান মনুরও অনুমোদিত। ন্যায় বলে বলীয়ান্ না হইলে ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান হয় না, এই কথা মনু বলিয়াছেন।

"যস্তর্কেনানু সন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।"

ইহা মনুর কথা।

"কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্ম হানিঃ প্রজায়তে॥"

ইহাও কোন স্মার্ত্ত মনীষীর কথা। সুতরাং ধর্ম্মকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাপন যুক্তি অবলম্বনীয়।

উক্ত ন্যায় বিদ্যার অপর নাম আন্বিক্ষিকী। প্রত্যক্ষ এবং আগম দ্বারা নির্দ্ধারিত বিষয়ের পশ্চাৎ অনুমান আন্বিক্ষা শব্দের অর্থ। ঐ অন্বীক্ষা অবলম্বন করিয়া যে বিদ্যা উপস্থিত তাহাই আন্বিক্ষিকী নাম পরিচিত।

ন্যায় শব্দের অর্থ প্রমাণ সমূহ দ্বারা অর্থ পরীক্ষা, কিম্বা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপায় এবং নিগমন এই পাঁচ প্রকার বাক্য সমষ্টি। যে বাক্যগুলি

প্রত্যক্ষ প্রভৃতি বস্তুর্ব্বিধ প্রমাণের আশ্রিত বলিয়া দর্প ভরে নিজ নিজ সমর্থনীয় বিষয় সমর্থন করিবার জন্য দণ্ডায়মান।

নীয়তে নির্ণীয়তে অনেন এই প্রকার ব্যাকরণের পদসাধন প্রক্রিয়া অনুসারে বৈদিক পদার্থ নির্ণায়ক, জৈমিনী এবং ব্যাসদেবের অনুমোদিত অধিকরণগুলিকে ঘুণাক্ষর ন্যায়, কাকাক্ষি গোলকনগর ইত্যাদি পারিভাষিক ন্যায়কেও ন্যায় বলিলেও ঐ গুলি ন্যায়শাস্ত্রের অবলম্বনীয় ন্যায় নহে।

আত্মতত্ত্ব উক্ত ন্যায় শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য হইলেও ন্যায় বিদ্যা উপনিষদাদির মত আধ্যাত্মিকী বিদ্যা হইয়া পড়ে এবং আত্মাকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে তন্ন তন্ন এই রীতি অনুসারে আত্মা এবং আত্মেতর সকল পদার্থকে সম্যক্ রূপে বুঝা উচিত বলিয়া ন্যায়শাস্ত্রে কেবল আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়নি। আত্মা এবং আত্মেতর সকল পদার্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

জীব এবং পরমেশ্বর এক নহেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহা ন্যায় শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

উপাস্য এবং উপাসকের ভেদ সমর্থিত না হইলে চিরাদৃত উপাসনা পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। উপাস্য এবং উপাসক এক হইলেও উপাস্য এবং উপাসকের ভেদ কল্পনা করিয়া পরিত্যাজ্য ভ্রমকে হৃদয় সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া সেই ভ্রমের আজ্ঞাবহ থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রুতি জীব এবং পরমেশ্বর ভিন্ন পদার্থ এই কথা বলিয়াছেন।

"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পনঞ্চাপরমেব চ।"

ইহাই শ্রুতির কথা। আর ব্রহ্ম জীব, এবং পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। জীব এবং পরমেশ্বর ২টী পৃথক্ পদার্থ না হইলে "দ্বে" এই কথাটী বলা অসঙ্গত হইত। এক পদার্থকে দুই বলা চলে না।

ন্যায় বিদ্যা বিখ্যাত চতুর্দ্দশ বিদ্যার অন্যতম।

"আত্মাদি বেদশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হেতা শ্চ দ্দশ॥"

এই সকল বিদ্যাই চতুর্দ্দশ বিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত।

পূজ্যপাদ গৌতম এই পৃথিবীতে ন্যায় বিদ্যার ১ম প্রবর্ত্তক ইহা নহে। অনাদিকাল হইতেই ঐ ন্যায় বিদ্যা ক্ষীণাকারে প্রকাশিত ছিল, পূজ্যপাদ গৌতম স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা বলে উক্ত বিদ্যাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন এই মাত্র।

তৎপরে বাৎসায়ন মুনি কৃত ভাষ্য উক্ত ন্যায় বিদ্যার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছিল। দিঙনাগাচার্য্য প্রভৃতি কতিপয় বৌদ্ধ দার্শনিক ন্যায় দর্শন এবং ভাষ্য উভয়ের প্রতিপক্ষ ভাবে উপস্থিত হইলে ভরদ্বাজ গোত্র সম্ভূত নৈয়ায়িক কুলচূড়ামণি উদ্যোতকর বার্ত্তিক নামক একটী ন্যায় দর্শনের টীকা রচনা করিয়া তাহার পঠন পাঠনা দ্বারা দেশের প্রভিতা বিস্তার পূর্ব্বক জগতে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া ছিলেন।

পরে ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমুখ প্রবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধ দার্শনিক বিরুদ্ধ ভাবে প্রবল হইয়া উঠিলে সর্ব্ব দর্শন পরমাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা বলে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া ছিলেন। ইহার পর উদয়নাচার্য্য শ্রীকণ্ঠ তিলকোপাধ্যায়, ন্যায় মঞ্জুরীকার জয়ন্ত ভট্ট জন্ম গ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্য ভূমিকে স্বর্গায়মান করিয়াছেন।

পরে নিরীশ্বরতা বাদ সমর্থক কর্ম্মবাদ অবলম্বন করিয়া মীমাংসকগণ দেশের নেতা হইয়া উঠিলে ঈশ্বর বিশ্বাস দেশ হইতে অস্তমিত হইবার মত হইয়া উঠিলে শিবারাধনায় ব্রতী কতিপয় ধার্ম্মিকবর নৈয়ায়িকের পুণ্য প্রভাবে গাঙ্গেশ উপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন।

সাক্ষাৎ শিবাবতার গাঙ্গেশ চিন্তামণি নামক নব্য ন্যায় গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার পঠন পাঠনা দ্বারা ঈশ্বর শ্রদ্ধা জাগাইয়া নিরীশ্বরতা বাদ পূর্ণ কর্ম্মবাদ বহিস্কৃত করিয়া দিলেন।

ঐ চিন্তামণি নব্য ন্যায়ের মূল গ্রন্থ। তাঁহার পর বর্দ্ধমানোপাধ্যায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম পক্ষানন্মিশ্র, রঘুনাথ শিরোমণি, হরিদাস, রামভদ্র, ভবানন্দ, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নব্য নৈয়ায়িকগণ ভারত অলঙ্কৃত করিয়া ভারতে সেশ্বরতাবাদ স্থাপন করিয়া ঈশ্বর বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত নৈয়ায়িকগণের মধ্যে আর একজন নৈয়ায়িক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নাম বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন।

তিনি গৌতম সূত্রের বৃত্তি এবং কারী কাকলী এবং তাহার টীকা মুক্তাবলী রচনা করিয়া নব্য প্রাচীন ন্যায় জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

অনেকে বৈশেষিক দর্শনের অনুগামী হইয়া নানা গ্রন্থ রচনা দ্বারা বিদ্যা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রশস্তপাদ ভাষ্য প্রণেতা প্রশস্তপাদ মুনি, ন্যায় কন্দলী প্রণেতা শ্রীধরাচার্য্য, সপ্ত পদার্থী নামক প্রকরণ

গ্রন্থ প্রণেতা শিবাদিত্য মিশ্র কিরণাবলী প্রণেতা উদয়নাচার্য্য, ন্যায় লীলাবতী প্রণেতা বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জীব এবং ঈশ্বরের ভেদ প্রতিপাদক শাস্ত্রই উক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যার অন্যতম ন্যায় বিদ্যা।

অতএব সাংখ্য এবং পাতঞ্জল উক্ত ন্যায় বিদ্যার অন্তর্গত। যদিও সাংখ্যে নিরীশ্বরতা বাদ সমর্থিত, জীব এবং ঈশ্বর উভয়ের প্রতিপাদন নাই। তথাপি সাংখ্যের উক্ত নিরীশ্বরতা বাদ, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, উহা কাল্পনিক।

আমার মনে হয় যে, সাংখ্য সূত্র রচনা কালে নাস্তিক সম্প্রদায়ের সমাজে প্রাধান্য থাকায় তাহাদের সহিত মতবিরোধ হইলে রাঢ়ী গ্রন্থের ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কায় নাস্তিক দুর্বৃত্তগণের চোখে ধুলি নিক্ষেপ তুল্য মিথ্যা নিরীশ্বরতা বাদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই কারণে "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্র রচনা না করিয়া "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এইরূপ সূত্র রচিত হইয়াছে।

সাংখ্য এবং পাতঞ্জল উভয়ই উক্ত প্রকারে ন্যায় বিদ্যার অন্তর্গত হইলেও ন্যায় বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ ন্যায় বিদ্যার সহিত উহাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়া, পদার্থ নির্ব্বাচন ও স্বীকৃত পদার্থের সদসদ্ ভাব লইয়া অনেক মত ভেদ আছে।

পরস্পরের অধীকৃত সৃষ্টি প্রক্রিয়া দুটী বিভিন্ন নিয়ম পরিচালিত। প্রসিদ্ধ ন্যায় বিদ্যার অনুমোদিত সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভবাদ পরিচালিত ও সাংখ্য পাতঞ্জলের অনুমোদিত সৃষ্টি প্রক্রিয়া পরিণাম বাদ পরিচালিত। নানা বৈষম্য থাকায় প্রসিদ্ধ ন্যায় বিদ্যা এবং সাংখ্য পাতঞ্জল বিভিন্ন দর্শন বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।

সকল দর্শনে ভূরি ভূরি মত বৈষম্য থাকিলেও শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন যে আত্মদর্শনের উপায় ইহা সমস্বরে ঘোষিত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাতে মতভেদ নাই।

শ্রোতৃগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আপত্তকায় সংক্ষেপে অনেক কথা বলিতে হইল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলনীর দর্শন শাখার সভাপতি ভারত বরেণ্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় উক্ত বৈশেষিক দর্শনের পরিষ্কার নামক সংস্কৃত টীকা ও বিশদ বঙ্গানুবাদ এবং বঙ্গভাষাকৃত অভূত পূর্ব্ব ব্যাখ্যা রচনা করিয়া এবং আমাদের শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কবিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় উক্ত সভাষ্য ন্যায় দর্শনের বঙ্গ-ভাষায় সুবিশদ অনুবাদ ও টিপ্পনী

করিয়া আপামর সাধারণের উপকার করিয়াছেন। এই ভাবে উৎকৃষ্ট দর্শন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইলে আমাদের দেশ রীতিমত উপকৃত ও আলোকিত হইবে সন্দেহ নাই।

সুন্দর।

লেখক,—শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস।

একদিন বৈকুণ্ঠে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ রত্নসিংহাসনে বসিয়া নারায়ণ লক্ষ্মীর মনোরঞ্জনার্থে নানাবিধ শ্রুতি সুখকর গল্প বলিতে লাগিলেন। অবশেষে নারায়ণ লক্ষ্মীকে কহিলেন, "বল দেখি লক্ষ্মি! জগতের মধ্যে কাহাকে দেখিতে অতি সুন্দর?

লক্ষ্মী কহিলেন, "প্রভো? আপনি ত্রিজগতের নাথ এবং পরমারাধ্য দেবতা আপনার চেয়ে সুন্দর কি কেহ আছে?

নারায়ণ কহিলেন, "তোমার কাছে আমি সুন্দর বটে; কিন্তু জগতের চক্ষে আমি কি প্রকৃত সুন্দর! আমার চেয়ে আরও অনেক সুন্দর আছে।"

লক্ষ্মী কহিলেন, "পতিব্রতা রমণীগণের স্বামীই পরম সুন্দর।"

নারায়ণ কহিলেন, "স্বীকার করি, তোমার কথা, কিন্তু সাধারণ পক্ষে কে দেখিতে অতি সুন্দর। একবার পরীক্ষা দ্বারা তাহা অবগত হও।"

লক্ষ্মী কহিলেন, "কি উপায়ে পরীক্ষা করিব প্রভো?

নারায়ণ কহিলেন, "তোমার গলার ঐ হার ছড়াটী তোমার বাহন পেচকের হাতে দিয়া বলিয়া দেও; জগতের মধ্যে যে ব্যক্তি পরম সুন্দর, তাহার গলায় এই হার ছড়াটী দিয়া আইস! আমরা সেই পরম সুন্দরকে দেখিতে বাসনা করি।"

নারায়নের কথা শুনিয়া লক্ষ্মী তাহাই করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "সুন্দরের গলায় হার ছড়াটী দিয়া আমাদের সংবাদ দিবে।" পেচক হার ছড়াটী লইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন প্রকৃত সুন্দর কোথায় পাই। যাহা হউক ত্রিভুবন অনুসন্ধান করিতে হইল! "নিশ্চয়ই একজন পরম সুন্দর পাওয়া যাইবে।" এই বলিয়া একবার লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি বক্র নয়নে দৃষ্টিপাত

করিল। পেচকের চক্ষে লক্ষ্মী নারায়ণ সুন্দর বোধ হইল না। তখন পেচক সুন্দর খুজিতে বৈকুণ্ঠ হইতে উড়িয়া ব্রহ্ম লোকে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং সাবিত্রির সহিত প্রজাপতিকে দেখিল। তাঁহাদের দেখিয়া সুন্দর বোধ হইল না। তখন তাঁহাদের চরণ বন্দন করিয়া কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূত প্রেতের ভয়ে হার ছড়াটী লুকাইয়া গোপনে গোপনে হর পার্ব্বতীর রূপ দেখিয়া লইল। এবং উদ্দেশে তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছে—এমন সময়ে মহাদেব ভগবতীকে কহিলেন. "দেখ দেখ পার্ব্বতী! লক্ষ্মীর বাহন পেচক সুন্দর খুজিয়া বেড়াইতেছে। সে গোপনে আমাদের রূপ দেখিয়া গা ঢাকা দেওয়ার উদ্‌যোগ করিতেছে; তুমি একবার পেচককে ডাকিয়া কি কারণে এখানে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা কর দেখি?" এই কথা শুনিয়া ভগবতী মৃদু হাস্য করিয়া ডাকিলেন, "পেচক ও পেচক!" পেচক তখন থতমত খাইয়া আমতা আমতা করিয়া কহিল, "এই যে মা! এই যে মা!" পার্ব্বতী কহিলেন, "বহুদিন যে তোমার দেখা পাইনে, আজ কি মনে করে আগমন বল দেখি?" বলি কুশল ত?" পেচক কহিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদে প্রানে প্রানে কুশলে আছি।" ভগবতী কহিলেন, "আগমনের উদ্দেশ্য কি? যদি প্রতি বন্ধক না থাকে শুনতে পাই কি?" এই কথা শুনিয়া পেচক মনে মনে কহিল, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সকল স্থানেই এড়ান যায়—কৈলাসে এসে এড়াবার যোটী নাই। একে ভুত প্রেতের জ্বালায় এখানে আসা যায় না, তার উপর আসল কথা না বল্‌লে রক্ষা নাই। যাহা হউক, আসল কথা কিছুতেই বল্‌বো না।" প্রকাশ্যে কহিল, "মা! বহু দিন হতে—আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করার ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু একটুও অবকাশ পাই না যে, আপনাদের চরণ দর্শন করে যাই। আজ মা লক্ষ্মী আমাকে ছুটী দিয়াছেন, তাইতে আপনাদের চরণ দর্শন কর্‌তে এসেছি।" এই কথা শুনিয়া ভোলানাথ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ভগবতীও মৃদু হাস্য করিয়া পেচককে আশীদার্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। পেচক "রাম বল বাচলাম" বলে সেখান হতে ভো দোড় দিয়ে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইল। শচীর সহিত ইন্দ্রকে দেখিয়া কুবের ভবনে উপস্থিত হইল। মুরজার সহিত কুবেরকে দেখিয়া আদিত্য লোকে উপস্থিত হইল, সংজ্ঞার সহিত সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিয়া চন্দ্র লোকে উপস্থিত হইল। কর্ত্তিকাদির সহিত চন্দ্রকে দর্শন করিয়া মদনালয়ে উপস্থিত হইল। যে মদন ও রতি রসের সাগর মন্থন করিয়া তার সার ভাগের দ্বারা সৃষ্টিত হইয়াছেন, পেচকের চক্ষে তাহারাও সুন্দর বোধ হইল না। এইরূপে

একে একে সমস্ত দেবলোক ভ্রমণ করিল, কিন্তু কোথাও সুন্দর খুজিয়া পাইল না। তখন মণ্ডলোকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূলোকে মুনি ঋষিগণের তপোবন হইতে আরম্ভ করিয়া মহা রাজাধিরাজের পুরী পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও সুন্দর খুজিয়া পাইল না। তখন মর্ত্তলোক ছাড়িয়া পাতালে প্রবেশ করিল। পাতালে বাসুকী অনন্দ ইত্যাদি নাগগণকে এবং সহস্র সহস্র অপূর্ব্ব সুন্দরী নাগকন্যাগণকে দেখিল; কিন্তু কেহ পেচকের চক্ষে সুন্দর বোধ হইল না। অবশেষে বলিরাজের পুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শ্রীহরি বলিরাজের পুরে প্রহরী হইয়া আছেন। পেচককে দেখিয়া শ্রীহরি কহিলেন, "কি পেচক ভাল আছ ত? এখানে আগমনের কারণ কি?" পেচক কহিল, "বহুদিন হইতে আপনার চরণ দর্শন হয় নাই, তাই আজ দর্শন কর্‌তে এসেছি।" শ্রীহরি কহিলেন, "বেশ বেশ! এখন পুরে প্রবেশ কর। পেচক তখন ভক্ত পুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যে বিন্ধ্যা বিন্ধ্যাবলীর সহিত বলিরাজ পুরী আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। এবং তাহাদের অঙ্গে এমনি একটী মাধুর্য্য যে, শত কোটী মদনও সেই মাধুর্য্যের নিকট স্থান পায় না। পেচকের তাঁহাদের দেখিয়া সুন্দর বলিয়া বোধ হইল না। পেচক ত্রিভুবন ভ্রমন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলাম, কোথাও সুন্দর পাইলাম না, এখন কোথায় যাই। কোথায় গেলে সুন্দর পাই।" এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে তাহার নিজ গৃহের কথা মনে হইল। তখন মনে মনে কহিল, "সমস্ত স্থানেতে খুজিলাম, সুন্দর পাইলাম না; এখন একবার নিজ গৃহটা খুজিয়া দেখি, যদি সুন্দর পাওয়া যায়।" এই বলিয়া নিজ গৃহের দিকে গমন করিল। দুর হইতে বাবাকে আসিতে দেখিয়া—পেচক নন্দন ভোম্বলদাস কালপেচা হেলে দুলে, "বাবা বাবা," করিতে করিতে ছুটীয়া যাইয়া বাবার কোলে উঠিল। পেচক তখন বলিল, "হায় হায়! আমার মত মুর্খ দুটী নাই, আমার গৃহে এমন সুন্দর থাকিতে; অকারণ ত্রিভুবন ভ্রমণ কারয়াছি। তখন গৃহে যাইয়া নিজ নন্দন ভোম্বলদাসের গলায় গজমতির হার ছড়াটী দিয়া অনিমিশ নয়নে দেখিতে লাগিল।

এদিকে নারায়ণ লক্ষ্মীকে কহিলেন, "লক্ষ্মী তোমার পেচক ত বহুক্ষণ গিয়াছে, এখনও তাহার দেখা নাই। তাহাকে খুজিবার জন্য কি কাহাকে পাঠাইব নাকি?, ' লক্ষ্মী কহিলেন, "তাহাকে খুজিবার জন্য গরুড়কে পাঠাইয়া দেন।" নারায়ণ তখন গরুড়কে স্মরণ করিলেন। গরুড় চক্ষুর নিমিশে শ্রীচরণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া পদবন্দনা করিল। শ্রীহরি গরুড়কে আশীদার্ব্বাদ করিয়া

কহিলেন, "দেখ গরুড়! লক্ষ্মীর বাহন পেচকের হাতে গজমতীর হার দিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, "ত্রিভুবনের মধ্যে যে ব্যক্তি দেখিতে সুন্দর, তাহার গলায় এই হার ছড়াটী দিয়া আইস। কিন্তু সে অনেকক্ষণ হইল গিয়াছে, তুমি একবার তার অনুসন্ধান করিয়া আইস ত! দেখিও, যেন তাহাকে ডাকিয়া আনিও না। সে কোথায় এবং কি ভাবে আছে, ইহাই দেখিয়া আইস!" শ্রীহরির আদেশ শুনিয়া গরুড় চক্ষের নিমিষে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিল; কোথায়ও পেচকের সন্ধান পাইল না। অবশেষে পেচকের পুরে যাইয়া দেখিল, পেচক সেই গজমতীর হার নিজ নন্দন ভোম্বলদাসের গলায় দিয়া অনিমিষ নয়নে তাহার দিকে চাইয়া আছে। তাহা দেখিয়া গরুড় মনে মনে কহিলেন, "লক্ষ্মী নারায়ণের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, সুন্দর খুজিতে ভার দিলেন এক বেটা কাল পেচকের!" এই বলিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল। গরুড়কে দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন, "কি গরুড়? পেচকের দর্শন পেলে?" গরুড় কহিল, "যেমন মা টী তেমনী বাবাটী! ত্রিভুবনে লোক খুজে পেলেন না—সুন্দর খুজিতে ভার দিলেন, একটা কাল পেচার হাতে। সে ত্রিভুবনে কোথাও সুন্দর খুজে না পেয়ে, বাঁদরের গলায় গজমতী হার পরাইয়াছে। তাহার নিজ নন্দন ভোম্বলদাসের গলায় হার ছড়াটী দিয়া, অনিমিষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।" এই কথা শুনিয়া নারায়ণ বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং লক্ষ্মীকে কহিলেন, "চল লক্ষ্মী আমরা সেই সুন্দরকে দেখিয়া আসি!" এই বলিয়া উভয়ে গরুড়ের পিঠে উঠিয়া, পেচক পুরে গমন করিলেন। এবং দেখিলেন, পেচক গজমতীর হার—নিজনন্দনের গলায় দিয়া অনিমিষ নয়নে তাহার রূপ মাধুরী নিরীক্ষণ করিতেছে। লক্ষ্মী নারায়ণ যে, সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা জানিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে গত হইলে লক্ষ্মী পেচককে ডাকিলেন, "পেচক!" এই স্বর পেচকের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র পেচক চমকিয়া উঠিল, এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ্মী নারায়ণ গরুড়ের উপর বসিয়া আছেন। তখন স্বসব্যস্তে পাদ্য অর্ঘ্য আসন আনিয়া বসিতে দিলেন। নারায়ণ "থাক থাক" বলিয়া কহিলেন, "এই অপূর্ব্ব সুন্দর ছেলেটী কি তোমার?" পেচক আহ্লাদে হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে আপনাদের কৃপা বলে এ দাসের।" নারায়ণ কহিলেন, "ছেলেটী যেমন রূপবান গুণবানও কি সেই রূপ?" পেচক তখন নিজ নন্দনের গুণের বস্তা খুলিয়া বসিল এবং কত রকম ভঙ্গি সহকারে নিজ নন্দনের গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। শ্রীহরি সমস্ত শুনিয়া পেচককে আশীর্ব্বাদ করিয়া লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করি।

পথে যাইতে যাইতে নারায়ণ লক্ষ্মীকে কহিলেন, "জগতে নিজ নন্দনকে যেমন সুন্দর দেখায়, এমন সুন্দর আর ত্রিভুবনে কিছুই নাই। নিজ পুত্র যতই কদাকার হউক না কেন, মাতা পিতার নিকট অতি সুন্দর দেখায়।" অতএব নিজ অপত্যই পরম সুন্দর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

মৃত্যুর জন্ম।

লেখিকা,—শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

বিশ্ব সৃষ্টি সমাপণ, মহা ব্যোমে বিশ্ব বিরাজিত,
অনন্ত অম্বর তলে অনন্ত নীলিমা শোভাস্তৃত।
কোটী গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র মণ্ডল—
অবিরাম ভ্রাম্যমান, পূর্ণ বেগে ব্যাপী নভোস্তল।
নিজ নিজ গতি সীমা মাঝে ঘুর্ণ্যমান, অবিরত—
সংখ্যাহীন জীব দলে জীবধাত্রী ধরণী পূর্ণিত।
কত শত লক্ষ জাতি জীব অগণন বাসস্থান—
স্রোতস্বতী, সরোবর, মহীধর, সাগর মহান্।
কলস্বনা নির্ঝরিণী, বন উপবন, স্নিগ্ধ শোভা—
তরুলতা, পুষ্পগুল্ম পশুপাখী শ্যাম শষ্প বিভা;
হরিৎ পাটল ধূম্র শুক্ল আর রক্ত নীল পীত—
সপ্তবর্ণে, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সমন্বিত।
রাত্রি দিন সন্ধ্যা ঊষা সিত কৃষ্ণ পক্ষ সমন্বয়ে—
বিপুল বৈচিত্রময়, নিরূপম সৌন্দর্য্য নিচয়ে
অবিরত অবিশ্রাম, পরিপূর্ণ গতিবেগে চলে—
প্রাণের প্রবাহ ধারা অহরহ কল কোলাহলে।
ক্রমে পূর্ণ পরি পুষ্টি শেষ হয়ে যায় সে কখন—
পরিপূর্ণ গতি, বেগ ক্রমে মৃদু, মৃদু মৃদু তম—
হয়ে আসি চায় মিলাইতে সুগভীর ধীর কোন্

পূর্ণ শান্ত অফুরন্ত, স্থিরতার মাঝ খানে যেন,
প্রগাঢ় কোয়াসাচ্ছন্ন পরিম্লান ছায়ার মতন,
অবসাদ ভার নামে অকস্মাৎ অপূর্ব্ব উদ্গম।
বহু দীর্ঘকাল ব্যাপি' অবিশ্রাম সদা সঞ্চালনে—
ক্ষয়প্রাপ্ত প্রাণ, শক্তি ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্রমে ক্রমে,
কর্ম্মের উদ্যম আসে নিজহতে মিলায়ে অলসে,
উৎসাহ-চাঞ্চল্যধারা পূর্ণ বিকাশে পরিশেষে—
স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলে', হারাইয়ে ফেলে আপনারে,
অবসাদ সমাচ্ছন্ন পরিপূর্ণ শিথিলতাভারে ;
গাঢ়, কাল ছায়া নামে ধীরে অতি ধীরে ধীরে—
পরিচিতা পৃথিবীর স্বতঃস্ফূর্ত্তি আলোকের পরে ;
উচ্চ সপ্তকের সুরে তন্ত্রী বাঁধা বীণার ঝঙ্কার
মুদারায় নেমে শেষে ক্রমে আসে খাদে উদারার
জীবনের অশ্রান্ত স্পন্দন তাল ধীরে আসে থেমে,
জড়তার বক্ষ পুটে মিলাইতে চায় ক্রমে ক্রমে ;
অতীতের সুখ-স্মৃতি রাশি সেও গাঢ় ভস্মাবৃত ;
নিদ্রাময় অনুভূতি শ্রান্তিভার সুধু ঘনীভূত,
পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ দীর্ণ পুরাতন দশদিকে—
শান্তি শূন্য সুখহীন অতৃপ্তি চাহিয়া অনিমিখে।
অন্তরে অন্তস্তলে সূক্ষ্ম কোন্ ইচ্ছা সুপ্রবল !
লক্ষ হস্ত প্রসারিয়া চাহিতেছে কি এক সম্বল ;
"প্রয়োজন, প্রয়োজন, আছে মোর আরো প্রয়োজন
নূতনত্ব চাই পুনঃ—প্রকৃতির অশ্রান্ত ক্রন্দন।
কে শুনিবে, সে ক্রন্দন, প্রার্থনা কে পুরাইবে তা'র !
কর্ম্মশেষে এক্ষণে যে বিশ্রামের সুখ নিদ্রাভার,
সৃষ্টি শেষে সৃষ্টিকর্ত্তা মানস সরস শতদলে—
যোগ নিদ্রা মগ্ন সুখে আপনার সাফল্যের ফলে।
কে তবে শুনিবে আর অন্তরের যাতনা রোদন,
মিটাবে প্রার্থনা কেবা ? পরিপূর্ণ হ'বে প্রয়োজন !
অনিন্দিত মহাসত্য ধ্রুবস্থির জাগ্রত মহান্

আপনার ভাবে ভোলা মহাকাল মঙ্গল নিদান।
পরম কল্যাণময় মহাশিব মঙ্গল কারণ
ভূমানন্দ রসে ভোর আছিলেন আনন্দ মগন,
আপন বিস্মৃতভাবে বিহ্বল বিভোর মহেশ্বর—
মহানন্দ ধ্যানে মগ্ন, প্রকৃতির ক্রন্দন কাতর
লুটা'য়ে পড়িল তাঁরি দুঃখ হ'র চরণের তলে।
পরমকরুণাসিন্ধু উদ্বেল অধীরউঠে দুলে,
জীবক্লেশ নিবারণে অফুরন্ত করুণা ক্ষরিত,
মহাসত্য জ্ঞান ময় শিব নেত্র হ'ল উন্মীলিত,
"ওরে ভ্রান্ত মূঢ় জীব ! অজ্ঞান অবোধ সংজ্ঞাহারা—
উন্মেষে পোষনে সুধু পূর্ণতৃপ্তি পেতে চাস্ তোরা !
অনন্তেরি রূপ সান্ত, সীমা যে অসীমে চিরলীন,
সসীম জীবন ধারে তৃপ্তি কোথা পাবি বোধহীন ?
নব নব উন্মেষনা চাই পুনঃ নূতন বর্দ্ধন,
চির পুরাতনের সে অনন্ত নবীন উন্মেষন ;
চির পুরাতন ছন্দে নূতনের মাঝে পুরাতন
মিলা'য়ে মিশা'য়ে গিয়ে হবে পুনঃ সম্পূর্ণ নূতন,
নবোন্মেষ সুধাছন্দে বিকসিত পূর্ণ পরিণত।
নবীন মধুর রূপে চির পুরাতন আবির্ভূত,
না হ'লে কোথায় পাবি সুগভীর পরিতৃপ্তি মধু ;
অমানিশা তমোলীন্ না হলে কি পূর্ণ হয় বিধু ?
অবিরত সঞ্চালিত যন্ত্র চলে' চলে' অবিশ্রাম
নিঃশেষিত শক্তি পুনঃ সঞ্চয়ার্থে চাহিবে বিরাম।
পরিপূর্ণ শান্ত স্থির স্তব্ধতায় সম্পূর্ণ বিশ্রামে—
নব শক্তি লাভ করি চলে পুনঃ নবীন উদ্যমে।
সর্ব্ব শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত কালের সংঘর্ষে অবিরাম,
ওরে মোহ ভ্রান্তজীব, এ বিশ্বের এইযে বিধান ;
চির অবিনাশী আত্মা অনশ্বর অনন্ত অক্ষয়
কালের প্রবাহ মাঝে নব নব ভাবোন্মেষ চায় ;
চির পুরাতন সে যে সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধরে,

পুনঃ প্রকাশের ইচ্ছা সুপ্রবল তাই যে অন্তরে,
উন্মেষ বিকাশে শুধু তাই তার মিটেনা তিয়াস—
পরিতৃপ্তি হীন তাই স্বভাবের স্বরূপ প্রকাশ ;
অখণ্ড অতৃপ্তি নিয়ে নিরন্তর অশ্রান্ত ক্রন্দন,
দু'বাহু বাড়ায়ে যাচে যাহা তা'র আছে প্রয়োজন
গভীর বিষাদ রাশি ঘুমরে অন্তরে গুরুভার,
পরিপূর্ণ পরিণতি যাচি' উঠে মহা হাহাকার।
ভয় নাই, ভয় নাই, হ'বে হ'বে প্রার্থনা পূরণ,
মহাক্লেশ বিমর্দ্দিত ওরে পথভ্রান্ত জীবগণ!
করুণার মহাসিন্ধু উছলিল মহাকরুণায়
ঝরিল নয়ন ধার শিবনেত্রে স্থির জ্যোতিশ্চয়,
মূর্ত্তিধরে' প্রকাশিল সে নয়ন করুণাশ্রুধার—
পরম মঙ্গল হেতু, সত্যশিব ভীষণ সুন্দর—
পরম কল্যাণময় সুমহান্ মঙ্গল কারণ—
—মৃত্যু হ'ল আবির্ভূত অমৃত স্বরূপ চিরন্তন।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু প্রকৃত প্রেম ও ভক্তির উচ্ছ্বাস সংসার ত্যাগ না করিলে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ রক্ষা করা কঠিন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশ সাধারণ মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেক স্থলে প্রকৃত বৈরাগ্য অভাবে কামাদির-বশবর্ত্তী হইয়া সংসার পরিত্যাগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশে গ্লানি উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রকৃতির ইচ্ছায় সেই গ্লানির আতিশয্য নিবারণের প্রয়োজন হইল। ক্রিয়া কলাপ সংযুক্ত বেদ সম্মত তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম মহাদ্রুম দৃঢ় মৃত্তিকার উপর সংস্থাপিত। বৈদিক ক্রিয়া বর্জ্জিত, শ্রীচৈতন্য ধর্ম্ম রূপ প্রবল পবনে

তাহার শাখা প্রশাখা ছিন্ন হইয়াছিল মাত্র, সেই মহা বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড বিচলিত হয় নাই। তাহাকে শাখা প্রশাখা যুক্ত করা অনায়াস সাধ্য। কিন্তু ভগবানের নাম সংকীর্ত্তনই মহামন্ত্র, মুক্তির সহজ উপায়, এই সহজ পথ হইতে সাধারণকে জটিল বহু আড়ম্বর যুক্ত, ব্রাহ্মণাধীন তান্ত্রিক ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপের পক্ষপাতী করা কঠিন। এ কারণে প্রকৃতির ইচ্ছায় বঙ্গীয় ১১২৭ সালে সাধক কবি মহাত্মা রাম প্রসাদ সেন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তন্ত্রোক্ত মাতৃ ভাবের উপাসনায় নাম ও ধ্যান একমাত্র মুক্তির উপায়, সঙ্গীত উপাসনার অঙ্গ, এই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রসূত ধর্ম্মপ্লাবিত স্থান সমূহে সুললিত সঙ্গীত ছড়াইতে লাগিলেন। তিনি গাহিলেন, যে ব্যক্তি মন প্রাণে কালীর নাম ও ধ্যানে সক্ষম তাঁহার তীর্থ পর্য্যটন ক্রিয়া কলাপ কিছুই নাই। তিনি গাহিলেন,—

"গয়ায় করে পিণ্ডদান, পিতৃ ঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি।"

নূতন ভাবে নূতন সুরে উপাসনার অঙ্গ সঙ্গীত সকল রচনা ও প্রচার করিয়া মাতৃভাবের উপাসনা বিস্তার করিতে লাগিলেন। তিনি মানব চরিত্রের সহিত সঙ্গীত সকলের সামঞ্জস্য রাখিয়া, সকল বস্তুতে জগদম্বার অস্তিত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি কলুর চোক ঢাকা বলদ দেখিয়া গাহিলেন,—

'মা আমায় আর ঘুরাবে কত,
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত।"

তিনি ঘুড়ী উড়াইতে দেখিয়া গাহিলেন,—

"মা আমার উড়াচ্ছেন ঘুড়ী সংসার বাজারের মাঝে।"

তিনি জেলেকে জাল ফেলাইতে দেখিয়া গাহিলেন,—

"জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে, ভবে আমার কি হবে মা।"

তিনি কৃষককে হল চালনা করিতে দেখিয়া গাহিলেন,—

"মন তুমি কৃষি কাজ জাননা,—
এমন মানব জমী রইল পতিত, আবাদ কল্লে ফলতো সোণা।"

প্রেম ও ভক্তি মুক্তির সোপান হইলেও চিত্ত শুদ্ধি ভিন্ন প্রেম ও ভক্তি স্থায়ী ও সফল হয় না। সেই জন্য তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া সকলের প্রয়োজন। তিনি শব সাধনা প্রভৃতি সঙ্গীতে চিত্তশুদ্ধির উপায় সকল শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবের উপাসনার পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল। ধনীর মন্দিরে,

গৃহস্থের বৈঠকে, কৃষকের শস্যক্ষেত্রে, নির্দ্ধনের পর্ণশালায়, রাখালের গোষ্ঠে, সংসারের ভাবে ভরা ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ রামপ্রসাদের সঙ্গীত সকল শ্রুত হইতে লাগিল। শিক্ষিত সমাজে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া রামপ্রসাদের বাণী উঠিতে লাগিল। প্রায় ৫০ বৎসরের অধিক কাল শ্রীচৈতন্য উপদিষ্ট ধর্ম্মের ও তান্ত্রিক মাতৃভাবের উপাসনার বিরোধ চলিতে লাগিল। উভয় পথের গ্লানি নিবারণের জন্য শাক্ত ও বৈষ্ণব কবিকুল জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ১১৯৯ সালে সাধক কবি রাম প্রসাদ সেন পর লোক গমন করেন। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া সংসার বিরাগী, সন্ন্যাসীবেশী সাধক কমলাকান্ত বীণা হস্তে বিবিধ তাল মান শব্দযুক্ত অপূর্ব্ব সঙ্গীত সকলে কেবল ভক্তি ও প্রেম ভরা মাতৃ-ভাবের উপাসনা মার্গে নৃত্য করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুমধুর গলা লোকালয় প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"কালীনাম তীক্ষ্ণ অস্ত্রে মায়ার লাগাম কেটে ফেল।"
"কালীনাম সত্বর হও, নামের গুণে তরে যাবে।"
ত্যজিয়া বসন বিভূতি ভূষণ, মাথায় লও কালী নামে ডালি।"

নব জলধর বরণীর ভুবন মোহিনী রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি গাহিলেন,—

"একি পরমাদ্ভুত পদনখ চন্দ্রে হৃদয় কমল পরকাশে।"

দ্বৈতভাব পরিত্যাগ করিয়া সুমধুর কণ্ঠে চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে লাগিলেন,—

"জাননারে মন পরম কারণ শ্যামাত শুধু মেয়ে নয়,
মেঘের বরণ করিয়া ধারণ, কখন কখন, পুরুষ হয়।"

লোক বিমোহনে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া মহাপুরুষ সাধক কমলাকান্ত স্থান বিচার; কাল বিচার, অবস্থা বিচার না করিয়া উর্ব্বর ও উদার হৃদয়ে কালীনাম স্থাপন করিতে লাগিলেন। লোক শিক্ষা ও ধর্ম্মস্থাপন তাঁহার জন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য। সেই জন্য মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়া ছিলেন, তিনি লোক বিচার, অবস্থা বিচার, না করিয়া সকল লোকের সহিত মিশ্রিত হইলেন।

মহারাজা তেজ-চন্দ্র বাহাদুরের বর্দ্ধমান গমনের জন্য রথাদি সজ্জিত হইল। অশ্বযান, নর যান, গো যান, সকল গমনার্থ প্রস্তুত হইতেছে। দাস দাসীগণ সজ্জিত হইয়া ব্যস্ত সহকারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; মহারাজা ইতি পূর্ব্বেই সাধককে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য তাঁহার নিকট জনৈক নিজ অমাত্য পাঠাইয়া ছিলেন। সাধক এক্ষণে অম্বিকার সমুদয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া

বিশুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ধনাঢ্য শিষ্যের সহিত বর্দ্ধমান গমনোদ্যত মহারাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অমাত্য, ধনাঢ্য ও কৃতবিদ্য প্রজাগণ পরিবৃত মহারাজা বাহাদুর সুবলাঙ্ক প্রতাপ চাঁদের সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনার সঙ্গীত শ্রবণের পূর্ব্বে আপনার দর্শন মাত্রেই আমার মন আপনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কল্য রাত্রে নিদ্রাকর্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে মন হইতে অপসারিত করিতে পারি নাই,—মন হইতে স্থানান্তরিত করিতে প্রবৃত্তি ও জন্মে নাই। জগদম্বাই জানেন, আপনার মূর্ত্তিতে, আপনার বাক্যে, আপনার কণ্ঠস্বরে, কি মোহিনী শক্তি আছে, অদ্যাবধি আমি আপনাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিব, প্রতিদিন আপনার চরণ দর্শন করিয়া সুখী হইব, প্রার্থনা করি,—আপনি আমার বাসনা পূর্ণ করিবেন। সাধক কহিলেন, "মহারাজ! সারবান বীজ সকল অনভিজ্ঞ কৃষক কর্ত্তৃক উর্ব্বর ক্ষেত্রে বিপর্য্যস্ত ভাবে রোপিত হইলেও ক্ষেত্রগুণে ফলবান হয়। আমার কর্কশ কণ্ঠ উচ্চারিত শক্তি-সম্পন্ন কালীনাম বীজ আপনার উদার হৃদয়ে পতিত হইয়া কার্য্যকর হইয়াছে। মহারাজা বাহাদুর পার্শ্ববর্ত্তী বিশুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"এটী কে! সাধক ওরগ্রামের ভাঙ্গার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলে সমাগত সকলের চক্ষু বিশুর মুখমণ্ডলের দিকে পতিত হইল ও সকলে অতিশয় কৌতুহলের সহিত সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। সাধক কহিলেন,—"বিশুর ভক্তি, বিশ্বাস ও বৈরাগ্য অচল, এখন আত্মগ্লানি দ্বারা ইহার পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষয় হইতেছে।" মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আমি দেখিতেছি, আপনার সঙ্গীতের কি এক মোহিনী শক্তি আছে। এ ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মের বিস্তর সুকৃতি ছিল, সেই জন্য আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে ও আপনার অনুচর হইয়াছে।" মহারাজা বাহাদুরের কথা অবসান হইবামাত্র বিশু গদ গদ কণ্ঠে কহিল, "রাজা বাহাদুর! আমি ডাকাত, আমি খুনরা, তোমার রাজত্বে বাস করে অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ করেছি, তুমি পাপীদের দণ্ডের কর্ত্তা, আমাকে শাস্তি দাও,। মহারাজা বাহাদুর বিশুর কথা শুনিয়া কহিলেন, "বিশু! তুমি স্থির হও, আমি দেখিতেছি,—তোমার গুরুতর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, কৃপাময়ীর কৃপা পাইবার জন্য তোমার ব্যাকুলতা আসিয়াছে। তুমি ভক্তির ভিখারী হইয়াছ,—ভক্তিমান সন্ন্যাসী গুরুতর পাপ করিলেও তাহার শাস্তি দিবার শক্তি রাজার নাই। রাজা যাহার কৃপাদৃষ্টির জন্য লালায়িত, ভক্ত সেই ভগবানের কিঙ্কর।" সাধককে নির্দ্দেশ করিয়া রাজা বাহাদুর কহিলেন, "তুমি এই যে,—ব্যক্তির আশ্রয় লইয়াছ,—ইনিই তোমার পাপ

ক্ষয়ের উপায় বলিয়া দিবেন। তুমি সত্বর দিব্য চক্ষু লাভ করিবে। চক্ষুষ্মান তেজস্বী ব্যক্তি যেমন দর্পের সহিত রাজপথে গমন করে, তেমনি তুমি মোক্ষের পথে অগ্রসর হইবে। অন্ধের ন্যায় আমাদের পদস্খলন হইবে। চারি দিক অন্ধকারময় দেখিয়া আমরা সংসার মধ্যে জটিল পথে ভ্রমণ করিব।" ইহা কহিয়া মহারাজা বাহাদুর অমাত্যগণের সহিত সাধক ও শিশুকে সঙ্গে লইয়া বৰ্দ্ধমান যাত্রা করিলেন।

বৰ্দ্ধমান অতি প্রাচীন নগর। এই নগর কোন সময়ে কাহাদ্বারা গঠিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। অনুমান হয়,—মুসলমান-দিগের রাজত্বের পূর্ব্বে ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। দিল্লির সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ইতিহাসে বৰ্দ্ধমানের নামোল্লেখ পাওয়া যায়,—মেহেরুন্নিসা নাম্নী পরম রূপবতী তাতার দেশীয় একটি কুমারী তাহার পিতার সহিত দিল্লিতে আগমন করেন। ঐ কুমারীর পিতা আকবর বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইয়া দিল্লিতে বাস করেন। যুবক জাহাঙ্গীর ঐ কন্যার রূপ মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় নিজ পিতা আকবরের নিকট প্রকাশ করেন। কিন্তু সের আফ্‌গান নামক তাতার দেশীয় এক যুবকের সহিত সেই কুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ তৎপূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। সেই জন্য ন্যায়দর্শী আকবর পুত্রের প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া সের আফ্‌গানের সহিত সেই কুমারীর বিবাহ দিয়া সের আফ্‌গান্‌কে সস্ত্রীকে বঙ্গ দেশে পাঠাইয়া দেন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইয়া সের আফ্‌গান্‌কে বৰ্দ্ধমানে হত্যা করান। এই মেহেরুন্‌নেসা জাহাঙ্গীরের প্রধান মহিষী হইয়া ছিলেন। এই সের আফ্‌গানের কবর বৰ্দ্ধমানে আছে। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে ইতিহাসে বৰ্দ্ধমানের নাম ও বৰ্দ্ধমান রাজবংশের প্রভুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে বাঙ্গলায় তৎকালিক নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ একদা বৰ্দ্ধমানের নিকট বর্গীগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বিপন্ন হন। আলিবর্দ্দিখাঁর সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক আলিবর্দ্দিখাঁর বহু অনুনয়েও যুদ্ধে নিরুদ্যম হইলে তিনি বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন। কথিত আছে বৰ্দ্ধমানে বৰ্দ্ধমান রাজার দেওয়ান বাহাদুর ঐ সন্ধির প্রস্তাবে দূতের কার্য্য করিয়া ছিলেন। বর্গীসেনাপতি সেই প্রস্তাবে বিপুল অর্থসহ বৰ্দ্ধমান রাজের সমুদয় হস্তি উপহার স্বরূপ চাহিয়া ছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ তাহাতে সম্মত না হইয়া বৰ্দ্ধমানরাজের সাহায্যে হস্তি পৃষ্ঠে অতিকষ্টে পলায়ন পূর্ব্বক কাটুয়ায়

আসিয়া নিরাপদ হন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয়, বৰ্দ্ধমান রাজাদিগের হস্তি বিস্তর ছিল ও তাঁহাদের মুর্শিদাবাদ রাজদরবারে সম্মান ও কর্তৃত্বও বিস্তর ছিল। ইতিহাসে আরও দেখা যায়, বর্গীগণ মুরশিদাবাদে জগৎশেঠের বাটীর ন্যায় বৰ্দ্ধমান কোষাগার লুণ্ঠনের চেষ্টা করে। তাহারা পুর প্রবেশ পূর্ব্বক জনৈক রমণীর অঙ্গের অলঙ্কার মোচনের চেষ্টা করিলে বীরাঙ্গনা এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা একটী সেনা পতির প্রাণ বিনাশ করেন। বাণিজ্যাদির সুবিধা বিষয়ে বৰ্দ্ধমানের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। দিল্লির বাদসাহ সেরশা গঠিত ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অবস্থিত বিপুল ধর্ম্ম অনেক নগরকে আলিঙ্গন করিয়া দিল্লি পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। বৰ্দ্ধমান এই রাজপথ মধ্যে অবস্থিত ও দামোদর নদীর তীরবর্ত্তী; দামোদর ছোট নাগপুরের পর্ব্বত সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। দামোদর বর্ষার সময় অতি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। কখন ৩।৪ ক্রোশ উভয় কূল প্লাবিত করিয়া অনেক লোকালয় ও জীব কুল গ্রাস পূর্ব্বক ভীষণ বদনে প্রবাহিত হন। সম্প্রতি দামোদরের জল নালী হুগলী জেলার আমতা প্রভৃতি স্থানে অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়াছে। জল প্রবাহ সমুদয় গ্রাম প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়। অত্রস্থ অধিবাসীগণ স্তূপাকার মৃত্তিকার উপর উচ্চ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। বর্ষাকালে আবাস গৃহ দ্বীপের ন্যায় বোধ হয়। এই দামোদর নদী বৰ্দ্ধমানের পণ্য বহনের সাহায্য করিয়া বৰ্দ্ধমানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এখন রেল পথ দ্বারা প্রায় সমুদয় পণ্য বহন কার্য্য সম্পন্ন হয়। বৰ্দ্ধমান রাজবংশও অতি পুরাতন। কোন কোন, বৃদ্ধ লোকের মুখে শোনা যায়, বাবুরাম নামক জনৈক ক্ষত্রিয় পঞ্জাব হইতে বাণিজ্য উদ্দেশে বৰ্দ্ধমানে আসেন। তিনি ক্রমে ধনশালী ও ক্ষমতাপন্ন হন। মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রাজা বীরসিংহের নাম উল্লেখ আছে। বীরসিংহের বংশ লোপ হইলে বাবুরাম রাজোপাধি ধারণ করেন ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হন, ইনিই বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমান রাজ-বংশের আদি পুরুষ। বৰ্দ্ধমান রাজবংশের কীর্ত্তি বিস্তর। হুগলী, বৰ্দ্ধমান ও মেদিনীপুর প্রভৃতি মহকুমায় অনেক বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা বৰ্দ্ধমান রাজবংশের অনুকম্পাতেই হইয়াছিল। মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র ও মহারাজা তেজ চন্দ্র বাহাদুরের কীর্ত্তি স্বরূপ ভূম্যাদির দান পত্র এই প্রদেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ গৃহে দেখা যায়। মহারাজা মহাতাপ চাঁদ বাহাদুরও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ ও সাধক কমলা কান্তের গীতাবলি সংগ্রহ

করিয়া মুদ্রিত করান। মহারাজ আপতাপ চাঁদ বর্দ্ধমানের উন্নতি কল্পে উচ্চ বিদ্যালয়, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে তাঁহার অল্প জীবন কাল মধ্যে সধারণের প্রিয় হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভূপতি বিজয়চাঁদ বাহাদুর অশেষ গুণালঙ্কৃত, বিদ্বান কবি, গুণগ্রাহী। তিনি ভারত সম্রাট কর্ত্তৃক বিবিধ রূপে সম্মানিত হইয়া বংশ উজ্জল করিতেছেন।

সাধক বর্দ্ধমানে আগমন পূর্ব্বক মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ও তাঁহার ভক্তিমান পুত্র প্রতাপচাঁদ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা বাহাদুর ও যুবরাজ তাহাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করেন ও সময়ে সময়ে তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ ও তাঁহার সহিত মুখালাপে সুখী হন। অম্বিকা কাল্‌নার ন্যায় বর্দ্ধমানেও তিনি কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন সকলের পরিচিত ও পূজিত হইতে লাগিলেন। সাধক গুণবান, তাঁহার অভিমান নাই, অহঙ্কার নাই, স্বার্থ নাই, সকলের দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। সাধারণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় গ্রহণ করিল। গুণগ্রাহী লোক তাঁহার গুণে আকৃষ্ট। ভক্তিমান তাঁহার ভক্তি পরাকাষ্ঠায় অনুরক্ত। দাম্ভিক অহঙ্কারী, ধনমদমত্তগণ মহারাজাসহ তাঁহার সম্মানের পক্ষপাতী। মহারাজা বাহাদুর জানিতেন, ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ, সম্মান, যশ, গুণকীর্ত্তন প্রভৃতি সংসারের রস সকল সংসারীর পক্ষে সরস ও সুখ সেব্য হইলেও মহাত্মাদিগের অন্তরে পাষাণ নিপতিত বারি ধারার ন্যায় নিষ্ফল হয়। ঐশ্বরিক প্রেম ভিন্ন আর কোন বস্তুই তাঁহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। প্রেমাসক্তি ভিন্ন আর কোন আসক্তিই তাঁহাদের মনকে বদ্ধ রাখিতে পারে না। সেই জন্য তিনি সাধক কে অধিকাংশ সময় বর্দ্ধমানে রাখিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সাধকের মুখে শুনিয়া ছিলেন, তাঁহার গর্ভধারিণীর আদেশ আছে, তিনি দেশত্যাগ করিবেন না। তিনি দেশে থাকিয়া জগদম্বার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবেন। রাজা বাহাদুর সাধক কে বর্দ্ধমানে রাখিবার এই এক সুন্দর উপায় অবধারণ করিয়া বর্দ্ধমানে কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাধক তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া সত্বর কালী বাড়ী নির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন, অঙ্গীকার করিলেন।

সাধক বিশুকে কহিলেন, "বিশু! মহারাজা বাহাদুর বর্দ্ধমানে মায়ের অভয় বরদা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। তুমি বর্দ্ধমানের প্রায় সকল স্থানই বন্যক রূপে অবগত আছ, কোন্ স্থানে তোমার অবস্থানের অভিরুচি হয়?"

বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমি ভাব্‌ছি, যদি আমার মা কালী মানুষ গুলোকে একেবারেই সৃষ্টি না কর্ত্তেন, তা হলে তার কি ক্ষতি হত। মা, আমার এই সব গাছ পালা, পশু পাখী, নদী পাহাড় দিন রাত, সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্টি করে, রাজার মত পা হাত ছড়িয়ে বসে থাক্‌তেন তা হলে মাকে আমার কোন জ্বালাই সইতে হত না।"

ক্রমশঃ

শ্যামা মা।

(অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বিষয়ক ভক্তিমূলক গীতি নাট্য।)

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—সুধা সমুদ্র।

(স্বর্গ কমল কোরক ভেদ করিয়া, গাহিতে গাহিতে "আনন্দ ভৈরবীর" উত্থান।)

(দিব্যালোক প্রকাশ।)

(আমি) জাগাব ঘুমান ছবি, (আমি) আঁধারে ফুটাব আলো ;
(আমি) মরুতে ভাসাব অপার সাগর, খেলিবে তুফান ভাল ॥
বিষাদের হাহুতাশ মুছাইয়ে দিব সুখে,—
সুখের মিলন হাসি জুড়াইব মুখে মুখে,
(আমি) গরলে গড়িব অমৃতের ধারা, প্রাণের ঘুচাব কালো ॥
বহাইব' হিমানিল, মথিয়া জলদ নলে,
স্বরগ সুষমা ভাতি ফুটাইব রসাতলে।
(আমি) পাষাণে রচিব কুসুম মালিকা ছড়াবে সুবাস জাল ॥

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বন।

("কর্ম্মফল" উপবিষ্ট ও খাতা লিখিতে ব্যস্ত। পরে লেখা শেষ করতঃ খাতা বন্ধন পূর্ব্বক কপালে যথাক্রমে খাতা, কলম ও দোয়াত ঠেকাইয়া মাটিতে রাখিয়া, কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া)

কর্ম্ম। বাবা! এই যে ব্রহ্মাণ্ডরূপী আজগুবী ভ্যাঁটাটী দেখ্‌ছ—এর ভেতরে

রকম ফেরে তিন থাকের পাপী আছে। যথা—জীব, জন্তু, আর জানোয়ার। সত্যি কথা ব'লতে কি, ছোট বড় এক কোটী পাপ কর্ম্ম কোল্লে একটী জীবের জন্ম হয়,—ধ'রে নাও—এই মনিষ্যি,—এই মনিষ্যি জীবেদের যেমন দুঃখুও আছে, তেম্‌নি সুখও আছে। যেমন খাটুনীও আছে, তেমনি জিরেনও আছে. মোটের ওপোর এই আট পোহরে দিন রাতটার মধ্যে, এই মনিষ্যি জীবেদের একটু হাত পা ছড়িয়ে আড় খাবারও সময় মেলে। সুতরাং এনারা হ'লেন উত্তম পাপী।

হ্যা দেখ! এই মনিষ্যি জীবেদের চেয়ে তিন গুণ পাপ কর্ম্ম কল্লে অর্থাৎ কিনা আমার এই পাপড়ার হিসেবে তিনটী কোটী মাত্তর পাপ কর্ম্ম ক'ল্লে—তবে একটী জন্তুর জন্ম হয়। এই ধর—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দির, চন্দর, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, আগুন,—ওর নাম কি দুর্গা, কালী, শেতলা, ষষ্ঠী, মনসা, মাণিক, মাকাল, ঘেঁটু, কচু, ঘেঁচু, অশথ, গাছ, ঘেনড়ো পাথর, মাটির ঢিপি, ইত্যাদি ইত্যাদি সব জন্তু—বাবা সব জন্তু। এঁরা গুন্‌তিতে হোলেন তেত্রিশটী কোটী। এঁদের রাশ নামটী কি জান? দেবতা,—দেবতা। সে কেমন? (কর যোড়ে) "ঠাকুর গো! আমার পরিবারটী বড় মুখরা, তাকে একটু মধুমুখী কর। ঠাকুর গো—আমার সোয়ামী বড় বেরগণা, তাঁকে একটু বাগে আনিয়ে দাও। ঠাকুর গো—দুঃখের কথা বলব কি আমার শালার চাকূরী নেই, তাকে একটী ভাল রকমের দাসত্ব জুটিয়ে দাও, ঠাকুর গো—এই শাশুড়ী টেঁকলে আমার গতি মুক্তি নেই, তাঁকে দীর্ঘজীবী কোরে দাও। ঠাকুর গো—আমার জ্ঞাতিরা সব উচ্ছোন্নোয় যাক্—আর ও মহাশয়ের ষোলো আনা হিসেটা যেন আমাতে এসে অর্শায়। ঠাকুর গো—দেনার জ্বালায় অস্থির হ'য়েছি—জুয়াচুরির বিচারটা ক'রে দাও। সে কেমন? যথা—"তুমি যে পার কর, যার ধারি তার মরণ কর, যে আমার আদ্‌লো মরেন, সে যেন দিয়ে মরে; আর আমি যার ধারি, সে যেন আগে মরে। ঠাকুর গো—আমার মাংজামাইকে সব আমাট ক'রে দাও। ঠাকুর গো—আমার দোজপক্ষের ছেলেরা যেন দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাকে, আর প্রথম পক্ষের ব্যাটারা যেন সব মরে যায়; কিন্তু ঠাকুর—আমার এই মুখে আগুন দেবার সময় তারা যেন সব "বাবা, বাবা" ব'লে ছুটে আসে। ঠাকুর

গো—আমার সোয়ের বোয়ের বোকুল ফুলের বোন্‌পো বোয়ের নাতনের বাগানের কাঁচামিঠে আম গুলো সব চোরে চুরি কোরে নিয়ে গেছে, চোরটার হাত দুটো ঠুঁটো কোরে দিও। ঠাকুর গো—দেবতার দেবত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব, গুরুর গুরুত্ব, আর এই বস্তা তস্য সব্বব, যেন অকাতরে পাকা কলাটীর মত গোঁৎ কোরে গিলে ফেল্‌তে পারি, দোহাই ঠাঁকুর! যেন বুকে না বাঁধে।

তার পর মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, অতিবিষ্টি, অনাবিষ্টি, সিঁদুর পড়া, তেল পড়া, সোরষে পড়া, ধূলো পড়া, ভাতে পোড়া; কচুপোড়া, ওর নাম কি ইজরে কাটা, আর এই গাড়াল কাটার তো কথাই নেই। তাছাড়া আবার ডিগ্‌রে ছোড়ারা বলে কিনা,—"কেলোর দোতের ঘন কালি, ভুলোর দোতে আয়,—আর ঐ ভুলোদোতের পাৎলা কালি, কেলোর দোতে যা।" ইত্যাদি ইত্যাদ লক্ষ লোকের লক্ষ রকমের আব্‌দার শুন্‌তে শুন্‌তে দেবতা জন্তুদের কাণ ঝালা পালা হ'য়ে গেল। অর্থাৎ এতে কোরে জন্তুদের একটু গাধার খাটুনি খাটিতে হয় বটে। তা হোলেও জন্তুদের শয়ান উত্থানের ব্যবস্থা আছে; জাগরণ নিদ্রার একটা ছুতো আছে। কাজেই এনারা হোলেন মধ্যম পাপী।

কিন্তু দুঃখের কথা বল্‌তে কি,—এই দেবতা জন্তুদের চেয়ে চারগুণ বেশী পাপ কর্ম্ম কল্লে অর্থাৎ ছোট্টই হোক, আর লণ্ডভণ্ড প্রকাণ্ড গোচেরই হোক; পাটকেল চুরিই হোক, আর পুকুর চুরিই হোক; ঘাস ছেড়াই হোক, আর তাল গাছ ফাড়াই হোক; মাকড় মারাই হোক, গুরু মারাই হোক, আর গোহত্যাই হোক—(অঙ্গুলির পর্ব্ব গুণিয়া) এই একে চন্দর, দুয়ে পক্ষর, তিনে নেত্তর, চেরে বেদ্দর, কোরে এমন দোয়াদশটী কোটী পাপ কর্ম্ম কোল্লে তবে আমার মত অধম পাপী কর্ম্মফলরূপী একটী প্রকাণ্ড জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, দোহাই ধর্ম্ম—দোহাই ধর্ম্ম—এ সম্বন্ধের এক পাপড়াও মিথ্যে নয়। খাঁটী সঁত্যি কথা—খাঁটী সত্যি কথা, যদি তা না হবে—তবে আমার ভাগ্যে এমন আটপোরে চাকুরি জুটবে কেন? হতভাগার কুষ্ঠিতে বিধাতা পুরুষ "জিরেন" বলে একটা কথাও লেখেনি। সেই নরকের কীট থেকে আর ব্রহ্মলোকের বিধেতা পুরুষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ কিনা আমার মহাপ্রভুর চার চৌদ্দ ছাপান্ন পুরুষের পাপ পুণ্যের কৈফিয়ৎ আটতে

আটতে আমার জীবনটা পাত হ'য়ে গেল। কি দুর্ভোগ বল দেখি — বাবা সাতে নেই. পাঁচে নেই, পাপে নেই, পুণ্যিকে নেই,—মোটের ওপোর এ চাঁদে আমাবস্তেই নেই—তা ব'লে কি বাবা একটু ফিরেনও নেই। জানিনে বাবা! পূর্ব্ব জন্মে কার হাওয়া আলোর দোরে কাঁটা দিয়েছিলুম। কার বাঙ্গ ধয়ে সাঁকো নাড়া দিয়েছিলুম। যে তারই ফলে এ জন্মে এই কর্ম্মফল শর্মা একটু হাওয়া খাবারও সময় পেলে না। বাবা! খাটতে খাটতে অন্ধকার দেখ্‌চি! এই পেল্লায় বেঙ্গাগুটার মধ্যে একতিল দাঁড়াবারও একটু জায়গা পেলুম না! যাক্‌ বাবা-- কোন কথায় দরকার নেই। হালফিল্‌ এই সাধক বাবাজীর কি চেস্ত নেস্ত হয় দেখা যাক। তা বুঝে মহাপ্রভুর সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করে নেওয়া যাবে।

বাবাজী বোধ হয়, এই দিকেই এসেছেন। একটু খুঁজে পেতে দেখি,— কোন্‌ বাগে ঘুরচে।

(খাতা তুলিয়া প্রস্থান।)

ইতি প্রথম দৃশ্য।

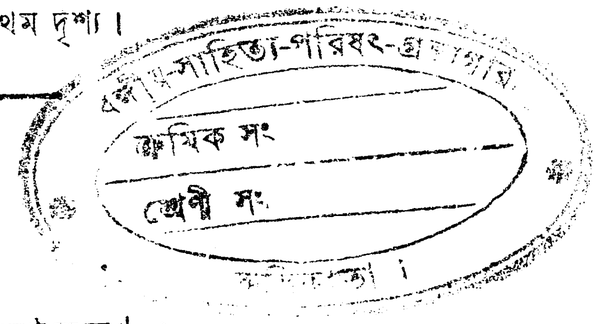

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সমালোচনা।

গঙ্গোদক মাহাত্ম্য।— শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সঙ্কলিত। ৺কাশী ধাম ব্রাহ্মণরক্ষা সভার আনুকূল্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত; মূল্য তিন আনা মাত্র।

দেবভাগবত, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ প্রভৃতি পুরাণাদি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে গঙ্গোদক মাহাত্ম্য বিষয়ের অবশ্য জ্ঞাতব্য শাস্ত্রীয় বচন ও তাহার মর্ম্মার্থ সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি সঙ্কলিত হইয়াছে; পাঠে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তি মাত্রেই শান্তি করিবেন।

বটকৃষ্ণ পালের এডওয়ার্ড্‌স্‌ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৵, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড নার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্‌।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রীতিমাখান

সুন্দর মুখখানি

কিসে হয় ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেছেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৵০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

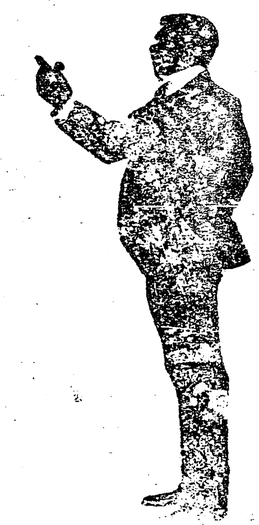

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী ব্যাধিতে-অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১৷০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ৷৵০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রী শক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রী যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

…শ, বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩০, [৪র্থ, সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯৭
মহাকবি কালীদাস	শ্রীমতী আশাদেবী (কবিতা)	১০২
বিমাতা উপন্যাস ...	...	১০৪
ভক্তের মান	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১১৮
বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ ...	...	১২২
সমালোচনা ...	...	১২৭

…ভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত

Phone 388 Barabazar. 17-11-23

…রক্ষ জারমলীন …

…মূল্য ৷৹, ডজন ৫৲, গ্রোস ৫০৲, পাইকারী দর স…

…গোভিন এণ্ড কোং, হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার

…পুর রোড ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

…gram:—GERMALINE. Telephone No. 1388

খানিকক্ষণ মস্তিক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা:
"ফিজীশিয়ান"

টেলিফোন নং:
২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

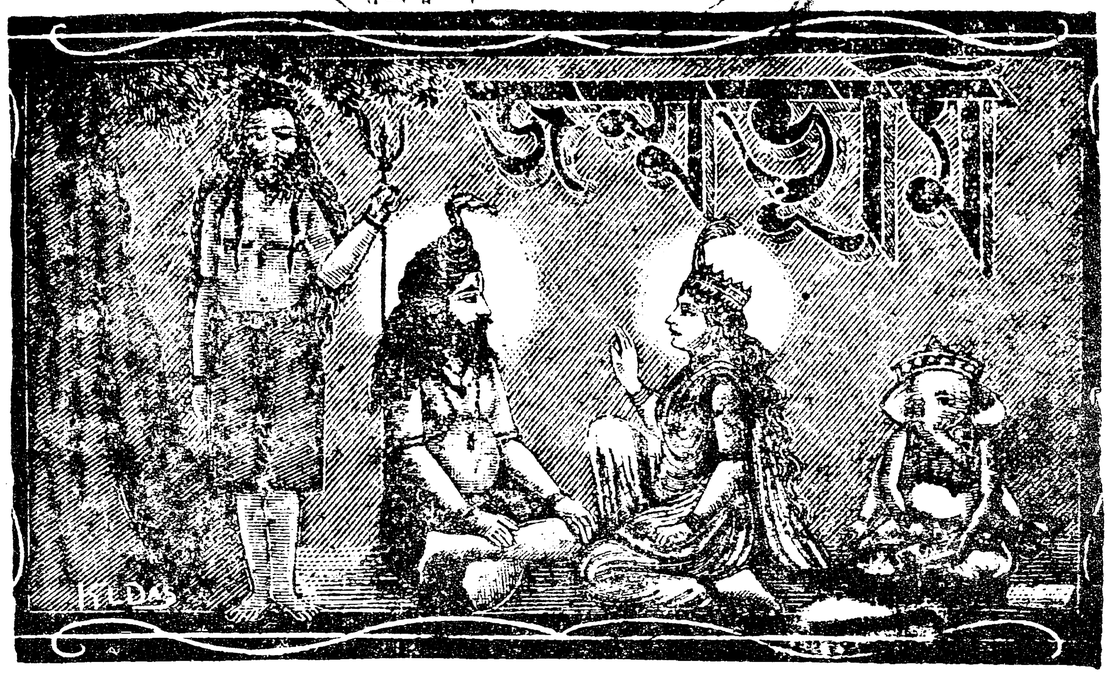

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩২শ, বর্ষ। | ১৩৩০ সাল, শ্রাবণ। | ৪র্থ, সংখ্যা।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মা আমার কখন কলি কলি পাতার দিকে চেয়ে থাক্‌তেন, কখন পাখীর স্বর শুন্‌তেন, কখন ফুলের হাসি দেখ্‌তেন, কখন চাঁদের আলোতে বসে চাঁদের হাসি দেখতেন। দেখুন,—মানুষের জন্ত তাঁকে বড় ঝঞ্ঝাট সইতে হচ্ছে। আমি সেদিন শুম্ভ, নিশুম্ভ, চণ্ড মুণ্ড আরও কত অসুরের কথা শোনালে বুঝুন দেখি মাকে কত করে তাদের নিপাত কর্ত্তে হয়ে ছিল, তাই আমি ভাব্‌ছি, মানুষ গুলোকে সৃষ্টি না কল্লেই কোন আপদ থাকতো না। আমি একটী অসুর, আমি মায়ের কাছে দিনরাত কাঁদ্‌ছি, আমাদের মত কত লোক আছে, তারাও মায়ের কাছে কাঁদ্‌ছে। দেখ্‌ছি মানুষের

জন্যে ভগবান্‌কে কত কাণ্ডই কর্ত্তে হয়েছে। অসংখ্য মানুষ সবাই তাঁর কাছে নালিশ কচ্ছে, একি কম ঝঞ্ঝাটের কথা। তাই ভাব্‌ছি, তাঁর মানুষ সৃষ্টি করাটা ভাল হয় নাই। যেখানে মানুষ, সেই খানেই গোলমাল। দৌড়া দৌড়ি মারা মারী, কাটা কাটী, কান্না, চীৎকার, রোগ শোক, এ কি ব্যাপার ঠাকুর। আমি এমন যায়গা চাই, যেখানে আর কেউ থাক্‌বে না, থাক্‌বো কেবল আমি, তুমি, আর আমার মা কালী। এই সহরটার দিকে চেয়ে দেখুন, কি কাণ্ড, পয়সার জন্য সব লোকই ব্যস্ত"। ইহা কহিয়া বিশু নীরব হইল। সাধক বিশুর কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বিশু বিশ্ব জননী তোমার মত চিন্তাশীল মানুষ সৃষ্টি না করিলে লোকে তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যে কি কর্ত্তব্য এ বিচার কে করিত! মানুষকে ঘৃণা করিও না। মানুষ সৃষ্টির সুন্দর, বিচিত্র, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেখ বিশু! এক জন গৃহ স্বামী আছেন, তাঁহার নিবাস বিশাল অট্টালিকা, বিচিত্র বিবিধ বস্তুতে পরিপূর্ণ। তাঁহার পশু শালা, পক্ষী শালা, কুসুম কানন, আম্র কানন, শস্য ক্ষেত্র বিস্তর, কিন্তু তিনি একা,। তাঁহার পুত্র, দাস অনুজীবী কেহই নাই। আচ্ছা বল দেখি, তিনি একা কি ঐ সকল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন ও সম্ভোগ করিয়া সুখী হইতে পারেন! তাঁহার সন্তান, দাস, দাসী অনুজীবিগণ ব্যতীত ঐ সকল সম্পদ বৃথা হয়। জানিনে জগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও অসংখ্য পুত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার দেখ বিশু! যদি সেই গৃহস্বামীর কয়েকটী পুত্র সন্তান থাকে ও তাহাদের মধ্যে কেহ দুষ্ট ও ভক্তিহীন হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই দুষ্ট সন্তানের অনেক উপদ্রব সহ্য করিতে হয়। সেই দুষ্ট সন্তানকে সুশীল করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। গৃহস্বামীর অন্য সন্তান সুশীল থাকিলে তিনি সেই উপদ্রবের ভিতর শান্তি লাভ করিতে পারেন। বিশু জননী এক হস্তে বরাভয়, অন্য হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক সংসার প্রতি পালন করেন। আরও দেখ বিশু যদি সেই গৃহ স্বামীর কোন সন্তান ভ্রাতার অসৎ কর্ম্মে ও অসৎ বুদ্ধিতে দুঃখিত হইয়া তাহাকে সৎকর্ম্মী ও ভক্তিমান করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে সন্তান গৃহস্বামীর বড় প্রীতি ভাজন হয়। আমি বলি, তুমি জনপদে থাকিয়া সৎকর্ম্মে ও সদানুষ্ঠানে তোমার মা কালীর বিপথগত সন্তানগণকে সৎপথে আনয়ন করিবার চেষ্টাকর, তাহা হইলে তুমি জগদম্বার ভক্ত ও প্রিয় হইবে। কিন্তু মানুষ জগদম্বার বড় সাধের

জিনিস। তুমি তাহাকে ঘৃণা করিও না। জগদম্বার ইচ্ছাতেই মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। দেখ মানুষ পশুরাজ সিংহের উপর বিচরণ করে, মানুষ মহাবল করী সকলকে দাসত্বে নিয়োগ করে। মানুষ অপার জলধি মার্গে ও অনন্ত আকাশে বিচরণ করে। তুমি নির্জ্জন স্থান প্রয়াসী, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তুমি এই জনপদের নিকটে নির্জ্জন স্থান নির্ব্বাচন কর" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমি মানুষকে ঘৃণা করি না, আমি সকল লোকের অধীন। আমি মানুষের উপর কত অত্যাচার করেছি, আমার মানুষের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ হয়।" সাধক কহিলেন, "বিশু এখন তুমি মানুষের উপকারে জীবন সঙ্কল্প কর, তাহা হইলে তোমার পাপের ক্ষয় হইবে। মানুষের সংস্রবে না থাকিলে আমাদের মত লোকের যথা সাধ্য মানুষের উপকার করা অসম্ভব।" বিশু কহিল, "ঠাকুর আপনার ইচ্ছা যা তাই হবে, যেখানে থাক, আমি তোমাকে পেলেই সন্তোষ। যেখানে তুমি সেই যায়-গাই আমার স্বর্গ। আমি এই সহরের সব যায়গাই জানি, তাহার মধ্যে কোটাল হাটই আমার মনোমত। কোটাল হাট রাজবাড়ীর পশ্চিম, অতি নিকট, বাঁকা নদীর ধার, গাছ পালা ফল ফুলে ভরা, কোন গোল মাল নাই।" বিশুর নিকট এই কথা শুনিয়া সাধক বিশুর সহিত কোটাল হাট দর্শন করিতে চলিলেন।

বর্ত্তমানের কোটাল হাটও অতি নির্জ্জন স্থান, অল্প সংখ্যক শ্রমজীবি লোকের বাস। সাধকের কালী গৃহের নিকটে কতকগুলি পশ্চিম দেশীয় মুসলমান বাস করিয়াছে। চারি দিকে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের উদ্যান বাটী। প্রকৃতি দেবী সৌরভে গৌরবে, পত্র পুষ্প ফলে নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক জগদম্বার অপূর্ব্ব রচনার চিত্র খুলিয়া প্রেমানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। অদূরে বাঁকা নদীর তীরবর্ত্তী মহীরুহগণ তরল কোমল পল্লীর আকাশের কোলে উঠিয়া দর্শনীয় হইয়াছে। কালী বাটীর নিকটস্থ মুসলমানগণও কালী বাটীকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহাদিগকে তৎস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "ও বাবা ও বাড় শক্ত যায় গা, পীরের আস্তানা, হাঁটু গেড়ে ছেলাম"।

সাধক বিশুর সহিত কোটাল হাট পরিদর্শন করিয়া সুখী হইলেন। ধীর সমীর সংযুক্ত বাঁকা নদীর তীরে বৃক্ষছায়ায় বসিয়া সহাস্য বদনে বিশুকে কহিলেন, "বিশু! উত্তম স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছ। স্থানটী নীরব

অথচ জনপদের নিকটবর্ত্তী। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের প্রদর্শনী ক্ষেত্র। এই ক্ষুদ্র কেদার বাহিনী বাঁকা নদী এস্থানে জননীর ন্যায় বিদ্যমান থাকিয়া ইহার ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রচুর রসামৃত সম্প্রদান পূর্ব্বক দেখ কি হরিৎবর্ণ, নেত্র তৃপ্তিকর অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাব করিয়াছে। এই বাঁকানদী বর্ত্তমান নগরের ১০।১২ ক্রোশ পশ্চিমে নোয়া নামক গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের প্রাঙ্গন হইতে উৎপন্ন হইয়া নানবিধ বক্র গতিতে খড়ী নদীর সহিত হইয়া কাটোয়ার নিকট সুরতরঙ্গিনীর আলিঙ্গন লাভ করিয়াছে। ইহা কহিয়া সাধক বর্দ্ধমানে প্রত্যাগমন করিয়া কোটাল হাটে শ্যামা গৃহ নির্ম্মাণের অভিপ্রায় মহারাজা বাহাদুরের নিকট প্রকাশ করিলেন। রাজা বাহাদুর অমাত্যগণের সহিত স্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক সত্বর কোটাল হাটে একখানি কাঁচা গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। জগদম্বার করাল বদনামূর্ত্তি গৃহমধ্যে স্থাপিত হইল। দেবীর প্রতিষ্ঠা ও পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, দীন দরিদ্রদিগের ভোজনের জন্য মহা আয়োজন আরম্ভ হইল। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর যুবরাজ প্রতাপ চাঁদ, দেওয়ান বাহাদুর ও অমাত্যগণ দেবীর পার্শ্বে পবিত্র আসনে উপবেশন করিলেন। সাধক দেবীর সম্মুখে উপবেশন করিয়া পূজারম্ভের পূর্ব্বে স্তোত্ররূপে গাহিলেন :—

শঙ্কর উপরে বিহরে শ্যামা রঙ্গিণী।
সৌদামিনী সহিত, সুধাংশু মিলিত, নীল কাদম্বিনী॥
(মা আমার) না বাঁধে চিকুর, না পরে বাস, ও বিধু বদনে মধুর হাস,
চিন্তামণি মিলয়ে প্রকাশ, সশিব শিব নিতম্বিনী।
(তারা) তারণ কারণ চরণ যন্ত্র, যে জন না জানে সে জন ভ্রান্ত, নিতান্ত শান্ত
করে কৃতান্ত, কমলাকান্ত বন্দিনী॥

পূজারম্ভের পূর্ব্বে সাধক মায়ের অনুপম রূপ নিরীক্ষণ করিয়া বলিতেছেন, "আজ জননীর নব জলধর বর্ণের মধ্যে ব্রহ্মজ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, জ্যোতি পরম রমণীয়, সুধাংশু কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ, মনোমুগ্ধকর। মা আমার তন্ত্রোক্ত ও চিন্তামণি পুরে জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়াছেন, মঙ্গলময়ী দিগ বাসনা এলোকেশে সর্ব্বাশক্তি শূন্য হইয়া উদয় হইয়াছেন। মা আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের এক মাত্র যন্ত্র। মা আমি এ কথা বলিব না "যাবৎ ত্বাং পূজয়িস্বামী তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব।" মরণ শঙ্কটেও যেন আমার চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, যাবৎ জীবন তোমাকে দেখিতে পাই।"

সাধক তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে পূজারম্ভ করিলেন। দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হইলে সাধকের অনুরোধে রাজা বাহাদুর অমাত্যবর্গের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্য গৃহের বাহিরে আসিলেন। প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইলে সকলে পুনর্ব্বার গৃহ প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলেন। প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মহারাজা বাহাদুরের অতিশয় কৌতুহল জন্মিল। কিন্তু তিনি তৎকালে মনোভাব প্রকাশ করিলেন না। পূজা বলিদান ব্রাহ্মণাদির ভোজন ক্রিয়া মহানন্দে সমাপ্ত হইলে মহারাজা বাহাদুর অমাত্যবর্গের সহিত প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সাধকের সহিত মুখালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা বাহাদুর কহিলেন, "গুরুদেব, প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি আমায় ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। মৃত্তিকা রচিত কল্পিত দেবীর শরীরে রক্তমাংসময় দেহীর মত প্রাণ সঞ্চার কি আপনার উপলব্ধি হয়, না শাস্ত্রের বিধান অনুসারে কর্ত্তব্য বোধে করিয়া থাকেন। সাধক মৃদু হাস্যে কহিলেন, "মহারাজ! শাস্ত্র অপ্রকৃত, অসম্ভব ও অকর্ত্তব্য বিষয়ের বিধান বার্ত্তা নহেন। সকল বস্তুতেই মহাশক্তির অস্তিত্ব আছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই মহাশক্তির অবস্থান উপলব্ধি করা বহু পুণ্যের ফল, জন্ম জন্মান্তরের বহু ভাগ্য সাধ্য। সচ্চিদানন্দ রূপ সোহং ভাবের উদয় হইলে মহাশক্তির আবির্ভাব সকল বস্তুতেই প্রতীতি হইয়া থাকে।" শ্রদ্ধাবান মহারাজা সাধকের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "সাধারণ পূজায় সকল স্থলে দেবীর আবির্ভাব না হইতে পারে, কিন্তু আপনার মত ভক্তিমান মহাপুরুষের পূজায় দেবীর আবির্ভাব ও পূজা গ্রহণ অসম্ভব নহে।" প্রবাদ আছে, দেওয়ান বাহাদুর সাধকের বাক্যে সন্দিহান হইয়া বলেন, "বশিষ্ট মুনি সহস্র বৎসর উপাসনা করিয়া ভগবানের দর্শন পান নাই, তাঁহার প্রতি আকাশ বাণী হইয়াছিল, "কালী তারা মহাবিদ্যা।" প্রাণ প্রতিষ্ঠায় দেবীর আবির্ভাব আকাশ কুসুম মাত্র। শাস্ত্রে অনেক বিষয় আছে, বাক্যেও অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু, কার্য্যে পরিণত করা কঠিন। দেওয়ান বাহাদুরের এই কথা শুনিয়া সাধক কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া কহিলেন, দেওয়ান বাহাদুর, ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়।
জ্ঞান লব্ধা পরাং শান্তি মচিরেণাধিগচ্ছতি॥
অজ্ঞেশ্চা শ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি নপরো নসুখং সংশয়াত্মনঃ।

শ্রদ্ধাবান ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই জ্ঞান ও পরম শান্তি লাভ করেন, কিন্তু সন্দেহ যুক্ত ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে কোন সুখই প্রাপ্ত হন না। জ্ঞান জ্ঞাতব্য এ জগতে বিশ্বাসই অমূল্য বস্তু। বিশ্বাস হইতে জ্ঞান জন্মে। এ জগতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থের সহিত অসংখ্য পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের অস্তিত্ব জ্ঞান দ্বারা অনুভব করিতে হয়। নানাবিধ জীব জন্তু ভূত প্রেতাদি আমাদিগের চারি দিকে অবস্থান করিতেছে, সে সকল আমাদিগের দর্শন যোগ্য নহে। ঘোর অন্ধকারে আমরা কোন বস্তুই দেখিতে পাই না, তাহা বলিয়া আমাদের কি সিদ্ধান্ত করা উচিত এ জগতে আমিও অন্ধকার ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই। প্রজ্ঞা চক্ষু ভিন্ন এ জগতকে প্রকৃত ভাবে দর্শন করা যায় না। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও জন্মান্তরের সুকৃতি সাধনা প্রভৃতি ভিন্ন প্রজ্ঞা চক্ষু লাভ করা অসম্ভব। সাধকের এই কথা শুনিয়া দেওয়ান বাহাদুর কহিলেন, আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আমরা কোন কার্য্যের কারণ অবধারণ করিতে না পারিলে অদৃষ্ট ও জন্মান্তরের অবতারণা করিয়া থাকি।

ক্রমশঃ

মহাকবি কালিদাস।

লেখিকা,—শ্রীমতী আশাদেবী।

জগৎ যারে নোয়ায় মাথা,
ত্রিলোক ভরে কীর্ত্তি যাঁর
এই বাঙ্গলার শ্যামল কোলে
জংলা দেশেই জন্ম তার।
জন্ম তাহার নয়ত ওগো
উচ্চ নগর সৌধেরা
আমেরিকা নয়ত সেটা
য়ুরোপো নয় দর্পভরা।
নয় সে জাপান আফ্রিকা নয়

নয় সিংহল সিন্ধু টিপ্
নয় সে নেপাল নয় সে ভূটান
জন্মেনি সে সাগর দ্বিপ।
জন্মেনি সে অষ্ট্রেলিয়া
স্বাধিন চিনেও জন্ম নয়
বাংলা মায়ের স্তনের ক্ষিরেই
মজ্জা তাহার তৈরি হয়।
যে যোর খোজ কৃত্তি যে তার
জগৎ জয়ী যশের গাথা
জগৎ যুড়ী সেই কবিরই
বাংলার পায় লুটত মাথা।
বাংলা দেশের লতা পাতা
অনুকনার হৃদয় আলো
বাংলা দেশের ছোট বড়
সবারে সে বাসতো ভালো
এই যে মোদের পরাধিনের
শির্ণ বুকের ক্ষুব্ধ প্রাণ
লজ্জা ব্যথা দুঃখেতে যে
ঘোর আঘাতে মুহ্যমান
স্মরে তবু অতিত কথা
প্রাণটা মনে উঠছে ফুলে
হেরবলে বিরাট ব্যথা
ফেল্‌তে যে চাই দুরে ঠেলে।

বিমাতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

কলিকাতার পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে একখানি রং করা দ্বিতল বাটিতে একজন হিন্দু-ধনপতি বাস করেন, হিন্দু ধনপতি,—এই কথায় বুঝিতে হইবে যে, বংশ পরিচয়ে তিনি হিন্দু;—অধর্ম্মে রত থাকিয়া পাষণ্ডতা আবরণে আপনাকে স্বধর্ম্ম পরায়ণ বলিয়া সকলের নিকটে তিনি নানা প্রকার ভণ্ডামী দেখান। বয়স অধিক নহে, পঞ্চাশের সহিত সাক্ষাৎ করিবার এখনও পাঁচবৎসর বিলম্ব। ষাট হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে, সেই গৌরবে তিনি সাধারণের নিকটে ধনপতি বলিয়া পরিচিত হইতে একান্ত অভিলাষী। আকারটি ধনপতির তুল্য, এমন বোধ হয় না। মুখখানি প্রায় গোল, দাড়িটুকু প্রায় দেখাই যায় না, নাকটিও যেন বিন্ধ্যাচলের ন্যায় ওষ্ঠের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে, চক্ষু দুটি বড় বড়, প্রায় চার্ব্বিশ ঘণ্টাই লাল, যখন কেহ দেখে, তখনই ভয় পায়; বর্ণ ঘোর কালো।

বাবুটি দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ট—কিন্তু তৃতীয় পক্ষের সংসার পাতাইবার পর সম্প্রতি তাঁহার—মাথার ভিতর কি এক ভয়ঙ্কর রোগ হইয়াছে, ডাক্তার কবিরাজে ধরিতে পারেন না, বাবু কিন্তু সর্ব্বক্ষণ নিজে ভাবেন, সেই রোগে দিন দিন তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন, ওদিকে কিন্তু উদরের ভারে দশপা চলিতে কষ্ট হয়! রোগটা সত্য হউক, আর না হউক, বাবুর মাথায় চুল সহেনা, প্রতি সপ্তাহে নেড়া হইতে হয়; রূপের সঙ্গে নেড়া মাথাটি বেশ মানায়। আর একটি কথা এইখানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য; খাঁটি সর্ষপ তৈল ভিন্ন বাবু কোন দিন অন্য তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করেন না; মাখিবার জন্য প্রতি দিন অর্দ্ধসের তৈল বরাদ্দ, বেলা আটটা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত সেই তৈল টুকু সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করা হয়;—মাথাটিতে যায় অর্দ্ধেক, ভুঁড়িতে যায় সিকি, বাকী টুকু লোমকূপদিয়া সর্ব্বশরীরে প্রবেশ করে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের উপর অর্দ্ধসের সর্ষপ তৈলের বার্ণিশ রূপের অতি চমৎকার খোলতা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসার।

এইবার ঘর সংসারের কথা। নাম ডাকে বাবু একজন ধনপতি, কাজে কিন্তু ধনপতি মহাশয়ের ভোগের লক্ষণ তাদৃশ কিছুই দৃষ্ট হয় না। সংসারে আপনি, গৃহিণী, একটি বিধবা কন্যা, আর একজন দাসী মাত্র; খরচ পত্র যৎসামান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম বার ব্রত কিছুই নাই,—ভিখারীর মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। বাবু আমাদের দেশের সামাজিক রীতি নীতিও ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই মানেন না। ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম, গলদেশে যজ্ঞোপবীতও ধারণ করেন; খৃষ্টান হন নাই, মুসলমান্ হন নাই, প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মও হন নাই, কিন্তু মেজাজটা যেন নব সংস্কারের ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের ঔৎসুক্যের আংশিক অনুগত।

এদিকে ত উদরের ভারে নড়িতে পারেন না, ওদিকে কিন্তু মহাকবি মাইকেলের জ্ঞান তরঙ্গিণী সভার সদৃশ্য একটি সভায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর গতিবিধি করা নিত্যকর্ম্ম। সে সভায় অনেক রকম কাজ হয়, অনেক রকম বক্তৃতাও হয়। বাবু বক্তৃতা করেন, যতদিন বাঙ্গালার স্ত্রী জাতিকে পুরুষের তুল্য অধিকার দেওয়া না হয়, ততদিন বাঙ্গালার কল্যাণ নাই। প্রস্তাব খুব ভাল?—যাঁহারা পুরুষগণকে সভ্য করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারিলেন না, বিদ্যাশিক্ষাদিয়া বঙ্গের কুল কামিনী কুলকে কুলের বাহির করিতে যাঁহারা আমোদ অনুভব করেন, বাবুটির প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহারা সুখী হইবেন, বাবুকে ধন্যবাদও প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রস্তাব কর্ত্তার তুল্য লক্ষ লক্ষ অভাগা পুরুষ সংসারের শান্তি হারাইয়া মনের দুঃখে অনাহারে মারা যাইবে, এটা ভাবিয়া প্রস্তাব কর্ত্তার আমোদ হয় কি কষ্ট হয়, তাহাও আমরা দেখিব।

বাবুর বয়স ৪৫ বৎসর। এই বয়সে তাঁহার তিনবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথম দুটি স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, তৃতীয়টি বর্ত্তমান; সেটির বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষের অধিক হয় নাই; ইংরাজী বাঙ্গলা দুই ভাষায় পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছে, নারী স্বাধিনতায় অভিলাষ বাড়িয়াছে, স্বামীকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবার প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছে; এই ধরণের আধুনিক স্বল্পশিক্ষিতা বিদ্যাবতী বঙ্গবালাগণ মনে করেন, পতি যেন কৃতদাস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাবুটি কে ?

বাবুটির একটি নাম দিলে ভাল হয়। বার বার বাবু বাবু বলিয়া কথায় কথায় উল্লেখ করা বড়ই বিরক্তি জনক, পাঠেও অরুচি জনক, অতএব নায়কটির একটি নাম দেওয়া কর্ত্তব্য। মনে করুন, বাবুর নাম প্রাণধন ৪৫ বৎসর বয়সে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে রসিকরনের ইয়ারকী দিতে বিলক্ষণ তৎপর। কলেজে পড়া জ্ঞানবাণ নবা যুবকেরা ইংরাজী ধরণে যাঁহারা সংসারের স্ত্রীর বাধ্য ও একান্ত অনুরক্ত হইতে প্রাণে প্রাণে অভিলাষী, প্রাণধন বাবু সেই দলে যোগ দিয়াছেন!

বাবুর বিধবা কন্যাটি বালিকা প্রাতঃকালে সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কন্যার দ্বারায় কিছুই হয় না, দাসীটি একটু বেলায় আইসে, প্রত্যহই একটি কার্য্যে বড়ই বিভ্রাট হয়;—নবীনা তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর নিত্য দুইবেলা চা খাওয়া অভ্যাস; ভোরবেলা নিদ্রাভঙ্গ হয়, কিন্তু বিছানায় শুইয়া চা না খাইলে তাঁহার উত্থান শক্তি ফিরিয়া আইসে না। যতক্ষণ চা প্রস্তুত না হয়, ততক্ষণ তিনি শয্যার উপর এপাশ ওপাশ করেন, ঘন ঘন হাই তুলিয়া স্বামীর বংশকে অভিসম্পাৎ দেন, ইচ্ছা হইলে আবার নিদ্রা যান।

প্রাণধন বাবু ষাট হাজার টাকার কোম্পানির কাগজের মালিক, তাহা ছাড়া তাঁহার স্বদেশে বার্ষিক প্রায় হাজার টাকার উপস্বত্বের জমি জমা আছে, এরূপ প্রকাশ, কিন্তু বাবু অত্যন্ত কৃপনতা প্রকাশ করেন কারণ বিধবার পুঁজিরাখিতে হইবে সংসারের কাজকর্ম্মের জন্য আবশ্যক মত ঝি চাকর রাখেন না, ভোর বেলা নিত্য কর্ম্ম কে করে? নিজে মাথার দায়েও পেটের দায়ে এক প্রকার অথর্ব্ব, তথাপি তৃতীয় পক্ষের বৌমাটির জন্য তাঁহাকেও পদে পদে খানসামাও পাচক ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতে হয়, ভোরের চা টুকু নিজেই গরম করিয়া দিতে বাধ্য, প্রত্যুষেও এই রকম, প্রদোষেও এই রকম।

বৌমাটির নাম মেঘমালা। এই মেঘমালা এখনকার নূতন ধরনের বিদ্যাবতী এই ধরনের বিদ্যাপাতরা ব্যবহারে শৌখিন হইলেও এদেশের সধবার সমাদৃত আলতার উপর আর সিন্দুরের উপর বড় চটা মেঘমালা দেবী বিবাহের পরেই এক মাসের মধ্যে কপালের সিন্দুরকে দূর করিয়াছেন কিন্তু আলতাটি ভাল বাসেন সেই খাতিরে প্রাণধন বাবু প্রতিমাসে তিন

শিশি করিয়া কলিকাতাতে ৩৯ নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীটের এন, দত্তের সুপ্রসিদ্ধ তরল আলতা বৌমার বাক্সের মধ্যে মজুত রাখেন, প্রতিদিন অপরাহ্ণে মেঘমালার শ্রীচরণে সেই সুবাসিত সুরঞ্জিত তরল আলতা জবা-ফুলের মত শোভা পায়।

আলতা পরিয়াই মেঘমালা আকাশে উঠিয়া যান,—তরল আলতা চরণে দিয়া তিনি আর ভূমিস্পর্শ করেন না, তরলা চপলার ন্যায় সমুচ্চে খট্টার উপরে বিরাম আরম্ভ করেন। সুস্থিরা সৌদামিনী। মেঘমালাতে সৌদামিনীর বাস, আলতা পরিয়া সুন্দরী মেঘমালা দিব্য একটি সৌদামিনী সাজেন।

আলতা পরা পা, সুতরাং সৌদামিনী আর আকাশ হইতে নামেন না, চরণ চন্দ্র মলিন হইবার ভয়ে চক্ষু বুজিয়া শুয়িয়া থাকেন, সময় বুঝিয়া উৎকৃষ্ট সুস্বাদু চা গরম করিয়া প্রাণধন বাবু নিজে প্রণয়িনীর মুখের কাছে ধরেন আর সৌদামিণী একটু একটু করিয়া চা পান করেন। ঠিক ঝি, সন্ধ্যা হইলে ঘরে চলিয়া যায়, বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভ প্রসূতা বালিকা বিধবা কন্যাটি সন্ধ্যার পর একাগ্র চিত্তে কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করেন, রাত্রে কিছুই আহার করে না, মহাভারত পাঠ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়েন। অথর্ব্ব প্রাণধনকে নিশা কর্ত্তব্য সমস্ত কার্য্যই স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হয়। মেঘমালার প্রাণেশ্বর,—সময় বিশেষে সৌদামিণীর প্রাণেশ্বর।

মেঘমালা পরম রূপবতী, সোনার গহনা পরাইলে,—হীরা মুক্তায় ভূষিত করিলে, রূপখানি অতি সুন্দর মানাইত, কিন্তু মেঘমালা এখন কার ধরনের বিদ্যাবতী, মেঘমালা গাউন পরেন, গাউন বডিরউপর গহনা শোভা পায় না, বিশেষতঃ গহনা পরিলে স্ত্রীজাতির অহঙ্কার বাড়ে, এই যুক্তি স্মরণ করিয়া মেঘমালা অঙ্গে বেশি অলঙ্কার ধারণ করে না; আছে কেবল দু—কানে দুটি দুল গলায় একছড়া চিক, চিকের কোলে নাম লেখা লকেট, আর দুহাতে দুগাছী বালা পরিষ্কার সজ্জা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্তঃপুরের অন্তঃকাল।

বাবু প্রাণধন চৌধুরী কলিকাতায় বাস করিতেছেন, কিন্তু তাহার জন্ম কর্ম্ম কলিকাতায় নহে, তিনি মফঃস্বল নিবাসী মফঃস্বলের কোন

কোন স্থানে কোন কোন গ্রামে এক খানিও ইষ্টকালয় নাই ইহা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন, যে গ্রামে প্রাণধন বাবুর নিবাস, এই গ্রাম খানি ইষ্টকালয় শূন্য তাঁহার পিতৃ পিতামহের কিছু কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল, পরিবারও অনেকছিল; কুটুম্ব সাক্ষাতাদির গতিবিধি ছিল, অতিথি অভ্যাগত মধ্যে মধ্যে আসিতেন, সুতরাং দু-এক খানি ঘরে তাঁহার সঙ্কুলান হইত না; ভিতরে বাহিরে অনূন্য ষোলখানি ছোট বড় চালাঘর এবং উৎসবাদির নিমিত্ত দেবার্চ্চনার নিমিত্ত বড় এক খানি চণ্ডীপছিল, আজিও আছে, বাবু প্রাণধন বিষয়াধিকারী হইয়া দুটি বিবাহিতা পত্নীকে জন্মের মত বিদায় দিয়াছেন, বন্ধুলোকে বলিয়াছে, অলক্ষণ, সেখান কার ভদ্রাসনে তাঁহার দম্পতি জীবন সুখী হইবে না, গৃহবিপ্রেরাও গণনা করিয়া সেই কথা বলিয়া ছিলেন, সুতরাং তিনি তৃতীয় বার বিবাহ করিয়া সংসার জীবনে পরমানন্দ লাভ করিবার প্রত্যাশায় কলিকাতার কড়েয়া অঞ্চলে একখানা ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিতে থাকেন, সেটাও প্রায় সাত বৎসরের কথা। মেঘমালা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া, প্রাণধন বাবুর সম্পত্তি আছে জানিয়া, ভাড়াটে বাটীতে বাস করিতে নারাজ হন। ভাল একটি পল্লী দেখিয়া একখানি বাড়ী কিনিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করেন, সেই অনুরোধেই বাড়ী কেনা হইয়াছে, এই বাড়ীতে দম্পতি জীবন সুখে থাকিবে কি না ভগবান জানেন। দম্পতি এক্ষণে যে বাড়ীতে বাস করিতেছেন, সেখানি মেঘমালার নামে রেজিষ্টারী করা খরিদা বাড়ী, ভাড়াটিয়া নহে। মেঘমালাই বাড়ীওয়ালী।

বাড়ী খানী দুই মহল, জমি দশকাটা দুই মহল সমভাগে বিভক্ত। পাঁচকাটাতে সদর পাঁচকাটাতে অন্দর। যখন খরিদ করা হয়, তখন সদর মহলে একখানি তিন ফুকুরে দালান ছিল। বর্দ্ধমান বীরভুম প্রভৃতি মফঃস্বল বাসীগণ দালান বলিলে সাধারণ ইষ্টকালয় বুঝায়, এই কারণে সদর বাড়ীর খিলান যুক্ত দালানকে ঠাকুর দালান অথবা চণ্ডী মণ্ডপ বলেন, আমাদের এ প্রদেশে সেরূপ বুঝতে হয় না। দালান বলিলে ঠাকুর দালান বুঝায়, সাধারণ কোটা বাড়ী মাত্রকেই বুঝায় না। যাহাই হউক প্রাণধনের খরিদা বাড়ীর সদর বাড়ীতে দালান ছিল। পূজা পার্ব্বণ হইত না, একপাল গোলা পায়রা সেই দালানে আশ্রয় লইয়া ছিল, তৎব্যতীত রাত্রিকালে তিন চারিটা বেকার কুকুর সেইখানে শয়ন করিয়া

থাকিত মেঘমালাদেবী তাহাও দেখিতে ভাল বাসিতেন না। প্রাণধনকে বলিলেন, "প্রানেশ্বর দালানটা ভাঙ্গিয়া ফেল, সমস্ত বাড়ী খানা ভাঙ্গিয়া ফেল, এখনকার নূতন ফ্যাসানে উপর নিচে দোহারা বৈঠক খানা প্রস্তুত কর, এখনকার কালে গৃহস্থ গৃহে অন্দর রাখিবার প্রয়োজন নাই, অন্দর মহল রাখিও না, ঘোমটা দিয়া অন্দর মহলে আসিতে আমার লজ্জা হয়। সভ্য দেশে কামিনীরা বিবাহ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া, আজ কাল যেমন সভা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, আমিও হিন্দুর অন্দরমহল উঠাইবার জন্য সেইরকমের এক সভা প্রতিষ্ঠা করিব। পরামর্শ স্থির হইয়া গিয়াছে পঞ্চাশটি রমণী একত্র হইয়া আমরা অনুষ্ঠানপত্র ছাপাইয়াছি সভাপতি প্রতিনিধি. সভাপতি, সেক্রেটারী, এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ সহকারী ধনাধ্যক্ষ উকীল ব্যাঙ্কার এবং মেম্বারগণ মনোনীত হইয়াছেন। প্রাণধন বাবু শুনিয়া অবাক, মেঘমালা বলিলেন, ও রকমের ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলে কেন, ব্যাকরণ ধরিতেছ বুঝি? বাঙ্গলা ব্যাকরনের আমরা আদর করি না, সভাপত্নী সেক্রেটারিণী কোষাধ্যক্ষাণী অথবা মেম্বরী মেম্বরণী এ রকম ভেদ আমরা রাখিনা, অথচ বুঝিয়া লও, সকল গুলিই স্ত্রীলোক, অনুষ্ঠান পত্র প্রচার করিলে—আমি আশাকরি. ছয় মাসের মধ্যে শত শত মেম্বর জুটিবে, সভার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বড় বড় চাঁদার খাতা বাহির হইবে, চাঁদা দাতা মেম্বরের অভাব হইবে না। আবার বলিতেছি, ব্যাকরণ ভুলিয়া যাও, কয়েকজন মহানুভবের কল্যাণে বঙ্গকুলের যে সকল মহিলা আপনাদিগকে সুশীক্ষিত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের মতের সহিত আমার সকল মতের ঐক্য না হইলেও তাঁহাদিগকে আমি ভালবাসি, তাঁহারাই একে একে আমার সভার মেম্বর হইতেছেন, কাহারও অনুরোধ নহে, স্ব স্ব আগ্রহে উৎসাহে উৎসাহে ইচ্ছা পূর্ব্বক। শুভ সময়ে উপস্থিত। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার অগ্রে আমিই আদর্শ দেখাইব, দালান খানা ভাঙ্গিয়া ফেল, অন্দর মহল উঠাইয়া দাও, নূতন দস্তুর মত বৈঠক খানা বানাও বেশী লোক লাগাইয়া দাও, নূতন বাটী প্রস্তুত হইতে যেন বেশী বিলম্ব না হয়, যে ক—দিন প্রস্তুত না হয়, সেই কদিনের বাসের জন্য এই পাড়ার ভিতরে স্বতন্ত্র একটা বাড়া ভাড়া লও।" এইরূপ দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া মেঘমালা দেবী আপন প্রানেশ্বরকে সদ্ উপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন, তদ অনু-

সারেই অন্তপুরশূন্য নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, মেঘমালা সহচরী প্রাণধনের এখন সেই বাড়ীতেই বাস।

মেঘমালা সহচরী প্রাণধন এই কথাটি ঠিক তালে বাজিল কি না? কোন কোন পাঠকের তৎবিষয়ে সন্দেহ জন্মিবে। কেননা, প্রাণধনের বালিকা বিধবা কন্যাটি রহিয়াছে, সেটিকে ত্যাগ করিয়া প্রাণেশ্বর কেবল মেঘমালাকে সহচরী করিয়াছেন, এমন বুঝিলে মিথ্যা বুঝা হয়, বস্তুত বালিকাটি তাঁহাদের উভয়েরই সহচরী হইয়া আছে, পাঠকমহাশয় কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। ঐ মিথ্যাকাটা যাহাতে সত্য হইয়া দাঁড়ায়, নূতন বাড়ীতে প্রবেশের একমাস পরেই মেঘমালা সেই চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

স্মরণ রাখিবেন মেঘমালা বিদ্যাবতী। সংসারে যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সরস্বতির সেবা করেন, তাঁহারা স্ত্রীরত্নই হউন আর পুংরত্নই হউন তাঁহাদের অন্তরে দ্বেষ হিংসা বাস করিতে পায় না, ইহাই শাস্ত্র সম্মত বিশ্বাস; নূতন সভ্যতার যুগে সে বিশ্বাসের মূল্য নাই। সরস্বতী সেবিকা মেঘমালা দেবী অন্তরে অন্তরে হিংসা দ্বেষের বিলক্ষণ বশবর্ত্তিনী। সকলে না হউক, বিদুষীরমণী দলে অনেকেই ঐ রকম। পুরুষেও বাদ যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রাণধনের কন্যাটির নাম কুব্জাকুমারী। সাত বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, দ্বাদশবর্ষে বিধবা হইয়াছে, এখন সপ্তদশ বর্ষিয়া। মিশনারী মহাশয় দিগের সংস্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কুব্জকুমারী কিছুদিন বর্ণ-পরিচয় ও সুসমাচারাদি পাঠ করিয়া ছিল, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পর গৃহে বসিয়া আলোচনা রাখিয়া কতক কতক বুৎপত্তি লাভ করিয়াছে; সহজ সহজ বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিতে পারে, মহাভারত রামায়ণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বঙ্গানুবাদ শাস্ত্র গ্রন্থের অর্থও বুঝিতে পারে। বলাযায় না, তথাপি সে বয়সের বালিকাকে মূর্খ বলিয়া অপেক্ষা করিবার তাদৃশ কোন কারণ নাই। মেঘমালা কিন্তু কুব্জকুমারীকে কুসংস্কার প্রিয়া অশিক্ষিতা বলিয়া ঘৃণা করেন।

প্রাণধনবাবুকে নির্জ্জনে পাইয়া মেঘমালা একদিন আদর করিয়া বলিলেন, "প্রাণেশ্বর! তোমার বুদ্ধি আছে, কিন্তু বিবেচনা কম। এখনকার

দিনে মেয়ে ছেলেকে মূর্খ করিয়া রাখা বড় দোষ, তাহাতে মাতা পিতার পাপ হয়। আমাদের কুব্জকুমারীর অক্ষর পরিচয় হইয়াছে, উহাকে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমি যদি—"শেষকথা না শুনিয়াই একটু পরিতাপের হাসি হাসিয়া, প্রাণধন বলিলেন, "আর বলিও না! মেয়েটা জন্মেরমত গিয়াছে, শৈশবেই বিধবা হইয়াছে, তাহাকে আর লেখা পড়া শিখাইয়া বেশী আগুণ জ্বালিবার আমার ইচ্ছা হয় না।"

ঘৃণায় হাসিয়া মেঘমালা কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! তোমাকে প্রাণেশ্বর বলিতে আমার ঘৃণা হয়। কথাটার যাহা প্রকৃত অর্থ, নূতন রুচিতে তাহার অক্ষরে অক্ষরে একটু একটু অশ্লিলতার গন্ধ আছে, সে অর্থে আমি তোমাকে সম্ভাষণ করি না; প্রাণধনটা তোমার মাতৃদত্ত নাম, তোমার মা তোমাকে প্রাণধন বলিয়া ডাকিতেন, সুতরাং সেই খাতিরে আমি তোমাকে প্রাণেশ্বর, বলিয়া ডাকিতে বাধ্য। তোমাদের হিন্দু সমাজের কুসংস্কারে অজ্ঞান লোকেরা সর্ব্বদাই বলে, স্ত্রীলোককে স্বামীরনাম ধরিতে নাই, সেকথা শুনিয়া আমার কেবল হাসি পায়। নাম ধরিয়া না ডাকিলে রমণীরা কি বলিয়া ডাকিবে, কেহই সে কথা বলিয়া দেয় না। কবিরা বলিয়া দিয়াছেন, প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর জীবিতেশ্বর, জীবী, জীবী, প্রাণবল্লভ ইত্যাদি ইত্যাদি। ছি ছি! ওসব নামে কি ডাকা যায়? হাঁ,—কি বলিতে কি বলিতেছি, বলিতেছিলাম, তোমারে প্রাণেশ্বর বলিতে ঘৃণা হয়! রূপ গুণ দুই সমান। মেয়েটা বিধবা হইয়াছে, তাহাকে আর লেখা পড়া শিখাইতে নাই। হায় হায় এই পর্য্যন্তই তোমার বিদ্যে। বিধবা হইয়াছে, ছোটবেলা বিবাহ দিয়াছিলে, সভ্যতার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ছিলে, তোমার পাপেই ছোটবেলা বিধবা হইয়াছে, তাহা বলিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? চিরদিন কি বিধবা থাকিবে? উত্তমরূপে লেখা পড়া শিক্ষা দাও, কত দেশের কত সুন্দর সুন্দর বর আসিয়া তোমার মেয়ের পায়ে ধরিয়া বিবাহ করিবার জন্য উমেদারী করিবে, তোমার ঐ বিধবা কুব্জকুমারী আবার ড্যাং ড্যাং করিয়া সধবা হইবে। একবার নয়, যতবার বিধবা হইবে, যদি বাঁচিয়া থাকি, আমি তাহাকে ততবার সধবা করিয়া দিব। সুশিক্ষা দাও, সুশিক্ষা দাও, মূর্খ করিয়া রাখিও না। বিদ্যার তুল্য বন্ধু নাই, মর্থের তুল্য গালি নাই। তোমাদের পণ্ডিতেরাই বলিয়া গিয়াছেন, "বিদ্যারত্নম্ মহাধনম্।"—জাতিতে ভাগ লইতে পারে না, চোরে অপহরণ করিতে পারে না, রাজা

করিলে ক্ষয় হয় না, অতএব বিদ্যাধন মহাধন। শিক্ষা দাও, শিক্ষা দাও; মুর্খ করিয়া রাখিও না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঊনবিংশ বর্ষিয়া তরুণী হইলেও ৪৫ বৎসরের প্রাণধন মেঘমালাকে ভয় করেন, বার বার তাঁহার কথা কাটিতে প্রাণেশ্বরের সাহস হয় না, মাথা হেঁট করিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কিরূপে কোথায় শিক্ষা দিবার সুবিধা হইবে? অতবড় মেয়েকে,—বিশেষত বিধবাকে বিদ্যালয়ে পাঠান যায় না "কুঞ্জকুমারীও রাজী হইবে না।"

বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া ভ্রূকুটী ভঙ্গিতে মেঘমালা কহিলেন, "ঐজন্যই তোমার এমন দশা! ঐজন্যই আমি তোমাকে বোকারাম নাম দিতে ইচ্ছা করি! বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইবে কেন? সুপবিত্র খৃষ্টধর্ম্মাশ্রিত মিশনারী মহাশয়েরা বাঁচিয়া থাকুন, অশেষ বিশেষে এদেশের কল্যাণ সাধনে তাঁহারা কৃত সঙ্কল্প। তোমাদে মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহারা আপনাদের স্বজাতীয়া সুশিক্ষীতা ধর্ম্মশীলা বিবিগুলিকে গৃহস্থের গৃহে গৃহে প্রেরণ করেন বিবিরাও যত্ন করিয়া তোমাদে যুবতি যুবতি কন্যা ভগ্নীগনকে উত্তম উত্তম বিদ্যা শিক্ষা দেন; শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্ম প্রদেশও প্রদান করেন; বাবুলোকের প্রণয়িনী সহধর্ম্মিনী গণকেও ঐ প্রকারের বিবিলোকরাও সর্ব্বগুণে গুণবতী করেন। বিবিগুলি যে স্থল হইতে আইসেন, সেই স্থলের নাম ফিমিশন অথবা জেনানা মিশন। তোমাদের জেনানা কথাটা যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই মঙ্গল। যতদিন উহা বিলুপ্ত না হয়, ততদিন ঐরূপ মিশনের ব্যবস্থা-টাই উত্তম। খরচ পত্র কিছুই নাই, বিবিগুলির যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া পর্য্যন্ত মিশন ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হয়। এমন সুবিধাকি পরিত্যাগ করিতে আছে? এমন সুন্দর সুযোগ কোন দেশে কতলোকের ভাগ্যে ঘটে? আরও বিবেচনা কর, কুঞ্জবালা সুন্দরী। তুমি হইতেছ কুঞ্জকুমারীর বাবা বিধাতা তোমাকে যেমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকায় গঠন করিয়াছেন, কুঞ্জ-কুমারীর শরীর সেরূপ উপাদানে গঠিত হয় নাই। আমি শুনিয়াছি, কুঞ্জ-কুমারীর গর্ভধারিণী দিব্য সুন্দরী ছিলেন, কুঞ্জকুমারী সেই সুন্দর ছাঁচে ঢালা। জান না বিশ্বনের প্রসাদে কুঞ্জকুমারীর অদৃষ্ট যদি সুপ্রশস্ত হয়,

কে বলিতে পারে, সত্যই যদি তাহা ঘটে, তাহা হইলে কোন একটি নবযৌবন সম্পন্ন পরম সুন্দর সাহেব কুমার তোমার কুঞ্জ কুমারীর প্রেম পিপাসী হইয়া তাহার পাণিগ্রহণার্থ লালায়িত হইবেন।

মেঘমালা যখন বক্তৃতা ধরেন, তখন অল্প কথায় শেষ করিতে পারেন না; তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাই সুদীর্ঘ হয়, বক্তৃতা করিবার সময় মেঘমালা যেন সহস্র বশন ধারণ করেন; বিশেষতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে। পূর্ব্বে বলিয়াছি সরস্বতী সেবিকা মেঘমালাদেবী অন্তরে অন্তরে হিংসাবিদ্বেষের বিলক্ষণ বশবর্ত্তিনী। কুঞ্জকুমারী তাঁহার সপত্নীকন্যা, সাপত্ন্য বিদ্বেষ স্ত্রীজাতির প্রায় স্বভাবসিদ্ধ। আধুনিক বিদ্যা শিক্ষা সেই স্বভাবের শিক্ষাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে না। মেঘমালাদেবী সাপত্ন্য বিদ্বেষ পরিবর্জ্জিতা হইতে পারেন নাই। সপত্নীকন্যাকে সংসার হইতে তফাত করিতে পারিলেই ইনি সুখী হন। পৃথিবী হইতে তফাত করা তাঁহার ইচ্ছা নহে, কৌশলে সেই কথাটি চাপিয়া রাখিয়া, মৃদু হাসিয়া স্বামীকে তিনি বলিলেন, "অন্তপুরের অন্তকাল উপস্থিত, আমাদের অন্তপুর নির্ম্মূলিনী সভা অতি শীঘ্রই খোলা হইবে; মিশনের অনুগ্রহে কুঞ্জকুমারী সুশিক্ষা হইলে মহাসমাদরে আমি আমার কুঞ্জকুমারীকে সেই সভার মেম্বর করিয়া লইব। দেখিও, সাবধান ভুলিও না, মেম্বর কথাটা শুনিয়া আবার যেন ব্যাকরণের কথা মনে করিও না। বাঙ্গলা ভাষায় ব্যাকরণ থাকা বড়ই লজ্জার কথা! আমাদের কাছে মেয়ে পুরুষ উভয়েই সমান। ব্যাকরনেও সমান সামাজিক অধিকারেও সমান, বৈষয়িক অধিকারেও সমান। ব্যাকরণে কিসে সমান, শত শত দৃষ্টান্তের মধ্যে তাহারও একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। তোমার উপাধিতে গর্ব্বিতা অথবা গৌরবাধিতা না হইলেও আমি গম্ভীর বদনে সাক্ষর করি, শ্রীমতী মেঘমালা চৌধুরী আর বেশী বকিব না। জেনানা মিশনে চিঠিলেখ, আগামীকল্য শুভদিন, কল্য হইতেই মিশনের একটি যুবতী বিবি আসিয়া কুঞ্জকুমারীকে বিদ্যাশিখাইতে আরম্ভ করুন।"

প্রাণেশ্বর মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। নিশ্চেষ্ট হেঁট মুণ্ড নহেন, মনের ভিতর দারুণ চিন্তা। মেঘমালার বাক্য খণ্ডনে সাহস কুলায় না, বাড়ীতে বিবি আনিতেও প্রাণ চায় না, অন্তর সাগরে মহাসমুদ্রের ক্রীড়া! প্রাণেশ্বর যেন তখন অকূল চিন্তা সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নিরন্ন বিভ্রাট।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মোহিনী মায়া একটি কল্পিতা নারীমূর্ত্তি। জগতের নারীগণ মূর্ত্তিমতী মোহিনী মায়া। যে সকল পুরুষের মানসিক শক্তি দুর্ব্বল, তাহারা কিছুতেই মোহিনীদের মোহন মন্ত্রের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না, চিন্তা সাগরে ভাসিয়াও, বিভ্রাটের ধাঁধায় ঘুরিয়াও অগত্যা প্রাণেশ্বরকে মোহিনী মেঘমালার "হিতকর" নির্ব্বন্ধে অনুমোদন করিতে হইল। মেঘমালা হাস্য করিলেন;—হাসিতে হাসিতে একবার উঠিয়া প্রাণেশ্বরের দক্ষিণ স্কন্ধে ধীরে ধীরে তিনটি চপেটাঘাত করিয়া, উল্লাসে উল্লাসে বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা বাহাদুর! এইবার তোমারে একবার সকৌতুকে প্রাণেশ্বর বলিবার জন্য আমার প্রাণ যেন হাঁই ফাই করিতেছে!"

মজলিস ভঙ্গ হইল। সূর্য্যদেব পাটে বসিলেন, সহরের অট্টালিকা গুলির শিখর দেশ সিন্দুর মণ্ডিত স্বর্ণ বর্ণ দেখাইতে লাগিল। ফাল্গুন মাসের শেষ, প্রাণেশ্বরের শয়ন কক্ষের সন্মুখের বারাণ্ডায় একটি স্বর উঠিল, "কুহু—কুহু—কুহু।" কোকিলের কুহু রব। কোকিল এখানে কোথা হইতে আসিল? আসিতে হয় নাই, বাঁধা আছে। প্রাণেশ্বরের পোষাকোকিল। তিনবৎসর হইল, আট আনা মূল্য দিয়া প্রাণেশ্বর একটি কোকিলশাবক ক্রয় করিয়াছেন, সেটি এখন বড় হইয়াছে, একটি পিত্তল নির্ম্মিত সুন্দর পিঞ্জরে বাস করিতেছে, সময় পাইলেই কুহু কুহু রব করে, বসন্তের সহকার কুঞ্জে বনের কোকিল যেমন কোকিলার ঝঙ্কারে সুর বাঁধিয়া মনের সুখে কুহু কুহু গান করে, পিঞ্জরের কোকিল তেমন সুরে তেমন সুখে গান করিতে পারে না: পিঞ্জরের কোকিল কাননের কোকিলের ন্যায় মনে সুখ পায় না; অধিনতাপাশে বদ্ধ থাকিয়া প্রাণের যাতনায় উহু উহু করে; সংস্কার বশে লোকে বুঝিয়া লয় কুহু কুহু। কল্পনা আমাদিগকে একথা বলিয়া দিতেছেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। মহা মহা কবিগণ বলিয়া গিয়াছেন, কোকিলেরা বসন্তকালেই গীত গায়। জগতের যে যে দেশে বসন্ত ঋতু আছে, রমনীয় কুঞ্জ বন আছে, কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল আছে, সেই দেশের লোকেরাও ঐ তত্ত্ব অবগত আছেন। বসন্ত ঋতু ভিন্ন অন্য ঋতুতে কাননে কোকিলের রব শ্রুতি গোচর হয় না। একজন উদ্ভট কবি বলিয়াছেন, বর্ষাকালে ভেক ডাকে, সে সময়ে কোকিলেরা

নীরব থাকিয়া ভালই করে। পিঞ্জরের কোকিল প্রকৃতির এই নিয়ম পালন করিতে পারে না, বৎসরের প্রায় সমস্ত ঋতুতেই ভগ্নস্বরে পিঞ্জরের কোকিল মনের দুঃখে উহু উহু করে। বন্ধন দশায় এত কষ্ট। প্রকৃতির নিয়ম পর্য্যন্ত উলট পালট হয়। অকালে কোকিলের রব কাননে শুনা যায় না, ঘরে শুনা যায়। বর্ষাকালে সৌখীন লোকের ঘরে এক এক দিন কোকিল ডাকে, কাহারও কর্ণে সে রব ভাল লাগে না। কারণ এইযে, ঘরের ভিতরের কোকিল অধিনতা পাশে বাঁধা।

মেঘমালা একটু অগ্রে একটু সরিয়া গিয়াছিলেন, কোকিল ডাকিবা মাত্র অন্য গৃহ হইতে দ্রুত বাহির হইয়া প্রাণেশ্বরের নিকটে আসিলেন অন্তরে হাসিয়াছে, অথচ মুখখানি ম্লান থিয়েটারের নায়িকারা অন্তরে আমোদ রাখিয়া, রঙ্গভূমিতে কাঁদে তাহাকেই অভিনয় বলে মেঘমালা, এখানে অভিনয় করিলেন, ম্লানবদনে ছোট ছোট দুটি নিশ্বাস ফেলিয়া প্রাণধনকে বলিলেন, "প্রাণেশ্বর কোকিলের স্বর শ্রবণ করিতেছ, কালো কোকিল, ইহ সংসারে সুমিষ্ট স্বরের: জন্য প্রসিদ্ধ; সুমিষ্ট স্বরের জন্যই কুরূপ কোকিলের বেশী আদর, কিন্তু প্রাণেশ্বর! (ছিঃ! আবার ঐ সম্বোধন।) কিন্তু প্রাণেশ্বর তোমার ঐ পিঞ্জরের কোকিল, সেই সুমিষ্টস্বর হারাইয়া ফেলিয়াছে, তোমার কুঞ্জকুমারীও সুমিষ্টস্বর ঐ ভাবে হারাইয়াছে। কুঞ্জকুমারী যৌবনে পদার্পন করিয়াছে, তবু কেন কুঞ্জকুমারী বিষাদিনী? আমি উত্তর দিব কুঞ্জকুমারী অধিনতা পাশে বাঁধা। অন্তঃপুর ভাঙ্গিয়া দিয়াছি,—(আমার দৃষ্টান্তে ক্রমে ক্রমে আমাদের দলে সকলেই ভাঙ্গিবে) তথাপি কুঞ্জকুমারীর মনে সোয়াস্তি নাই। অভাব কেবল স্বাধীনতার আর সুশিক্ষার। নামে তুমি প্রাণেশ্বর, কাজে তুমি বঙ্কেশ্বর। স্ত্রী স্বাধীনতার নাম শুনিলেই তুমি ক্ষিপ্তপ্রায় হও। স্বাধীনতা না থাকিলে সংসারের স্ত্রী পুরুষ কাহারও মনে সুখ থাকে না, সেটা তুমি ভাবিতে পার না, স্ত্রীজাতির অধিনতায় কত যন্ত্রণা, তাহাও তুমি জাননা, বনের পাখী কোকিল, অধিনতায় যন্ত্রণা তোমার ঐ কোকিলটি জানে, অষ্ট প্রহর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ফাল্গুন মাস বসন্ত কাল প্রকৃতির রাজ্যে ঋতু রাজের আধিপত্য; এই সময়ে কোকিলের স্বর, সকলকেই বিমুগ্ধ করে, পিঞ্জরের কোকিল, আমার দুটি কর্ণকে ঝালা পালা করিয়া দিতেছে সেইজন্য আবার বলিতেছি, অধিনতা পাশে বাঁধা থাকিলে প্রকৃতিকে মনের সাধে পূজা করা যায়না, আমার মন স্বাধিন হইয়াছে; কুঞ্জকুমারী একটি

কোকিল, অধিনতা পিঞ্জরে আবদ্ধ, কুঞ্জকুমারীর মনকে শীঘ্র স্বাধিনতা দেওয়া কর্ত্তব্য বিবি আনিয়া নিত্য নিত্য লেখাপড়া শিখাও সংসারে সুখ শান্তি উথলিয়া উঠিবে।

প্রাণেশ্বর এতক্ষণ মেঘমালার অঙ্গের দিকে নেত্র পাত করেন নাই, মাথা হেঁট করিয়া স্বাধীনা বঙ্গাঙ্গনার রঙ্গরঞ্জিত বসন্ত বর্ণনা শ্রবণ করিতে ছিলেন, "শান্তি সুখ উথলিয়া উঠিবে" এই তত্ত্বটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, চকিত নেত্রে মেঘমালার দেহ লতার সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অভাবনীয় রূপান্তর। মেঘমালা ঘাগরা ছাড়িয়াছেন, দিব্য চওড়া কালা পাড়াপেড়ে ধোপ দাস্ত শান্তিপুরে সাড়ী পরিয়াছেন, রূপ খানি নূতন ধরণে উত্তম মানাইয়াছে, বঙ্গ গৃহের সুন্দরী সুন্দরী কুল বালারা কালা পেড়ে সাড়ী পরিলে ভাল মানায়, ঘাগরায় তেমন মানায় না, বদ্ধমূল সংস্কারে তাহাই আমরা বুঝিতে পারি, সাড়ীপরা সুন্দরী মেঘমালার রূপ দেখিয়া অবশ্য প্রাণেশ্বরের আনন্দ জন্মিল; প্রেমানুরাগ বাড়িল, সোহাগ করিবার ইচ্ছা হইল, প্রেয়সীর একখানি হাত ধরিয়া, প্রেম নয়নে প্রেম-ময়ীর মুখপানে চাহিয়া রসিক নায়ক রসভাবে কহিলেন, "প্রেয়সি! তুমি সুন্দরী, সাড়ী পরিলে তোমাকে আরও সুন্দরী দেখায়, তাহাই আমি দেখিতেছি; তবে তুমি নিত্য নিত্য সুন্দর সুন্দর সাড়ী পরিয়া এই অনুপম সজ্জায় সুন্দর শরীরকে সুসর্জ্জিত রাখ না কেন?"

মুখখানি একটু ভারীকরিয়া অভিমানে সোহাগের সঙ্কেতে মেঘমালা উত্তর করিলেন, "মনের ভাব যদি জাননা, তবে কথা কও কি সাহসে? মনের দুঃখেই আমি সাড়ী পরিনা। সেই দুঃখের কথা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে পারিব না, কাঁপিয়া কাঁপিয়া পড়িয়া যাইব, নিমেষেই হয়ত ফিট হইবে, ফিট হইলেই মুর্চ্ছা আসিবে। তুমি উপবেশন কর।

বারাণ্ডায় একখানি কৌচপাতা ছিল, দক্ষিণ দিকে মুখ রাখিয়া প্রাণেশ্বর সেই কৌচের উপর বসিলেন, উত্তর দিকে মুখ রাখিয়া সেই কৌচে ঠিক সম্মুখে মেঘমালা বসিলেন, নায়ক নায়িকা মুখা মুখী দিব্য হাবভাব দেখাইয়া

মেঘমালা বলিতে লাগিলেন, "লোকে বলে, তোমার অনেক টাকা আছে, আমি কেবল সেইকথা শুনি, আর আমার মনের ভিতর দপ্ দপ্ করিয়া আগুনজ্বলে। ভাল করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, সত্য করিয়া বলদেখি, আমি কি তোমার মনের মতন সুন্দরী নই? দেখ দেখি, আমার মুখখানি—"ঠিকযেন প্রেম সরোবরের পদ্মফুল।" দেখ দেখি, আমার নয়ন দুটি, ঠিক যেন কবিবর্ণিত খঞ্জন পক্ষী; দেখ দেখি, আমার নিশ্বাস বাহিনী নাসিকা ঠিক যেন খগ চঞ্চু;—দেখ দেখি, আমার ঠোঁট দুখানি, ঠিকযেন রক্ত মাখা বিম্বফল;—দেখ দেখি, আমার কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশী ঠিকযেন ভূমি চুম্বিত কৃষ্ণ চামর! এত রূপ আমার, এত টাকা তোমার, তুমি আমাকে একটি দিনও ভাল করিয়া সাজাইলে না।"

বিস্ময়ে প্রাণেশ্বরের চক্ষু ক্ষণেকের জন্য পলক শূন্য হইল, বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন, "সাজাইলাম না? কি রকম সাজ তুমি চাও? অলঙ্কার? তোমাকে অলঙ্কারে সাজাইতে আমি কি অক্ষম? সুন্দরী প্রাণ-প্রতিমাকে মণিরত্নে ভূষিতা করিতে আমার কি অনিচ্ছা, তবে কি জান, তুমি নিজেই বল, অলঙ্কার পরিলে স্ত্রীজাতির অহঙ্কার বাড়ে, তাই তুমি অলঙ্কার ভালবাস না। আর এক বিশেষ বাধা, ঘাগরায়, তোমার সমস্ত অঙ্গ ঢাকা থাকে; ঘাগরার উপর অলঙ্কার মানায় না। এই দুই বাধা যদি না থাকিত, তাহা হইলে প্রাণেশ্বরী, আমি তোমাকে দিবা রাত্রি উজ্জ্বল উজ্জ্বল সোণা দানায় মুড়িয়া রাখিতাম। আজ তুমি সাড়ী পরিয়াছ, কল্যই আমি উমাচরণ স্বর্ণকারের দোকান টা জাকাইয়া দিব, উমাচরণের বিলক্ষণ দশটাকা লাভ হইবে, মণিরত্নে তোমাকে সাজাইয়া আমিও জীবন সার্থক জ্ঞান করিব, আমার স্বর্গে উঠিবার সুন্দর সোপান প্রস্তুত হইবে।"

হাস্য করিয়া মেঘমালা বলিলেন, সুধু কেবল মনিরত্নে সাজাইয়া শোভা দেখিলেই শোভা হয় না, সাজাইয়া সাজাইয়া পূজা করিতে হয়। প্রাণেশ্বর! বঙ্গদেশের হিন্দুর ঘরে তোমার জন্ম; হিন্দু কথাটা আমার কানে ভাল লাগেনা, হিন্দু মনুষ্য গুলাও আমার দুটি চক্ষের বিষ, তবু কিন্তু দৃষ্টান্ত বলিতে দোষ নাই। যাহারা পুতুল পূজাকরে, পুতুলকে তাহারা প্রতিমা বলে; কলিকাতায় আছি, কলিকাতার কথাই বলি,—কুমারটুলী প্রবাসী কৃষ্ণনগরের পাল বংশীয় কারিকরের দ্বারা সুন্দর সুন্দর প্রতিমা গড়াইয়া প্রতিমা পূজকেরা কেমন দামি দামি ডাকের গহনায় সাজায়; প্রতিমার

কোন অঙ্গই প্রায় দেখা যায় না, কেবল মুখগুলি, আর আঙ্গুল গুলি, জাগে। কত ঘটায় সেই সাজানো সাজানো প্রতিমা গুলির পূজা হয়; কেবল হুগলী নদীর জলে. আর ফল বিল্বদলে, পূজা নহে, বস্ত্রালঙ্কারে, ভোগ রাগ নৈবেদ্য ষোড়শোপচারে পূজা। আমারে যদি তুমি সাজাও,— সাজাবেই ত;—তোমার মুখ দেখিয়া তাহা আমি বুঝিতেই পারিতেছি, ডাকের গহনায় নয়, আপনিই বলিতেছ, মনিরত্নভূষায়,—আচ্ছা সেই রকমে সাজাইয়া—হু হু—ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হইবে। কেমন, পারিবেত?

"কোন্ দিন না করি?"—উল্লাসে হাঁ করিয়া প্রাণেশ্বর বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি! প্রাণপ্রতিমা! হৃদি সিংহাসনের কমলাসনা লক্ষ্মি! কোন্ দিন আমি তোমার পূজা না করি? গৃহস্থ লোকেরা মাটির প্রতিমার পূজা করে, কাঠের প্রতিমার পূজা করে, পাথরের প্রতিমার পূজা করে, ধাতু প্রতিমার পূজা করে, সে সব প্রতিমা নির্জ্জিব, আমি তোমার এই সজিব প্রতিমার পূজা করি। ঘাগরা পরা প্রতিমার পূজাতে ঘটা হয় না, লোকেরাও দেখিতে পায় না, সেই জন্যই তুমি সজ্জা চাহিতেছ; এইবার অবধি আমি সজ্জিতা প্রতিমার পূজা করিব।"

একদিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া, মেঘমালা আবার প্রাণেশ্বরের মুখের দিকে চাহিলেন; মেঘমালার মুখে মৃদু হাসি,—মেঘেমেঘে সৌদামিনীর খেলা করিল।

ভক্তের মান।

(পৌরাণিক বিষয়ের আলোচনা।)

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

যুগে যুগে ভক্তের জন্য ভগবানকে কত মূর্ত্তিই না ধরিতে হইয়াছে, কত খেলাই না খেলিতে হইয়াছে। অত্যন্ত স্নেহের পাত্র যে, তাহার সকল বাসনাই পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয়। পিতামহ স্নেহের নাতিটির জন্য ঘোড়া হইলেন! আর আদরের দুলাল নাতিটি একখানা চাবুক লইয়া তাহার পৃষ্ঠে

চড়িয়া হাঁকাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ দাদা ভাই মাতা পিতা স্ত্রী স্বামী দাস প্রভু বন্ধু মিত্র যে ভাবেই ভগবানকে ভজনা করিনা কেন, ভক্তের আবদার তিনি রক্ষা করিবেনই; একনিষ্ঠ প্রেমের মধুরানন্দে শ্রীভগবান গলিয়া যান। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সন্তানই জানিতেন। মার হৃদয়ে যতখানি সন্তান বাৎসল্য থাকা সম্ভব, তাঁর তাহাই ছিল। তিনি শয়নে, ভোজনে, রন্ধনে গমনে জাগ্রতে স্বপনে, সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন। মাতৃভাবে যশোদার ন্যায় উপাসনা আর কে করিয়াছে? এই গোকুলরূপ অনীর দেশে যে দিন গোলকচন্দ্ররূপ শীতল বারি প্রবাহ আগমন করিয়াছিল—পুষ্প-ফল-মুকুল বর্জ্জিত লতিকা-অঙ্গে যেদিন শ্যামচাঁদরূপ ফল শোভা পাইয়াছিল, সে দিন গোকুলবাসীর কি আনন্দ! কি উৎসব!! কিন্তু ঐ আনন্দের সহস্রগুণ আনন্দ হইয়াছিল—নন্দ যশোদার! সে আনন্দে তাঁরা অনুক্ষণ মগ্ন থাকিতেন। শত্রুকার্য্যের ঘূর্ণিপাকের মধ্যেও সে আনন্দ অব্যাহত প্রবাহিত হইত।

ননী চুরি করিয়া খাওয়ার অপরাধে গোপিগণ যশোদার নিকট অনুযোগ করিলে, তিনি মায়ের ন্যায়ই শাস্তি দিলেন। তাঁহার এই শাস্তি দানটি বড়ই মধুর—বড়ই হৃদ্য! দুখানি হাত যোড় করিতে বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ (যেন ভয়ে বিহ্বল হইয়া) তাহাই করিলেন। তখন মা—যশোদা একগাছি দড়ি লইয়া তাঁহার সুকোমল—নবনীত কোমল—হাত দুখানি বন্ধন করিলেন! ভক্তের নিকট ভগবান বাঁধা পড়িলেন!

আর একদিনের কথা। কৃষ্ণ যখন দু'বছরের কিংবা তার ছোট—তখন দামাল বেলা। এঘর ওঘর হামাগুড়ি দিয়া বেড়ান। হাঁড়ি পাতিল ভরা দুধ, দই থাকে, ছোট নোড়া নুড়ি দিয়া সেগুলি ভাঙ্গিয়া দেন, যখন দুধ দই এর স্রোতে মেজেখানি সাদা হইয়া যায়, তখন রঙ্গরসের শিরোমনি শ্রীকৃষ্ণ হাত তালি দিয়া হাসিতেছেন, আর নাচিতেছেন—নাচিতে নাচিতে পড়িয়া যাইতেছেন! যশোদা আসিয়া দেখেন ওমা! এযে দুধে দইয়ে একাকার! "এমন দুষ্ট ছেলে! এই আমার কাছে ছিলি, এর মধ্যেই এত কাণ্ড করলি? আচ্ছা তোর দুষ্টুমি ভাঙ্গছি" এই বলিয়া মা—যশোদা একগাছি শক্ত দড়ি আনিয়া উদুখলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া দিলেন! মায়ের বন্ধনে মুরারি আজ দারুভূত হইলেন।

এইরূপে তিনি কতবার বাঁধা পড়িয়াছেন বামনাবতারে বলির দ্বারে প্রকাশ

বাগদেশে চিরদিন তাঁর দ্বারে বাঁধা রহিলেন! বৃত্রপুত্র গয়াসুরের বিপুল শিরে শ্রীচরণ অর্পনছলে তাঁহার কাছে বাঁধা রহিলেন। হরি হরি!! যিনি ভববন্ধন মোচনকারী যাঁর নামমাত্র স্মরণে মায়ামোহের মোহন বাঁধান ছিঁড়িয়া যায়, তিনি কিনা ভক্তের মান রক্ষার জন্য জন্মে জন্মে ভক্তের কাছে বাঁধা রইলেন! তাঁহার দয়া অনন্ত ও অহেতুকী, স্নেহ অপার অহেতুকী, বাৎসল্যভাব অসীম!

সত্যভাবে পার্থরথে সারথি হ'য়ে তিনি রথাশ্ব চালন করিলেন। যাঁর ইচ্ছামাত্রই বিপুল বিশ্বধ্বংস হয়, তিনি ভক্তের জন্যই ত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সারথি? এমন অহেতুকী দয়া আর কার আছে দয়াময়? ঐশর্য্যমদমত্ত দুর্য্যোধনের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া, কৃষ্ণসর্ব্বস্ব বিদুরের প্রদত্ত তণ্ডুলকণাই তুমি আদর-পূর্ব্বক ভোজন করেছ। ভক্তাধীন তুমি, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করাই ত তোমার কাজ! কুরুক্ষেত্র মহাসমরে কুরুবীর্য্যগাঙ্গেয় যখন যুদ্ধে পরিশ্রান্ত, তখন একবার ভক্তের নিকট যাচ্ঞা করিলেন—

"কৈ তোদের সখা হরি।

একবার এনে দেখা তাঁরে এই ভিক্ষা করি।" ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করি-বার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেব তিন বাণে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন! ভক্তসখা শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের নয়ন সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। ভক্তবীর তখন সারথ্য-কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন সুতরাং মনে মনেই আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার বাসনা পূর্ণ হক।" এদিকে মহাভক্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ করিয়া অস্ত্র ধারণ করবাই "এ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিজ্ঞা ত ভঙ্গ হইবার নয়। আর এ প্রতিজ্ঞা তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াই ত করিয়াছেন? তবে এখন উপায়? উপায় আর কি? ভক্তের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পূর্ণ-ব্রহ্মনারায়ণ আজ সুদর্শনচক্র হস্তে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দণ্ডায়মান। সকলে অবাক্! বিস্ময়ে নির্ব্বাক!! এ কি? যিনি কেবল সারথ্য-কর্ম্ম স্বীকারপূর্ব্বক পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করিয়াছেন, তিনি আজ চক্রধারণ করিলেন কেন? মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণাদি ইহার অনুমোদন করিতেছেন কিরূপে? চক্রধারী চক্রধররূপে ভীষ্মের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াই পুনর্ব্বার সারথিরূপে অর্জ্জুনের রথে উপবিষ্ট হইলেন। চক্রদ্বারা একটি প্রাণীও বিনাশ করিলেন না।

দ্রৌপদীর বসন হরণ ব্যাপারে বস্ত্র মধ্যে অনন্ত বসন যোগাইয়া জ্ঞান গর্ব্বিত কুরুগণকে নির্ব্বাক, বিস্ময়ে অভিভূত করিলেন। সেই লোমহর্ষণ অঘন্য অভি-নয়ের অভিনেতা পাপমতি দুঃশাসন পরিশ্রান্ত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইয়া বলিতে লাগিল—"কি আশ্চর্য্য! বস্ত্র যে অসীম হইয়া উঠিল! এ বস্ত্র যোগাইতে

কে? আলুলায়িত কুন্তলা সজলাক্ষী কৃষ্ণৈকপরায়ণা যাজ্ঞসেনী যুগ্মপাণি হইয়া বলিলেন, "লজ্জানিবারণ মধুসূদন! আমার লজ্জা নিবারণ কর। আমার লজ্জা, মান, সকলই তোমাকে দিলাম। দয়াময় হরি! তুমি ভিন্ন ত্র বিপদে আমায় আর কেউ নাই। তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই পুণ্য। সতীর ধর্ম্ম রক্ষা কর। বিপদভঞ্জন! ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের রক্ষক।"

লজ্জানিবারণ হরি সতীর কথাগুলি সকলেই শুনিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সতীর মর্য্যাদা রক্ষিতে, অধর্ম্ম নাশিতে, স্বকীয় ভক্ত-প্রাণতা দর্শাইতে, বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন! দ্রৌপদী এখন নিঃশঙ্কা-নিশ্চিন্তা হইলেন। কেবল করযোড়ে ভক্তিভরে সেই বিশ্বরূপী দামো-দরের স্তব করিতে লাগিলেন।

দয়াময়হে! তোমার দয়া যে অফুরন্ত। এ দয়ার কণামাত্র যে জন পায়, সেই কৃতার্থ ও পরিতৃপ্ত হয়। মন্দমতি কংস যখন তোমার প্রাণ বিনাশ করিতে পূতনারাক্ষসীকে গোকুলে প্রেরণ করেন, তখন তুমি ত সকলই বুঝিলে, বুঝিবা-মাত্রই পূতনার মনোবাসনা পূর্ণ করিলে! তাহার স্তনপানছলে প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া একেবারে তাকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিলে! হে অচিন্ত্য! হে অচ্যুত! তোমার কার্য্য কারণ কে বুঝিতে পারে? কেহ বা তোমার পাদপদ্ম সেবা না করিয়াই পরমপদ প্রাপ্ত হয়। কেহ বা শত শত বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াও তোমায় পায় না। এ দুর্জ্ঞেয় রহস্য—কে বুঝিতে পারে, রহস্যময়!

হে অনন্ত! হে শান্ত! আপনার রূপ অনন্তলীলা, অনন্ত—কার্য্য অনন্ত—কারণ অন্তহীন। আমি হীনমতি কিরূপে আপনার লীলার আস্বাদন করিতে সমর্থ হব লীলাময়! অনন্তকাল ধরিয়া আপনি চতুর্যুগ সৃষ্টি করিতেছেন। সর্ব্ব-যুগেই সেই দশাবতার নব গোপগোপীর খেলা, দ্বাদশ গোপালের অভিনয়! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সকল যুগেই আপনি নরদেব মূর্ত্তিতে এই লীলার রহস্য বুঝাইতে নরকা-কুল কলুষাবৃতগণের পরিত্রাণ করিতে তোমার আধার এই ধরাধামে আবির্ভূত হইতেছেন!

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

বহুমূত্রের ঔষধ।

ইনসুলিন নামক বহুমূত্রের এক উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিস্কৃত হইয়াছে। এই ঔষধ বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এদেশের হাঁসপাতালে ব্যবহারের জন্য কতক পরিমাণ আনিতেছেন। এই ঔষধ অব্যর্থ বলিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছে। যে সকল চিকিৎসক এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উপদেশ অনুসারে এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত, কারণ মাত্রাধিক্যে বিপদ ঘটিতে পারে। বঙ্গদেশে এই ঔষধ এখনও পাওয়া যায় না। যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে এই ঔষধ আনিতে চাহেন, তাঁহারা নিম্ন ঠিকানায় উহা পাইবেন। British Drug Houses Ltd. Graham Street. City Road, London. N. এই ঔষধ দুর্ম্মূল্য সে জন্য ধনী ব্যতীত সকলেই ক্রয় করিতে পারিবেন না।

বস্ত্রের পোক।

গ্রীষ্মকালে পশম রেশম ও কখন কখন তুলার প্রস্তুত বস্ত্রেও পোকা ধরে এবং বস্ত্র নষ্ট করে। যদি এ সকল মুল্যবান বস্ত্র পরিষ্কার অবস্থায় এমন কোন বাক্সের মধ্যে রাখা যায়, যাহার প্রত্যেক রন্ধ্র বন্ধ করা হইয়াছে, এবং তজ্জন্য কোন প্রকারে পোকা যাইতে পারে না, তাহারই বন্দোবস্ত করিলে বস্ত্র নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

অল্পমূল্যের বস্ত্রে পোকা মহাশয়েরা স্ত্রী ডিম পাড়িয়া আত্মসম্মান নষ্ট করিতে পারেন না। এই কথা পাঠ করিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বস্ত্র হইতে খাদ্য সংগ্রহ করাই পোকার উদ্দেশ্য। পশমের বস্ত্র পরিস্কার রাখিতে হইলে শক্ত বুরুসের দ্বারা উহা প্রায়ই মার্জ্জনা করা উচিত; তাহা না করিলে স্ত্রী পোকা আপনার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও আপনার অতি উত্তম এবং মূল্যবান বস্ত্রে বাসা বাঁধিবে। পশমের বস্ত্রে ঐ পোকার ডিম এরূপ ভাবে আবদ্ধ হইয়া যায় যে, বস্ত্রাদি ঝাড়িলে উহা পড়িয়া যায় না। বস্ত্রের কোন স্থানে পোকা বেশীভাবে কাটে, তাহা সম্ভবতঃ সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন। কোটের গলায় যে ভাজ হইয়া থাকে, প্রায়ই সেই স্থানে, বগলের নীচে প্রভৃতি স্থানে বেশী করিয়া কাটে। ইহার কারণ এই যে, ঐ

সকল স্থানে ঘাম ও তৈল লাগে এবং ইহাই স্ত্রীপোকার আহারের ও ডিম পাড়িবার মনোমত স্থান।

স্ত্রী পোকা যেটী উৎকৃষ্ট বস্ত্র সেইটী বাছিয়া লয়। উহার ৫০টী ডিম হয় এবং সেগুলি অতি ক্ষুদ্রাকৃতি। যে কাপড়ে পোকা ডিম পাড়ে, ডিমের বর্ণও ঠিক তাহাই হয়। যদি কাল কাপড়ে ডিম পাড়ে তবে ডিমের বর্ণ কাল হয়, সাদা কাপড়ে ডিমের বর্ণ সাদা হয়। ইহাতে ডিম কোথায় পাড়া হইয়াছে, তাহা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপেই প্রকৃতি দেবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকে আত্ম গোপন করিয়া রাখিয়া আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। যেখানেই পশমের টুকরা বা কাপড় অন্ধকার স্থানে থাকে. সেইখানেই এই পোকার আবাস-স্থল হয়। ঐ ডিম ফাটিয়া যে, পোকা বাহির হয়, তাহা ধূসর বর্ণের এবং দেখিতে সূয়া পোকার ন্যায়, এই পোকাই বস্ত্র নষ্ট করে।

আমরা এই পোকার হস্ত হইতে কাপড় বাচাইবার জন্য কত ন্যাপথেলিন, কত কর্পূর প্রভৃতি কাপড়ের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া থাকি এবং আশা করি যে, এই সকল পোকা মরিয়া যাইবে। বস্ত্রের মধ্যে একবার ডিম পাড়িলে যে পোকা ফুটিয়া বাহির হয়, তাহাদিগের ঐ গন্ধ সহিয়া যায় এবং তাহারা ঐ সকল বস্ত্র নষ্ট করিয়া পুষ্ট হইতে থাকে। অনেক সময়ে এই সকল তীব্র গন্ধযুক্ত স্থানে বা তাহার নিকট পোকা ডিম পাড়িতে চাহে না, কিন্তু নিকটে সুবিধাজনক স্থান না পাইলে ঐ স্থানে ডিম পাড়িতে বাধ্য হয় এবং এই সকল তীব্র গন্ধ অগ্রাহ্য করে। পশমের মধ্যে যে মেদ থাকে ঐ পোকা তাহা সেবন করে। ঐ চর্ব্বি পাইতে হইলে উহাদের পশমের বস্ত্র খাওয়ার দরকার হয়। আমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, পোকা যে, বস্ত্রে ধরিয়াছে, সেই বস্ত্রের নানা স্থানে অল্প অল্প খাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার কারণ যে, ঐ সকল স্থানে কোনও প্রকারে অল্প চর্ব্বিময় পদার্থ ছিল।

ইস্পাতের ন্যায় শক্ত ও এলু মিনিয়ামের ন্যায় হাল্কা ধাতু।

বহুকাল ধরিয়া গবেষণার ফলে "ডুরা লুমিন" নামক এক পদার্থ আবিস্কৃত হইয়াছে, উহা ইস্পাতের ন্যায় শক্ত এবং এলুমিনিয়ামের ন্যায় হাল্কা, অথচ বিশুদ্ধ এলুমিনিয়মে যে সকল অসুবিধা আছে, ইহাতে তাহা নাই। ডুরালুমিন অপর দিকে ইস্পাতের ন্যায় শক্ত ও কঠিন এবং ইস্পাত ও লৌহ অপেক্ষা ইহার মূল্য কম। যে, সকল জিনিস ইস্পাকের ন্যায় শক্ত হওয়া প্রয়োজন অথচ ওজনে হাল্কা হওয়া চাই, সেই থকল কার্য্যে ডুরলুমিন অতি উৎকৃষ্ট।

ব্যাধি হীনতা।

শ্যাম দেশের মধ্যে স্বাভাবিকতঃ সংক্রামক রোগ হয় না। শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাংকক সহরের পূর্ব্ব দিকের লোকের জন্য পরিস্কৃত জল সরবরাহ হইয়া থাকে, কিন্তু পশ্চিম তীরের দিকের লোক অপরিস্কৃত জলই পান করে; সাধারণতঃ সহরের পূর্ব্ব দিকের লোকের মধ্যে মৃত্যুর হার কম কিন্তু কোন সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বদিকের লোকের মধ্যে মৃত্যুর হার পশ্চিম-দিকের লোকাপেক্ষা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়; ইহা দেখা গিয়াছে, এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখা গিয়াছে যে, বিশুদ্ধ পরিস্কৃত জল আজীবন পান করার ফলে সহরের পূর্ব্বদিকের লোকের মধ্যে মধ্যে ক্রমাগত কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজপূর্ণ জল পান করিয়া যে, জাতিগত সংক্রামক রোগহীনতাগুণ লাভ করিয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু পশ্চিমদিকের লোক সেই অবিশুদ্ধ রোগ-বীজপূর্ণ জল সেবন করিতে থাকায়, তাহাদিগের মধ্যে সেই গুণ নষ্ট হয় নাই। শ্যামদেশের নীচ শ্রেণীর লোক যদিও অত্যন্ত অপরিস্কৃত ও অস্বাস্থ্য পূর্ণ স্থানে বাস করিয়া থাকে, তথাপি তাহাদিগের মধ্যে টাইফয়েড জ্বর কচিত দেখা যায়, সম্ভবতঃ ইহা জাতিগত সংক্রামক রোগ হীনতার জন্য ঘটিয়াছে। তাহারা পুরুষ পরম্পরা এইরূপ ময়লা ও নোংরা স্থানে বাস করিয়া রোগ বীজপূর্ণ জল পান ও খাদ্য সেবন করিবার ফলে তাহাদিগের মধ্যে আর ঐ সকল রোগ প্রবণতা নাই তাহাদিগের মধ্যে প্লেগ রোগও হয় না। চীনা জাতি যেরূপ অপরিস্কার স্থানে থাকে এবং যে সকল জিনিষ সেবন করে, তাহা অত্যন্ত অবিশুদ্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর চিকিৎসকগণ তাহাদিগকে এই সকল স্থানে থকিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করে ও তাহাদিগের সংক্রামক রোগ না হইয়া বরং সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহা দেখিয়া কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, যে ইহার একমাত্র কারণ জাতিগত সংক্রামক রোগহীনতা।

পুরাতন কর্কের দ্বারা কার্য্য।

শিশির দ্বারা কার্য্য হইয়া গেলে আমরা উহার কর্কের ছিপিগুলি ফেলিয়া দিয়া থাকি। ঐ কর্কের দ্বারা অনেক জিনিষ পরিস্কার করা যায়। মূল্যবান আয়না ও কাঁচ যাহা সাধারণ জিনিষ দ্বারা পরিস্কার করা যায় না তাহার উপর শুষ্ক কর্ক দ্বারা ঘষিলে অতি শীঘ্র পরিস্কৃত হইয়া যায়। তাপিনের মধ্যে কক ডুবাইয়া চিনামাটির টালি বা বাসনাদির উপর ঘষিলে উহা পরিস্কার হয়। কোন জিনিষে মরিচা ধরিলে কেরাসিন তৈলে কর্ক ডুবাইয়া ঘষিলে মরিচা উঠিয়া যায়। এই সকল কার্য্যে অতি দ্রুত ঘষিতে হইবে।

রৌপ্যের বাসন শুষ্ক কর্ক দ্বারা ঘষিলে যেরূপ শীঘ্র পরিস্কার হয়, এরূপ আর কিছুতে হয় না এবং কর্ক ব্যবহারের জন্য রৌপ্যের বাসনে আচড়ও লাগে না। কর্ক সোজা করিয়া কাটিয়া লইলে রৌপ্যের বাসনের কোণা সকলে পরিস্কার করা সহজ হয়। শীতের সময় পায়ে অত্যন্ত শীত বোধ হইলে একটা ফ্লানেলের থলিয়াতে কর্কের গুড়া ভরিয়া দশ বা পনের মিনিট ধরিয়া গরম করিয়া লইলে ঐ কর্কের থলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গরম থাকিবে।

কর্পূরের গুণ।

রৌপ্যের বাসন প্রভৃতি কিছুদিনের জন্য তুলিয়া রাখিয়া পুনরায় ব্যবহার করিবার জন্য বাহির করিলে দেখা যায় যে, সেগুলি বিবর্ণ হইয়াছে। তখন সেগুলি পরিস্কার করিতে হইলে অনেক ঘষিতে হয়। যে বাক্সে রৌপ্যের বাসন রাখা হয়, তাহাতে কয়েক টুকরা কর্পূর রাখিলে অনেক দিন পরেও বাক্স খুলিয়া দেখা গিয়াছে যে, রৌপ্যের বাসন সকল অতি সামান্য বিবর্ণ হইয়াছে।

পশমের তৈয়ারী বস্ত্র বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখার সময় প্রতি পাটের মধ্যে কর্পূর ছড়াইয়া দিতে হয়। মূল্যবান কার্পেট পাট করিয়া রাখিবার সময় তাহার পাটের মধ্যে কর্পূর ছড়াইয়া দিয়া কার্পেট ভাল করিয়া লম্বাভাবে জড়াইয়া বান্ধিয়া তাহার উপর কাগজ বান্ধিয়া দিয়া মুড়িয়া রাখিলে কর্পূর সহজে উড়িয়া যায় না। এইরূপে পশমের জিনিষে পোকা ধরে না।

পেট বেদনা ও দাস্তে কর্পূর সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়। যাহারা সহজে অধীর ও ক্রোধপরায়ণ হয় এবং মৃগীরোগগ্রস্তকে কর্পূর সেবন করাইলে তাহাদিগের প্রকৃতি শান্ত হয়।

ফুলের গন্ধ।

আমাদিগের দেশে যত রকম ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ১ ভাগের ৯ ভাগ ফুলে সুগন্ধ আছে, বাকী ৮ ভাগের ৯ ভাগ হয় দুর্গন্ধ আছে, না হয় গন্ধহীন। যে সকল ফুলে সুগন্ধ আছে, তাহার অধিকাংশ ফুলের সাদা রং কিংবা ঈষৎ বাদামী রং তাহার পরেই হরিদ্রাবর্ণের ফুলে সুগন্ধ অধিক পাওয়া যায় এবং তাহারপরে লাল, নীল ও বেগুনিরঙ্গের ফুলে সুগন্ধ পাওয়া যায়। যত প্রকার বেগুনি রঙ্গের ফুল দেখা যায় তাহার ১ ভাগের ৬০ অংশের ফুলে মাত্র সুগন্ধ আছে।

হাঁপানি রোগ।

হাঁপানি রোগ কাহার যে কি জন্য হইতেছে, তাহা স্থির করা কষ্টকর। এই রোগ কাহারও বদহজমের জন্য হয়, কাহারও হৃদযন্ত্রের রোগের জন্য হয়, কাহারও ধুলার জন্য, কাহারও স্বাভাবিক উত্তেজনার জন্য প্রভৃতি নানাকারণে হয়। একজন হাঁপানি রোগী কোন স্থানে বেশ সুস্থ থাকেন, অপর হাঁপানি রোগী হয়ত সে দেশে থাকিলে অত্যন্ত অসুস্থ হন। এই জন্য এই রোগ হইলে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত কষ্টকর। এই প্রকার রোগীর ব্যক্তিগত পরীক্ষাও স্থান, ইচ্ছা অনিচ্ছা, খাদ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রকার ও উপযোগী করিয়া ব্যবস্থা দিতে হয়।

অধিকাংশ রোগীই মানসিক ও স্নায়বিক কারণে এই রোগে ভুগিতেছে, তবে চিকিৎসক তাহাই বলিয়া যদি মনে করেন যে, সকলেই একই কারণে ভুগিতেছে, তবে অত্যন্ত ভুল করিবেন। সম্প্রতি রয়াল সোসাইটি অফ মেডিসিনে কোন চিকিৎসক এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট এক ভদ্রলোক আসেন, তিনি সেই ভদ্রলোকের চামড়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে তাঁহার চামড়াতে আলু স্পর্শ করাইলে উহা সহজেই উত্তেজিত হয়। তাঁহার আলু সেবন করা বন্ধ করার ফলে তাঁহার হাঁপানি আরাম হয়।

কেহ চেরাপুঞ্জির ন্যায় অত্যার্দ্র স্থানে বাস করিলে সুস্থ থাকেন, কেহবা বৈদ্যনাথ, মধুপুর কিম্বা তদপেক্ষা শুষ্ক স্থান গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে থাকিলে সুস্থ থাকেন। কেহ সহরে বাস করিলে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন, কিন্তু সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে বেশ সুস্থ অবস্থায় থাকেন। কে কোন যায়গায় ভাল থাকেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা ছাড়া এরূপ অবস্থায় আর কোন উপায় নাই।

নরম বলিয়া অনেকেই পালখের বালিস ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন রোগীর এই উপাদান ব্যবহার করা বন্ধ করার ফলে হাঁপানি রোগ আরাম হইয়া যায়। কেহ কেহ কুকুর পুষিয়া থাকেন। কোন বালকের হাঁপানি রোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার বস্ত্রে কুকুরের লোম আছে। কুকুর হইতে তাহাকে দূরে রাখার ফলে তাহার হাঁপানি ভাল হইয়া যায়। এই সকল ক্ষুদ্র কারণ কেবল অনেকদিন ধরিয়া অনুসন্ধান করার ফলে বুঝিতে পারা যায়। তবে অধিকাংশ রোগীরই কোষ্ঠবদ্ধতা ও বদহজমের জন্যই এই রোগ হয়।

চা পান।

সম্প্রতি চা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জলে দ্রবীভূত হয় যে, ভিটামিন তাহা চার মধ্যে আছে; এই ভিটামিনের নাম ভিটামিন বি। চা যাহারা পান করে, তাহাদিগের চা পানের আর এক অজুহাত জুটিল।

ম্যালেরিয়ার উপকারিতা।

উপরের লিখিত কথা দুইটি পড়িলে সকলেই অবাক ও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। সকলেই ভাবিবেন, যে রোগের জন্য বঙ্গদেশ উজাড় হইতে চলিল, পৃথিবীতে এত অসুখ ও কষ্ট হইতেছে, তাহা হইতে অপকারই সম্ভব, উপকার হইবে কোথা হইতে? কিন্তু কিছুকাল ধরিয়া অষ্ট্রীয়া প্রদেশে যে, সকল রোগীর মানসিক রোগ হইয়াছে, তাহাদিগের শরীরে ম্যালেরিয়ার বীজ সূচিকা দ্বারা প্রবেশ করাইবার ফলে অনেক রোগী উপকার পাইয়াছে। যাহাদিগের পক্ষাঘাত হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর উহার প্রসার হইতেছে, এইরূপ রোগীর শরীরে ম্যালেরিয়া রোগের বীজ প্রবেশ করাইবার ফলে আশাতীত রকম সুফল পাওয়া গিয়াছে। ১৯১৯ সাল হইতে এপর্য্যন্ত গত চারি বৎসরে তিনশত পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে এই উপায়ে চিকিৎসা করা হইয়াছে, ইহাতে এত রোগী আরাম হইয়াছে যে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদিগের আশ্রমে শুশ্রূষা পাইবার জন্য রোগীর ভর্ত্তি হওয়ার সংখ্যা কম হইয়া গিয়াছে! বর্ত্তমান সময়ে চেষ্টা হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্তরূপ পক্ষাঘাত রোগ আক্রমণ করার পরে চিকিৎসা করার পরিবর্ত্তে উহা প্রথম দেখা দিবার সময়ে এই উপায় দ্বারা ঐ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই বন্ধ করা যাইতে পারে কিনা?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

সমালোচনা।

নসিরুদ্দিন। (ঐতিহাসিক নাটক) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম. এ. প্রণীত, ২৭ নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য এক টাকা মাত্র।

ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"সুলতান নসিরুদ্দিন ভারতেতিহাসের

একটি উজ্জ্বলতম রত্ন—এরূপ রাজর্ষিতুল্য নৃপতি কেবল ভারতের ইতিহাসে নহে, জগতের ইতিহাসে বিরল। তাই তাঁর পবিত্র জীবনের দুই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই নাটকখানি লিখিত হইল—অর্গলরাজ্যের বিদ্রোহ, অর্গলের রাণীর বীরত্ব, সুলতান কর্তৃক সেনাপতির পদচ্যুতি, রুটি প্রস্তুত করিতে করিতে বেগমের হাত পুড়িয়া যাওয়া, সুলতান কর্তৃক কোরাণের উক্তি লিখিয়া বিক্রয়—মাত্র এই গুলি ঐতিহাসিক সত্য। অবশ্য সুলতানের আদর্শ চরিত্র পরিস্ফুট করিবার জন্য কল্পনার সাহায্যে কয়েকটি নূতন ঘটনা চরিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মাধব মিত্র ও মুরবাঈ সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ভারতেতিহাসের পবিত্র চরিত্র অবলম্বনে গ্রন্থকার এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন, যাহারা ভারতের অতীত গৌরব কাহিনী পাঠ করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা এই নাটকখানি পাঠ করিলে পরমানন্দ লাভ করিবেন। নাট্যকার হিন্দু হইলেও মুসলমান মহাত্মাদিগের চরিত্র চিত্রাঙ্কণে বিশেষ শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা "নসিরুদ্দিন" পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।

দেববীণা। শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ সরস্বতী বিরচিত; ছাপাকাগজ বাঁধান উৎকৃষ্ট; মূল্য দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার বিখ্যাত সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ, হৃদয়ের সাধনোচ্ছ্বাস পরিপূর্ণ সরল সুন্দর প্রেম ভক্তিতত্ত্ব পূর্ণ সঙ্গীত সকল এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। গীত গুলি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। বলাবাহুল্য গীতগুলি কবিত্ব পূর্ণ কেন না, কবিত্ব প্রেম ও ভক্তির চিরসহচর। এমন প্রাণস্পর্শী, সরল সুন্দর গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র গীত বঙ্গসাহিত্যে বড় বাহির না, গায়ককণ্ঠে এরূপ সঙ্গীত গীত হইলে শ্রবণ করিয়া পাপ তাপ ক্লিষ্ট নরনারী শান্তিলাভ করিবেন।

আশাপথে। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, ইনিই এই উপন্যাসের প্রণেতা কি না, তাহার কোন উল্লেখ নাই। প্রিণ্টার ও প্রকাশকের নাম যখন আছে; তখন উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে গ্রন্থকার বলিয়াই আমরা অনুমান সিদ্ধান্তে স্থির করিয়া লইলাম; ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে, মানব চরিত্র বিশ্লেষণে বিশেষ রূপ পটু এই "আশা পথে" উপন্যাসে সে পরিচয় উত্তম রূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই উপন্যাসে দু-এক জন নায়ক নায়িকার চরিত্র অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এম, এ, তাই স্থানে স্থানে পাশ্চাত্য ভাব পরিস্ফুট করিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

বটকৃষ্ণ পালের এডওয়ার্ড্‌স্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৸০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৷৹ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৸০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৸০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ২ নং বনফিল্ড্‌ লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রীতিমাখান

সুন্দর মুখখানি

কিসে হয়, ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ৵০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী ব্যাধিতে-অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ৷৷৵০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

২৯শ, বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩০, [৫ম, সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। বিদ্যাপতি	শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	১২৯
২। সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৪৫
৩। অন্ধকার	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-বি	১৫৪
৪। বিমাতা	... ...	১৫৫
৫। প্রার্থনা	শ্রীযুক্ত ফজলরহমান খাঁ জি, টী	১৬০

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত

Tele. Phone 388 Barabazar. 28-11-23

জ্বরের ... জারমলীন সর্ব...

মূল্য ৷৷ ... ডজন ৫৲, গ্রোস ৫০৲, পাইকারী দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

আর, গোভিন এণ্ড কোং, হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Telegram:—GERMALINE. Telephone No. 1388

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
[illegible]
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

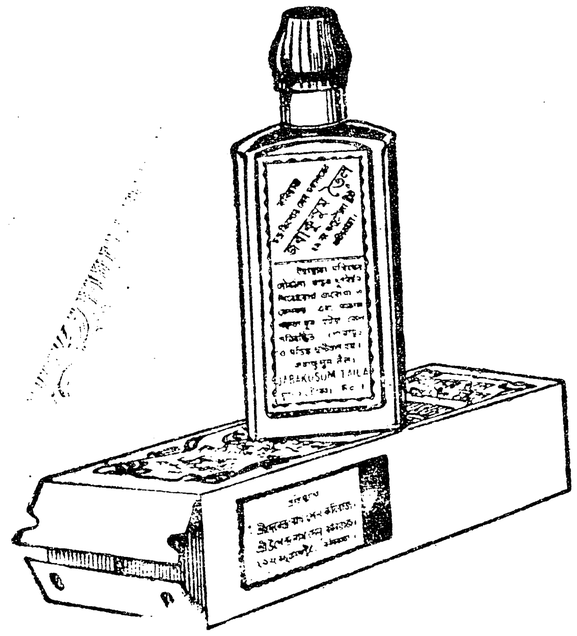

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন
এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা : "ফিজীশিয়ান"
টেলিফোন নং : ২৭১৫ কলি :
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

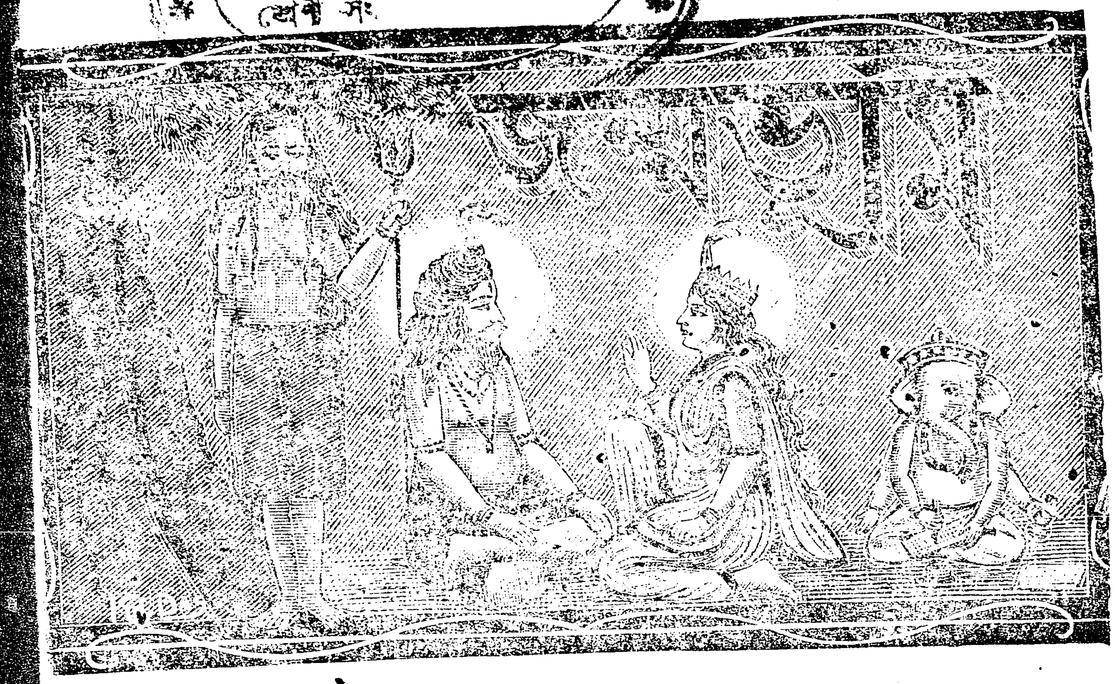

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৯শ, বর্ষ। | ১৩৩০ সাল, ভাদ্র। | ৫ম, সংখ্যা।

বিদ্যাপতি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গলার সাহিত্য-যুগের এই দীপ্ত প্রভাতে জগৎ সাহিত্যে আজ আমাদের স্থান কোথায়, সে কথা কাহারও অবিদিত নহে। সমগ্র বাঙ্গলার চিত্তসিন্ধু মন্থন করিয়া যে, অমৃতধারা উদ্ভূত হইয়াছে, বিশ্বভারতীর পূজার ডালায় সে উপহার অযোগ্য হইবে না। কিন্তু কত যুগ-যুগান্তরের স্পন্দিত হৃদয়ের সঞ্চিত সাধনা এই অমিয় উৎসের অন্তরালে সুপ্ত রহিয়াছে, কে বলিবে? বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিলেই দূর অতীতের কোটি কণ্ঠের অশরীরি বাণী অন্তরের গোপন কেন্দ্রটাকে যেন ঝঙ্কার দিয়া যায়। নিখিল বঙ্গের আকুল আহ্বানে [illegible] বঙ্গভারতী যেদিন এই 'তমাল তালী বনরাজি [illegible] শুভ্র কুমারী মূর্ত্তিতে আসিয়া দাড়াইলেন,

সেদিন কে তাঁহার প্রথম বন্দনাগীতি গাহিয়াছিল, কাহার ললিত কণ্ঠের স্বপ্নরাগিণী তাঁহার প্রথম অর্ঘ্য রচনা করিয়াছিল, কোন ঋষি কবির নিপুণ বীণার গভীর ছন্দঃ সেই কল্যাণ সুন্দর-শ্রী মাতৃ মূর্ত্তিকে প্রথম অভিনন্দনে বরণ করিয়া তুলিয়াছিল? সে এই বর্ত্তমান সাহিত্য যুগের কবি গুরু বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি ঠাকুর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাঁহার কাব্য কুঞ্জ-রচনা করেন। বিদ্যাপতির বহুপূর্ব্বে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও যে বাঙ্গলায় গীতি কবিতার প্রচলন ছিল, কৃষ্ণাচার্য্যের ভাষ্যে কাহ্নুর গান প্রভৃতিতে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে সত্য. কিন্তু ক্রমবিচ্ছিন্ন কবিতা সমষ্টিই কাব্য নহে, নানা রস সৌষ্ঠবে সম্পন্ন, গভীর ভাব লালিত্যে প্রাণস্পর্শী, বিপুল শব্দ সম্ভারে পরিতৃপ্ত এবং ঝঙ্কারময় ছন্দো মাধুর্য্যে নৃত্যপর জীবন্ত সাহিত্য বাঙ্গলায় বিদ্যাপতিই প্রথম সৃষ্টি করেন।

এখন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে—বিদ্যাপতিকে খাঁটী বাঙ্গালী কবি বলা সঙ্গত হইবে কি না। মিথিলার কবি বলিয়াই তিনি আমাদের নিকট সমধিক পরিচিত। তাঁহার সমসাময়িক চণ্ডীদাসের ললিত মধুর পদাবলীর সহিত তুলনা করিলে সত্য সত্যই মনে হয়, যেন বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর নিকট হইতে কিছু দূরে দূরে ছিলেন। আমাদের প্রথম কথা—

কবি যাহা গায় সে কি শুধু তার আপনার গান?
তার সে বীণার সুরে বাজে সারা জগতের প্রাণ!

কবি দেশ কালের সীমাবদ্ধ নহেন; কবি সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বদেশের সর্ব্ব যুগের। সাহিত্য এবং জাতীয়তা লইয়াই কোন দেশ বা সমাজ বিশেষ তাঁহাকে নিবিড়তররূপে আপনার করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। দোষাবহ নহে; কিন্তু এই চেষ্টার আয়োজনে আমরা যেন রাজনৈতিক গণ্ডিতেই বাঙ্গলার স্বাভাবিক সীমা বলিয়া—ভ্রমে না পড়ি। বিদ্যাপতির গীতি-সাহিত্যে- মৈথিলবৎ শব্দের প্রাচুর্য্য-পরিলক্ষিত হইলেও উহা প্রাদেশিক বিভিন্নতা মাত্র—একদিন তাহাই বাঙ্গলার এবং বাঙ্গালীর নিজস্ব ছিল।

গভীর পরিতাপের বিষয়—যে, পিকবরের কলকণ্ঠের কাকলী ধ্বনিতে একদিন সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, আমরা তাঁহার ইতিহাস জানি না। বিদ্যাপতির গীতিকবিতায় বাঙ্গলার এই আত্মবিস্মৃত ভাবপ্রবন জাতির প্রাণের যে সাড়া পাওয়া যায়, আজ তাহাই তাঁহার একমাত্র গৌরবস্মৃতি।

যে দেশকে তিনি আপন জন্মের দ্বারা পবিত্র কর্ম্মের দ্বারা উন্নত এবং ভাবের দ্বারা মহীয়ান করিয়া ছিলেন, সেই দেশবাসী আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে চলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার অন্তরের অন্তরতম কাহিনীটী ত বিস্মৃত হইবার নহে, তাহার তরুণ কণ্ঠের মুগ্ধসঙ্গীতটী ত নীরব হইবার নহে। ভক্তভাবুকের বৈষ্ণবী চিন্তার মাধুর্য্য প্লাবনে তিনি যে, অপূর্ব্ব রসধারার সৃষ্টি করিয়াছিলেন সে অমৃত পান করিয়া বঙ্গবাসী এমনই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, নিদ্রালয়া রজনীর গাঢ়তিমিরাঞ্চল সরাইয়া এ মুগ্ধ জ্যোৎস্নার স্রোত বহাইল কে, গৃহপ্রাঙ্গনের অনাদৃত উদ্যানটীতে স্নিগ্ধ শোভাগন্ধভরা ফুল ফুটাইয়া তাতে এ অক্ষয় মধু সঞ্চার করিল কে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসরও বুঝি পায় নাই। অভিমান ভরে কবি বুঝি, তাই আপনার কাব্যের মধ্যেই আত্মবিলোপ করিলেন। আজ সাহিত্য পরিষদের মহতী প্রচেষ্টায় এই কবিগুরুর জীবন কথার কিয়দংশ আমরা পাইয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত কবিকাহিনী কতটুকু সে বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে পারে।

ইতিহাস মাত্র শুষ্কঘটনা সংযোজন নহে, কবি কথার মূল্য সেইখানে যেখানে তাঁহার জীবনের পারিপার্শ্বিক ঘটনা পুঞ্জের সহিত কবি হৃদয়ের ভাব প্রবাহের একটী সুসঙ্গত নিবিড় বেগ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যাহাই হউক, বিদ্যাপতির জীবনের ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—সমিতির কোন যোগ্যতর সাহিত্যিক সে ভার গ্রহণ করিবেন। প্রকৃতি আপন মনে কবির সাধনাপীঠের শিলাতল বেষ্টন করিয়া মাধবী কুঞ্জ রচনা করে, নদী সেই অজ্ঞাত তীর্থের স্মৃতির মহিমা গান করিতে করিতে বহিয়া যায়, পাখী তাহার আকুল কলগানে সেই বিস্মৃতকাহিনীর বন্দনা করে—আমরাও কেবল সম্ভ্রম নত শিরে উদ্দেশ্যে সেই বরেণ্য বাণী সেবকের চরণে প্রণাম জানাই। আমরা কবিকে জানিতে চাহি, তাঁহার কাব্যের মধ্যদিয়া দেখিতে চাহি, তাঁহার সুরের কেন্দ্রটী অনুভব করিতে চাহি তাঁহার স্পন্দিত চিত্তের গভীর স্পর্শখানি।

সুদূর যুগের কত নবীন উষার কনক রশ্মি স্নাত উদ্যান বন্ধুত করিয়া কবি তাঁহার উদ্বোধন গীতি গাহিয়াছিলেন, কত দ্বিপ্রহরের রুদ্ধ দ্বার কক্ষে তাঁহার কম্পিত কণ্ঠের অস্ফুট ধ্বনিটী উদগ্র প্রতীক্ষায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়াছিল, কত ধূসর সন্ধ্যার নীলাঞ্চল ছায়াতলে তাঁহার ব্যথাতুর চিত্তের মিনতি সঙ্গীতটী দীর্ঘশ্বাসের সহিত স্তিমিত আকাশের বুকে মিশিয়া গিয়াছিল, কত তামস রজনীর পল্লীপথপার্শ্বে ঘনবিন্যস্ত শ্রেণীর পল্লব দোলাইয়া তাঁহার উন্মথ

আকুল অভিসার কাহিনী ভাসিয়া চলিয়াছিল, শুভ্র জোৎস্নাস্নাত যামিনীর তন্দ্রালসা মাধবী কুঞ্জে স্রস্তা তরুণীর আলিঙ্গনবদ্ধ আবেশ বিহ্বল কবি আপনার উন্মাদ রাগিনী ঢালিয়াছিলেন, আরও তাহার স্পন্দনটুকু বুকে আনিয়া লাগিতেছে। কিন্তু আশঙ্কা হয়, এই দীর্ঘ পঞ্চশতাব্দীর পর আজ আমরা তাহাকে ঠিক যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিব কি না। সত্য সত্যই এ আশঙ্কা অমূলক নহে। তাঁহার ত আমাদের মধ্যে কালের যে দূর ব্যবধান পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে রুচি এবং মনোভাবের যে বৈচিত্র্য পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ এই আদিরস প্রধান কবির গীতি সাহিত্যে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা আধুনিক যুগের নৈতিক শীলতা ত শালীনতার সহিত সুসঙ্গত হইবে না, তবে সে যুগের রীতি ও রুচির কথা ভাবিয়া কবিকে নিষ্কৃতি দেওয়া যাইতে পারে। নৈতিক আদর্শে অতিরিক্ত সন্দিগ্ধ সমালোচকের নিকট বলিতে চাহি—শুষ্ককাষ্ঠ লইয়া কাব্য রচনা হয় না। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, আদিরস ও অশ্লীলতা একই বস্তু নহে।

এতদপেক্ষা গভীরতর অপবাদ কবির ব্যক্তিগত জীবন রাহুগ্রস্ত করিয়া আছে। ব্যক্তিগত হইলেও তাঁহার কাব্যের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতের কথাসাহিত্যের কবিগণের সম্বন্ধে গ্লানিকর জনপ্রবাদ সৃষ্টি করা আমাদের লৌকিক সমালোচকের একটী বিশেষত্ব; কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস প্রভৃতি কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রবাদ রাজা শিবনারায়ণের তরুণী মহিষী লক্ষ্মী দেবীর সহিত এই নবীন কবির অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক ছিল। রাজা আদেশ করিলেন, কবি গান শোনাও, কবির কণ্ঠে আর সুর আসে না, সহসা বাতায়ন পথে কাহার চঞ্চল চরণের নুপুর শিঞ্জন শুনা গেল—কবি গাহিয়া উঠিলেন,—

"গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি—"

এ উপাখ্যান কেবল কবির ব্যক্তিগত চরিত্র বলিয়া নহে, পরন্তু তাঁহার কাব্যকেও গৌরবের শৈলশিখর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া হীনতার কলুষ পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে চাহে। ইহা কোন কুৎসিত রসোপজীবী সমালোচক কর্তৃক বিদ্যাপতির আদিরসাশ্রিত কাব্য সমালোচনা। নতুবা যে কাব্যের ভাব এবং চিন্তাধারার সহিত কবির জীবনের কোন সুসঙ্গতি ও সমানুবর্ত্তিতা নাই সে শূন্যগর্ভ শব্দাডম্বর-সম্বল কৃত্রিম কাব্যখানি কি যুগ যুগ ধরিয়া কোটি নরনারীর অন্তরের তৃষ্ণা

নিবারণ করিতে পারিত? যে কবি মানব অন্তরের অনাবিল প্রেমধারা প্রত্যেক পূনাতরা অভিব্যক্তির মধ্যদিয়া তরঙ্গায়িত করিয়া কামনার সর্ব্বশেষ পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তির চরণ সার্থকতার দ্বারে লইয়া গিয়াছেন, তিনি প্রেমের অবমাননা করিবেন, একথা কেবল অবিশ্বাস্য নহে, অতীব অশ্রদ্ধেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের উপাখ্যান ভাগ লইয়া বিদ্যাপতির কাব্যখানি রচিত। ভাগবতে যাহাকে দেবতার আসনে বসাইয়া দূর হইতে ভক্তি সম্ভ্রমে মান অর্ঘ্যে পূজা করা হইয়াছে, কবি তাহাকে দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ মান অভিমান চিন্তা কল্পনার মধ্যদিয়া তাহাকে পরিচিত বন্ধুর মত আপনার হইতে আপনার করিয়া প্রীতির আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছিলেন। শুষ্ক জীবনে যাহা কুৎসিত ও বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়, কবি দেখাইয়াছেন, প্রেম তাহাকে সার্থক করিয়া তুলে, সমস্ত অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া, সমস্ত অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি আনিয়া সে আপনার স্বচ্ছন্দ অব্যাহত গতিতে পূর্ণতার প্রতি ছুটিয়া চলে; জীবন তাহার পুণ্যস্পর্শে ধন্য হয়।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নারীত্ব আছে, যাহা কর্ম্মজগতের সহস্র পৌরষ পুরুষ ঝঞ্ঝা আঘাতের মধ্যদিয়াও আপনার কমনীয় স্বভাব ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে—সে যায় আপন সমান ধর্ম্মী কোন তরল প্রবাহে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে সে আপনাকে বিলাইতে চাহে—স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাস্নাত রজনীর মলয় সেবিত উদ্যান কুঞ্জে মুঞ্জরিত কানন-লতিকাটী যেখানে শুভ্র মর্ম্মর বেদিটাকে অর্দ্ধ আচ্ছন্ন করিয়া আছে, সেখানে ওই কানন কুমারীর কণ্ঠালিঙ্গনে তাহার পেলব কুসুমদলের শিহর অধরস্পর্শের মাঝে সে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া বিলাইয়া দিতে যায়। বিশ্বমানবের এই অন্তরতর নারীত্বকে লইয়া কবি তাঁহার মানসী প্রতিমা গঠন করিয়াছেন ভাবজগতের অস্পষ্ট ছায়ার মেঘাবরন উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে বাস্তবের জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রীতির মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গোপরাজসুতা রাধিকা কবির এই মানসী মূর্ত্তি। সৌন্দর্য্য বিহ্বল কবি তাহার আলেখ্য রচনা করিয়াছেন—,

পল্লবরাজ, চরণযুগ শোভিত
গতি গজরাজক ভানে
কনক কদলী কর সিংহ সমাহল
তাপর মেরু সমানে—

সে মেরুর উপরে দুটী মৃণালহীন কমল কোরক যাহা মণিময় মাল্যস্পর্শেও শুকাইয়া যায় না। সত্যই এ রামা কবির অপরূপ সৃষ্টি—কণকলতা অবলম্বনে উয়ল—

হরিণী হীন হিমধামা—তাহার—

নয়ন নালনী দউ অঞ্জন রঞ্জই

ভাব বিভঙ্গি বিলাস

চকিত চকোর জোর যিহি বান্ধল

কেবল কাজর পাশ

গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিত

গীম গজমতি হারা

কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি

ঢারত সুরধুনীধারা—

বিশ্ব সাহিত্যে এ তরুণী সুন্দরীর তুলনা কোথায়? কবি বলিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই—

"কবীর ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে

মুখভয়ে চাঁদ আকাশে

হরিণী নয়ন ভয়ে স্বরভয়ে কোকিল

গতিভয়ে গজ বনবাসে"—আবার

কুচভয়ে কমল কোরক জলে যদি রহুঁ

ঘট পরবেশে হুতাশে

দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু

শম্ভু গরল করু গ্রাসে

ভুজভয়ে কণক মৃণাল পঙ্কে রহু

কারভয়ে কিশলয় কাঁপে—কল্পলোকের।

এই উদ্ভিন্ন যৌবনা কিশোরীটী যখন উদ্যানসংলগ্ন বাতায়ন তলে লাজনম্র মস্তকে আসিয়া দাঁড়াইত, যমুনাতীরের মধুর বাঁশরী ধ্বনি শ্রবণে যখন মুগ্ধা কুরঙ্গিনীর মত ভাববিহ্বল নেত্রদুটী আয়ত করিয়া কান পাতিয়া রহিত, কবি তাহার চিত্র-খানি মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন—

"মেঘমাল সঞ্চে তড়িত লতা জনু—তাহার

"আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি

আধ হি নয়ান তরঙ্গ

আধ উরজ হেরি আধ আচরে ভরি

খেলত চপল অনঙ্গ"—

কিন্তু এ অফুরন্ত সৌন্দর্য্য কি ব্যর্থ হইবে? তরুণী রূপসীর পিপাসু চিত্ত কি চিরদিনই কেবল তাহার মিলনোন্মুখ মর্ম্মের অনাঘ্রাত পুষ্পের ডালি সাজাইয়া নিষ্ফল প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিবে? ওই বাতায়ন নিম্নে মাধবী কুঞ্জের অন্তরালে কি কেহ আসন রচনা করিয়া তৃষিত নেত্রে তাহার পানে চহিয়া রহিবে না? চকিত চাহনীতে চিত্ত বিনিময় করিয়া মনে পীড়ায় কাতর একটী প্রাণীও তৃষিত আকুল হতে পারিবে না—

"সজনি, ভাল করি পেখন না ভেল"—

এ কেবল গোরি দরশনে আশা না পূরল

হৃদয়ে শেল দেই গেল"—

তাই বিহ্বল কবি এক স্নিগ্ধশ্যাম কান্তি তরুণ যুবককে আনিয়া তাহার এই স্বপ্নরাজ্যের অধিনায়ককরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ওই স্ফুটনোন্মুখী কিশোরীর যৌবন ব্যাকুলতা কবির অন্তরেরই একটী মগ্নচিত্র এবং কবিই আবার সে সৌন্দর্য্য সুষমাটুকু আস্বাদন করিতে চাহেন; তাই এ শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্ট। এই শ্রীকৃষ্ণের অন্তরালে থাকিয়া কবি যেন নিজেই আপনার মধ্যদিয়া আপনাকে উপভোগ করিতে চাহেন। তাই সেদিন কোন শিথিল অপরাহ্ণ বেলায় স্বচ্ছ তোয়া তটিনী তীরে তরুচ্ছায়তলে বসিয়া কবি গহিতেছিলেন,—

"যব গোধূলি সময় বেলি

ধনি, মন্দির বাহির ভেলি

নব জলধর বিজুরি রেহা

দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি"—

এ দ্বন্দ্ব কি অপসৃত হইবার? উন্মাদ কবি কেবল শুষ্ককণ্ঠ চাতকের মত আশাপথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন কবে—

"পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব

টুটব বিরহক ওর।"

তারপর কোন বাসন্তী পূর্ণিমার ফাল্গুন সন্ধ্যায় যমুনা পুলিনে একদিন চারি চক্ষুর মিলন হইল। এতদিন যাহা হেমন্ত প্রভাতের কুজ্ঝটীকা-পারের অস্পষ্ট ওঙ্কারে অর্দ্ধজাগ্রত বিহঙ্গবধূর অস্ফুট আলাপের মত এই নায়ক নায়িকার চিত্তে জানা ও অজানার মাঝখানে অনির্দ্দেশ্য আকুলতা রূপে প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ আর তাহাকে মর্ম্মের গোপন গৃহটীতে চাপিয়া রাখা হইল না, কবির দৃষ্টিতে সে কথা ধরা পড়িয়া গেল। কবি তখন শ্যামসখার দৌত্য লইয়া হংসদূতী পাঠাইলেন, সেই মুগ্ধা তরুণীর নিকট—

শুন লো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
একাজ করিলি কি ?

হে সুন্দরি যদি পাষাণ প্রতিমার মত এমন নীরব উপেক্ষায় বসিয়া রহিবে তবে কেন তাহাকে—

"হৃদয় দরশি থোরি
মন করিলি যোরি"—

তাহার বিরহী চিত্ত যে শূন্যগৃহে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে—

"ভ্রমর বিকল কতহুঁ নাহি ঠাম
তুয়া বিনা কিশোরি নাহি বিসরাম।"

কিশরীর হৃদয়ও তখন পরিপূর্ণ ব্যগ্রতায় উন্মাদ—কিন্তু সমস্যা কৈছনে মিলব মাধব সাথ ? কবি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সেই শঙ্কাকুলা শারদশুক্লা মিলনোন্মখী অভিসাররাত্রি। রুদ্ধদ্বার সুপ্তগেহিনী পল্লীর সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া ওই ব্রীড়া সঙ্কুচিতা উদ্বেগ আকুলা অবগুণ্ঠনবতী অভীসারিনী কম্পিত পথে চলিয়াছে, তরুবীথিকার পত্রান্তরাল হইতে হিমাংশুর রজতরশ্মি আসিয়া মাঝে মাঝে সেই আধ অন্ধকার আলোকে অস্পষ্ট তাহাকে দেখা যায়। কবি তাহার বক্ষের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন—সেখা'ন উৎকণ্ঠা আকুলতায় আশঙ্কা উন্মাদনায় সন্দেহ নির্ভরতায় কি উদ্বেল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে—

পহিল চললি ধনী পিয়াক পাশে
হৃদয় আকুল ভেল লাজ তারসে
ঠাড়ি রহল কভু নাহি আগুসারে
হেম মুরতি জলি নাচল পিছারে

আবার শঙ্কা জাগে, হয়ত'—

অবহু রাজপথে পুরজন জাগি
চাঁদ কিরণ জগমণ্ডলে লাগি,

কিন্তু পঞ্চশর তাহা মানিবে কেন ? তাই আবার—

"রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ"—

তারপর সেই নিভৃত নিকুঞ্জে শ্যামবঁধুয়ার সহিত মিলন। প্রথম মিলনের সঙ্কোচমাধুর্য্য টুকু কবির নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—

কর মুহু ধরি পহু নিয়রে বৈসায়
কোপ সরমে ধনি বদন লুকায়—

মুখে ভাষা নাই, হৃদয়ে ব্যাকুলতা আছে, অঙ্গশিথিল, চিত্ত আত্মবশ নহে, তাহার উপর—

'দেয়লহি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি
তৈখনে হৃদয়হি উঠলকাঁপি—

আনন্দে লজ্জায় আবেশ শিহরণে হৃদয়তন্ত্রী তখন রী রী করিতেছে—

তারপর সর্ব্বশেষে—

"খোলি বায়ন যব চুম্বই মুখে
সমর হি লুকায়ল মাধব বুকে"—

কবির অঙ্গুলি তখন অবশ হইয়া গিয়াছে, বীণার রাগিণীও নীরব হইয়া গিয়াছে, নৈশতন্দ্রালুব্ধ মুগ্ধমৃদুল সমীরে শুধু জাগিয়া আছে, তাহার সুরের রেশটী।

তারপর কবির সম্ভোগ জীবনের আত্ম বিস্মৃত সুখদুঃখের বিচিত্র চিত্রশ্রেণী কোথাও মান অভিমানের কপট কলহে মধুর।

"মাধব নাম শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণে মুদয়ে দুই পানি
মাধব পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী"—

আর সখীগণের স্তোক বাক্য—

সুন্দরি হরিবধে তুই ভেলি ভাগী
রাতি দিবস সোই আন নাই ভাবই
কাল বিরহ তুয়া লাগি
"তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ
তব তুই কাসরে সাধবি মান
কো কহে কোমল অন্তর তোর
তু সম কঠিন হৃদয় নাহি হোর

আবার তখনই—

দুরে গেল মানিনী মান
আময়া সরোবরে ডুবল কান"—

দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতর সুখদুঃখ হইতে বহুদূর সেখানে বাস্তব ভুবনের লজ্জাভয় সঙ্কোচ নাই, আছে কেবল যৌবন বিহ্বলতার এক অব্যাহতি উচ্ছ্বাস—

"স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে
কি অতি নিকট কি দূর
তড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল
আতরে সুরধুনী ধারা
তরল তিমির শশী সুখ গরাসল
চৌদিকে খস পড়ু তারা"—

কবির আবেশ মুগ্ধ বীণাখানিও হয়ত তাহার সহিত তাঁহার হস্ত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। অন্তরের সমস্ত উদ্দাম আকাঙ্খা, সমস্ত সম্ভোগ উন্মাদনা নিঃশেষ করিয়া রিক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"এমন পিয়ার কথা কি পুছিস রে সখি
পরাণ নিছিয়া দিছি তারে।"

বিদ্যাপতি সাহিত্যের ইহাই প্রথম যুগ।

কবি যদি এইখানেই তাহার কাব্য হইতে বিদায় লইতেন তবে তাহার বর্ণন চাতুর্য্য তাহার লিপিমাধুর্য্য এবং উপমাসৌন্দর্য্য হয়ত তাহাকে প্রাচীন সাহিত্য বেদীকায় তাহাকে অমর করিয়া রাখিত, কিন্তু ভারতীর সাধনার একতম শ্রেষ্ঠ গৌরবের বৈষ্ণবী বিশিষ্টতা অবমানিতা হইয়া গভীর লজ্জায় কবির দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইত। স্পর্দ্ধিত যৌবনের উন্মত্ত চঞ্চলতার মাঝে যে অন্ধ লালসার পরিসমাপ্তি হয়, মানবের গভীরতর অন্তরতর মানুষটী কি তাহাতে তৃপ্তি হইতে পারে? দুরন্ত প্রবৃত্তির উত্তেজনা বশেই হউক, অথবা মিলনাকাঙ্খার পূর্ণতম প্রয়াস সহিবার অক্ষমতা প্রযুক্তই হউক, বাহিরের মানুষটী যে পথভ্রষ্ট হইয়া রূপযৌবন সম্ভোগের লীলা বিলাসকেই একমাত্র কাম্য জ্ঞানে তাহাতে আত্ম নিয়োগ করিতে পারে, জগতের ইতিহাসে ইহা অতি নিষ্ঠুর উলঙ্গ সত্য, কিন্তু সেই লালসার্ত্ত বসন্তোৎসবের মাঝে অস্বস্তি পীড়িত অভ্যন্তরের যে চিরন্তন মানুষ উচ্চতর আনন্দের আশায় অশান্ত আগ্রহে ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া রয়, সে তপস্যা ত ব্যর্থ হইবার নহে—তাই সহসা এমন দিন জীবনে আসে যখন সদ্য জাগ্রত মানুষ তাহার সমস্ত বিলাস আয়োজন চুর্ণ করিয়া সেই তরুণ চাপল্যের তপ্তস্তূপের উপর বৈরাগ্যের গৈরিক আস্তরণ বিছাইয়া দেয়—সেইখানে তাহার প্রকৃত প্রেমের সন্ধান মিলিয়া থাকে। প্রেয়কে শ্রেয় বোধে শ্রেয়ের লাঞ্ছনা সেখানে

নাই, শ্রেয়কে প্রেয়জ্ঞানে প্রেয়ের গৌরব আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—যে প্রেমের কোন বন্ধন নাই, কোন নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযম দুর্গের ভগ্নপ্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, বিদ্যাপতি তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্ম সমর্পন করেন নাই।

মদন যে মিলন সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে, সে মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া আপনার বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত পরম সুন্দর বাসর শয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। কবি তাই সুন্দরকে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহার কুৎসিত পরিণতি চাহেন নাই। সৌন্দর্য্যকে তিনি সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাষিত করিয়া কল্যাণের পূর্ণতর আনন্দের মাঝে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন।

এইখানে তাঁহার গীতিসাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরের আরম্ভ। কাব্যের গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরে নায়ক নায়িকাদেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভবী হইয়াছে—শ্রীমতী আর কবির মদন পীড়িত উৎসবপিপাসু নারীত্ব নহে সে তাহার সমগ্র চিরপ্রতীক্ষু মানব প্রকৃতি, শ্রীকৃষ্ণও আর তাহার অনঙ্গ বিহ্বল উপভোগ পিপাসার ছদ্মবেশ নহে; তিনি জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য হইতে সুন্দরতর সমস্ত মহত্ব হইতে মহীয়ান, প্রেয়গণের মধ্যে প্রিয়তম, শ্রেয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠনিধি অনন্ত এবং অনাদি পুরুষ। এই পরিবর্ত্তন একদিনে হয় নাই, হইলে সে এক নবীনতর কাব্য হইত। কেবল নামরূপের একত্ব ব্যতীত পুরাতনের সহিত তাহার অন্য কোন সংযোগ থাকিত না, মাটীর মানুষ এবং অতিমানুষের মধ্যে যে দীর্ঘ ব্যবধান পড়িয়া আছে, তাহা আর গ্রথিত হইত না। কিন্তু কবি দেখাইতে চাহেন, নিম্নতর কামনা উৎসবের লীলাবিলাস ভঙ্গীতে যে উদ্ভ্রান্ত সম্ভোগলালসা জাগ্রত হয়, দুঃখতাপদগ্ধ ক্লীষ্টকঠিন তপস্যার গৈরিক ধারার মধ্যদিয়া তাহাকেই আবার সংযমশান্ত অম্লান কল্যাণশ্রী প্রেমের বন্ধবাধাবিরাম হীন আনন্দরাজ্যে লইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। মৃত্তিকায় মৃন্ময়মূর্ত্তি এবং সুবর্ণে সুবর্ণ প্রতিমা নির্ম্মানে শিল্পীর যে, নিপুনতার প্রয়োজন, বিদ্যাপতি যে কেবল তাহারই পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে পরন্তু কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ো মৃত্তিকা দিয়াই সুবর্ণ মূর্ত্তি রচিত হইতে পারে, তাহারও উদ্ভাবনা করিয়াছেন, তিনি কেবল মানুষকে মানুষ এবং দেবতাকে দেবতা করেন নাই—সংযমনিষ্ঠ তপস্যার ধ্যান গম্ভীর পথ বাহিয়া মনুষ্যত্বকে তিনি মহিমাময় দেবত্বে পরিণত করিয়াছেন, আর সে পন্থা গভীর বেদনাহত দীর্ঘবিরহের দুর্ব্বহজীবন।

বিরতিহীন ভোগবিলাসের মিলন স্বপ্নের মাঝখানে সহসা একদিন করুন রোদনোচ্ছাস উঠিল—

"আর মথুরাপুর মাধব গেল
গোকুল মানিক কো হরি নেল ?"

বৃন্দাবন সেদিন নন্দপুর চন্দ্র বিনা অন্ধকার—

"শূন্য ভেল মন্দির শূন্য ভেল নগরী
শূন্য ভেল দশদিশ শূন্য ভেল সগরি।"

ব্রজপুরের এই দারুন দুর্দ্দিনে শূন্য মাধবী কুঞ্জ পথের ধূলিশয্যায় যেথানে ওই বিয়োগ বিধুরা তরুণীর মর্ম্মন্তুদ যাতনাহত হৃদয়খানি করুন নৈরাশ্যে লুটাইয়া পড়িতেছে, প্রত্যেক পাঠকের ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস সেখান হইতে সজল হইয়া ফিরিয়া আসে।

"হায়—কত পরবোধব তোই
দেহ দীপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গোঙায়লি রোই
অঙ্গুরী বলয়া ভেল কামে পিঙ্কায়ল
দারুণ তুয়া নবলেহা
সখীগণ সাহসে ছোই না পারই
তন্তুক দোষর দেহা"—

সে রূপযৌবনের পরিপাট্য আর নাই—

"ফুয়ল কবরী না বাঁধে সংবরি
ধনী অবশ এতা
রূখলি ভুখলী দুখলি দেখলি
সখিনী সঙ্গ সমেতা

সখীগণের অশ্রান্ত সেবা ব্যর্থ হইয়াছে। এ সন্তাপ যে, অন্তরদাহ হেতু সেখানে বাহিরের শুশ্রূষার স্থান কোথায় ? তাই—

শীতল সলিল কমল দল শেজ হি
লেপহুঁ চন্দন পঙ্কা
সো সব যতহঁ আনল সম হোয়ল
দশগুন দহই মৃদঙ্কা

হায় নিষ্ঠুর ! এ অশ্রুজল বেদনা কাতর হিয়াখানির একটী নিশ্বাসও কি

তোমর কঠিন মর্ম্মকে ব্যথিত করিয়া তুলে নাই ? আশনিগড় কবি জীউ কত রাখব

অবহি যে করত পরাণ—" কুসুম সুকুমার নারী হৃদয়ের ধৈর্য্যের কি সীমা নাই ?

নিকট সিন্ধু যদি কণ্ঠ সুখায়ব

কো দুর করব পিয়াসা ! হে চির দয়িত, এমন করিয়াই যদি প্রচ্ছেদহীন নিবিড় দুঃখের শিয়রে এই অশ্রু সিক্ত রুদ্ধ রোদনের তলেই এ অতৃপ্ত পিপাসার পরিসমাপ্তি হয়, তবে মোহন বাঁশরীর উন্মাদ আহ্বানে ডাকিয়াছিলে কেন, অজ্ঞাত হৃদয়কে প্রেমের আস্বাদ দিয়াছিলে কেন প্রভু ?

সখিরে হামার দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর—

দেবতা কি হেথায় আসিবে না ? উপেক্ষিত এ জীবনের ব্যথিত অর্ঘ নৈরাশ্যে ফিরিয়া যাইব ?

এখন তখন করি দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
ছোড়নু জীবনক আশা
বরিখ বরিখ কার সময় গোঙায়নু
খোয়নু এ তনু আশে
হিম কর কিরণে নলিনী যদি জায়ত
কি করবি মাধবী মাসে

সত্যই কি তুমি আসিবে না ? সজল নয়ান করি পিয়া পথ হেরি হেরি" এই বিরহ বিধুরা নারী কি নিষ্ফল আশায় শূন্য পানে চাহিয়া বসিয়া রহিবে ? তবে এ দুর্ব্বহ জীবনের মূল্য কি ? এ লাঞ্ছনাহত ব্যথাভার রাখিবার কি স্থান নাই ? আছে—সে জীবনের পর পারে, চির কুণ্ঠাহীন অমৃতের রাজ্যে। তাহাই হউক এ দুঃসহ বিরহের হোমানলে আজ মরনোৎসব অনুষ্ঠিত হউক। এ জীবন দুঃস্বপ্নের অবসান হউক—

তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে
মরন কালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে

মরিতে চাই, কিন্তু প্রাণ হইতে প্রিয়তর প্রিয়তর, হইতে প্রিয়তম যে, তাহাকে ছাড়িয়া মরিলেও যে সুখ নাই, শুধু তাঁহার মধুর স্মৃতিটী আমার সঙ্গে দিও—

"জতিকা প্রাণের সখি মন্ত্র দিয়ে কাণে
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে
না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ না ভাসায়ো জলে
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরই ডালে
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে"—

মরিতে চাই, মরিতে চাই, সেই চির হিমানীর তলে এ জ্বালা জুড়াইতে চাই— কিন্তু মরা ত হইল না।

(আমার) কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব? নিষ্ঠুর আঘাতে অভিমান নাই, ব্যর্থ বেদনায় অশান্তি নাই, যাহাকে হৃদয় দান করিয়াছি, শুধু তাহারই চিন্তা আজ মুগ্ধ স্বপ্নের মত সমস্ত জীবন খানি আচ্ছন্ন করিয়া আছে—এমন সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া আত্মদান আর কোন কবির কাব্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তার পর সেই বিদীর্য্যমান তরুণ হৃদয়ের অন্তর তর সঙ্গীত—স্বপ্ন এবং বাস্তবে যেখানে একাকার হইয়া গিয়াছে, প্রণয়ী প্রণয়িনীর যেখানে ভেদ নাই, বিরহিনী ও আকাঙ্খিতের মধ্যে যেখানে ব্যবধান নাই।

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই
ও নিজভাব স্বভাব হি বিছুয়ল
আপন গুণ লুবধাই
মাধব, অপরূপ তোহারি সুনেহ
আপন বিরহে আপন তনু জর জর
জীবইতে ভেল সন্দেহ
রাধা সঙ্গে যব পুন তহি মাধব
মাধব সঙ্গে যব রাধা
দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত
বাড়ত বিহরক বাধা—

বিরহ ব্যঞ্জার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বিয়োগ কাব্যের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত—বিশ্ব সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। হউক এ স্বপ্ন, হউক এ মিথ্যা, হউক এ বেদনার্ত্ত চিত্তের

আকাশে সৌধরচনার ব্যর্থ প্রয়াস কিন্তু জগতের যে কোন দেশের যে কোন যুগের যে কোন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির অন্তর হইতে এ সঙ্গীত উদ্ভূত হইলে সে কবি ধন্য হয়, সে দেশ সার্থক হয়, সে যুগ গৌরবান্বিত হয়।

কবি এই স্বার্থলেশ শূন্য তপস্যা কঠিন সংযম শান্ত নিষ্কলুষ প্রেমের পথ বাহিয়া যে পুণ্যতর পূর্ণতর কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার কাব্যের চরম কথা। বিলাস লালসাময় দৈহিক মিলনের কথা সেখানে স্থান পায় না, আমি, তুমি, সে সেখানে নাই—ধ্যান মন সমাধির তলেনিত্য বুদ্ধ-মুক্ত আত্মার আত্মার সহিত এ মিলন।

কবির সে উৎসৃষ্টাত্ম প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয় নাই, সে কামনাহীন মিনতির বন্দনা গান ব্যর্থ হইবার নহে, সে যে অনন্ত যুগ ধরিয়া বিশ্বমানবের অন্তরের একতম ধ্রুব এবং পূর্ণ সত্য—আর সেই জন্যই

"আওল গোকুলে নন্দ কুমার
আনন্দ কোই কহই জনি পার"—

আজ কি পরম উৎসব প্রভাত, জীবনের সমস্ত আকাঙ্খা আজ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে—

"আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা
আজু বিহি মোহে অনুকুল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা।"

আজ আর কোন ব্যথা নাই, কোন বেদনা নাই—

"যতহু আছিল মম হৃদয়ক সাধ
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ"—

পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, আশা মিটিয়াছে কি? কবি উত্তর দিবেন, আশার শেষ কোথায়? প্রত্যেক মানবের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ, অনন্ত পিপাসা, অসীম প্রার্থনা—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সোই পীরিতি অনু রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি
লাখ লাখযুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি

অনন্ত মিলনের এই অনন্ত বিরহের অনির্দ্দেশ্য স্বপ্নের মাঝে কবির লেখনি থমকিয়া দাঁড়াইল. ভাব যতই গভীরতর হয়, ভাষা ততই নীরব হইয়া আসে; তখন কেবল পূর্ব্বসুরের রাগিনী রেশটুকু অবশিষ্ট থাকে, যাহা আজ পর্য্যন্ত নীরব হয় নাই।

সর্ব্বশেষে দুটী আত্মনিবেদন গীতি গাহিয়া কবি তাঁহার কাব্য হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মাটীর স্নেহ আকর্ষণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু কাব্যের প্রত্যেক সঙ্গীত প্রত্যেক ছন্দটীর মধ্যে কবি তাঁহার অন্তরতর মর্ম্মখানিকে রাখিয়া গিয়াছেন, বিশ্বসাহিত্যের একতম শ্রেষ্ঠ গীতিকুঞ্জে তাহা চিরদিন আমাদের অন্তর প্লাবিত করিয়া আমাদের পথভ্রান্ত চিত্তকে উন্মনস্ক করিয়া সত্য হইতে মঙ্গলতর ধ্রুব হইতে সুন্দরতর স্বপ্নবাণী রচনা করিবে। ওই মহাসিন্দুর পরপার হইতে তাহারই আহ্বান সঙ্গীত ভাসিয়া আসে—প্রত্যেক মানবের সুপ্ত অন্তরটীকে আঘাত করিয়া চলিয়া যায়, আর জীবনের শেষের মিনতি সুরটী তাহার মাঝে করুণ ঝঙ্কারের—স্পন্দন খানি হারাইয়া ফেলে—

তাতল সৈকতে করিবিন্দু সম
সুত মিতি রমণী সমাজে
তোহে বিসরি মন তাহে সমপিনু
অব মঝু হব কোন কাজে
মাধব হাম পরিনাম নিরাশা

তুহুঁ জগতারণ কারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহারি বিশোয়াসা
আধ জনম হাম নিদে গোঙায়নু
জরাশিশু কতদিন গেল
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন বেলা
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা
তোহে জনমি পুন তোহে সমারত
সাগর লহরী সমান।

সে লহরীর একটা কম্পনও যাহার চিত্ত প্রাকারে আসিয়া লাগিয়াছে সে উন্মাদ হইয়াছে। এই ইতর কল কোলাহলময় জীবনের শেষ হইয়া সে দ্বন্দ্বহীন উন্মত্ততা কি কোন দিন আসিবে না? বিশ্বমানবের চিরন্তন আত্মা যে তাহারই পথ চাহিয়া বসিয়া আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

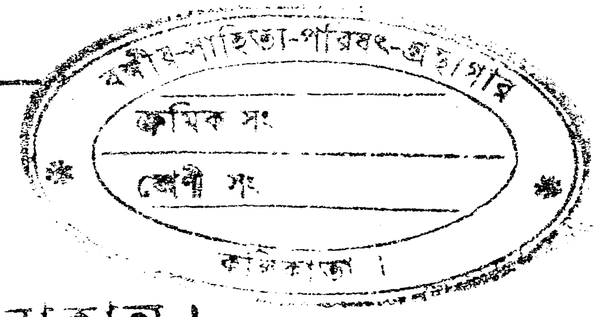

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এ জগতের সুখ দুঃখাদি জন্মান্তরের কর্ম্মফল মাত্র, এই অন্ধ বিশ্বাসে আমার বিবেচনায় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। সাধক কহিলেন, "এ জগতের সমুদয় বস্তুই কি বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অনেক বিষয়ের তথ্য অবধারণ করিতে হয়। সেই জন্য মহাশক্তি মানবের মনকে অতীব শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন। দেহ ধ্বংশ হয়, মন কর্ম্মরূপী আবরণ লইয়া দেহান্তরকে অবলম্বন করে। মনের উৎকর্ষ্য লাভে কখন কখন জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার জন্মান্তরের কথাও স্মরণ হয়। দিবসের পর রাত্রি রাত্রির পর দিবস যত সত্য, এক জন্মের পর পুনর্জন্ম তত সত্য। মহর্ষি চরক সংহিতায়

বলিয়াছেন, যাহার মতে জন্ম নাই, জন্মান্তর নাই, কর্ম্মনাই, কর্ম্মফল নাই, সে মহাপাপী অপেক্ষাও মহাপাপী, সুবৈদ্য যেন তাহাকে ঔষধ প্রদান না করেন। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও জ্ঞান লাভ জন্মান্তরের সুকৃতির ফল। রাজা বাহাদুর ভক্তিমান ও বিশ্বাসী, ইহার পক্ষে মৃত্তিকা নির্ম্মিত দেহে দেবীর অস্তিত্ব অনুভব করা অসম্ভব নহে। সাধকের এই কথা শুনিয়া রাজা বাহাদুর দেবীর আবির্ভাব অনুভব করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রবাদ আছে, সাধক দেবীর আবির্ভাব প্রদর্শন করাইয়া রাজা বাহাদুরের চিত্ত চাঞ্চল্য দূর করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে দুই প্রকার জনশ্রুতি আছে। প্রথম প্রবাদ এই—দেওয়ান বাহাদুর কহিলেন, "যদি আপনি দেবীর অঙ্গ ক্ষত করিয়া রক্ত দর্শন করাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা প্রাণ প্রতিষ্ঠায় দেবীর আবির্ভাব বিশ্বাস করিতে পারি।" সাধক বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমি রক্ত দর্শন করাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে আপনাদের মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে, আপনারা নিঃসন্তান হইবেন।" দেওয়ান ও রাজাবাহাদুর উভয়ে কহিলেন, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে, আপনি আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। সাধক তথাস্তু বলিয়া বিল্ব কণ্টক দ্বারা দেবীর দক্ষিণ হস্ত বিদ্ধ করিয়া রক্তদর্শন করাইলেন। কেহ কেহ বলেন, "সেই জন্য রাজাবাহাদুর ও দেওয়ান উভয়ে নিঃসন্তান হইয়াছিলেন।" এই প্রবাদ সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। সাধক যে ভুবন মোহিনীর ধ্যানে সর্ব্বদা বিভোর, যাহার চরণ তলে বসিয়া মা মা বলিয়া আত্মজ্ঞান শূন্য হন, জগৎ ভুলিয়া যান, তাঁহার পক্ষে স্বহস্তে দেবীর অঙ্গ ক্ষত করা নিতান্ত অসম্ভব। সাধক সংসারের দুঃখে সর্ব্বদাই কাতর, বিশেষতঃ তিনি মহারাজা বাহাদুরের আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছেন, যে কর্ম্মে মহারাজা বাহাদুরের মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তাঁহাকে সে কর্ম্মে নিয়োগ করা তাদৃশ মহাত্মার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। মহারাজা বাহাদুর সাধকের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি সাধকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কোন কর্ম্মে অনুরোধ করিবেন না। রাজা বাহাদুর দেবীর অঙ্গ ক্ষত করিয়া রক্ত দর্শন করাইবার অনুরোধ করিলে তিনি নিশ্চয়ই তাদৃশ রাজসঙ্গ পরিত্যাগ করিতেন! এই সকল কারণে পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়না। দ্বিতীয় প্রবাদ এই—দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূজাদি সম্পন্ন হইলে মূর্ত্তিতে আবির্ভাব সম্বন্ধে রাজা বাহাদুরের সমক্ষে জল্পনা উপস্থিত হয়। সাধক বলেন, দেবীর আবির্ভাব অনুভব করিবার শক্তি থাকিলেই অনুভব করা যায়। সেই শক্তি সম্বন্ধে দেওয়ান বাহাদুর ও সমাগত অনেকের সহিত বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সাধক

বলেন, "রাজা বাহাদুর বিশ্বাসী, শ্রদ্ধাবান ভক্তিমান, যাহার জন্মান্তরের সুকৃতিও বিস্তর, তাঁহার পক্ষে দেবীর আবির্ভাব অনুভব করা অসম্ভব নহে। রাজা বাহাদুর জানিতেন, সাধকের মুখে কখনও অসত্য বাক্য বাহির হয় না, দেবীর আবির্ভাব উপলব্ধি করিবার আশা তাহার বলবতী হইল। রাজা বাহাদুর কহিলেন, "গুরুদেব! আমি সংযম ও সাধনাহীন, কামাত্মা, আমার এরূপ অভিলাষ বাতুলের আকাশ ভ্রমণের ন্যায়, অন্ধের চিত্র দর্শনের ন্যায়, কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনার কৃপাদৃষ্টি থাকিলে সকলই সম্ভব, আমি জানি মহাত্মা দিগের অসাধ্য কিছুই নাই। পাপী তাপী দিগের উদ্ধারই তাহাদিগের কীর্ত্তি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যবন হরিদাসকে উদ্ধার করিয়া ছিলেন। মহাত্মারা ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইহা শুনিয়া সাধক মহারাজার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেবীর গৃহ প্রবেশ করিলেন। রাজা বাহাদুর করযোড়ে নতজানু হইয়া দেবীর পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণ নয়নে দেবীর চরণপদ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সাধক দেবীর সম্মুখে আসনে উপবেশন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন—,

এতদিনে জানিলাম দয়াময়ী কালী গো।
কাতর দেখিয়ে দীনে দরশন দিলি মা॥
এই মনে ছিল ভয়, আমি অতি দুরাশয়,
অধম দেখিয়ে বুঝি আমারে ত্যজিল গো॥
কমলা কান্তের বাণী, হেন মনে অনুমানি,
বুঝি শ্রীনাথের কথা সফল করিলি মা॥

সঙ্গীত শেষ হইলে সাধক করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া তন্ত্রোক্ত দেবীর কর্পূরাদির স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। মহারাজা বাহাদুর করযোড়ে তদবস্থায় সাধকের পার্শ্বে উপবিষ্ট। সুর ও ছন্দ সংযুক্ত স্তোত্র সাধকের মুখাধার হইতে ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইয়া কালীগৃহের প্রাঙ্গনস্থ ব্যক্তি বর্গের শ্রুতি যুগল কে পরিত্রস্ত ও তাহাদিগকে নিশ্চল ও নীরব করিল। মহারাজা বাহাদুরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। নতজানু, যোড়কর, নিশ্চল নয়নে দেবীর দিকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার অশ্রুপাত হইতে লাগিল, যেন তিনি কোন দেশে কোথায় আসিয়াছেন। কি এক পরমানন্দের স্রোত তাঁহার প্রেম পূর্ণ হৃদয় সাগর হইতে উত্থিত হইতে লাগিল, তিনি আত্মজ্ঞান ও অহঙ্কার শূন্য হইলেন। স্তব পাঠ সমাপ্ত করিয়া সাধক রাজা বাহাদুরকে দেবীর চরণ স্পর্শ করিতে বলিলেন।

রাজা বাহাদুর রক্তমাংসময় দেহীগণের পদদ্বয়ের ন্যায়, দেবীর পদ যুগলের কোমলত্ব অনুভব পূর্ব্বক আনন্দে অধীর ও জ্ঞানহীন হইয়া দেবীর চরণ তলে পতিত হইলেন। সাধক তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র তাহার জ্ঞান লাভ হইল, তিনি পুনর্ব্বার দেবীর চরণ স্পর্শ করিবারর অভিপ্রায়ে হস্ত প্রসারণ করিলেন। সাধক তাহাকে নিশেধ করিলেন। তিনি গদ গদ কণ্ঠে কহিলেন, "আজ আমি আপনার কৃপায় ধন্য হইলাম। আপনার সঙ্গীত শ্রবণের পর হইতেই আমি কি এক আনন্দ অনুভব করিতে ছিলাম। সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া রাজত্ব ঐশ্বর্য্য বল বীর্য্য ভোগ অপেক্ষা মুহূর্ত্তকাল এরূপ আনন্দ উপভোগ করা সহস্র-গুণে ভাল।" ইহা কহিয়া মহারাজা বাহাদুর যাহা দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন, অমাত্যবর্গের নিকট আহ্লাদের আনন্দের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই প্রবাদ অনেক বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ লোকের মুখে শোনা যায় ও ইহা বিশ্বাস যোগ্য দেবির প্রতিষ্ঠা মহাসমারহে সম্পাদিত হইল। সাধক মহারাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বিশুর সহিত বর্দ্ধমান কোটাল হাটে কালি বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অংশ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তি যুবরাজ প্রতাপ চাঁদের প্রকৃতি গত ছিল। তিনি সন্ন্যাসী ও সাধু সহবাসে বড় আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি শাস্ত্রালাপে অনেক সময় অতি বাহিত করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্ম গ্লানি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি রাজ শক্তিকে অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, মহাত্মাদিগের শক্তি আমি। এই অসীম শক্তি সম্পন্ন সংসার যন্ত্রে সাধক ও ভক্তিমান লোকই বলবান ও কর্ম্মী। তাঁহারাই অশেষ শুভ দায়ক সুফলের প্রসব করিয়া থাকেন। অহঙ্কারী, অজ্ঞানী ও আত্মজ্ঞান বিহীন ব্যক্তিরা সংসার যন্ত্রে জীবহীন ছবির ন্যায় বিবিধ অঙ্গেতে ঘুর্ণমান হইয়া থাকে। তাঁহার ধারণা হইল, বিষয় সম্ভোগ ও লোক সম্মান পরম পথের কণ্টক। তিনি আর বিষয় কর্ম্মে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। যিনি বর্দ্ধমান রাজসংসারের রাজস্ব আদায়ের অষ্টম আইন বিধিবদ্ধ করেন, যিনি রাজপুরুষদিগের নিকট বুদ্ধিমান, কর্ম্মী ও ন্যায় দর্শী বলিয়া সম্মানিত হইতেন, যিনি ন্যায় বিচারে প্রজাবর্গের অতিপ্রিয় হইয়াছিলেন,

যিনি তাঁহার অধিকার মধ্যে অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিবামাত্র অত্যাচারের মূলচ্ছেদ করিতেন, সেই প্রতাপচাঁদ আজ অনেক কর্ম্মে উদাসীন। আত্মার উৎকর্ষ্য লাভ করিয়া কি উপায়ে চিরশান্তি লাভ করিবেন, তিনি এখন সেই চিন্তায় ব্যাকুল। বুদ্ধিমান বিশ্বাসী মানব যেমন পরমাত্মীয় ঈশ্বরকে দুঃখের সময়, শোকের সময়, মনের যাতনা জানাইয়া শোক দুঃখের লাঘব করেন, চিত্ত চাঞ্চল্যের সময় তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার চিন্তায় শান্তি পান, প্রতাপচাঁদও তেমনি সাধকের নিকট আসিয়া প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলিতেন, প্রসাদে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ সকল স্মরণ ও তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া শান্তি লাভ করিতেন। একদা যুবরাজ কোটাল হাটে আসিয়া সাধকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শীতকাল, তুষার মণ্ডিত উত্তরীয় পবন তীব্র বেগে প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্যরশ্মি ক্ষীণ দীপ্তিতে সুখাস্পর্শ ও রমণীয় বোধ হইতেছে, শিশির সিক্ত তরু-রাজি শ্রীহীন হইয়াছে, শীত ঋতুর প্রখর কটাক্ষে সঙ্কুচিত, জড়ীভূত ও বিবর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছে। সাধক কালীগৃহের পৃষ্টদেশে, ও পবনের আবরণ স্থলে, অর্দ্ধঅঙ্গে সূর্য্যরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক আহারান্তে উপবেশন করিয়া বিশুর সহিত বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে সুখী হইতেছেন। রাজপুত্র উপস্থিত হইবামাত্র বিশু আসন প্রদান করিল ও সাধক সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন। প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "গুরুদেব! আমার বেশ প্রতীতি হইয়াছে, এই সকল বিচিত্র বর্ণ বস্ত্র সজ্জিত আজ্ঞাধীন দাসগণ, হস্তী, অশ্ব, অট্টালিকা, রজত, স্বর্ণ, মণি, মুক্তা পূর্ণ কোষাগার অতি অকিঞ্চিৎকর, ক্রন্দন শীল বালককে ভুলাইবারজন্য মাতৃ প্রদত্ত কাষ্ঠ পুত্তলিকা মাত্র। সম্পদ হইতে শান্তি পাওয়া যায় না, এই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ সংসারে সুখী কে? সাধক কহিলেন, "যুবরাজ আমি তোমাকে দেখিয়া সুখী হইতে পারিতেছি না।" মহারাজা বাহাদুরের মুখে শুনিয়াছি তুমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগ করনা। কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলায় সর্ব্বলোকের প্রত্যায় আছে। যদি তুমি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাসাধ্য ধর্ম্ম বুদ্ধিতে প্রতিপালন কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে সুখও শান্তি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেনা। কর্ম্মভূমি এই ভূমণ্ডলে সকল শ্রেণীর লোকেরই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে, সেই সকল কর্ম্ম যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া যথাশক্তি সম্পাদন করেন, বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। হংসগণ যেমন জলমগ্ন নিমগ্ন হইয়া আহার অন্বেষণ পূর্ব্বক জলের সহিত আহার গ্রহণ ও জলভাগ পতিত্যাগ করিয়া রুচির আহার উদরস্থ করে, তেমনি এই সংসার

সরোবরে কর্ত্তব্য পরায়ণ মানবগণ নিজ কর্ত্তব্য অনুসন্ধান ও সম্পাদন পূর্ব্বক অতি বাঞ্ছনীয় সুখ ও শান্তির আস্বাদন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই চতুর্বিধ বিষয়ের আলোচনা ও উপার্জ্জন চেষ্টা সংসারীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি তুমি অর্থ উপার্জ্জন ও কাম্য বস্তুর সম্ভোগে বিমুখ হও, সংসারে থাকিয়া তুমি সুখ লাভে বঞ্চিত হইবে। এই স্থলে তোমাকে এক পৌরাণিক ইতিবৃত্তের কথা বলিতেছি শোন। মহাভারত বন পর্ব্বে কথিত আছে, একদা বনবাস পীড়িত রাজা যুধিষ্টির পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া অনুজ নকুলকে জল অন্বেষণ করিতে বলিলেন। নকুল নিকটে এক দিব্য সরোবর দেখিয়া তাহার জলপান করিবামাত্র গতাসু হইলেন। জল আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া সহদেব, ভীম, অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে ঐ সরোবরে গমন ও জলপান করিবামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরিশেষে যুধিষ্টির তথায় গমন করিয়া ভ্রাতৃগণকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া নিতান্ত শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে কারণ অনুসন্ধান করিয়া সরোবরে পদার্পন করিবামাত্র আকাশ বাণী হইল রাজপুত্র ! এই সরোবর আমার রক্ষিত, আমি যক্ষ, আমি নিষেধ করিতেছি, তুমি জল পান করিও না। তোমার ভ্রাতৃগণ আমার বাক্য অবহেলা করিয়া এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, যদি তুমি আমার বাক্যে অবহেলা কর, তোমাকেও তাহাদের অনুগমন করিতে হইবে। তুমি অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তাহার পর জলপান করিও। যদি তোমার উত্তর আমার মনোমত হয়, তুমি জলপান করিতে পারিবে, তোমার ভ্রাতৃগণও জীবন লাভ করিবে। যুধিষ্টির কহিলেন, "আপনি কে ?" এবং দেখিলেন, বিরূপাক্ষ সম মহাকায় এক যক্ষ একটী বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। যুধিষ্টির কহিলেন, "হে মহাবাহো ? আমি যথাসাধ্য আপনার প্রশ্নের উত্তর করিব। আপনি প্রশ্ন করুন। যক্ষ বহুবিধ প্রশ্ন করিয়া সেই সকলের যথার্থ উত্তর পাইয়া সন্তোষের সহিত এই চারিটী প্রশ্ন করিলেন সুখীকে ? আশ্চর্য্য কি ? পথ কি ? বার্ত্তা কি ? যুধিষ্টির কহিলেন, অঋণী অপ্রবাসী হইয়া যে ব্যক্তি দিবসের পঞ্চম কি ষষ্ঠ ভাগেও শাকান্ন মাত্র ভক্ষণ করে, সেই সুখী। প্রাণীগণের জন্ম ও অকাল মৃত্যু দেখিয়া মানবের চৈতন্য হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য। মহাজন যে পথে গমন করেন, সেই পথ। অনন্ত কালসহ মায়া মোহ জড়িত প্রাণীগণের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনই বার্ত্তা। যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া যুধিষ্টিরকে জলপান করিতে অনুমতি দিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণকে জীবন দান পূর্ব্বক বকরূপে সরোবর মধ্যে একপদে দণ্ডায়মান হইলেন। যুধিষ্টির কহিলেন, "হে পুরুষ প্রবর ! আপনি কে ? বকরূপী ধর্ম্ম উত্তর করিলেন, তাতঃ !

আমি যক্ষ কিম্বা বক নহি, আমি তোমার পিতা ধর্ম্ম, আমি তোমার দর্শন জন্য এই সরোবরে আসিয়া ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম, আমার আশীর্ব্বাদে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। ইহা কহিয়া বকরূপী ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলেন। সাধক কহিলেন, যুবরাজ সুখী কে ? তোমার এই প্রশ্নের উত্তর যাঁহার মুখে কখনও [illegible] কুক্কুর বাহির হয় না, সেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির দিয়াছেন। তুমি অঞ্জলী [illegible] কালে কুক্কুর কিম্বা দাসীগণ পরিবৃত হইয়া যথাসময়ে প্রশস্ত পান [illegible] চক্ষু মুদ্রিত করে; কিন্তু ও তেমনি সংসারে তুমিই সুখী। তোমার পূর্ব্ব [illegible] বায়ু বহির্গত করিবে। বৃক্ষ তলে বাহাদুর অনেক অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে [illegible] হয়ে পলায়ন করে, লোকপ্রিয়, তুমি তাঁহাদিগের পথ অনুসরণ পূর্ব্বক সংসারে যশস্বী [illegible] পাখী সুখ ভোগ কর। অর্থচিন্তায় অবহেলা করিওনা। অর্থ অধার্ম্মিকের হস্তে বিষময় ফল উৎপাদন করে, কিন্তু ধার্ম্মিকের হস্তে অর্থ অমৃত স্বরূপ। ধর্ম্ম ও অর্থ উভয় চিন্তাই যথা সময়ে করিবে। বৎস সংসারীর পক্ষে অর্থশূন্যতা অতিশয় বিড়ম্বনা। যুবরাজ কহিলেন, গুরুদেব ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সংসারীর পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু যে ব্যক্তি পরমার্থ প্রার্থনা করেন, যে ব্যক্তি সংসারের দুঃখ জাল হইতে চিরশান্তি লাভের প্রয়াসী, আমার বোধ হয়, তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থা সংসার সুখ-ভোগে থাকিয়া আত্মার উৎকর্য্য লাভ, চিরশান্তি উপার্জ্জন, জন্মান্তর সাধ্য। মন প্রাণ একেবারে ঈশ্বরে সমর্পণ সম্ভোগ ও বিলাস প্রয়াসী সংসারীর পক্ষে অসম্ভব। সংসারে থাকিয়া মায়া মোহ ভোগ বিলাস একবারে বর্জ্জন নিতান্ত কঠিন। সেই জন্য প্রথমে তীর্থ পর্য্যটন ও সাধুসঙ্গ, পরে সংসার পরিত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণই উপযুক্ত উপায়। সাধক কহিলেন, "প্রতাপ দেশত্যাগ করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন ও আত্মার উৎকর্ষলাভের বাসনা নিজগৃহ পরিত্যাগ পরগৃহ বাসে সুখের প্রত্যাশার ন্যায় বিফল হয়। স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সংস্রব ত্যাগের নাম সংসার ত্যাগ, কিন্তু যদি তোমার মনের উপর বল না থাকে, তুমি যেখানে যাইবে যে বেশে থাকিবে, সংসার তোমাকে পরিত্যাগ করিবেনা; বরং ছদ্ম বেশী মন লইয়া তুমি বিদেশে বিকৃত বেশে অশেষ ক্লেশে অধিকতর সংসারী হইবে। যদি তুমি সংসারে থাকিয়া মনকে মনের মত করিতে পার, মনকে বিলাইয়া না দাও, দেহমধ্যে সচ্চিদানন্দকে সমর্পণ করিতে পার, তবে তোমার দেশত্যাগের, বেশ-ত্যাগের প্রয়োজন ? সংসারে থাকিয়া মনকে স্ববশে রাখিবার অনেক উপায় আছে। তোমার মত লোকের দেশত্যাগ নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কথিত আছে, একদা মহর্ষি জনক তাঁহার মহিষীর নিকট সংসার ত্যাগের বাসনা প্রকাশ

সরোবরে কর্ত্তব্য পরায়ণ মানবগণ নিজ কর্ত্তব্য অনুসন্ধান ও সম্পাদন পূর্ব্বক অতি বাঞ্ছনীয় সুখ ও শান্তির আস্বাদন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ বিষয়ের আলোচনা ও উপার্জ্জন চেষ্টা সংসারীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি তুমি অর্থ উপার্জ্জন ও কাম্য বস্তুর সম্ভোগে বিমুখ হও, সংসারে থাকিয়া তুমি সুখ লাভে বঞ্চিত হইবে। এই স্থলে তোমাকে এক পৌরাণিক ইতিবৃত্তের কথা বলিতেছি শোন। মহাভারত বন পর্ব্বে কথিত আছে, একদা বনবাস পীড়িত রাজা যুধিষ্ঠির পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া অনুজ নকুলকে জল অন্বেষণ করিতে বলিলেন। নকুল নিকটে এক দিব্য সরোবর দেখিয়া তাহার জলপান করিবামাত্র গতাসু হইলেন। জল আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া সহদেব, ভীম, অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে ঐ সরোবরে গমন ও জলপান করিবামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরিশেষে যুধিষ্ঠির তথায় গমন করিয়া ভ্রাতৃগণকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া নিতান্ত শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে কারণ অনুসন্ধান করিয়া সরোবরে পদার্পন করিবামাত্র আকাশ বাণী হইল রাজপুত্র! এই সরোবর আমার রক্ষিত, আমি যক্ষ, আমি নিষেধ করিতেছি, তুমি জল পান করিও না। তোমার ভ্রাতৃগণ আমার বাক্য অবহেলা করিয়া এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, যদি তুমি আমার বাক্যে অবহেলা কর, তোমাকেও তাহাদের অনুগমন করিতে হইবে। তুমি অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তাহার পর জলপান করিও। যদি তোমার উত্তর আমার মনোমত হয়, তুমি জলপান করিতে পারিবে, তোমার ভ্রাতৃগণও জীবন লাভ করিবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আপনি কে?" এবং দেখিলেন, বিরূপাক্ষ সম মহাকায় এক যক্ষ একটী বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহাবাহো? আমি যথাসাধ্য আপনার প্রশ্নের উত্তর করিব। আপনি প্রশ্ন করুন! যক্ষ বহুবিধ প্রশ্ন করিয়া সেই সকলের যথার্থ উত্তর পাইয়া সন্তোষের সহিত এই চারিটী প্রশ্ন করিলেন সুখীকে? আশ্চর্য্য কি? পথ কি? বার্ত্তা কি? যুধিষ্টির কহিলেন, অঋণী অপ্রবাসী হইয়া যে ব্যক্তি দিবসের পঞ্চম কি ষষ্ঠ ভাগেও শাকান্ন মাত্র ভক্ষণ করে, সেই সুখী। প্রাণীগণের জন্ম ও অকাল মৃত্যু দেখিয়া মানবের চৈতন্য হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য। মহাজন যে পথে গমন করেন, সেই পথ। অনন্ত কালসহ মায়া মোহ জড়িত প্রাণীগণের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনই বার্ত্তা। যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া যুধিষ্টিরকে জলপান করিতে অনুমতি দিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণকে জীবন দান পূর্ব্বক বকরূপে সরোবর মধ্যে একপদে দণ্ডায়মান হইলেন। যুধিষ্টির কহিলেন, "হে পুরুষ প্রবর! আপনি কে? বকরূপী ধর্ম্ম উত্তর করিলেন, তাতঃ!

আমি যক্ষ কিম্বা বক নহি, আমি তোমার পিতা ধর্ম্ম, আমি তোমার দর্শন জন্য এই সরোবরে আসিয়া ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম, আমার আশীর্ব্বাদে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। ইহা কহিয়া বকরূপী ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলেন। সাধক কহিলেন, যুবরাজ সুখী কে? তোমার এই প্রশ্নের উত্তর যাঁহার মুখে কখনও কুকুর বাহির হয় না, সেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির দিয়াছেন। তুমি অঞ্জলী কালে কুকুর কিম্বা দাসীগণ পরিবৃত হইয়া যথাসময়ে প্রশস্ত পান চক্ষু মুদ্রিত করে; কিন্তু তেমনি সংসারে তুমিই সুখী। তোমার পূর্ব্ব বায়ু বহির্গত করিবে। বৃক্ষ তলে বাহাদুর অনেক অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে ভয়ে পলায়ন করে, লোকপ্রিয়, তুমি তাঁহাদিগের পথ অনুসরণ পূর্ব্বক সংসারে যশস্বী পাখী সুখ ভোগ কর। অর্থচিন্তায় অবহেলা করিওনা। অর্থ অধার্ম্মিকের হস্তে বিষময় ফল উৎপাদন করে, কিন্তু ধার্ম্মিকের হস্তে অর্থ অমৃত স্বরূপ। ধর্ম্ম ও অর্থ উভয় চিন্তাই যথা সময়ে করিবে। বৎস সংসারীর পক্ষে অর্থশূন্যতা অতিশয় বিড়ম্বনা। যুবরাজ কহিলেন, গুরুদেব! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সংসারীর পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু যে ব্যক্তি পরমার্থ প্রার্থনা করেন, যে ব্যক্তি সংসারের দুঃখ জাল হইতে চিরশান্তি লাভের প্রয়াসী, আমার বোধ হয়, তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থা সংসার সুখ-ভোগে থাকিয়া আত্মার উৎকর্ষ্য লাভ, চিরশান্তি উপার্জ্জন, জন্মান্তর সাধ্য। মন প্রাণ একেবারে ঈশ্বরে সমর্পণ সম্ভোগ ও বিলাস প্রয়াসী সংসারীর পক্ষে অসম্ভব। সংসারে থাকিয়া মায়া মোহ ভোগ বিলাস একবারে বর্জ্জন নিতান্ত কঠিন। সেই জন্য প্রথমে তীর্থ পর্য্যটন ও সাধুসঙ্গ, পরে সংসার পরিত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণই উপযুক্ত উপায়। সাধক কহিলেন, "প্রতাপ দেশত্যাগ করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন ও আত্মার উৎকর্ষলাভের বাসনা নিজগৃহ পরিত্যাগ পরগৃহ বাসে সুখের প্রত্যাশার ন্যায় বিফল হয়। স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সংস্রব ত্যাগের নাম সংসার ত্যাগ, কিন্তু যদি তোমার মনের উপর বল না থাকে, তুমি যেখানে যাইবে যে বেশে থাকিবে, সংসার তোমাকে পরিত্যাগ করিবেনা; বরং ছদ্ম বেশী মন লইয়া তুমি বিদেশে বিকৃত বেশে অশেষ ক্লেশে অধিকতর সংসারী হইবে। যদি তুমি সংসারে থাকিয়া মনকে মনের মত করিতে পার, মনকে বিলাইয়া না দাও, দেহমধ্যে সচ্চিদানন্দকে সমর্পণ করিতে পার, তবে তোমার দেশত্যাগের, দেশ-ত্যাগের প্রয়োজন? সংসারে থাকিয়া মনকে স্ববশে রাখিবার অনেক উপায় আছে। তোমার মত লোকের দেশত্যাগ নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কথিত আছে, একদা মহর্ষি জনক তাঁহার মহিষীর নিকট সংসার ত্যাগের বাসনা প্রকাশ

অন্ধকার।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

বিশ্বচক্ষু অন্ধকার, অন্ধকার দিয়া—
করিয়াছে আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার।
দিবালোক লোপ করি প্রতি রন্ধ্র মাঝে—
মিশায়েছে আপনার অন্ধ কলেবর।
প্রদোষের মাঙ্গলিক শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি—
ঘোষিয়াছে নৃপতির রাজ্য অভিষেক।
সান্ধ্যবায়ু বিধুনিত রম্য কুঞ্জবনে
গাহিয়াছে বিহঙ্গম স্তুতি মাঙ্গলিক॥
লোককণ্ঠে দিবসের হট্ট গণ্ড গোল
মিশে গেছে অন্ধকার ঝিল্লি রব সনে;
ঘর্ঘর চকিত শব্দ শিল্প যন্ত্রোদ্ভূত—
মিলায়েছে অন্ধকারে বিরলে বিজনে॥
পিশাচ পিশাচীগণ শ্মশানে মশানে
করিতেছে সবে মিল উন্মাদ নর্ত্তন।
ভীষণ পেচক রব মগ্ন করি দেছে
দিবসের সুমধুর বিহঙ্গ কুজন॥
মহীপতি অন্ধকার অন্ধচক্ষু বলে
দেখিতেছে আপনার সাম্রাজ্য বিশাল।
ভাবিতেছে মনে মনে অটুট এ রাজ্য
স্বীয় করতলগত রবে চিরকাল॥
কিন্তু যবে পূর্ব্বভাগে তরুণ অরুণ
দেখা দিবে প্রভাতের রক্তিম অধরে।
জাগরণে স্বপ্নপ্রায়, টুটিবে অমনি
অন্ধকার বিশ্বরাজ্য দিবালোক পরে॥

বিমাতা।

নবম পরিচ্ছেদ।

মেঘমালা বলিলেন, "চরণামৃত পান করিবে ত?"

অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, নত শিরে সেই অঞ্জলি মুখের কাছে লইয়া গিয়া, ভক্তিভরে প্রাণধন উত্তর করিলেন, "তোমার ভাই ঐ প্রশ্নটা ভুল,—প্রকাণ্ড ভুল! চরণামৃতের কথা কি বলিতেছ, চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, হস্তামৃত, হৃদয়ামৃত কণ্ঠামৃত, ললাটমৃত, ইত্যাদি সর্ব্বামৃত পান করিয়া, পরিশেষে অধরামৃত পান করিব।

একজন দাসী আসিয়া প্রবেশ করিল। কথা বন্ধ হইয়া গেল। মেঘমালাকে সম্বোধন করিয়া দাসী বলিল, "মেম সাহেব আসিয়াছেন।"

তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, দেওয়ালের ঘড়ি দেখিয়া, চঞ্চলস্বরে মেঘমালা কহিলেন, "আটটা বাজিতে ১০ মিনিট দেরি, এত রাত্রে মেম সাহেব?—চেয়ার দিয়াছিস?

দাসী উত্তর করিল, "দিদিসাবুর ঘরে বসেছে, চেয়ার দিয়াছি, চা দিয়াছি, লিমনেট চাহিয়া ছিল, আনিবার জন্য রঞ্জন সিংকে পাঠিয়ে দিয়েছি, বিবিবলিলেন, তোমাদের বৌ বাবুকে খবরদাও, তাই আমি খবর দিতে এসেছি।

চকিত স্বরে প্রাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মেম সাহেব?"

মেঘমালা। মিশন হাউসের মেম।

প্রাণধন। কেন?

মেঘ। কুঞ্জকুমারীকে পড়াইতে হইবে, সেই বিষয়ের কথাবার্ত্তার জন্য।

প্রাণধন। সে কথা ইতিমধ্যে মেমসাহেব কিরূপে জানিল?

মেঘমালা। আমি চিঠি লিখিয়া ছিলাম।

প্রাণধন। তুমি মেম সাহেবকে জান নাকি?

মেঘমালা। মিশন হউসের গুটি পাঁচেক বিবির সঙ্গে আমার জানা শুনা আছে।

প্রাণধন। রাত্রে আসিল কেন?

মেঘমালা।—আজ বৈকালে আমি চিঠি লিখিয়াছিলাম, বোধ হয়, সন্ধ্যার পর পাইয়া থাকিবে।

প্রাণধন। তবেত মেম-সাহেবটি বেশ লোক।

মেঘমালা। বেশ না হইলে কি আমার সঙ্গে আলাপ হয়?

প্রাণধন। আমি একবার কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব ?

মেঘমালা। কেন পাইবেনা,— চল।

দাসীর দিকে ফিরিয়া মেঘমালা কহিলেন, "পদ্মা ! তবে তুই আগে যা,— বল্‌গিয়া, বাবু আর বৌবাবু একসঙ্গে আসিতেছেন।

পদ্মাবতী চলিয়া যাইবার জন্য দশ পা অগ্রসর হইবামাত্র বৌবাবু পশ্চাতে ডাকিয়া পুনর্ব্বার ,কহিলেন, "হাঁ হাঁ— দাঁড়া দাঁড়া,—শোন্ শোন্,— কুঞ্জকুমারী সেখানে আছে ?" পদ্মা উত্তর করিল, "দিদিবাবু উঠানের তুলসী তলায় বসে হরিনামের মালা নিয়ে জপ কর্‌ছেন।

এই উত্তর দিয়াই পদ্মা চলিয়া গেল। দেওয়ালের ঘড়ীতে টুং টুং করিয়া ৮টা বাজিল। প্রাণধনের সহিত মেঘমালা কুঞ্জ কুমারীরর গৃহের দিকে চলিলেন।

কুঞ্জ কুমারীর গৃহে কর্ত্তা গৃহিণী প্রবেশ করিয়া চেয়ারোপবিষ্টা মেমসাহেবকে সেলাম করিলেন, মেম সাহেবও দুইবার মাথা নোয়াইলেন, আসন হইতে উঠিলেন না। পাশের দুইখানি চেয়ারে কর্ত্তা গৃহিণী বসিলেন, ইতিপূর্ব্বে কুঞ্জ কুমারি পট্টবস্ত্র পরিধান করতঃ হস্তে কুড়েজালি লইয়া পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

বিবিটি দিব্য সুন্দরী। ইংরাজী সুন্দরীতে আর আমাদের দেশের সুন্দরীতে অনেকটা প্রভেদ, ইহা অনেকেই জানেন। এই বিবিটি ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী ; বর্ণের কথা বলিতে হয় না, শুভ্রাবর্ণা, নাতি স্থূলা নাতি কৃশা, লম্ব গ্রীবা, উপমায় সারস কণ্ঠি, উচ্চ ললাট, স্বর্ণকেশা.(ইংরাজি কামিনীরা কবি বর্ণনায় পূর্ব্বে ছিলেন পট্টকেশী, এক্ষণে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধিতে স্বর্ণকেশী হইয়া উঠিয়াছেন) স্বর্ণানেত্রা মুক্তাদন্তা ; কেন যে ইংরাজি কবিরা ইংরাজ কামিনীগণকে মুক্তাদন্তা বলেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না ; মুক্তাতে শ্বেতের সহিত লালের আভা, কিন্তু বিবিদের দন্ত অতি সদৃশ আমশ্র শুভ্রাবর্ণ ; মুক্তাদন্ত বলিলে অলঙ্কার দোষ হয়। যাহাই হউক, সৌন্দর্য্য বিচারে যে দেশের লোকের যেমন রুচি, তাহাই স্বভাব সঙ্গত হইয়া থাকে।

প্রাণধনবাবু ইংরাজী লেখা পড়ায় অপণ্ডিত নহেন, বিবির সঙ্গে ইংরাজীতেই তাঁহার কথা হইয়াছিল, কথোপকথনের নির্ঘণ্টটি কিন্তু আমরা ইংরাজীতে দিব না, মাঝে মাঝে বাঙ্গলা ছিল, তাহাই তুলিয়া দিব।

মেঘ সাহেবকে সম্বোধন করিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কুঞ্জ-কুমারীর বাল্য শিক্ষা কিরূপ হইয়াছে, তাহা কি তুমি পরীক্ষা করিয়াছ ?"

মিহিসুরে মিস্ লিবার্টি বাঙ্গালা ভাষায় উত্তর করিলেন, "পরীক্ষা করিয়াছে

পুস্তক পাঠে পরীক্ষা না করিয়াছে ; বাক্য কহিয়া জানিতে পারিয়াছে, হয় নাই মন্দ। (Itwas not Bad.) কুঞ্জকুমারী উত্তম বুদ্ধিমতীআছে, যদি তিনি পাঠ করেন দুই চারি ইংরাজী কিটাব, দুই-চারিমাসে উত্তম ইংরাজী হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

কথা গুলি শুনিয়া কর্ত্তা কিয়ৎ ক্ষণ মনে মনে ভাবিলেন, যাহাকে শিক্ষানিতে হইবে, তাহার জন্ম বঙ্গদেশে, তাহার মাতৃভাষা বঙ্গভাষা ; শিক্ষা গুরুটি বঙ্গ-ভাষায় ব্যুৎপত্তির যেরূপ পরিচয় দিলেন, তাহাতে ইহাঁর দ্বারা মাতৃভাষা শিক্ষায় যতদূর সুবিধা হইবে, তাহাত বেশ বুঝিতে পারা গেল ; তবে হাঁ, কথঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা হইতে পারিবে ;—হইতে পারিবে বটে, কিন্তু তাহাইবা সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হইবে কিসে ?—বাঙ্গালীর মেয়ে, বাঙ্গলা করিয়া বুঝাইয়া না দিলে সে মেয়ে নূতন নূতন ইংরাজী পদের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবে কিরূপে ? এই শ্বেত কুমারীটি যেরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় আমার সঙ্গে কথা কহিলেন, সেইরূপ বাঙ্গলায় যদি ইংরাজী পদাবলীর অর্থ বুঝাইয়া দেন, কিংবা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা পান, তবে ত কুঞ্জকুমারী একমাসের মধ্যেই মাতৃভাষা ভুলিয়া যাইবে,—এক বিকৃত ভাষা শিক্ষা করিবে উপায় এখন কি করা যায় ? প্রাণধন ভাবিলেন, উপায় এখন কি করা যায় ?—আমরা ভাবিতেছি, নিরুপায়। মেঘমালাদেবী নিমন্ত্রণ করিয়াই এই ক্ষুদ্র বিবিটিকে আনয়ন করিয়াছেন, ইহাঁর কাছে সুশিক্ষিতা করিয়া কুসংস্কারপ্রিয়া কুঞ্জকুমারীকে এক রূপবান সাহেব কুমারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে মিলাইয়া দিবেন, এই হইতেছে তাঁহার আসল মতলব ; প্রাণধনের সাক্ষাতেও তিনি নিজমুখে মুক্তকণ্ঠে সেই আসল মতলবটা একপ্রকার প্রাণ খুলিয়া ভাঙ্গিয়া বসিয়াছেন, মেমসাহেবকে শিক্ষাগুরু পদে মনোনীত না করিলে সহজে প্রাণধনের নিস্তার থাকিবে না। এক ঢিলে দুই পক্ষী বধ করা মেঘমালা দেবীর ঐ আসল মতলবের ভবিষ্যৎফল।—বিধবা বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ। নব্যবঙ্গ যুবকবর্গকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য বলিতে হইল।

উপরে বলা হইল, একঢিলে দুই পক্ষী বধকরা; প্রকৃত পক্ষে তিন পক্ষী বধকরাই মেঘমালার উদ্দেশ্য। দুটি পক্ষীর কথা বলা হইয়াছে, একটি পক্ষী বাকী। সে পক্ষীটি মেঘমালার হৃদয়-সিন্দুকের গুপ্ত বাসনা। সাবেক বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণে সদর অন্দর একাকার করা হইয়াছে, অন্তঃপুরনামে এখন আর পৃথক মহল নাই, পতিপত্নী এবং ইয়ার বন্ধু সকলেই একঘরে

বসিয়া রসালাপ চলিবে, ইচ্ছা হইলে অরুচি না থাকিলে নিধুবাবুর টপ্পা, দাশুরায়ের চতুর্থ খণ্ড পাঁচালী এবং গোপালে উড়ের সুমধুর বিদ্যাসুন্দর রসেরও তুফান ছুটিবে; এত স্বাধীনতা, এত আনন্দ,—এতদূর জমাট মজার অভিনয় করা মেঘমালার অভিলাষ; তাঁহার প্রস্তাবিত "অন্তঃপুর—নির্ম্মূলীণী" সভারও ঐটি মুখ্যউদ্দেশ্য বোধ হয়। উদ্দেশ্য তাঁহার সিদ্ধ করিতেও পারিবেন, কিন্তু আপনাদের দলে;—সাধারণ বঙ্গসমাজ তাঁহাদের দলকে কেমন চক্ষে দর্শন করিবেন, পরিণাম দর্শী পাঠকেরা তাহা অনুভব করিয়া লইবেন. আচ্ছা, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, একঢিলে তিনপক্ষী বধকরা কথাটার সার্থকতা কি রহিল? সার্থকতা আছে। বিধবা কুঞ্জকুমারী মেঘমালা দেবীর সপত্নী কন্যা; সম্পর্ক মহিমায় কুঞ্জকুমারীর প্রতি মেঘমালার স্নেহ যত্ন কত বেশী হওয়া সম্ভব, ভুক্তভোগী সমাজ তাহা অজ্ঞাত নহেন; সপত্নীকন্যাকে নিকটে রাখিয়া মেঘমালা সুখে থাকিবেন, এমন প্রত্যাশাকে তিনি কিছুতেই মনোমধ্যে স্থান দিতে পারেন না; স্ত্রীলোকেরা সপত্নী কন্যাগণকে কণ্টকের ঝাড় বলিয়া তাঁহাদের ভয় হয়; মাঝে মাঝে রাগ হয়; রাগের অগ্রে বিষধরী হিংসা আসিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আশ্রয় করে। মেঘমালা হইতেছেন প্রাণধনের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী,—বয়সে নবীনা,—স্বামীকে ক্রীতদাসের ন্যায় বসে রাখিয়া স্বয়ং সর্ব্বেশ্বরী হইয়া থাকা তাঁহার ইচ্ছা; তিনি সর্ব্বদাই ভাবেন, পূর্ণস্বাধীনতা গ্রহণ করিলেও সপত্নীকন্যার সহিত একত্র বাস করিলে নির্ব্বিঘ্নে সকল ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার সুবিধা থাকিবে না; অতএব কুঞ্জকুমারীকে ইংরাজিতে পণ্ডিতা করিয়া, সাহেবের সঙ্গে বিবাহ দিয়া, সংসার হইতে তফাত করাই তাঁহার আন্তরিক বাসনা। সংসার হইতে তফাত করাই এই অংশ পাঠকরিয়া কেহ যেন মনে না করেন."কুঞ্জকুমারীকে প্রাণে মারা মেঘমালার উদ্দেশ্য। আপনাদের গৃহসংসার হইতে কুঞ্জকুমারীকে সরাইয়া দেওয়াই মেঘমালার মনের নিগূঢ় ভাব।

এখন আমরা বুঝাইব, এক ঢিলে তিনপক্ষী বধকরা। এখানে ঢিলের নাম কুঞ্জকুমারীর ইংরাজী শিক্ষা;—প্রথম পক্ষীর নাম বিধবা বিবাহ, দ্বিতীয় পক্ষীর নাম অসবর্ণবিবাহ, তৃতীয় পক্ষীর নাম সুখের গৃহ হইতে কুঞ্জকুমারীকে তফাত করা। তফাত করিবার মতলবের আর একটি বিশেষ হেতু আছে; কুঞ্জকুমারী প্রাণধনবাবুর ঔরসজাত কন্যা,—মাতৃহীনা,প্রকৃতিঃ শিক্ষায় সে একটি স্নেহউৎপন্ন হয়, জন্মদাতা পিতার সেই স্বাভাবিক স্নেহের অন্ততঃ কিয়দংশও যদি কুঞ্জকুমারীর উপর পড়ে, তাহা হইলে মেঘমালার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইবে, পূর্ণস্নেহের অংশী রহিয়াছে, ভাবিয়া মেঘমালা সর্ব্বদা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকিবেন, মুহূর্ত্তের

জন্যও সুখ পাইবেন না, অহরহ বৈরনির্য্যাতনের ছল অন্বেষণে ফিরিবেন। মেঘমালা ভাবিয়াছেন, সে কর্ম্মটা ভালনহে। অন্যপ্রকার উপায়ে বৈরনির্য্যাতনের চেষ্টা না পাইয়া,কৌশলে সহজে নির্দ্দোষ উপায়ে ইষ্টসিদ্ধ করাই ভাল; এইনিমিত্ত অধিক আগ্রহে কুঞ্জকুমারীকে ইংরাজীতে সুশিক্ষিতা করিবার আকিঞ্চন।

বঙ্গভাষায় মেমসাহেবের অধিকার নাই দেখিয়া, প্রাণধনবাবু তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। মেঘমালার ভয়ে মেমসাহেবকে নিজ কুমারীর শিক্ষয়িত্রীপদে নিযুক্ত করিতেই হইল। মেমসাহেব হাস্য করিতে করিতে আর গুটীকতক বাঙ্গলা কথা কহিয়া ছিলেন, পূর্ব্বের কথা গুলি অপেক্ষা সেই শেষের কথা গুলিতে আরও অধিক পরিমাণে রংতামাসা প্রকাশ হইয়াছিল, মেঘমালার ভয়ে তথাপি প্রাণধন সে সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিলেন না।

কথা বার্ত্তা শেষ করিয়া বিবিটি সেরাত্রে চলিয়া গেলেন; ধার্য্য হইয়া রহিল, ৫০টি টাকা মাসিক পুরস্কার।

বিদায় হইবার জন্য মিস লিবার্টী আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, পুরস্কার ধার্য্য হইবার পর আন্তরিক আহ্লাদে পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন; কুঞ্জকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া, বাঙ্গালা কথায় কর্ত্তাকে বলিতে লাগিলেন, "বাবু মহাশয়! ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে তোমাদের মেয়ে লোকেরা সংসার পছন্দ করিতে না পারক হইবে। মোদের বেলাতে সকল বালিকারা শিক্ষাকরে ভাল বিদ্যা; সেই কারণে মোদের বেলাতে সকল বিবিলোকের স্বাধীনতা হয়, জীবলোকের প্রতি তানারা দয়া করে, পুরুষলোক দর্শন করিলে সরম করে না, তোমাদের পুত্র যাহাকে সাদী করে, তাহাকে তোমরা কি বলেন? Stop! Stop! let me see! হাঁ—হাঁ, বহুমা; তোমাদের দেশের বহুমারা যেমন করিয়া গোমটা (ঘোমটা) দিয়া মুখ ডাকিয়া রাখে, মোদের বেলাতের বিবিলোকেরা তেমন করিয়া গোমটা দেয় না; হপ্তাহে হপ্তাহে প্রতি স্যাবাথে ভাল ভাল সজ্জা পরিধান করিয়া ফিটার হস্তে হাস্য করিতে করিতে সাহেব লোকের সঙ্গে চার্চ্চে যায়। হাঁ,—চার্চ্চের কথা—তোমাদের চার্চ্চ আছে না; ধর্ম্মের জন্য তোমরা পুতুলের পূজা করে; কুঞ্জকুমারীকে আমি ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে, আমাদিগের ধন্য ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যেশু খৃষ্টের পবিত্র নাম তাহার কর্ণে আমি শুনাইবে; পাপীলোকের পরিত্রাণের নিমিত্ত দয়াময় প্রভু যেশু আপনার শরীরের রক্ত দিয়া গিয়াছেন।"

ক্রমশঃ

প্রার্থনা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ফজলরহমান খাঁ জি, টী।

পরমেশ! ইহকাল পরকাল গতি,
কি করিব তব স্তুতি আমি ক্ষুদ্র মতি।
দয়ার সাগর নাথ তুমি সর্ব্ব শক্তিমান,
সাধিতেছ অবিরাম মোদের কল্যাণ।
আমার শকতি নাই বর্ণিতে তোমাকে,
তোমার শকতি সব বর্ণিতে আমাকে।
জগতের সব কাজ তোমার কৃপায়,
তোমার করুণা বিনে নাহিক উপায়।
আমি যে কাজই করি সবই তোমার,
তুমি যে কাজই কর তাহাও তোমার।
কলে পরিচয় তাই পাইবে কাজেতে,
জলের তিলেক কভু রয়না ভালেতে।
তোমার কল্যাণে যবে ধরেছি কলম,
যাহা লিখি হয় যেন সদৃশ মলম।
সে টুকু দিয়াছ তুমি শকতি আমার,
সে টুকু প্রকাশি যেন "করে" আপনার।
এ ভরসা দেহ তুমি বসিয়ে স্বংগে,
স্পর্থ মানি হই যেন কবির সোহাগে।
সুধাংশুর কিরণে শীতল প্রাণীগণ,
হিমকর বলি আখ্যা হল সে কারণ।
ধরণী পাঠক দোষ কলঙ্কী বলায়,
এ চাঁদ কলঙ্কহীন উদিত ধরায়।
জগৎ তাঁহার কাছে শান্তি শিখিয়াছে,
শত্রুতেও তাঁর করে ভিক্ষা ধরিয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক বা

য়্যান্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১০, ছোট বোতল ১০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্ড মার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নবীবল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রীতিমাখান

সুন্দর মুখখানি

কিসে হয় ইহার সমস্যা: আমরাই করিয়া দিব। একরাশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৶০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী-ব্যাধিতে-অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১।৷০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ৷৶০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 28

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্র
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

৯শ, বর্ষ]. আশ্বিন, ১৩৩০, [৬ষ্ঠ, সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ভক্ত প্রেম দাস	শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস	১৬১
লীলাময়	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	১৭৫
সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৭৭
বাঙ্গালীর মেয়ে	ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৮১
বিমাতা	... ...	১৮৪
গীত	শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস	১৮৯
বিবিধ-প্রসঙ্গ	... ...	১৯০
সমালোচনা	... ...	১৯২

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত

le. Phone 388 Barabazar. 10-12-23

জ্বরেরযম জারম্মলীন সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

মূল্য ৷৷০, ডজন ৫৲, গ্রোস ৫০৲, পাইকারী দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

ার, গোভিন এণ্ড কোং, হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার

ারকূলার রোড ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

elegram:—GERMALINE. Telephone No. 1888

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা : "ফিজীশিয়ান"

টেলিফোন নং : ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

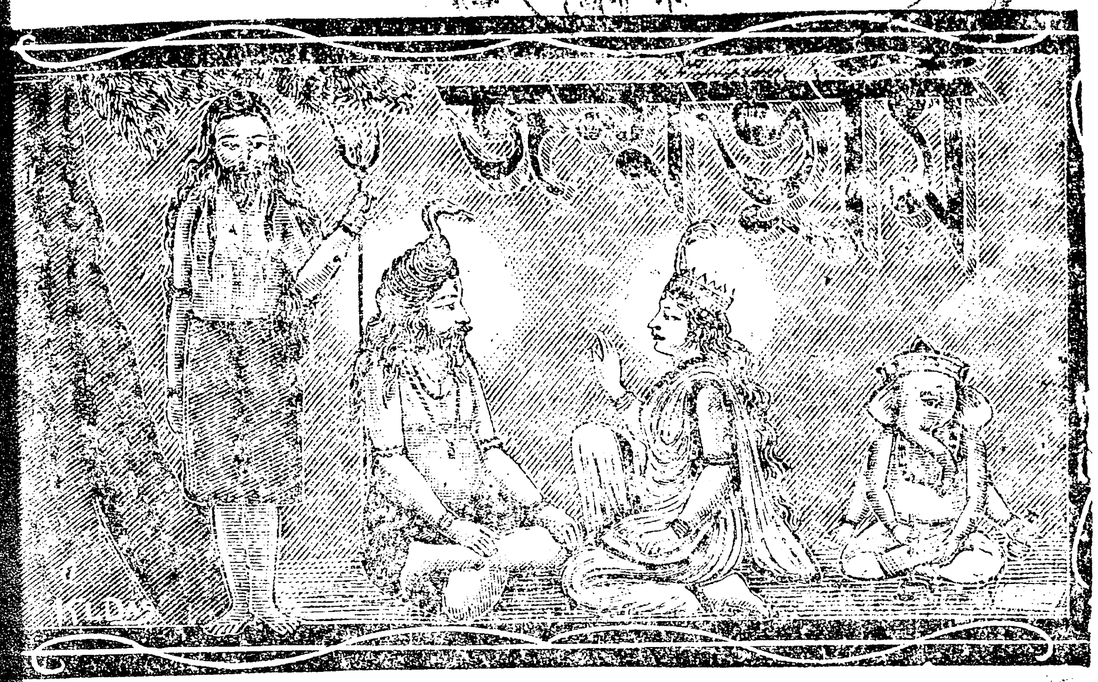

২৯শ, বর্ষ। ১৩৩০ সাল, আশ্বিন। ৬ষ্ঠ, সংখ্যা।

ভক্ত প্রেম দাস।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস।

একদিন নারদ বীণায় হরিগুণগান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন;—শ্রীহরি বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে একটী মনোরম পুরী নির্ম্মাণের জন্য বড়ই ব্যস্ত আছেন। নারদ শ্রীহরিকে ব্যস্ত দেখিয়া—কাহার জন্য ঐ পুরী নির্ম্মাণ হইতেছে, জানিবার জন্য, শ্রীহরির নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীহরি নারদকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বসিতে আজ্ঞা করিলেন। নারদ আসনে উপবেশন করিয়া শ্রীহরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! এই স্বর্ণময় সুন্দর পুরীটী কাহার জন্য নির্ম্মিত হইতেছে?"

শ্রীহরি কহিলেন, "মর্ত্তলোকে আমার একটী অতি প্রিয় ভক্ত আছে, তাহার বাসস্থানের জন্য এই পুরী নির্ম্মাণ করাইতেছি।" এই কথা শুনিয়া নারদ

অহঙ্কার বশতঃ মনে মনে কহিলেন, "আমার চেয়ে প্রিয় ভক্ত প্রভুর আর কেহ আছে নাকি? যাহা হউক আমার সেই ভক্তটীকে একবার দেখিতে হইবে।" তখন প্রকাশ্যে কহিলেন, "প্রভো! আমি কি আপনার সেই প্রিয় ভক্তটীকে একবার দেখিতে পাই! যাহার জন্য এই ত্রিভুবন দুর্ল্লভ মনোরম পুরী নির্ম্মান করিতেছেন?"

শ্রীহরি নারদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "হাঁ! তুমি স্বচ্ছন্দে আমার সেই প্রিয় ভক্তটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পার! কিন্তু নারদ তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি,—তাহার সহিত অতি সাবধানে সাক্ষাৎ করিও; কারণ তাহার নিকট তোমার ঘোরতর অনিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা আছে।"

ভগবানের কথা শুনিয়া নারদ মনে মনে কহিলেন, "এমন ভগবৎ ভক্তের কথাত কখনও শুনি নাই,—যাহার নিকটে গেলে অনিষ্ঠ হয়। যাহা হউক তাহাকে একবার দেখিতেই হইবে। তাহাতে যদি ঘোর অনিষ্ঠ হয়—ক্ষতি নাই।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "প্রভো! আপনার কথার অর্থ আমি সম্যক অবগত হইতে পারিলাম না। আপনার প্রিয় ভক্তের নিকট অপর প্রিয় ভক্ত গমন করিলে সে তাহার অনিষ্ঠ করে—এমন ভক্তের কথা আপনার মুখে আজ নূতন শুনিলাম। অতএব আপনার সেই অত্যাশ্চর্য্য ভক্তটীকে দেখিতে বড়ই বাসনা হইয়াছে। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার নাম ধাম বলিয়া দেন, তাহা হইলে এ দাস তাহাকে দর্শন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হয়।"

শ্রীহরি কহিলেন, "যাও তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু—সাবধানে যাইও। যদি সে তোমার কোন অনিষ্ঠ করিয়া বসে, তাহা হইলে আমার রক্ষা করার কোন ক্ষমতা নাই। কারণ আমাকেও তাহার নিকট তটস্থ হইয়া থাকিতে হয়।"

নারদ কহিলেন, "আমি অতি সাবধানেই যাইব, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন তাহার নাম ও ধাম বলিয়া চরিতার্থ করুন।"

শ্রীহরি কহিলেন, "শান্তশীল, নগরে প্রেমদাস নামে এক ব্যক্তি আছে; সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয় ভক্ত। তুমি সেই নগরে গমন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর।"

নাম ও ধাম শুনিয়া নারদ আনন্দ ভরে বীণায় হরিনামের ঝঙ্কার দিয়া তথা হইতে উঠিলেন এবং ঢেঁকির উপরে আরোহন করিয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে মর্ত্তলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "প্রভু আমাকে সাবধান হইয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন;—অতএব এ বেশে তাহার

সহিত সাক্ষাৎ করা হইবে না।" তখন ঢেঁকিকে বিদায় দিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন এবং বীণাটীকে এক বৃক্ষ কোটরে লুকাইয়া রাখিয়া প্রেমদাসের বাড়ীতে গমন করিয়া অতিথি হইলেন। তখন দিবা মাত্র দেড় প্রহর। প্রেমদাস কার্য্যউপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছেন। বাড়ীতে একমাত্র প্রেমদাসের স্ত্রী কল্লোলিনী ব্যতিত আর কেহ তখন উপস্থিত ছিলেন না। কল্লোলিনী একজন অতিথিকে গৃহে সমাগত দেখিয়া ব্যস্তে ব্যস্তে পাদ্য অর্ঘ আসন আনিয়া দিলেন এবং অতি মধুর বচনে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

মহামতি নারদ কল্লোলিনীর সাদর সম্ভাষণ শুনিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং আসনে উপবেশন করতঃ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কল্লোলিনী আসিয়া কহিলেন, "প্রভো! দ্বিপ্রহর আগত প্রায়, আপনি স্নানাদি করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন পাক করুন।'

নারদ কহিলেন, "মা! তুমি পাক করিলেই চলিবে। আমার স্বহস্তে পাক করিবার প্রয়োজন নাই। আরও তোমার হাতে খাইতে আমার বড়ই বাসনা হইয়াছে।" কল্লোলিনী অতিথির কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি স্নানাদি করিয়া উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জন ও পরমান্ন পাক করিলেন। অতিথিও ইত্যাবসরে স্নানাদি করিয়া আসিলেন। পাক সম্পন্ন হইলে কল্লোলিনী অতিথিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রভো? দ্বিপ্রহর গত হইতে চলিল—অতএব অনুমতি করুন, আপনার আহারের জন্য অন্ন প্রস্তুত করি?"

নারদ কহিলেন, "মা! এখন অন্ন প্রস্তুত করিয়া কাজ নাই, গৃহ-স্বামী বাড়ী আসিলে তাহার সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন করিব।"

কল্লোলিনী কহিলেন, "প্রভো! আমাদের কর্ত্তা অত্যন্ত উগ্রস্বভাবের লোক। যদি আসিয়া শোনেন আপনার এখনও আহার হয় নাই;—তাহা হইলে একটা কাণ্ড করিয়া বসিবেন। অতএব আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি এখন ভোজন করুন।

নারদ কহিলেন, "মাগো! তোমার কোন ভয় নাই। গৃহস্বামী যাহাতে তোমার উপর রাগ না করেন, সে উপায় আমি করিব। তুমি নিশ্চিন্ত মনে তাহার আগমনের অপেক্ষা কর।"

এই কথা শুনিয়া কল্লোলিনী আর বাক্য ব্যয় করিলেন না। প্রায় তিন প্রহরের সময় প্রেমদাস অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গৃহে আগমন করিলেন। মণ্ডপে একজন অতিথিকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মস্ত একটা নমস্কার করিয়া

বাড়ীর ভিতরে গমন করিলেন এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতিথির আহারাদি হইয়াছে ?"

কল্লোলিনী কহিলেন" তোমার সঙ্গে একত্রে ভোজন করিবে, বলিয়া অতিথি এখনও আহার করেন নাই। তিনি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। আমি অনেকবার আহার করিতে অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু—উনি তোমার মত এক গোঁ ধরিয়া আছেন।"

স্ত্রীর কথা শুনিয়া প্রেমদাস অতিথির নিকট যাইয়া কহিলেন, "আপনি এখনও আহার করেন নাই কেন ?"

নারদ কহিলেন, "আপনার সহিত একসঙ্গে ভোজন করিব তাই এখনও আহার করি নাই।"

প্রেমদাস কহিলেন, 'সেদিন এক ঠাকুর আসিয়া আমাকেএই কথা কহিলেন, —যে গৃহস্থ অতিথিকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে ভোজন করে, তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হয় এবং ঊর্দ্ধতন ও অধঃতন চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হয়। সেই হইতে আমি অতিথির আহার না হইলে কখনও আহার করি না। অতএব আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি অগ্রে ভোজন করুন—পশ্চাৎ আমি আহার করিব।"

নারদ কহিলেন, "সত্য বটে, সে কথা। কিন্তু ইহাও শাস্ত্রে আছে, অতিথির অনুমতি লইয়া কিম্বা অতিথির সন্তোষ বিধানার্থে এক সঙ্গে আহার করিলে কোন দোষ হয় না। অতএব এ ক্ষেত্রে আপনার কোন দোষ হইবে না।"

প্রেমদাস আর কোন কথা না বলিয়া গৃহিণীকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিলেন। কল্লোলিনী অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া একটী ঘরের মধ্যে উভয়ের আসন করিয়া দিলেন। প্রেমদাস অতিথিকে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহ অভ্যান্তরে গমন করিলেন। নারদ আসনে উপবেশন করিয়া দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,—তিন খান তীক্ষ্ণধার সম্পন্ন ত্রিহস্ত পরিমিত খড়্গা দেওয়ালের গায়ে লম্বায়মান রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া নারদ অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং মনে মনে কহিলেন, "প্রভুর মুখে শুনিয়াছি, এ ব্যাক্তি পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের গৃহে শক্তি পুজার সামগ্রী। যাহারা কামার্থে বলির দ্বারা পূজা করে, তাহারা বৈষ্ণবপদ বাচ্য হইতে পারে না। এ ব্যাক্তি কেমন ভক্ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" এইরূপ নানান চিন্তা করিয়া আচমন করিলেন এবং অন্ন নারায়ণে নিবেদন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রেমদাস আচমন ও নিবেদনের কোন ধার ধারেন না। অতিথির অনুমতি পাইবামাত্র

গো গ্রাসে অন্ন ব্যঞ্জন উদরসাৎ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া নারদ মনে মনে কহিলেন, "এ আবার কেমন ভক্ত! অন্ন প্রভুকে নিবেদন না করিয়া রাক্ষসের মত আহারে প্রবৃত্ত হইল। যাক ; পরে এ কথা জিজ্ঞাসা করিব"।

ক্ষণ কাল পরে নারদ কহিলেন, "লোকমুখে শুনিয়াছি, আপনি একজন পরম হরিভক্ত। তবে আপনার গৃহে হিংসার জিনিষ ঐ তিন খানি খড়্গা কেন ?"

প্রেমদাস খাইতে খাইতে কহিলেন, "ও দুঃখের কথা আর বল্‌বেন না। সে কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এতই রক্ত গরম হয় যে—যদি তাহাদের পাই, তবে এখনি বলিদান দিয়া জল খাই।"

নারদ কহিলেন, "ব্যাপার কি বলুন দেখি ?"

প্রেমদাস কহিলেন, "আমার প্রভুর তিন জন ঘোর শত্রু আছেন। সেই তিন জনের জ্বালায় তিনি এতই জ্বালাতন হন যে—খাইতে শুইতে বসিতে এক তিলও সুস্থির হতে পারেন না। তাই আমি প্রভুর কষ্ট দেখিয়া ঐ তিন খানি খড়্গা তৈয়ারী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; তাহাদের দেখা পাইলেই খড়্গা দ্বারা বলি দিয়ে—প্রভুকে নিষ্কণ্টক করিব।"

নারদ কহিলেন "কোন তিন জন আপনার প্রভুর পরম শত্রু ?"

প্রেমদাস কহিলেন, "একজন ধ্রুব একজন প্রহ্লাদ ও একজন নারদ। সব চেয়ে নারদ মুনি প্রভুকে বেশী জ্বালাতন করে থাকেন। তার জন্য ঐ খড়্গাখানি তৈয়ারী ক'রে রেখেছি। এখন তার সাক্ষাৎ পেলে হয়। প্রভুর কৃপায় একদিন না একদিন নিশ্চয় তাকে পাইব। সেই দিন কোন বিচার না করিয়া বলিদান দিব।"

প্রেমদাসের কথা শুনিয়া নারদ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে কহিলেন, "এ যদি আমাকে নারদ বলিয়া চিনিতে পারে, তাহা হইলে এখান ঐ খড়্গা খানা আমার গলায় বসাইবে। তাইতে প্রভু বলিয়াছিলেন, সাবধান হইয়া সাক্ষাৎ করিও, এখন সে কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। যাহাতে আমাকে নারদ বলিয়া চিনিতে না পারে, তজ্জন্য খুব সতর্ক হইতে হইল।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতে লাগিলেন! কল্লোলিনীও নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে আচমন করিলেন এবং একটী তাম্বুল গ্রহণ করিয়া প্রেমদাসের নিকট বিদায় হইয়া গ্রামের বাহির হইলেন। বৃক্ষ কোটর হইতে বীণাটী গ্রহণ করিয়া ঢেঁকিকে স্মরণ করিলেন ; স্মরণ মাত্রেই ঢেঁকি আসিয়া উপস্থিত হইল। নারদ ঢেঁকিতে আরোহন করিয়া বীণায় হরি গুণ গান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীহরি নারদকে দেখিয়া মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "কি নারদ! ভক্তটীর সহিত সাক্ষাৎ হল?"

নারদ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "প্রভু আপনার কথাই ঠিক। আমি যদি আপনার কথায় অবহেলা করিয়া—সাবধান না হইয়া যাইতাম; তবে আজ পৃথিবী হইতে নারদ নাম লোপ হইত। বাপরে বাপ! আপনার এমন শাক্ত ভক্ত কোথাও দেখি নাই।"

শ্রীহরি কহিলেন, "ব্যাপার কি বল দেখি! সে আমার প্রিয় ভক্ত—শাক্ত ভক্ত কেমন?"

নারদ আনুপূর্ব্বিক সকল বিষয় শ্রীহরির গোচর করিলেন।

শ্রীহরি সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, "তাহাকে পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছ ত? না খড়্গ দেখিয়া পলাইয়া আসিয়াছ?"

নারদ কহিলেন, "পরীক্ষা করিতে গিয়া যদি ধরা পড়ি, তাহা হইলে আমার দফা রফা শেষ হয়—সেই ভয়ে পরীক্ষা করিতে সাহস করি নাই। বাপরে বাপ সেই ভীষণ খড়্গের কথা মনে হইলে এখনও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।"

শ্রীহরি কহিলেন, "তুমি যে এত ভীতু তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। তাহাকে পরীক্ষা করা তোমার সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল। অন্ততঃ একটা কোন্দল বাঁধাইয়া যদি আসিতে তাহা হইলে তোমার নাম থাকিত?"

নারদ কহিলেন, "শক্তের নিকট সকলি ভক্ত মহাশয়। ও সব স্থানে নারদের কোন্ চাল্ চোল্ খাটে না। পরীক্ষা করিতে যাইয়া মাথাটা তার হাতে দিয়ে আসি আর কি! আমি ভীতু ইহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনিও দেখ্‌ছি আমার চেয়ে আরও ভীতু। তা না হইলে আগে হইতে তার জন্য একটা প্রকাণ্ড পুরী তৈয়ারী করিবেন কেন? কি জানি, সে যদি আপনার জন্য একখানি খড়্গ তৈয়ারী করিয়া গো ধরিয়া থাকে।"

শ্রীহরি বাধা দিয়া কহিলেন, "যাক্ বাজে কথায় আর কাজ নাই। তুমি পুনঃরায় সেখানে গমন করিয়া তাহাকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া আইস।

নারদ কহিলেন, "আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু প্রভু বলুন দেখি, ধ্রুব প্রহ্লাদ ও আমি আপনার পরমশত্রু কিসে? আমাদের জ্বালায় নাকি আপনি এক তিলও স্থির হতে পারেন না। আরও আপনার ভক্তটী আমাকেই আপনার ভীষণ শত্রু মনে করেছে। আমি অনেক চিন্তা করিয়া ইহার প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে পারি নাই। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বুঝাইয়া দিয়া চরিতার্থ করুন?"

শ্রীহরি কহিলেন, "বাস্তবিক তাহার ধারণা মিথ্যা নয়। তোমাদের জন্য আমার একতিলও স্থির হইবার উপায় নাই। যেই আমি অবকাশ মত একটু বসিয়াছি, অমনি ধ্রুব ডাকিল, কোথায় হে পদ্ম পলাশ লোচন হরি" আমি তৎদণ্ডে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া আসিতে না আসিতে প্রহ্লাদ ডাকিল, "কোথায় হে দয়াময় বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন একবার দয়া কর প্রভু। দেখ যেন বিপদ ভঞ্জন নামে কলঙ্ক না হয়।" এই ডাক শুনে আর কি থাকিতে পারি। অমনি সেই পায়ে সে স্থানে উপস্থিত হয়ে তাহাকে রক্ষা করিলাম। তবে ইহারা আপদে বিপদে পতিত হলে আমাকে ডাকে। অন্য সময় আমাতে চিত্ত অর্পণ করে বসে থাকে। কিন্তু তুমি দিবা রাত্রি শয়নে স্বপনে জাগরনে আপদে বিপদে সুখ শান্তিতে সকল সময়েই হে হরে হে হরে বলিয়া ডাকিতে থাক। তোমার জ্বালায় আমার বৈকুণ্ঠে থাকা দায় হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য ভক্তটী তোমাকে আমার ঘোর শত্রু মনে করিয়াছে। আমাকে বিরক্ত করিলে ভক্তটী মোটেই তাহা পচ্ছন্দ করে না। সে তাহার শত্রু বলিয়া বিবেচনা করে।

নারদ শ্রীহরির কথা শুনিয়া কহিলেন, "প্রভু আবার চলিলাম। আপনার সেই ভক্তটীকে একবার পরীক্ষা করিয়া আসি।" এই বলিয়া ঢেঁকিতে চড়িয়া শান্তশীল গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এবার নারদ এই ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে প্রেম দাসের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। অতিথি ব্রাহ্মণকে আগত দেখিয়া প্রেমদাস তাঁহার সাদর সম্ভাষণ করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রদান করিলেন। নারদ আসনে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ও প্রেম দাসের কার্য্যের পর্য্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রেম দাস কখন দম্ভ প্রকাশ, কখন আত্মগরীমা, কাহাকেও ভয় প্রদর্শন, ইত্যাদি দাম্ভিকতার সহিত কার্য্য ও কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এক ব্যাক্তি ভগবানকে দোহাই দিলে প্রেমদাস কহিলেন, "রেখেদে তোর ভগবানের দোহাই। আমিও সব দোহাই মানি না, আগে কড়ায় গণ্ডায় শোধ কর, তার পর দোহাই দে।" নারদ প্রেমদাসের কথা শুনিয়া মনে মনে কহিলেন, "যে ব্যক্তি এত অহঙ্কারী সে প্রভুর কেমন ভক্ত—তাহাত বুঝিতে পারি না। যাহার মনে আত্ম গরিমা আছে, সে কি কখন ভক্ত পদবাচ্য হইতে পারে? যাহা হউক, ইহার সহিত আলাপ করিলে কেমন ভক্ত বুঝা যাইবে।"

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা উর্ত্তিণ হইয়া গেল। প্রেমদাস বিষয়কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া

গৃহিণীকে কহিলেন, "একটী ব্রাহ্মণ অতিথি আছেন, তাঁহার পাকের বন্দোবস্ত করিয়া দাও।" কল্লোলিনী তৎদণ্ডে স্বামীর আদেশ পালন করিলেন। নারদ সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করিয়া পাক করিলেন এবং আহারাদি করিয়া মণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। প্রেমদাসও আহারাদি করিয়া অতিথির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হয়, শুনিবার জন্য কল্লোলিনী বেড়ার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নারদ মনে মনে কহিলেন, "এযাবত পর্য্যন্ত প্রভুর নাম—একবার ও ইহার মুখে শুনিলাম না। কেবল সংসারের কথা লইয়া ব্যস্ত। এখন একবার ইহার সহিত আলাপ করিয়া দেখি—তাহাতে যদি ভক্তের কোন পরিচয় পাওয়া যায়। এই বলিয়া প্রকাশ্যে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রেমদাসও তাহার উত্তর দিলেন। তৎপরে নারদ কহিলেন, "দেখ বাপু! এই চরাচর বিশ্ব মাঝে পরমারাধ্য যদি কিছু থাকে, শ্রীহরিই মায়ান্ধ জীবের একমাত্র আরাধ্য। সেই পরম পুরুষ ভগবানকে ভজনা করা দেহী মাত্রের একান্ত কর্ত্তব্য। এই মর জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভবের রাস্তা পরিস্কার কর, জীবমাত্রের দরকার। অতএব তুমি চিত্তকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ভগবানের পাদ-পদ্মে ন্যাস্ত কর, আর ও দেখ! এই মায়াময় সংসার চক্রে নিপতিত হইয়া জীব কেবল ত্রিতাপ বহ্নিতে অহরহ দহ্যমান হইতে থাকে, ইহাতে শান্তির লেশ মাত্র নাই। যাহাতে পূর্ণ শান্তি প্রাপ্তি হওয়া যায়, তাহার উপায় করা উচিত প্রেমদাস কহিলেন, "আমি স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া এই সংসারে বেশ শান্তিতে কাল পুরণ করিতেছি। ইহার চেয়ে আর কোন শান্তি আছে নাকি?"

নারদ কহিলে, "পাগল সংসারে থাকিয়া কি কখন শান্তি পাওয়া যায়? হৃদয়কে ভগবৎ প্রেমে মাতাইতে না পারিলে কখনই পূর্ণ শান্তির আবির্ভাব হয় না। যাহারা মুখে শান্তি শান্তি করে, তাহারা মহাভণ্ড। অতএব তুমি সেই দীন দয়াল অধম তারণ পতিত পাবন, করুণানিদান, দীন বন্ধুর নাম সংকীর্ত্তনে মত্ত হও;—দেখিবে, তোমার হৃদয়ে প্রেমানন্দের আবির্ভাব হইয়া কেমন শান্তি আনয়ন করিবে।"

প্রেমদাস কহিলেন, "তাঁর নাম সংকীর্ত্তন করিলে, সুধু শান্তি ছাড়া আরও কিছুর আবির্ভাব হয়?"

নারদ কহিলেন "তাঁর নাম সংকীর্ত্তন করিলে জীব প্রেম বিভোর হইয়া আনন্দ নগরে গমন করেন এবং নিত্য নব নব রস আস্বাদন করিয়া থাকেন।"

প্রেমদাস কহিলেন, "আমি যদি তাঁর নাম সংকীর্ত্তন না করি, তাহা হইলে কি আনন্দ পাইব না? আমার যেন মনে হয়, আমি তাঁর নাম না করিয়া বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেছি।

নারদ কহিলেন, "বল কি বাপু? তাঁর নাম না করিলে কি কখন আনন্দ পাওয়া যায়! আরও তাঁর নাম ধরে ডাক্‌লে তিনি তাকে বড় ভাল বাসেন।"

প্রেমদাস কহিলেন, "আর তাঁর নাম ধরে যাহারা না ডাকে তিনি তাহাদের মোটেই ভাল বাসেন না!"

নারদ কহিলেন, "না।"

প্রেমদাস কহিলেন, "যাঁহার নাম করিতে বলিতেছেন, তিনি কিরূপ ধরণের লোক?"

নারদ কহিলেন, "তিনি মঙ্গলময়। জীবের মঙ্গল ছাড়া কখনও অমঙ্গল করেন না।"

প্রেমদাস কহিলেন, "বেশ ভাল কথা। তিনি যেখানে মঙ্গলময়, সেখানে সকলেরই মঙ্গল করিবেন। সেখানে ডাকিলেই বা কি, না ডাকিলেই বা কি। তিনি ত মঙ্গলই করিবেন। শুধু গলায় চীৎকার করা চেয়ে না ডাকাই ভাল!"

নারদ কহিলেন, "তবু তাঁর নাম কীর্ত্তন করা ভাল।"

প্রেমদাস কহিলেন, "আপনি অতিথি আমার গুরু সদৃশ। শুনেছি, শাস্ত্রে আছে, "সর্ব্ব অভ্যাগতং গুরু" গুরুর সহিত তর্ক বিতর্ক করা কদাচ উচিত নয়। যদি তর্ক করিতে করিতে কোন রূঢ় কথা বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে আপনার মনোবেদনার কারণ হইব। অতএব আমি আপনার কথার উপর আর কোন কথা কহিব না। আপনি বলিতেছেন, নাম সংকীর্ত্তন করিতে;—এখন বলুন কি, নাম বলে নাম সংকীর্ত্তন করিব?"

নারদ প্রেমদাসের কথা শুনিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং কহিলেন, "আমি সেই নাম তোমায় বলিয়া দিতেছি শু'ন"—

"হরে কৃষ্ণ হরে হরে হরে মুরারে হরে হরে।"

নাম শুনিয়া প্রেমদাস চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"ও! আপনাকে ছদ্মবেশী নারদ বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে। কারণ নারদই বীণা যন্ত্রে ঐ নাম গুণ গান করিয়া থাকেন। আর কাহারও নিকট ও নাম শুনি নাই! আজ প্রভুর কৃপায় তাঁর একজন প্রধান শত্রুকে আমি হাতে পাইয়াছি। আমার প্রভুর শত্রু যে সে আমার মহাশত্রু এবং বধার্হ।

প্রেমদাসের কথা শুনিয়া নারদ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "না হে বাপু! আমি নারদ নহি। আমি একজন অতিথি।

প্রেমদাস কহিলেন, "আর ছাপাইলে কি হইবে ঠাকুর। আপনাকে নারদ বলে আজ আমি চিনিয়াছি; আর একদিন ছদ্মবেশে আমার বাড়িতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার সেই খাঁড়া দেখিয়া তাড়াতাড় পালাইয়া গিয়াছিলেন।

নারদ মনে মনে ভাবিলেন, এ ব্যক্তি যখন আমায় চিনিতে পারিয়াছে; তখন আত্ম গোপন করিয়া কাজ নাই; যাহাতে খোসামদ বরামদ করিয়া জীবনটাকে রক্ষা করা যায়, এখন সেই উপায় করা যাক।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "বাপু আমি নারদই সত্য। প্রভুর আদেশে তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আমাকে বধ করিও না। তোমার সেই খাঁড়ার কথা মনে হইলে আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। সেই জন্য ছদ্মবেশে আসিয়াছি!

প্রেমদাস কহিলেন, "ঠাকুর! আজ আপনি আমার অতিথি। আপনাকে পাদ্য অর্ঘ আসন প্রদান করিয়াছি। অতিথি ও গুরুর কোন প্রভেদ নাই। যদি আজ আপনাকে হত্যা করি, তাহা হইলে গুরু হত্যা মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব আজ আমার খাড়া হইতে আপনার কোন ভয় নাহি। যদি আজ আপনাকে অতিথি বলিয়া পাদ্য অর্ঘ অর্পণ না করিতাম, তবে নিশ্চয়ই সেই খাঁড়া দিয়া বলি দিয়া প্রভুর কণ্টক দূর করিতাম। তবে আপনাকে যে একদিন বলি দিব ইহা সত্য! সত্য! সত্য!"

নারদ কহিলেন, "আমার মরিতে কোন ক্ষোভ নাই। তবে তোমার মুখে যদি প্রভুর নাম শুনিয়া মরিতে পারি, তবেই জীবন স্বার্থক হয়। অতএব তোমার নিকট আমার সানুনয় নিবেদন—যেদিন আমার গলায় সেই খড়্গ বসাইয়া সেই দিন "হরে মুরারে হরে হরে" বলিয়া মারিও!"

প্রেমদাস কহিলেন, "আবার বিপদে ফেলিলেন ঠাকুর। আমি মনে ভাবিয়াছিলাম, সত্বর আপনার কাজ শেষ করিব। আপনার মনের ইচ্ছাই পূর্ণ হক্। কিন্তু ঠাকুর, আমি প্রভুর নাম শুনিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়, তবে অমুক বৎসরে অমুক মাসে অমুক তারিখে অমুক দিবসে এই স্থানে অসিবেন। আমি সেই দিন প্রভুর নাম করিয়া আপনাকে বলি দিব। দেখিবেন, যেন বঞ্চনা করিবেন না, তাহা হইলে আপনার ঘোর বিপদ উপস্থিত হইবে। আমি আপনার দয়ার প্রভুকেও ভয় করি না, জানিবেন।"

নারদ, কহিলেন, "আমি নিশ্চয়ই আসিব, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক!"

প্রেমদাস কহিলেন, "আপনার কথায় আমার তত বিশ্বাস নাই। অসিবেন কিনা, ত্রিসত্য করুন?"

নারদ, কহিলেন, "আসিব। আসিব। আসিব।"

প্রেমদাস কহিলেন, "তবে অদ্য শয়ন করুন। আমিও শয়ন করিগে।" মনে মনে কহিলেন, 'ধূর্ত্ত নারদ আমি কৌশলে আমার কার্য্য—শেষ করিয়া লইয়াছি। আর আমার অবশিষ্ট কিছুই নাই!"

পর দিবস সকাল বেলা নারদ প্রেমদাসের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া হরি গুণ গান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। শ্রীহরি নারদকে দেখিয়া হাসিতে হাসতে কহিলেন, "কিহে নারদ! কেমন পরীক্ষা করিলে বল দেখি?"

নারদ কহিলেন, "আর প্রভু পরীক্ষা! পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজেই ফাঁন্দে পা দিয়াছি। অতিথি হইয়া গিয়াছিলাম, তাই এ যাত্রা রক্ষা।"

শ্রীহরি কহিলেন" ব্যাপার কি বল দেখি?"

নারদ কহিলেন, "পরীক্ষা কি করিব। আমি যাহা কিছু বলি, সে বলে সব আমার। তোমার উপর কিছুই অর্পণ করে না। অবশেষে তাকে নাম সংকীর্ত্তন করিবার জন্য উপদেশ দিতে গেলাম। সে আমায় গোটা কতক কথা শুনে অমনি আমাকে নারদ বলে পাকড়াও করলেন। আর আমি যাই কোথা, শেষে আমি তার মুখে হরি নাম শুনে মরিতে ইচ্ছা করিলাম। সে তাহাতে স্বকৃত হইয়া কহিল, আমি এক দিবসের বেশী ঐ নাম করিব না। যদি আমার মুখে নাম শুনে মরিতে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অমুক বৎসরে অমুক মাসে অমুক তারিখে আসিবেন, সেইদিন আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। আমি তাহাতে স্বীকৃত হয়ে ত্রিসত্য করিয়া আসিয়াছি। অতএব সে দিনে আপনার নাম শুনাইয়া আমার গলায় খাড়া বসাইবে এবং নারদ নাম লোপ পাইবে।"

শ্রীহরি কহিলেন, "তার ত এখন অনেক দিন বাকি আছে! এই কটা দিন খুব বেশী জ্বালাতন করিয়া লও। তার পর তুমিও বাঁচ আমিও বাঁচি। কিন্তু নারদ এটা মনে রেখো, আমি তার খাড়া হইতে কিছুতেই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। সে তোমার গলায় খাড়া বসাবেই বসাবে।"

নারদ কহিলেন, "যদি রক্ষা করিতে না পারেন, তবে যেন সেই শেষের দিনে আপনার শ্রীচরণ একবার দর্শন পাই।"

শ্রীহরি মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "তা দেখা যাবে।"

নারদ কহিলেন, "তাও দেখা যাবে হ'ল। যাক নারদের অদৃষ্টে যা থাকে তাহাই হইবে!" এই বলিয়া বীণায় হরি নামের ঝঙ্কার দিয়া তথা হইতে উঠিলেন এবং ভ্রমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে প্রেম দাসের দিন ঘুনাইয়া আসিল। প্রেমদাস নির্দ্দিষ্ট দিনে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন দীন দুঃখী কাঙ্গাল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ইত্যাদি সকলে নিমন্ত্রন করিয়া চোর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা ভোজন করাইয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। নারদের তখনও দেখা নাই। তখন মনে মনে ভাবিলেন, "ঠাকুর কি আমাকে ফাঁকি দিল!" দিল এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন—এমন সময়ে বীণা হস্তে নারদ ঋষি আগমন করিলেন। প্রেমদাস নারদকে আগত দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন।

নারদ কহিলেন, "আর বেশী ভক্তির দরকার নাই। এখনিত তোমার খড়্গাঘাতে আমার দেহ ধুলি লুণ্ঠিত হইবে।"

প্রেমদাস কহিলেন, "তবু আপনার অভ্যর্থনা টুকু বাকী রাখি কেন! তখন নারদকে উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন। সকলের আহারাদি শেষ হইলে প্রেমদাস আহার করিলেন। কল্লোলিনী স্বামির পাতে প্রসাদ খাইলেন। প্রেমদাস আহারাদি শেষ করিয়া একে একে আত্মীয় স্বজন পুত্র পৌত্রের নিকট হাসি মুখে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের সারগর্ভ নানাবিধ হিতকথা উপদেশ দিলেন। আরও বলিলেন, "তাহারা যেন তাহার জন্য কোন রূপ দুঃখ বা অনুতাপ না করে।" অবশেষে কল্লোলিনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য গমন করিলেন এবং কহিলেন, "প্রিয়ে সময় আগত প্রায় এখন একবার হাসি মুখে বিদায় দাও, কর্ম্মশেষে ভবের পথে অগ্রসর হই।"

কল্লোলিনী কহিলেন, "ওমা সে কি গো! তুমি যে এত ছল তাত পূর্ব্বে জানিতাম না। তাহা হইলে তোমাকে গুরুদেবের মত আজীবন সেবা করিতাম না। দেখ! আমি জীবন থাকিতে তোমায় বিদায় দিতে পারিব না!"

প্রেমদাস কহিলেন, "প্রিয়ে! শীঘ্র বিদায় দাও পরকালের পথ পরিষ্কার করি।"

কল্লোলিনী কহিলেন, "এত কাল স্বামী সেবার ফল বুঝি এই। মনে ভেবেছিলাম, স্বামীসেবার উৎকৃষ্ট ফল পাইব। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তার পরিবর্ত্তে বিষফল—বিরহ। পুরুষ জাতি এত কপট তাত পূর্ব্বে জানিতাম না। ব্রজ-

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিপট কপট শঠ বলিয়া ডাকিত। আমি মনে ভেবেছিলাম, ওটা যাত্রাদলের ঘর গড়া কথা, এখন দেখ্‌ছি ঠিক কথা। দেখ! তুমি যতই বল না কেন, আমি কিছুতেই তোমায় বিদায় দিতে পারিব না। তবে যদি সহগমনের অনুমতি দাও—তবেই পারি?"

প্রেমদাস কহিলেন, "তুমি কেমন করিয়া আমার সহগমন করিবে?"

কল্লোলিনী কহিলেন, "ও তা জান না? যে দিন অতিথির নিকট তুমি সেই নাম শুনেছিলে, আমিও গোপনে থাকিয়া সেই নাম শুনেছিলাম। সেই দিনই নামটী অন্তকালের সম্বল স্থির করিয়া অন্তঃকরণের গুহার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। সেই নামের বলে তোমার সহিত মহাগমন করিব।"

প্রেমদাস আর কোন আপত্তি না করিয়া কহিলেন, "চল, তবে দুই জনেই ভবের পথে অগ্রসর হই।"

প্রেমদাস তখন কেবল মাত্র ধ্রুব প্রহ্লাদ ও নারদের বলিদানের জন্য সেই খড়্গা তিন খানি গ্রহণ করিলেন। কল্লোলিনী স্বামীর মনোভাব পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া তিনটী ফুলের মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই মালা তিনটী অঞ্চল মধ্যে লুকাইয়া লইলেন।

প্রেমদাস পুনরায় সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তুলসী তলার সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, "এস ঠাকুর এসদেখ! তোমারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হক্। আমার ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হক্?"

নারদ বীণা হস্তে আস্তে আস্তে প্রেমদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রেমদাস তাঁহাকে সম্মুখভাগে উৎকৃষ্ট আসনে বসাইয়া খড়্গহস্তে নিজ আসন গ্রহণ করিলেন। কল্লোলিনী তাঁহার বাম ভাগে বসিলেন। প্রেমদাস কহিলেন, "প্রভো! এই খড়্গা আপনার জন্য প্রস্তুত করিয়াছি। এখন আপনি প্রস্তুত হউন আমার নাম কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে আপনার গলদেশে ইহা বসাইয়া গমন করিব।"

নারদ কহিলেন, "আমি প্রস্তুতই আছি, এবং আমিও নাম জপ করিতেছি।" প্রেমদাস ও কল্লোলিনী নারদের অনুমতি লইয়া নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।"

হরে কৃষ্ণ হরে হরে হরে মুরারে হরে হরে।

নরদও সেই সঙ্গে সঙ্গে নামের ঝঙ্কার দিলেন। পুনঃরায় নাম উচ্চারিত হইল।

হরে কৃষ্ণ হরে হরে হরে মুরারে হরে হরে।

এবার নারদের কর্ণরন্ধ্রে নাম সুধাসম প্রবেশ করিল, তাহাতে নারদ মোহিত হইয়া গেলেন।

পুনঃরায় নাম উচ্চারিত হইল।

হরে কৃষ্ণ হরে হরে হরে মুরারে হরে হরে।

এই নামের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমদাস ও কল্লোলিনীর দেহ হইতে দুইটী জ্যোতিঃ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। এবং দেখিতে দেখিতে প্রেমদাসের খড়্গ তিন খানি তিনটী পুষ্প মাল্যে পরিণত হইল। প্রেমদাস তখন কহিলেন, "গুরো! এই আমার অতি সাধের খড়্গ রূপ পুষ্প মাল্য আপনার গলদেশে অর্পন করিলাম।" কল্লোলিনাও সঙ্গে সঙ্গে নারদকে পুষ্প মাল্যে ভুষিত করিলেন।

এমন সময়ে ধ্রুব প্রহ্লাদ সেই স্থানে আগমন করিলেন। প্রেমদাস ও কল্লোলিনী তাঁহাদের পুষ্প মাল্যে ভুষিত করিবামাত্র সহসা সহস্র ব্রজদল পরিশোভিত একখানি উৎকৃষ্ট পুষ্প বিমান সেই স্থানে আগমন করিল। তাঁহাদের সকলের হস্তে এক একটী পুষ্প ব্যজন রহিয়াছে,। তাঁহারা প্রেমদাস ও কল্লোলিনীকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া পুষ্প রথের উপর তুলিলেন এবং পুষ্প আসনে বসাইয়া পুষ্প চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। দেবতারা পুষ্প বরিষণ করিতে লাগিলেন। প্রেমদাস কহিলেন, "গুরো। গুরো। গুরো। বিদায় দেন।" এই গুরু শব্দ নারদের কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র মোহ ভঙ্গ হইল। তখন বক্ষদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, খড়্গের পরিবর্ত্তে পুষ্প মাল্য গলদেশে শোভা করিতেছে। একি বলিয়া উদ্ধ দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া দেখিলেন, প্রেমদাস সহস্র ব্রজঙ্গনা বেষ্টিত হইয়া পুষ্প বিমানে অবস্থান করিতেছেন। তখন ধন্য ধন্য ধন্য প্রেমদাস বলিয়া তাড়াতাড়ি বীণাটী গ্রহণ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, 'বাজরে বীণে মধুর স্বরে হরে কৃষ্ণ হরে হরে।' এই বলিতে বলিতে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। এমন সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে হরিবোল হরিবোল হরিবোল ধ্বনি গগণ ভেদিয়া উত্থিত হইল। এই সময় টুকু যেন বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া গেল।

প্রেমদাস ভার্য্যাসহ বৈকুণ্ঠে সেই নূতন পুরিতে নীত হইলেন। নারদও এমন সময়ে বৈকুণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীহরি নারদকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কই নারদ? প্রেমদাসের খাড়া কই। প্রেমদাস খাড়ার পরিবর্ত্তে তোমাকে এই পুষ্প মাল্য বিভুষিত করিয়াছে?"

নারদ কহিলেন, "প্রভু। আপনার লীলা বুঝা ভার। কখন যে, কি লীলা! করেন তাহা এই ক্ষুদ্র নারদের বুঝিবার কোন ক্ষমতা নাই। প্রভো! ধন্য আপনার ভক্ত। আমি এমন নির্ম্মল ভক্ত কখনও দেখি নাই। এই ভক্ত আমার দর্প চুর্ণ করিয়াছে। আমি কুটজ্ঞান সম্পন্ন কোন্দল প্রিয় নারদ। আমার কুটজ্ঞান ছেদন করিতে পারে, এমন ভক্ত আপনার দেখি নাই। কিন্তু এই প্রেমদাসের কুট জ্ঞানের নিকট আমাকে পরাজিত হইতে হইয়াছে। সে আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কোন সময় গুরু করিয়াছে, তাহা আমি বুনাক্ষরেও বুঝিতে পারি নাই। এবং অন্তঃকাল গুরুকে সম্মুখে করিয়া কখন তিরোভাব হইয়াছে তাহাও জানিতে পারি নাই।

ধন্য প্রভু ধন্য তোমার প্রিয়ভক্ত। এই বলিয়া বীণার ঝঙ্কার দিয়া হরি গুণ গান করিতে করিতে গমন করিলেন।

বাজ রে বীণা মধুর স্বরে হরে কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে হরে মুরারে হরে হরে॥

লীলাময়।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,

নবীন ভারত দাঁড়ায়েছে আজি
অতীতের ভিত্তি পরে।
হেরিছে বিস্ময়ে বিশ্ব মানব
ভীত চকিত অন্তরে॥
কয়ম ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র
জাগিয়া উঠেছে ওই।
উৎসুক উদ্‌গ্রীব সাধক ভক্ত
চাহিয়া রয়েছে ওই॥
এক দিন সেই এসেছিলে তুমি
পূত যমুনা কুলে।

বাঁশরী বাজায়ে ডাকিয়াছিলে
ভক্ত সাধক দলে ॥
সাধক ভক্ত আকুল আবেগে
এসেছিল সবে ছুটী।
করেছিল দান আত্ম পরাণ
(তব) চরণের ধুলা লুটি ॥
আবার যখন কুরুক্ষেত্রে
বাজায়েছিলে পাঞ্চজন্য।
ভক্ত যত বীর এসেছিল ছুটী
মমতা করিয়া ভিন্ন ॥
আবার জেগেছে ভক্ত সবাই
আবার এসেছ তুমি।
করিছ প্রকাশ অপরূপ লীলা
ওহে লীলাময় স্বামী ॥
আবার শোভিছে বিরাট বিপুল
তীর্থ কুরুক্ষেত্র।
আকুল আজিকে হেরিতে সে লীলা
সহস্র সতৃষ্ণ নেত্র ॥
মুখে তুলে লহ পাঞ্চজন্য
বাজাও জলদ স্বরে।
নাচিয়া উঠুক ভক্ত শোণিত
তোমার চরণ তরে ॥
প্রকাশ পাইল তব লীলা স্বামী
আবার ভারত ভূমে।
ধর্ম্মক্ষেত্রে নামিবে সাধক
তোমার চরণ চুমে ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত শেষে সাধক কহিলেন, "প্রতাপচাঁদ তোমার, চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তোমার তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় নাই। দীন ভাবে তীর্থ পর্য্যটনের ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। তুমি কৃতদার ও পিতার একমাত্র পুত্র। সংসার পরিত্যাগে তুমি সুখী হইতে পারিবে না। সংসারে থাকিয়া যাহাতে তোমার আত্মার উৎকর্ষ লাভ হয়, তাহার চেষ্টা আমি করিব।" যুবরাজ কহিলেন, "গুরুদেব! বিশুর ন্যায় আমিও আপনার শরণাগত। আমি কখনও আপনার উপদেশ অবহেলা করিব না।" ইহা কহিয়া যুবরাজ মৌনাবলম্বন করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত। কিয়ৎ-ক্ষণ পূর্ব্বে দিবসপতি জ্যোতিঃ জাল সঙ্কুচিত করিয়া জীবগণের নেত্র পথ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। বসন্ত কালের কুজ্ঝটিকা জালের ন্যায় অন্ধকার দিক্‌মণ্ডল, আকাশ মণ্ডল আবরণ করিয়া অবনীর উপর পড়িতেছে। বিহঙ্গমগণ তরুবর শিরে আরোহণ করিয়া সন্ধ্যা বন্দনছলে মানবগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। যুবরাজ প্রতাপচাঁদ সাধকের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক প্রসাদে প্রত্যাগত হইলেন।

দিন আসিতেছে, দিন যাইতেছে, জীবন কালের একদিন চলিয়া গেল। আজ পরকালের সম্বল কিছু হইল না, একথা বোধ হয়, অতি অল্প লোকেই ভাবিয়া থাকেন। সংসার চক্রে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণমান জীব সমূহ কালকে উপেক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু মোক্ষ প্রয়াসী মহাত্মারা মুহূর্ত্ত কালও অপব্যয় করেন না। প্রতি-শ্বাস প্রশ্বাসে ভগবৎ চিন্তা করিয়া সংসারের সৎকর্ম্মে ব্রতী হন। মহাত্মা কমলা-কান্ত বর্দ্ধমানে আসিয়া, রাজভোগে জীবন অতিবাহিত করেন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, লোক শিক্ষা তাঁহার জন্মগ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি বর্দ্ধমানে আসিবার পূর্ব্বে মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরকে বলিয়া ছিলেন, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্দ্ধমানে অবস্থান করিবেন। সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিলিত হইবেন। এখন তিনি মধ্যে মধ্যে অম্বিকায় গমন করেন কখনও বা চান্নায় যাইয়া দেবী বিশালাক্ষীর চরণ দর্শন করিয়া সুখী হন। প্রতিবৎসর শ্যামা পূজার পর অমরার গড়ে তাঁহার অনুগত কেশারাম চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে গমন পূর্ব্বক তৎস্থানীয় লোক দিগকে সুখী করেন। ভক্ত ও অনুগত ব্যক্তিগণ যেরূপ

অবস্থাপন্নই হউন, তিনি তাঁহাদের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের বাটীতে আগমন পূর্ব্বক তত্ত্ব কথায় সকলকে ভক্তিরসে সিক্ত করিতেন। বর্দ্ধমানে থাকিতে সময় ক্রমে রাজদরবারে যাইতেন, মনোহর সঙ্গীত দ্বারা সমাগত লোকদিগকে বিমুগ্ধ করিতেন। কথিত আছে, সাধক একদা পীড়িত থাকায় রাজ সভায় যাইতে পারেন নাই। মহারাজা বাহাদুর তাঁহার সহিত কোটাল হাটে সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। রাজা বাহাদুরের ধারণা হইল, তাঁহার গুরুদেব মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ মধ্যে অবস্থান করেন,সেই জন্যই তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে সময় সংক্ষেপ হেতু রাজাবাহাদুর কোটাল-হাটের কালী বাড়ী ও সাধকের বাসগৃহ ইষ্টক নির্ম্মিত করাইতে পারেন নাই। এখন তিনি দেবীর মন্দির ও সাধকের বাসগৃহ নির্ম্মান করাইবার সঙ্কল্প করিয়া কোটাল হাটে গমন করিলেন। রাজা বাহাদুর গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সাধক যোগমায়ার সম্মুখে কুশাসনে উপবেশন করিয়া জপ করিতেছেন। সাধকের সম্মুখে একটী সছিদ্র কোশা, তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া মৃত্তিকা আদ্র করিতেছে। বিশু গৃহের এক প্রান্তে উপবিষ্ট। গৃহমধ্যে অন্য কোন বস্তু নাই। পরম বস্তু জগদম্বার প্রতিমূর্ত্তি। গৃহের একপ্রান্তে জলপূর্ণ একটী কাষ্ঠের কমণ্ডলু, আর একখানি কুশাসন, অন্যপ্রান্তে মৃগচর্ম্ম ও কম্বল শয্যা। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর গৃহ প্রবেশ করিবা মাত্র বিশু সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাজাবাহাদুরের উপবেশন জন্য আসন প্রদান করিল। মহারাজা বাহাদুর নতজানু হইয়া করযোড়ে দেবীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক পিপাসু ভ্রমরের ন্যায় চরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাধকের যপ সমাপ্ত হইলে রাজা বাহাদুর সাধককে প্রণিপাত পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, 'শুনিলাম আপনার শরীর অসচ্ছন্দ আছে। আপনি এখন কিরূপ অনুভব করিতেছেন, সাধক কহিলেন, "মহারাজ! গত দুই দিবস সামান্য জ্বরঅনুভব হইয়াছিল। লঙ্ঘন দ্বারা আজ সুস্থ বোধ করিতেছি।" মহারাজ বাহাদুর কহিলেন, আমার বোধ হয়,এই মৃত্তিকাময় গৃহমধ্যে শয়ন জন্যই আপনার শারীরিক পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকিবে, আপনি এ স্থানের কি অভাব দেখিতে-ছেন।" সাধক কহিলেন, "মহারাজ! আমি কম্বল ও মৃগচর্ম্মের উপর শয়ন করি, এ গৃহও তাদৃশ শীতল নহে, আপনি যাহা আশঙ্কা করিতেছেন, আমার বোধ হয় তজ্জন্য আমার শরীর অসুস্থ হয় নাই। আপনি আশ্রমের অভাব কি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু আমি অভাব কিছু দেখিতেছিনা। পূর্ণানন্দময়ী হাস্য

মুখে আশ্রম মাঝে বিরাজ করিতেছেন। ওই দেখুন আশ্রম মধ্যে জবাকুসুম সকল মায়ের চরণ পদ্মের জ্যোতিতে আশ্রম প্রাঙ্গন উজ্জ্বল করিয়াছে। স্থল পদ্ম সকল নতমুখে প্রফুল্লবদনে মায়ের ধ্যানে রত। দেখুন মল্লিকা দল আশ্রম গগণে নক্ষত্র মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। মহারাজ বিল্বদলের কোমল কান্তি অবলোকন করুন, নব জলধর বর্ণে নয়ন আকর্ষণ করিতেছে। আশ্রম বাহিরে বিটপী সকল ও বিবিধ ফল পুষ্পে পরিপূর্ণ। বিহঙ্গমগণও হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ, তাহারা সকল সময়ে বিশেষতঃ সকাল সন্ধ্যায় কলধ্বনিতে কালী কালী বলিয়া কোটাল হাটকে কৈলাস সদৃশ রমণীয় করিয়া তোলে। আমি আশ্রমের কোন অভাব দেখিতেছিনা। যেখানে সদানন্দময়ী বিরাজ করেন, সেখানের কিসের অভাব, কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য। এই বলিয়া মৃদুমধুর হাস্য করিয়া গাহিলেন,—

"কিছু নাই সংসারের মাঝে শ্যামা মা মোর সার রে।
মন কালী ধন কালী আমার প্রাণ কালী আমার রে॥"

যিনি জগদম্বার নিতান্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার কোন দুঃখ, কোন অভাব থাকা সম্ভব নহে, তিনি রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও সুখী এই ভাবিয়া পুনশ্চ গাহিলেন,—

কেহ সংসারে এসেছে, বড় সুখে আছে,
পেয়েছে রাজ্য ভার রে।
আমার গরীবের ধন, ওরাঙ্গা চরণ,
গলায় করিছি হার রে॥

নিজের শারীরিক অসুখের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

এতনু ধারণে, এতিন ভুবনে,
যাতনা নাহিক কার রে।
কিন্তু হেরিলে এমুখ, দুরে যায় দুঃখ,
এই গুণ শ্যামা মার রে।
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত আসিতেছে বারে বার রে।
এবার অভয় চরণ, করেছে শরণ,
অনায়াসে হবে পার রে॥

সঙ্গীত শেষে সাধক কহিলেন, "আমি আমার ও আপনার কালী বাটীর কোন অভাব দেখিতেছিনা। রাজা বাহাদুর কহিলেন, 'আজ কয়েক দিন আপনার মধুময় কণ্ঠস্বর ও অমৃত তুল্য বাক্য শ্রবণ না করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে

পারি নাই। এক্ষণে আপনি সুস্থ হইয়াছেন, দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। গুরুদেব সত্বর দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হেতু এই গৃহ মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে দেবীর মন্দির, রন্ধন গৃহ, আপনার বাসগৃহ ইষ্টক নির্ম্মিত, প্রাঙ্গণ বিস্তৃত ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত করাইবার বাসনা করিয়াছি।" সাধক কহিলেন, "রাজা বাহাদুর! মা আমার বিবসনা, অলঙ্কার দেখুন, গলে নরশির হার, মুক্ত কেশ, মায়ের বাহন শবশিব, মা আমার শ্মশান বাসিনী এমন মায়ের মণি কোটার কি প্রয়োজন।" একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "মা রাজার ঘরে আসিয়াছেন, চারি দিকে অট্টালিকা, মনি কাঞ্চন দেখিয়া বোধ হয়, বেশভুষা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, রাজার ঘরে থাকিয়া রাজার মা হইবার ইচ্ছা হইয়াছে, নচেৎ আপনার এরূপ ইচ্ছা হইবে কেন? দেবীর কৃপায় আপনার পুণ্যফলে আশ্রমের কোন অভাব নাই।" রাজা বাহাদুর কহিলেন, "সংসারী লোক দেব দেবী মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও সেবাদির যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেন। মণি মুক্তাদি-দ্বারা দেব দেবী অঙ্গ সজ্জিত করিয়া চক্ষুর তৃপ্তি লাভ করেন। সংসারী লোক যে বস্তুর প্রিয়, সেই বস্তুই আপন উপাস্য দেবতাকে প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাও ভালবাসার লক্ষণ। আপনি সন্ন্যাসী, আপনার দেবীও তদনুরূপ ভূষণ প্রিয় হওয়া সম্ভব। গুরুদেব! আপনি ফল পুষ্পাদি প্রিয়, সেই জন্যই দেবীকে ফল পুষ্পাদি প্রদান দ্বারা সুখী হন।" সাধক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যাহা কহিলেন, "তাহা সত্য। মানুষ যে সকল বস্তুর প্রিয়, সেই সকল বস্তু নিজ উপাস্য দেবতাকে নিবেদন করিয়া সুখী হয়। নিজ শরীর ও মন অপেক্ষা মানুষের অন্য কোন বস্তুই অধিকতর প্রিয় হইতে পারে না। শরীর ও মনের নিতান্ত সমর্পণেই উপাস্য দেবতা সন্তুষ্ট হন। নিজ শরীর ও মন ব্যতীত অন্য বস্তুর সমর্পণে তাঁহার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা দেখান হয় না।" সাধকের এই কথা শুনিয়া মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা সত্য, তিনি ভাবগ্রাহী, মানুষের বদান্যতার প্রার্থী নন। বাস্তবিকই মানুষ ভ্রম বশত মণি মুক্তাদি সম্প্রদান দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করে। আমি পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি, আমি আপনার ইচ্ছার বশবর্ত্তী থাকিব। কোটাল হাটের কালী বাড়ীর বর্ত্তমান অবস্থা বিদ্যমান থাকা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহাই হইবে।" সাধক কহিলেন, "যদি আমি অট্টালিকা বাস ও ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করি, মণি মুক্তাদি দ্বারা দেবীর অঙ্গ ভূষিত করিয়া সুখী হই, এই সকলের প্রতিক্রমে আমার আসক্তি জন্মিতে পারে, অতএব

এ বাসনা পরিত্যাগ করুন। আপনি আমার অভাব বিমোচনের বাসনা করিয়া আগমন করিয়াছেন, আপনার অভাব দূর করিবার সঙ্কল্প সার্থক হউক। আমি একটা বস্তুর অভাব অনুভব করিতেছি, আপনি সেই অভাব দূর করিয়া সুখী হ'ন।" রাজা বাহাদুর আগ্রহের সহিত কহিলেন, "অনুমতি করুন, আপনার কি অভাব, যদি সে অভাব বিমোচনের আমার শক্তি থাকে, আমি আপনার অভাব দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" সাধক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আমার অভাব মোচন আপনার সাধ্যায়ত্ত নহে, আমি একখানি কোশার অভাব অনুভব করিতেছি, এই কোশা খানিতে জল পড়িতেছে, এই কোশাখানি সারাইয়া দিবেন।" সাধকের এই কথা শুনিয়া রাজা বাহাদুর সহাস্যে কহিলেন, "আমার গুরুদেবের এ অভাবনীয় অভাব, এ অভাব মোচন করা আমার ক্ষমতা সাধ্য হইবে কি? হায়! হায়! আপনি এরূপ ত্যাগ শীল বাসনা শূন্য না হইলে কি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন, সর্ব্ব লোকের প্রিয় হইতে পারেন, জগদম্বার বরপুত্র হইতে পারেন।" এই বলিয়া রাজা বাহাদুর সাধকের সম্মুখ হইতে কোশা খানি নিজ হস্তে লইয়া কহি[লেন], এই "[কোশা] খানি সারাইয়া দিব, এই কোশাখানির অনুরূপ এক খানি নূতন কোশাও পাঠাইব, বোধ হয়; তাহাতে আপনার কিছু আপত্তি নাই।"

ক্রমশঃ

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বাঙ্গালীর মেয়ে।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ।

(১)

কি দেখিছ তুমি মাগো বঙ্গ ভূমি
আরো বা দেখিবি কত;
গৃহলক্ষ্মী যা'রা একি হ'ল তা'রা
বিপরিত হেরি যত।

ছড়া ঝাঁট নাই পাক শালে যাই
বলে না মুখেতে বার;
পূজা ব্রত তিথি অথবা অতিথি
ধারে না কাহারো ধার।
দেখ সবে চেয়ে বাঙ্গালীর মেয়ে
বিবিধ ভূষণে সাজি,
যেথা সেথা যায় চা'র বাটি চায়
কি কাল পড়েছে আজি।

(২)

শ্বশুর শাশুড়ী আছে যার বাড়ী
দেখে না তা'দের মোটে;
শিশু মেয়ে ছেলে ঝির কোলে ফেলে
আপন আগারে ছোটে!
দেবর ভাশুরে চায় রাখি' দূরে
তাদের ভাবে সে পর;
অভাগি ননদী কথা কয় যদি
তা'রে বলে তুই মর।
দেখ সবে চেয়ে বাঙ্গালীর মেয়ে
বিবিধ ভূষণে সাজি,
যেথা সেথা যায় চা'র বাটি চায়
কি কাল পড়েছে আজি।

(৩)

বেলা বাজে নয় বিছানায় রয়
সম্ভ্রমের নাহি লেশ;
গুটি গুটি উঠি' বাসি ঢাকা রুটি
ভোজন করিল শেষ।
থাকে না আটকে নভেল নাটকে
নিয়ত তা'দের মন;
হাসি খুসি কথা কয় যথা তথা
মানে না কো গুরু জন।

দেখ সবে চেয়ে বাঙ্গালীর মেয়ে
বিবিধ ভূষণে সাজি,
যেথা সেথা যায় চা'র বাটী চায়
কি কাল পড়েছে আজি।

(৪)

সারা নিশি জাগি, গহনার লাগি,
করে যে নিয়ত দাবি;
রাখে না-ক মান ধনের সমান
পতি রয় গৃহ ভাবি।
পিপাসার বারি বলে দিতে নারি
স্বামিতে চাহিলে পরে;
আতুর আগারে বলে চলে যা-রে
যখন কেহ বা মরে।
দেখ সবে চেয়ে বাঙ্গালীর মেয়ে
বিবিধ ভূষণে সাজি,
যেথা সেথা যায় চা'র বাটী চায়
কি কাল পড়েছে আজি।

(৫)

দেবতার সেবা বলে করে কেবা
পড়ে গেছে বড় দায়;
ফেলে দাও জলে অথবা ভূতলে
শিলাতে কি কভু খায়?
সন্দেশ মিঠাই নিতি নিতি চাই
নতুবা যে মুখ ভারি;
স্বামী কয় মুখে কত যে বা দুখে
আমি গো কেমনে পারি।
দেখ সব চেয়ে বাঙ্গালীর মেয়ে
বিবিধ ভূষণে সাজি,
যেথা সেথা যায় চা'র বাটী চায়
কি কাল পড়েছে আজি।

(৬)

সংসারের কাজ পড়ে শিরে বাজ
শুনিলে স্বাধীন যুগে ;
পিসী মাসী খুড়ী দিদি আই বুড়ী
তারা ত মরিত ভূগে।
আচার বিরত কদাচারে রত
শানেতে তামাক সেবা ;
হিষ্টিরস হয় শূল কাশী ক্ষয়
যখন ধরিছে যেবা।
দেখ সবে চেয়ে বাঙ্গালীর মেয়ে
বিবিধ ভূষণে সাজি;
বেথা সেথা যায় চা'র বাটী চায়
কি কাল পড়েছে আজি।

বিমাতা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মুখে কথা কহিবার সাহস নাই। বিবির বক্তৃতা শুনিয়া মনে মনে কিন্তু প্রাণধন বাবু বড়ই বিরক্ত হইলেন। মনের বিরক্তি মনেই থাকিয়া গেল ; মেঘমালার ভয় ; বিরক্তি প্রকাশে কোন ফল হইবে না, বরং বিভ্রাট বাঁধিয়া যাইবে ; বিবিটিও চটিয়া যাইবেন ; সেই ভয়ে প্রাণধন তখন বোবা। বিবি আবার বলিতে ছিলেন, "স্বর্গীয় পিতার প্রিয় পুত্র দয়াময় প্রভু যেশু স্বর্গীয় মেষপালক ; মেষগণের মুক্তির নিমিত্ত অবতার হইয়া,"—

সহসা আসন হইতে উত্থিত হইয়া, চঞ্চল ব্যগ্রস্বরে কর্ত্তা কহিলেন, "কল্য আবার শেষ কথা শুনিব, রাত্রি অধিক হইতেছে, তুমি কি আর এক পাত্র চা খাইয়া যাইবে ?" সহাস্য বদনে বিবি একটি থ্যাঙ্ক (Thank) দিলেন।

পদ্মঝি এক পাত্র গরম চা প্রস্তুত করিয়া আনিলেন, পুনর্ব্বার থ্যাঙ্ক

দিয়া মেমসাহেব ফুল্লবদনে পূর্ণপাত্র পান করিলেন ; তাহার পরেই বিদায়। সেকহ্যাণ্ড ভুল হইল না।

পরদিন হইতে প্রতিদিন বেলা দুই প্রহর দ্বিতীয় ঘটিকার সময় মিস্ লিবার্টী উপস্থিত হইয়া কুঞ্জকুমারীকে দুই ঘণ্টাকাল ইংরাজী শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। রবিবার ছুটি।

এক বৎসর গেল। কুঞ্জকুমারীর ইংরাজী বিদ্যার দৌড় অনেক দূর ধাবিত। মেমসাহেব দস্তুর মত প্রতিদিন আইসেন, মধ্যে মধ্যে রসিক ধরণের জনৈক নব্য বয়সের একটি ছোকরা সাহেবকে সঙ্গে করিয়া আনেন। ছোকরাটি সুন্দর, বয়স বিংশতি, কুঞ্জকুমারীর পড়িবার ঘরের বারাণ্ডায় সিস্ দিয়া গান করে, কখন কখন হাত পা নাড়িয়া কি বক্তৃতা করে, আবার কুঞ্জকুমারীকে দেখিয়া হাসিয়া আকুল হয়, কুঞ্জকুমারী এসকল ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারেন না।

বাড়ীতে এই সব কাণ্ড হয়,—দু-একদিন নহে, মেমসাহেব নিয়োগের দুইমাস পর হইতে ক্রমাগত দশ এগার মাস সপ্তাহে দুইদিন ছোকরা আইসে, কর্ত্তা তাহা জানেন, একটি যুবা আইসে, কর্ত্তা তাহা দেখেন, কিছুই বলেন না ;—শ্রীমতী কামিনী মেঘমালার ভয়ে কোন কথা বলিতেই পারেন না,—(আধুনিক বিদ্যাবতী কামিনীগণের পতি হওয়া এই দশা !) মুখটি বুজিয়া চুপটি করিয়া থাকেন।

মেঘমালাদেবী কোন্‌কার্য্যে ব্যাপৃতা ?—অন্তঃপুর নিস্ম্‌লিনী সভাস্থাপনের আয়োজনে কমিটি বসিয়াছে। সপ্তাহে সপ্তাহে মিটিংহয়। প্রতি শনিবার মিটিং। অন্যবারে না হইয়া কেবল শনিবারে মিটিং হয় কেন, একথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর পাইবেন, ইংরাজী অনুকরনের গুণে। ইংরাজী মিটিং প্রায় শনিবারেই হয়, যেখানে ইংরাজীর গন্ধ, সেইখানেই অনুকরণ দরকার ! অন্তঃপুর নির্ম্মলি সভার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সভার প্রেসিডেণ্ট, ভাইস প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী এসিষ্ট্যাট সেক্রেটারী ক্যাসিয়ার ইত্যাদি ইংরাজী উপাধিভূষিতা কার্য্যনির্ব্বাহিকানারীগণ মনোনীতা হইয়াছেন, কতকগুলি মেম্বর হইয়াছেন। এই ভবিষ্যৎসভার যিনি প্রেসিডেণ্ট সাদা কথায় যিনি সভাপতি অথবা সভাপত্নী, তিনি হয়ত ইংরাজী জানেন, তাঁহার গায়ে হয়ত ইংরাজী গন্ধআছে, সেই কারণে মিটিং বসিবার দিন ঐরূপ ইংরাজী অনুকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শনিবার অপরাহ্ণ ঘটিকা।

ছোটবড় সায়ত্রিশটি কামিনী এই ভবিষ্যৎসভার উত্থান কারিনী হইয়া সভার খাতায় নাম দস্তক্ষত করিয়াছেন। ছোটবড় সায়ত্রিশটি. এই কথা বলিলাম, ইহাতে পাঠক-পাঠিকারা যেন এমন মনে না করেন যে, যাহারা বড়, তাহারা প্রাচীনা,যাহারা ছোট,তাহারা সূতিকাগার হইতে প্রথম বাহির হইয়া আসিয়াছে; বাস্তবিক ত্রিশবৎসরের অধিক বয়স একটিরও নাই ; দ্বাদশ বর্ষের ন্যূন বয়ক্রমও এদলে অতি বিরল,—কেবল দুটী নবম দশমবর্ষিয়া চতুরা বালিকা স্বস্ব হস্তে খাতায় নাম লিখিয়া দিয়াছে।

সপ্তাহে সপ্তাহে মিটিংহয়। মিটিংহইয়া কি হয়, দেখা আবশ্যক। গৃহস্থ লোকের সদর অন্দর ভাঙ্গিয়া একাকার করা, অন্তঃপুরের নাম ইহসংসার হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করা, নারীগণকে নরগণের সমান অথবা তদপেক্ষা বেশী স্বাধিনতা প্রদান করা, এই কয়েকটি প্রধান কার্য্য সম্পাদন করা এই সভার সংকল্প। অন্তঃপুরনামে এসংসারে কোন পদার্থ ছিল, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা সে কথা কিছুই জানিতে না পারে, তাহার একটি বিধান করাও অন্তঃপুর নির্ম্মূলিনী সভার একটি উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য। (বিভ্রাটের কথা! রাজ্যের অভিধান বদল করিতে হইবে!)

নারীসভার নারী মেম্বর;—তাঁহাদের মধ্যে একটি বিলক্ষণ স্বাধিন; তাঁহার কিছু সম্পত্তিও আছে। বিধবা। পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা খুব, বয়স কাঁচা —বোধ হয়, অষ্টাদশ পূর্ণ হয় নাই;—সেই বিধবাটি আজিও যদিও অন্দর মহল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উঠিতে পরেন নাই, কিন্তু নিজে আর অন্দরে বাস করেন; সদরে হইয়াছেন, সদরেই থাকেন; সেই সদর মহলটি তিনি আপাততঃ সভাকরিবার জন্য দিয়াছেন; ইহার পর সাধারণ চাঁদার দ্বারা সভার নিজের বাড়ীপ্রস্তুত হইলে বিধবা আবার সধবা হইয়া ঐসদর মহলের অধিকারীণী হইবেন। সেই সময় অন্দর ভাঙ্গিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। যাঁহারা যাঁহারা মেম্বর তাঁহাদের সকলকেই অচিরে অন্দর ভাঙ্গিতে হইবে। যাঁহাদের মাতা পিতা অছেন, তাঁহারা কি করিবেন? অন্তঃপুর ত্যাগকরিয়া বাটীর বাহিরে বাস করিবেন, কি? যে বাড়ীতে অন্দর আছে, সেবাড়ীতে থাকিতে নাই, অতএব ঐ বাড়ী কি ত্যাগকরিবেন? কাজে কাজে তাগাই! লোকে জিজ্ঞাসা করেন, সায়ত্রিশটি মেম্বর অথবা অশুদ্ধ ইংরাজীতে মেম্বরী, ইহাঁরা কোন ধর্ম্মের সেবিকা?—সরগুলি কি, ঠিক জানা যায়না, সামান্য পরিচয় আছে, চার পাঁচটি নাকি স্বাধীন মতাবলম্বিনী। স্বাধীন জেনানা।

সভার খাতা আছে; খাতায় নাম দস্তখত করিতে হয়। খাতার মাথার উপর একখানি একরার লেখা আছে। একরার মানে অঙ্গিকার পত্র। অঙ্গিকার পত্রে লেখা আছে কি, নিম্নে দেখুন:—

আমি শ্রীমতি মহামায়া এতদ্বারা অঙ্গিকার করিতেছি যে. যে বাড়ীতে অন্দর থাকে, সে বাড়ীতে বাস করিব না; বাড়ীর উপর কর্তৃত্ব করিবার আর কেহ না থাকিলে আমি সে বাড়ী ভাঙ্গিয়া একাকার করিব, বাবু লোকের বাগানের ইমারতের মত নূতন বৈঠকখানা বানাইব, পুরুষকে বড় বলিয়া মানিবনা, স্ত্রীপুরুষ উভয়ে সমান স্বাধিনতা ভোগকরিবে, পরের অধীন থাকিব না; লেখা পড়াশিখিয়া চাকরি করিব, এই সব কার্য্য করিলেই এদেশের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি হইবে। বিধাতা দয়া করিয়া এই সভার দলপুষ্টি সাধন করিয়া সভাটিকে চির জীবীনী করুন।

উপরের পাঠগুলিতে অঙ্গিকারও আছে, বক্তৃতাও আছে। উত্তম হইয়াছে; কিন্তু অঙ্গিকার ভঙ্গ করিলেকি হইবে, অঙ্গিকার পত্রে সেই মতর্ব্বর কথাটার একটুও উল্লেখ নাই। অঙ্গিকার করিয়া অঙ্গিকার পালন করিতে অনেক লোক অক্ষম, অথবা অসম্মত। কবিরা বলেন, অঙ্গিকার করা সহজ, পালন করা অত্যন্ত দুরহ, এই সংকল্পিত সভাটি গুটিকতক স্ত্রীলোক পাইয়া গৃহীত হইয়াছে, এরূপ ক্ষুদ্র সভার সভ্যগণের মধ্যে এক আধজনের অঙ্গিকার ভঙ্গের সমাচার শুনিতে পাওয়া অসম্ভব নহে, বড় বড় সভাতেও ঐ প্রসঙ্গে বিষম গোল। কিছুদিন হইল, এই কলিকাতা সহরের এক পাড়ার কুলিন মৌলিক কায়স্থ মহাশয়ের বিবাহের পণ গ্রহণ নিবারণের উদ্দেশ্যে এক সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন পুত্রের বিবাহে কন্যার পিতার নিকট হইতে দাবি করিয়া পণ গ্রহণ করিব না, এইরূপ অঙ্গিকার পত্রে অনেক গুলি বড় বড় কায়স্থ সন্তান আপনাপন নাম দস্তক্ষত করিয়া ছিলেন। অল্প দিবসের মধ্যেই। দুএকজন স্বাক্ষর কারি মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ পূর্ব্ব প্রণালীতে হইয়া গেল, বরকর্ত্তা বিলক্ষণ দাবি করিয়া পণ লইলেন দলের লোকেরা সকলে সে কথাটা জানিল কি না জানিল, তাহা আমরা জানিনা, একটি কর্ত্তা কিন্তু ধরাপড়িয়া ছিলেন। তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তিনি একজন গৃহস্থ কুলিন কায়স্থের নিকট ৮ আট হাজারটাকা পণ দাবি করিয়া ছিলেন। জানি সেই সভার একজন সাক্ষর কারি। দলের কেহ কেহ এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কর্ত্তাটি উত্তর দিয়াছিলেন, আমার ইচ্ছা ছিল, দাবি করিব না, গৃহিনীর মত হইল না, গৃহিনী বলেন, "এখন কার দিনে দাবি দাওয়া না করিলে জাতি থাকে না, মান থাকে না, গহনা

হয় না, কিছুই হয় না, খুব দাবিকর।” আমি কি করিব? কথাও সত্য; কর্ত্তা কি করিবেন? যদি কিছু দোষ থাকে, সে দোষ গৃহিনীর। (হায় হায়! যেখানে গৃহিনীর অমতে বড় বড় অঙ্গিকার রক্ষা হয় না, সেখানে সহস্র মিটিং করিয়া, সহস্র একরার লিখিয়া কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, এমন বিশ্বাস হয় না।) (হায় হায়! হিতৈষীমহাশয়েরা এতদ্দেশে সভা করিয়াছেন, হায় হায়! সে সভা কোথায় গেল! সব একাকার!)

অঙ্গিকার পালনের আর এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণ আছে। স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার এদেশে মদ খাওয়া কমাইবার উদ্দেশ্যে, যখন সুরাপান নিবারিণী সভা সংস্থাপন করেন, তখনও অঙ্গিকার পত্রের বয়ানে এইরূপ লেখাছিল যে, আমি শ্রী অকাল কুষ্মাণ্ড চৌধুরী ধর্ম্মতঃ অঙ্গিকার করিতেছি, ডাক্তারের ব্যবস্থা ব্যতীত কখন মদ খাইব না; যদি দৈবাৎ ভুলভ্রান্ত খাইয়া ফেলি, তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর। এই অঙ্গিকারটি উত্তম প্রহসন। (হায় হায়! সেইদেশ হিতৈষী প্যারীচরণ সরকায় কোথায় গেলেন! সেই সভায়ইবা কোথায় গেল! রক্তস্রোত বাড়িতেছে, কমিতেছে না!)

আক্ষেপের সহিত বলিতে হয়, সভাকরা একটা, হুজুগের ধর্ম্ম। সহরে হুজুগ অনেক প্রকার। সভাকরার হুজুগটা নূতন বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই কলিকাতার সহরে জনকতক তরুণ বয়স্ক বাঙ্গালি বালক একবার একটা সাদর নিবারণী সভা করিয়াছিল। এক উড়ানী চাদর কতরকম বেশ ধারণ করিয়া বাবু বেশধারিগণের স্কন্ধে, কণ্ঠে, বক্ষে, কটিদেশে, মস্তকে, পদ্মফুলের আকারে করতলে, কুণ্ডলিকর ক্ষুদ্র সর্পের ন্যায় কার বা পকেটে শোভা পায়, তাহাও সহ্য হইল না, তাহাও ভাল লাগিল না, সৌখিন বালকেরা রাগান্ত হইয়া চাদরের প্রথা এককালে সমূলে উঠাইয়া দিবার মতলবে সভা করিয়া ফেলিল। বক্তৃতা হইয়াছিল, দু-এক খানা রিপোর্ট ছাপা হইয়াছিল, মেম্বরের দলে পাঁচসাতজন বাবু সত্য সত্য চাদর ফেলিয়া দিয়াছিলেন, কেবল জামা গায়ে দিয়া, মোজা জুতা পরিয়া, ষ্টিক হস্তে লইয়া, এক একটি বাঙ্গালী বাবু পাটের কলে চাকরির উমেদারির জন্য অবহেলে দুইক্রোশ পথ পাড়ি মারিয়াছেন। হইয়াছিল অনেক দূর, সভা কিন্তু বাঁচিল না. রোগ ধরিয়া অল্প দিনেই মরিয়া গেল। সেই বাবুর এখন বেশী বাহারওয়ালা ফুলকাটা ঢাকাই চাদরের গোলাম হইয়া পড়িয়াছেন। (হায় হায়! সেই বাদর নর্ত্তনী সভাটি কোথায় গেল!)

যাহা যায়, তাহা ঐরূপেই উড়িয়া যায়। ভাল জিনিষ থাকিবে, মন্দ জিনিষ

যাইবে, কিম্বা ভাল জিনিষ যাইবে, মন্দ জিনিষ থাকিবে, সচরাচর এমন ঘটনা হয় না। মেঘমালাদেবীর প্রতিষ্ঠিত অন্তঃপুর নির্ম্মুলিনী সভা যদি জন্মে, অতি শীঘ্র মরিবে, কিম্বা বেশীদিন বাঁচিবে, অনুমাণ করিয়া তাহা বলিতে পারা যায় না! সদর খিড়কী একাকার? এই একাকারের আগুণে যে সভা বাতাসদেয়, সে সভার দ্বারা মঙ্গল হইবে কি, অমঙ্গল ঘটিবে, দশের মুখে যতদিন তাহার বিচার না হয়, সভাটা হয়ত যোগে যাগে ততদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সভার পরমায়ু অল্প, সায়ত্রিশটি মাত্র মেম্বর। মেঘমালা একদিন ঘোষণা করিয়াছিলেন, আশীজন মেম্বর জুটিয়াছে, আশী দ্বিগুণে একশত ষাট টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। মাসে মাসে একশত ষাট টাকা উঠিবে, ক্রমে ক্রমে বাড়িবে। কাওই মিথ্যা। যেদিন মিটিং হয়, সেদিন উপস্থিত থাকে, ফরসা ফরসা কাপড় পরা, বুকবন্ধ জামা আঁটা ঘোমটা খোলা খোঁপা বাঁধা বারটি কি তেরটি স্বাধীনা জেনানা মাত্র ঠিক্‌যেন গোবিন্দ অধিকারীর গোপাঙ্গনা যাত্রার একদল সখি।

এমন ক্ষুদ্র আয়োজনে, এমন ক্ষুদ্র অবয়বে, এমন ক্ষুদ্র আভরণে মহৎ কার্য্যের সভা হয়না,—হইতে পারেই না। খাঁচার ভিতর বসিয়া, খাঁচার দ্বার ভাঙ্গিয়া উড়িয়া, এক বাগানের একধারের গুটি কতক বঙ্গ বিহঙ্গিনী আমাদের অন্তঃপুর উঠাইবার কল্পনা করিতেছে। সাহস দুর্জ্জয়! সে কথাও সত্য, কিন্তু মেয়ে গুলির যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আমাদের দিন কতক একটা নবরঙ্গ দেখিবার ইচ্ছা হওয়া উচিত। বহুদিন কল্পনা হইল, কার্য্য হইল না; মেয়েগুলি পারিল না; লোকে হাসিতেছে।

গীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস।

ভৈরবী—একতালা।

কবে গহন সংসার তেয়াগিয়া যাব তোমারি বিজন কাননে।
কবে বিষাদ তম বিদূরিত হবে তোমারি উজ্জ্বল কিরণে॥
কবে বনজ কুসুম তুলিয়া নিরালে,
রচিয়া মালিকা পরাইব গলে,

কবে প্রিয়তম জ্ঞানে পূজিব তোমায় স্থাপিয়া হৃদয় আসনে ॥
কবে এমর মরতের মায়া পাশরিবে,
মম সুপ্ত জীবন তোমাতে মিশাবে,
তোমারই গরিমায় তোমারই মহিমায়,
দলিব কামিনী কাঞ্চনে।
(মম) তন্দ্রা জড়িত মানস চক্ষে,
(চির) দুঃখ নিহিত নিদাঘ বক্ষে,
তব তুষার পরশে, পলকে হরষে,
নাশি এ বিষম বেদনে ॥
বাঁধিয়া যতনে ভক্তির নিগড়ে,
(তব) কীর্ত্তি পতাকা উড়াব অম্বরে,
তব পদ চুমি, পড়ি যদি ঘুমি,
রেখহে অন্তিম শয়নে ॥

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

স্যর জগদীশচন্দ্র বসু প্রেগ উইনিভারসিটিতে সম্বর্দ্ধনা।

স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রেগ ইউনিভারসিটিতে তাঁহার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে বৈদ্যুতিক শলাকার সাহায্যে দুইটী বক্তৃতা করিয়া সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। সেই ইউনিভারসিটীতে তাঁহাকে বিপুল উৎসাহে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। বৃক্ষাদির নাড়ীর স্পন্দন অবিরাম চলিতেছে এবং সেই আভ্যন্তরিক স্পন্দন সাহায্যে উচ্চ বৃক্ষাদির শাখায় জল উত্তোলিত হয়। এই সত্যের তিনি নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বৃক্ষের সবুজ বর্ণের পত্রাবলি বায়ুমণ্ডল হইতে কার্ব্বনিক এসিড গ্রহণ করে এবং সূর্য্যকিরণের বীর্য্য বা শক্তি কার্ব্বো-হাইড্রেট রূপে তাহাতে সঞ্চিত হয়। চারা গাছগুলি যে পদ্ধতিতে কার্ব্বণ গ্রহণ করে, তাহা মানবচক্ষুর গোচরীভূত বিষয় নহে। স্যর জগদীশচন্দ্র এই সকল বিষয় পরিষ্কার রকমে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্যর জগদীশ একটী যন্ত্র

বা য়্যাপারাটাস আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহারা অনুভূতি শক্তি (sensitiveness) অদ্ভূত এবং অপূর্ব্ব। কার্ব্বন ইত্যাদি গ্রহণ এবং স্বাভাবিক পরিমাণে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে সেই যন্ত্রে স্বতশ্চালিত হইয়া তাহা রেজেষ্ট্রি কৃত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বেসের গতির পরিমান যেরূপ থাকে, তাহা হইতে পরিমাণ কমিয়া গেলে মানবদেহে যেরূপ বিশৃঙ্খলার অবস্থা উপস্থিত হয়, সেইরূপ উদ্ভিদের কার্ব্বন ইত্যাদির সমাহারে কতকগুলি অবস্থায় যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহা এই নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে ধরিতে পারা যায়। এখন সমস্যা এই যে, বিশেষ চিকিৎসার সাহায্যে উদ্ভিদের সঞ্জীবনী শক্তি সমাহারের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে পারে কি না। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনী শক্তির উন্নতি ও তৎপ্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া যে একই ভাবে চলে, স্যর জগদীশ তাঁহার যন্ত্রের সাহায্যে তাহা প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাজেই ভেষজ বা ঔষধ আবিষ্কারের ব্যাপারে তাঁহার আবিষ্কারের ফলে অনেকটা গুরুতর সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্যর জগদীশচন্দের নব অবিষ্কার ও অপূর্ব্ব পদ্ধতি সম্বন্ধে শারীর-স্থান-বিদ্যাবিদ (Physiologist) বিখ্যাত অধ্যাপক মিঃ নেমি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন এবং স্যর জগদীশচন্দ্রের গবেষণার তারিফ করিয়াছেন। বার্লিন, ডেনমার্ক এবং স্কাণ্ডিনাভিয়া ইউনিভারসিটীতে এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সাদরে আহ্বান করা হইয়াছে। তিনি সেই সকল আমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন

নোবেল পুরস্কার

কয়েকদিন হইল, রয়টার খবর দিয়াছেন যে, আইরিশ কবি ইয়েটস এবার সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। এই পুরস্কারটী ডিনামাইটের আবিষ্কর্ত্তা আলফ্রেড নোবেল স্থাপন করেন। তিনি ইহার জন্য ১,৭৫০,০০০ পাউণ্ড দিয়া যান। এই অর্থ হইতে নিম্নলিখিত পাঁচটী বিষয়ে পাঁচটী পুরস্কার স্থাপিত হয়। (১) পদার্থবিদ্যা (২) রসায়ন (৩) ভেষজবিদ্যা অথবা শরীরতত্ত্ব (৪) সাহিত্য (৫) শান্তি। বর্ত্তমানে প্রত্যেকটী পুরস্কারের মূল্য ৬,৫০০ পাউণ্ড।

১৯০৫ হইতে যাঁহারা সাহিত্যের জন্য এই পুরস্কার পাইয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া গেল :—১৯০৫—সিনকিওয়েজ, ১৯০৬—জি, কার্ডুসী, ১৯০৭—রাডিয়ার্ড কিপ্‌লীং ১৯০৮—রুডল্‌ফ অয়কেন, ১৯০৯—সেলমা লেগ

১৯১০—পল হেইসী, ১৯১১—মরিস মেটার লিঙ্ক, ১৯১২—জারহার্ট হাউপ্ট-ম্যান, ১৯১৩—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯১৪—কোনও পুরস্কার দেওয়া হয় নাই, ১৯১৫—রোমা রোলা, ১৯১৬—ভন হেইডেনষ্ট্যাম, ১৯১৭—কে, জেলরাপ, কে, পন্টপিডান, ১৯১৮—কোনও পুরস্কার দেওয়া হয় নাই, ১৯১৯—কার্ল স্পিটলার, ১৯২০—নুট হ্যামসান, ১৯২১—আনাতোল ফ্রান্স, ১৯২২—জেকিণ্টেন বেনাভেন্টি, ১৯২৩—উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস্।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

সমালোচনা।

সঙ্গীত-সোপান। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া প্রণীত, গৌরীপুর, আসাম গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য মুল্য দুই টাকা মাত্র।

এই পুস্তকে সাঙ্কেতিক স্বরলিপির বিশদ ব্যাখ্যা ও স্বরলিপি দৃষ্টে সঙ্গীত শিক্ষার সহজ উপায় সমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি কণ্ঠ সঙ্গীতের প্রথম শিক্ষার্থীগণের উদ্দেশে লিখিত; যাহারা সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকেন, এই "সঙ্গীত সোপান" পুস্তকখানি তাঁহাদের সঙ্গীত সাধনের বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সঙ্গীত শাস্ত্রে যাহাদের অধিকার আছে তাঁহারা আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। গ্রন্থকার বঙ্গের সুবিখ্যাত গায়ক স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শিষ্য এবং নিজেও তিনি একজন সুগায়ক বলিয়া পরিচিত। তিনি এই পুস্তকে সঙ্গীত শাস্ত্রের নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন।

সত্য-কথা। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এইচ, এম, বি, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৯৮।১ নং বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা সাধন-সমর কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

১৬ পৃষ্ঠায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সমাপ্ত হইয়াছে, গ্রন্থকারের নাম নাই। পুস্তকের নামেই আলোচ্য বিষয়ের নির্দ্দেশ করিতেছে। পুস্তক খানিতে সত্যকে কেন্দ্র করিয়া আত্মতত্ত্ব লাভের উপায় প্রদর্শন করা হইয়াছে। পুস্তক ... নি ক্ষুদ্র হইলেও ভাষাও যেমন গম্ভীর, ভাবও সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী।

বিষয় পরিষ...

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মুল্য বড় বোতল ১॥০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১॥০ মাত্র।

গোল্‌ড নার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্‌।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Foamula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রীতিমাখান

সুন্দর মুখখানি

কিসে হয় ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৵০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী-ব্যাধিতে-অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ॥৵০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

২৯শ, বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩০. [৭ম, সংখ্যা

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ব্রাহ্মণ-কুমারের সিদ্ধি	শ্রীযুক্ত হরিদাস ব্রহ্মচারী	১৯৩
২।	ধোপানী	শ্রীযুক্ত কালিপদ মুখোপাধ্যায়	১৯৮
৩।	ভোজন প্রণালী	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষাল	২০৩
৪।	শ্যামা মা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত	২০৯
৫।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২১৪
৬।	সমালোচনা	... ...	২২৪

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কালকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত

Tele. Phone 388 Barabazar. 3-1-24

জ্বরের যম **জারম্মলীন** সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

মূল্য ॥০, ডজন ৫৲, গ্রোস ৫০৲, পাইকারী দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

আর, গোভিন এণ্ড কোং, হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Telegram:—GERMALINE. Telephone No. 1388

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর

যখন চখের সামনে লেখাগুলি

[illegible] যাবে

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তৈল

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা : "ফিজীশিয়ান"

টেলিফোন নং : ২৭১৫ কলি :

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

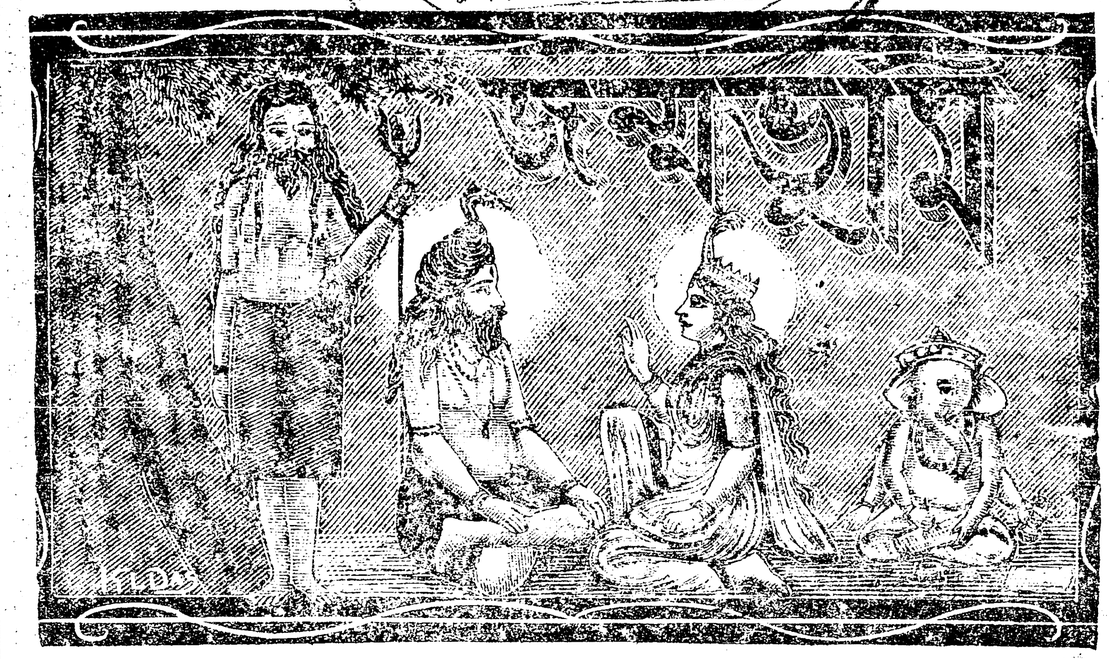

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৯শ, বর্ষ। | ১৩৩০ সাল, কার্ত্তিক। | ৭ম; সংখ্যা।

ব্রাহ্মণ-কুমারের সিদ্ধিলাভ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিদাস ব্রহ্মচারী।

যিনি শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, বিশ্বের বীজ-স্থানীয়, ঋক যজু সামবেদ যাহার প্রশংসা গান করেন, যিনি অদ্বিতীয় অবিনশ্বর, স্থুল, সূক্ষ্ম, নিত্য অনিত্য, বিশ্বস্বরূপ হইয়াও আবার বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র, যিনি চরাচর স্রষ্টা, জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত সদা আনন্দবহ ইন্দ্রিয়াদি মনঃ বুদ্ধি সত্য তেজঃ বল ধৃতি শ্রুতি স্মৃতি সেই অনাদিনিধন ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান লোকগুরু, জীবের দুঃখে কাতর হইয়া অবতার গ্রহণ করেন। কলির দুর্ব্বল মানবের ভিতর থাকিয়া, এই কালোপযোগী জ্ঞান ভক্তি প্রেম, দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায়! দুর্ব্বল আমরা ধরিতে পারি না, তাঁহাকে ধরিতে শক্তি চাই; যার সেই শক্তি আছে, সেই ধরিতে সমর্থ হয়, যোগী ঋষিরা ধরেন; তাঁহাদের সে শক্তিরূপ ব্রহ্মচর্য্য আছে, তাহাতেই তাঁহাদের ভিতর

ভগবানের অবির্ভাব, যেমন কাঁচে সূর্য্যের বেশী আভা ; তিনি এই জীবের ভিতর আছেন, ধরা দেন না ; ধরে তাহারা, যাহারা, তাঁহার সন্ধানে ফেরে। মানুষ আর মানহুঁস ; যে মানুষে হুঁস আছে, সেই মানব ধরে, সেই জন্য মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, মানুষ্যের ভিতর তিনি সমস্তই দিয়াছেন, এখন হুঁস হইলে হয়, কিন্তু সে হুঁস অর্থাৎ চৈতন্য হওয়া দুর্ল্লভ। মনোরূপে জীবের ভিতর তিনি বাস করিতেছেন ; আগে তাঁহাকে জান। সাধন তপস্যা ভিন্ন তাহা হইবার উপায় নাই। এইরূপে নিয়মপূর্ব্বক তপঃজপ চলিলে সেই জ্ঞানময়গুণসিন্ধুর কণামাত্র কৃপা হইলে জীবের মুক্তি হইল। ব্রহ্মচর্য্য ধারণরূপ আচার হইলে শুদ্ধ মন শুদ্ধ আত্মা হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ নিমাই পণ্ডিত যখন টোলে পড়াইতে ছিলেন, কেহ তাঁহাকে বলিল,"আপনি নিজে যখন শিক্ষাদাতা তখন আপনার ছাত্রেরা কেন অনুপযুক্ত ?" নিমাই পণ্ডিত উত্তর করিলেন,—"ছাত্রেরা অপব্যয় করিয়া ফেলে। মেধা কোথা হইতে হইবে। লক্ষ্মণ চৌদ্দ বৎসর স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করেন নাই। সীতার মুখপানে চান নাই,সীতার অলঙ্কার শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে দেখানতে লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্য ! আমি কেবল পায়ের অলঙ্কার চিনি। অন্য অলঙ্কার জানি না।" ব্রহ্মচর্য্য ধারণ হলে মনঃ সংযত হয়, চিত্ত নিবৃত্তি লাভ করে ; তখন বৈরাগ্য হয়। ঠিক যাহার বৈরাগ্য হয়, সেই শরণাগত হইতে পারে, নহিলে মুখে শরণাগত হইলাম, বলিলে হয় না। সেই ভগবান মনে ব'সে মন দেখেন, শরণাগত হইলে তাঁর কৃপা হবেই।"

এ সংসারচক্রে জীব অহর্নিশ কর্ম্ম-বিপাকে ঘুরিতেছে ; শান্তি পাইতেছে না ; কেবল ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে ; যখন চুষিকাটি ফেলিয়া দিয়া মা বলিয়া কাঁদিবে, তখন মা আসিয়া স্তন্য মুখে ধরিবেন। কিন্তু চুষিকাটি ফেলিয়া দেওয়া মুখের কথা নয়। গুরু শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ সংসার অনিত্য বুঝিতেছিস্ ত ? দুদিনের জন্য, কেহ কাহারও নয়। জীব নিজ নিজ কর্ম্মফল, ভোগ করিবার জন্য পৃথক্ আসে পৃথক্ যায়; এখানে আসিয়াই সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে, এ আমার স্ত্রী, এ আমার পুত্র ; এ আমার মাতা এইরূপ কত কত ! অতএব চল্ আমার সঙ্গে।" শিষ্য উত্তর দিল. "গুরুদেব ! কেমন ক'রে যাইব. স্ত্রী ভালবাসে—পিতা মাতা কত স্নেহ করেন ! সংসারের কত আশা ভরসা" ইত্যাদি। তখন গুরুদেব বলিলেন, "বাছা ! ও সকল কেবল মহামায়ার মায়া, আমি একটি বটিকা ঔষধ দিতেছি, তুমি এইটি রাত্রে আহারের পর খেয়ে শুয়ে থেকো ; মরিবে না, ভয় নাই ; আমি কাল তোমার বাড়ীতে গিয়া তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিব,

কে কত তোমাকে ভালবসে।" শিষ্য গুরু-আজ্ঞা পালন করিল। পরদিন বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল ; শয্যায় অঙ্গ কাঠ মত হইয়া পড়িয়া আছে। বাড়ী শুদ্ধ রোদনধ্বনি, সকলের শোকানল, উথলিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় এক ঘটনা ঘটিল। তেজঃপূর্ণ কলেবর এক সন্নাসী মহাপুরুষ ঐরূপ রোদনধ্বনি শুনিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল. "তোমাদের রোদনের কারণ কি ?" তখন বাড়ীর সকলে একবাক্যে বলিল, "আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" পিতা বলিলেন, "আমার পুত্রটি মারা গিয়াছে !"

সন্নাসী। আমি কি একবার দেখিতে পাই ?

পিতা। আসুন ! বলিয়া যে ঘরে মৃতদেহ রহিয়াছে, সেই ঘরে সন্নাসীকে লইয়া গেল।

সন্নাসী। নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "এ মরে নাই। চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারে।" এই বলিয়া সন্নাসী ঝুলি হইতে একটি বটিকা বাহির করিয়া বলিলেন, এই বটিকাটি যে কেহ খাইলে এ ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিবে ; কিন্তু যে খাইবে সে মারা যাইবে। তোমরা ত এত রোদন করিতেছ, ইহার মাতার ও স্ত্রীর রোদনটা বেশী—তা-দু—জনের মধ্যে কেহ একজন খান না কেন ?"

তখন মার ও স্ত্রীর মধ্যে কেহই খাইতে সম্মত হইল না। মাতা বলিলেন, "আমি সংসার না দেখিলে সংসার চলিবে না।" স্ত্রী বলিল, "আমার পুত্র কন্যাদিকে আমি না দেখিলে আর কে, দেখিবে। ওর ত যা হবার হইয়া গিয়াছে।"

গুরুর কৃপায়, সেই দেহ মৃতবৎ ছিল মাত্র। ভিতরে জ্ঞান ছিল। মাতার ও স্ত্রীর কথা গুলি শুনিয়া উঠিয়া বসিল, তখন গুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "গুরুদেব ! এইবার চলুন, আপনার কৃপায় আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। সে তখন সংসার ত্যাগ করিয়া গুরুর সহিত চলিয়া গেল। ইহাকেই বলে—মা যদি কেশে ধরে তোলে।

কোন সময়ে অর্জ্জুন প্রভু ভগবান্‌কে বলিতেছেন "সখা ! সে ব্যক্তির ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ হইল, সে ইহ-পরকাল কিছুই পাইল না।" কৃষ্ণ বলিলেন,— "সখা, সে ইহজন্মে যাহা কিছু করিল, পরজন্মে তাহাকে এমন স্থান দি—যে তাহা হইতে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধি লাভ করে।" তা এ জন্মে এই ব্রাহ্মণ-কুমার যে কার্য্য করিয়া ভগবান্‌কে পাইয়া ছিল সে কথা বলিতেছি। বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইলে, সেই ব্রাহ্মণকুমারের মনে কেমন এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল যে, আমি

ভগবানের উদ্দেশ করিব, মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিল, এবং অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পিতা মাতা এখন হইতে তাহাকে কেমন একপ্রকার উদাসীনের ন্যায় দেখিতে লাগিল। ক্রমে তাহার ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইল। সন্ধ্যা গায়ত্রী উপাসনায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত করিত। এইরূপে কিছুদিন যায়; সংসারের ভিতর থাকিয়া তাহার এ সকল কার্য্যে অনেক বাধা বিঘ্ন হয়, দেখিয়া একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া সে কোথায় চলিয়া গেল। তাহার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়াছে; তখন সে কি আর স্থির থাকে? আপন মনে ভাবে বিভোর হইয়া অনেক পথ অতিক্রম করিয়া এক নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া ধ্যান-যোগ অবলম্বন করিল। সেই নিবিড় বনে একমাত্র ভগবৎ চিন্তায় থাকায় ভগবান তাহার সহায় হইলেন। এইরূপে কতদিন কত রাত্রি গেল তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে তখন এত তন্ময় হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ে সেই প্রভু ভগবান্‌কে দেখিয়া বিভোর হইয়া আছে। মহামায়ার মায়া। এ দিকে তাহার পিতা মাতা পুত্রহারা হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল; পুত্র কোথায় গেল; জননী পাগলিনীর ন্যায় হইল; পিতা মাতার রোদন বিলাপে পাষাণও বিগলিত হয়। পাড়া প্রতিবাসীরা আসিয়া কত সান্ত্বনা দিতে লাগিল; কিন্তু হায়! তাহাতে তাহাদের মনে কি শান্তি হয়? একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় গেল, রাত্রি দিন এই ভাবনা! সংসারে জীবনবিহীনের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিল। কোন উপায় নাই, দেখিয়া অবশেষে ভগবানে নির্ভর করিয়া রহিল; মনের বেদনা মনে চাপিয়া অতিশয় দীনের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিল।

এই সময় হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণকুমার এক বাধা প্রাপ্ত হইল, তাহাতে মন প্রাণ অবসন্ন হইল; তাহার মনে হইতে লাগিল যে, তাহার দীক্ষা মন্ত্র ত হয় নাই; কেমনে ভগবান লাভ হইবে! আবার মনে উদয় হইল যে, "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ" তিনিই আমার গুরু, এই প্রহেলিকায় পড়িয়া তাহার মন বিচলিত হওয়ায় উঠিয়া পড়িল; কোথায় যাই, বাটী ফিরিয়া যাই, মনে হইতে লাগিল। এই বলিয়া ব্রাহ্মণকুমার বাটী ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল। ভক্তবৎসল ভগবান্ দেখিলেন, আহা ভক্ত আমার নিষ্ফলে বাটী ফেরে, তখন তিনি এক পূর্ণ বট হইয়া পথ মধ্যে রহিলেন। যেমন সেই ব্রাহ্মণকুমার সেই বটের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, অমনি সেই বট হইতে গভীর শব্দে দৈববাণী হইল, হে ব্রাহ্মণ! তুমি ভগবৎ উদ্দেশে বাটীর বাহির হইয়া এই অল্পকালের মধ্যে

ঈশ্বর লাভ হইল না, বলিয়া বাটী ফিরিতেছ? কিন্তু ভগবান্‌কে কি কেহ সহজে পায়? যোগী ঋষিরা কত যুগ যুগান্তর তপস্যা করিয়া তাঁহাকে পাইতেছেন না। আর তুমি এত অল্প আয়াসে তাঁহাকে পাইবে? দেখ! আমি এই ঘট, কুমারেরা মাটি কাটিয়া আনে, পা দিয়া চটকায়, তারপর কত পেটে, রৌদ্রে রাখে, পনে দেয়, পোড়ায়, এত কষ্ট সহিয়া তবে আমি কলসী ঘট হইয়াছি, তুমি এই মন্ত্র লও, অধ্যবসায়ের সহিত ধ্যানযোগ কর, 'অবশ্য ভগবান দর্শন পাইবে।" তখন পুনরায় সেই ব্রাহ্মণকুমার তথায় আসিয়া একগ্রচিত্তে দৃঢ়তার সহিত পুনরায় ধ্যানে বসিল। এবার যেন হৃদয়ে এক অভিনব শক্তি অনুভব করিল। অচিরাৎ ভগবৎ কৃপায় সমাধি লাভ করিল, তখন ভক্তবৎসল প্রভু জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে সেই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়া দেখা দিলেন। শঙ্খ স্পর্শ মাত্রেই চৈতন্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণকুমার সম্মুখে দেখিল, যে অপূর্ব্ব তেজঃপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে ভগবান্ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহার মনে যে তখন কি আনন্দ প্রবাহ বহিতে লাগিল, তাহা বর্ণনাতীত। তখন যে ভাবে পরম যোগী যোগ করেন যুগ যুগান্তরে, একপ ভাব-তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তিগদ্‌গদ ভাবে প্রভুকে স্তব করিলেন, "হে দেব দেব! তোমাকে নমস্কার, তুমি জন্মমৃত্যু বিহীন, তুমি আদিদেব, শাশ্বত, তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি পুরাণ পুরুষ, তোমাকে নমস্কার।" ভগবান্ তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'বৎস! বরং বৃণু' তোমার অধ্যবসায়ে প্রসন্ন হইয়া তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন, "হে বরদ প্রভু! আপনার দর্শনে আমি সমস্তই পাইয়াছি, আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, তবে যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন, যেন আপনার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে।" ভগবান্ "তথাস্তু বলিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণকুমারকে বলিলেন, "ভক্ত! তুমি ইহকালে সুখে থাকিয়া বিবিধ পুণ্যকর্ম্ম সকল করিয়া, অন্তে আমার কৃপায় বৈকুণ্ঠে যাইবে, তোমার কোন বিষয়ের অপ্রতুল হইবে না।" এই বলিয়া ভগবান্ সেইখানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকুমার প্রফুল্লচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিয়া পিতা মাতার চরণ বন্দনা করিয়া আদ্যপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। পিতা মাতা পুত্রের মুখদর্শন করিয়া হারানিধি পাইলেন ও এমন গুণবান্ পুত্র পাইয়া ধন্য জ্ঞান করিলেন। তদবধি সেই ব্রাহ্মণকুমার ভগবৎকৃপায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া অনেক পুণ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। তিনি দার পরিগ্রহ করিলেন না। তাঁহার যশঃসৌরভে দেশ

দেশান্তর হইতে লোক-সমাগম হইতে লাগিল। যে যাহা বাসনা করিয়া তাঁহার কাছে আসে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, কাহারও বাসনা অপূর্ণ থাকে না। পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়া কত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করাইতেন! ব্রাহ্মণকুমার ভগবৎ কৃপায় সমস্ত বিষয়ের এমন সদর্থ করিয়া দিতেন যে, বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। সেই ব্রাহ্মণকুমার পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারগুণে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, এ জন্মে এই অল্প অনুষ্ঠানে একেবারে শাশ্বতধাম পাইলেন। ঘুড়ি লক্ষের মধ্যে একটা কাটে।

ধোপানী।

লেখক—শ্রীযুক্ত কালিপদ মুখোপাধ্যায়।

(১)

ধোপানী লো ভালবাসি দেখিতে তোমায়!
পান পানা মুখখানি ললাট নিলোট,
নবনী কোমল কিবা যুগল কপোল।
বাঁকা বাঁকা চোখ দুটী চাহনী চটুল,
নাকটী টিকোলো কিবা বাঁশী সমতুল।
টানা টানা ভুরুদুটী অগ্রসূচী মুখ,
কে যেন রেখেছে ভেঙ্গে কামের কার্ম্মুখ।
জীর্ণতরী মাজাখানি উরস পিবর;
রুচির বরণ শ্যাম কৃশ কলেবর।
যুগোল সুচারু উরু বিপুল জঘণ,
গতি মন্দ অঙ্গভরা ফুটন্ত যৌবন।
বরষা জোছনা হাঁসি ফুটান অধরে—
ফোটে ফোটে ফোটেনা সে জলদ অম্বরে।
আধ হিন্দি কথাগুলি আধ বাঙ্গালায়,
দোভাষে ক্ষরিত সুধা শ্রবণ জুড়ায়।
ধোপানী লো ভালবাসি দেখিতে তোমায়!

(২)

ধোপানী লো ভালবাসি দেখিতে তোমায়,
দোবেড়ো কাপড় পরা পাড়ের বাহার,
পোদ্দারি পরের ধনে অতি চমৎকার।
পাটা বুকে আটা সদা রঙিন কাঁচলি,
খোট্টাহি পাঁজর পায়ে রুনু ঝুনু বুলি।
কাঁকালে মেঘলা মালা ক্ষিরোদ অম্বুধি,
বাহুতে রূপার তার শারদ কৌমুদী।
প্রকোষ্ঠে কাঁচের চুড়ী কানে কান ফুল।
কপালে উলকি টিপ শোভায় অতুল।
দশনে মিশির রেখা অসিত বিভাস—
সিমন্তে—সিন্দুর ছটা অরুণ প্রকাশ।
রাঙা পেড়ে শাড়ী টানা আধেক মাথায়
আধেক জলদ জালে চিকুর খেলায়।
ধোপানী লো ভালবাসি দেখিতে তোমায়।

(৩)

প্রভাতে ধোপার পাশে দাওয়াতে বসিয়া
কাপড়ে ভেলার দাগ [illegible]ছ দাগিয়া।
চুপি চুপি কত কথা মিটি মিটি হাসি,
সে হাঁসিতে ঝরে পড়ে প্রেমসুধা রাশি—
চোখে চোখে চাওয়া চায়ি প্রাণ বিনিময়।
অকণ্টক ভাব-রাজ্যে দোঁহে ভাবময়।
কভু বসা ঘেঁসাঘেঁসি অঙ্গে মেশামেসি—
সে প্রেমে নাহিক ভাগী নাহি রেষা রেষি,
প্রহর গগনে ভানু উদিত হেরিয়া,
তাড়াতাড়ি উঠ তুমি কাপড় ফেলিয়া।
স্নান করি শীঘ্র করি রাঁধা বাড়া সার,
খাওয়ায়ে প্রাণের সাধে প্রাণের ধোপায়।
পাঠাও বাগানে তারে করি আয়োজন,
পথের দোসর করি সঙ্গে দেহমন।

শূন্য দেহে শূন্য ঘরে করিয়া প্রবেশ,
কাপড় বিছায়ে শোও আলুথালু কেশ :
আধ ঘুমে ভরা আঁখি আধ জাগরণ,
আধ মেঘে ঢাকা চাঁদ আধেক কিরণ।
হেরিয়া মাধুরী মরি সে শ্যামল তায়,
কার না তৃষিত আঁখি তৃষ্ণা মিটে যায়।
ধোপানী লো ভালবাসি দেখিতে তোমায়।

(৪)

প্রদোষে সুনীল বাসে সুচারু সাজিয়া,
উপবাসী আঁখি দুটী পথেতে রাখিয়া,
ধোপানী বসিয়া ভাবে আকুল আশায়,
নিরালার সাথী তার ফিরিবে সন্ধ্যায়।
তামাকে কলিকা ভরা জলে ভরা হুকো,
দোকাটী হাতের কাছে পানে ভরা শুকো,
ঘটীটি জলেতে ভরা গামছা গোছান,
হৃদিমাঝে ফুল শয্যা রয়েছে বিছান।
উল্লাসে সহসা আঁখি উঠিল ভাসিয়া,
পোষাপাখী এলো তার নিকটে উড়িয়া।
পিঞ্জর হইল পূর্ণ আশাটী পুরিল,
মুখোমুখি বসি দোঁহে কত কি বলিল।
দিনের জমান কথা যত কিছু ছিল,
একে একে সবগুলি ফুরায়ে আসিল।
ফুটীল অকাশে তারা হাঁসিল যামিনী,
হাসিল রজনীগন্ধা ফুটিল কামিনী।
উঠিল ত্বরিতে রামা ফিরি দুজনায়,
রন্ধন করিতে চলে রন্ধন শালায়।
ধোপানী বাটনা বাটে ধোপাদের আঁচ,
ধোপা কোটে তরকারি ধোপানীতে মাছ।
ভাগা ভাগী করে রাধে খায় একপাতে—
খেলিবার সাথী যেন খেলে একসাথে।

নীরব গোছনা কোলে নীরব নিশায়,
সাধের পিঞ্জরে শুয়ে পাখিটী ঘুমায়।
ধোপানী লো এত ভালবাসা দেখিনি কোথায়,
তাই এত ভালবাস দেখিতে তোমায়।

(৫)

সুখের প্রভাতে শুক উঠিল জাগিয়া,
প্রাণের সাথিটী তার জাগিল হাসিয়া।
ফুটিল অপরাজিতা প্রভাত সমীরে,
আলো করি কালরূপে আঁধার কুটীরে।
বাহিরিল দোঁহে মিলি হাঁসি মাখা মুখ,
অতুলিত বিকশিত আঁখি ভরা সুখ।
ধোপানী গৃহের কাজ করি সমাপন,
দুজনে কাপড় ভাজে কিবা হৃষ্টমন।
দাঁড়াইয়া পাশাপাশি টেবিলের পাশে,
দুজনে ইস্তিরী করে মনের উল্লাসে।
বাতাসে আচল দোলে দোলে এলোচুল,
ধোপা দেখে চেয়ে চেয়ে কাজে করে ভুল।
কাপড়ে ঘসিতে ঘসে টেবিলের গায়,
ধোপানী মুচকি হেসে আড় চোখে চায়।
বাগানে যাবে না ধোপা আজি তার ছুটী,
উল্লাসে ভরিল আখি ধোপানীর দুটী।
পড়া পাখী সারাদিন রহিবে পিঞ্জরে,
সে আনন্দ ধোপানীর হৃদয়ে না ধরে।
বিকালে ধোপানী বাড়ী বান্ধব স্বজন
আসে গীত বাদ্য করে করে আলাপন।
ধোপানীর পড়সী শোনে মনোহর সাজে—
হাঁসি খুসি করে কত বসি গৃহমাঝে।
সাথীকে শোয়ায়ে রেখে কুসুম শয্যায়
পাশে শুয়ে সারী তার সুখেতে ঘুমায়।
ফুটেছে দুইটী ফুল একটী বোঁটায়—
ধোপানী লো তাই এত ভালবাসি দেখিতে তোমায়।

(৬)

শুন গো প্রসাদবাসী ধনী মহাজন,
মটরে হঠর গতি নিশা বিহরণ।
ভাগিরথী পুণ্যধারা গৃহে বহমান,
উপকূলে কেন তবে তৃষা তিরোধন।
মলয় চন্দনলতা গৃহ উপবনে—
কেন তাপশান্তি তবে পঙ্ক বিলেপনে।
সুধার নির্ঝর বহে গৃহের মাঝার,
কেন তবে কালকূটে বাসনা তোমার।
পুণ্যগৃহে পূর্ণতব মন্দার সৌরভে,
কেন মজ মন্দ ভাগ্য দুর্গন্ধ রৌরবে।
ভাব না কি, ধনি তুমি ভাগ্য আপনার,
সৃষ্টির কলঙ্ক তুমি বিশ্ব বিধাতার।
প্রেম কল্প বৃক্ষ শাখে দুটী সারী শুক,
হেরি কি তোমার মনে জনমে না সুখ।
পুণ্য মন্দাকিনী কূলে বসি এ যুগল,
নিরবধি করে পান সুধা নিরমল।
নন্দনের পারিজাত ফুটায়ে কুটীরে—
ভুঞ্জে দেবতার সুখ মানব শরীরে।
পুণ্য-মূর্ত্তি এ দম্পতী উদিত ধরায়,
শিখাতে দম্পতী প্রেম জগতে সবায়।
বারেক দাঁড়াও আসি হে পুণ্য যুগল,
ছাড়াইয়া ত্রিদিবের সুধা পরিমল,
দেখাইয়া চিত্রা সনে চন্দ্রমা মিলন,
বিছাইয়া বসন্তের শান্ত সমীরণ।
মুক্ত কর অন্ধ চক্ষু সকলে দেখুক—
এ নহে ধোপানী ধোপা শান্তি সনে সুখ
কর্ম্মের জীবনে যথা ধর্ম্ম মিশে যায়।
সুখ শান্তি দুটী তথা খেলিয়া বেড়ায়॥

ভোজন প্রণালী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষাল।

আমাদের শাস্ত্রসম্মত ভোজন প্রণালী অবলম্বন করিলে বোধ হয়, অনেকটা স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে, এজন্য এ সম্বন্ধে আমি কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

ভোজন (ভূজ × অনট ভাবে) ভক্ষণ, কঠিন দ্রব্য গলাধঃকরণ—

১। ভোজন গুণ বিধান—ভোজনের পূর্ব্বে লবণ ও আদা খাওয়া কর্ত্তব্য, যেহেতু ইহা জিহ্বা ও কণ্ঠের বিশোধক অগ্নিবর্দ্ধক ও তৃপ্তিজনক।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্।
অগ্নি সন্দিপনং হৃদ্য লবণার্দ্রক ভক্ষণম্॥

আয়ুর্ব্বৃতে গুড়ে রোগ মৃত্যুর্লীনো বিদাহিষু, অরোগ্যং কটুতিক্তেষু বলং মাংসে পয়ংশুচ অন্নাদৃষ্টগুণং পিষ্টং পিষ্টাদষ্টগুণং পয়ঃ, পয়সোদৃষ্টগুণং মাংসং মাংসাদষ্টগুণং ঘৃতম্। ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনান্নচ ভক্ষণাৎ।

"আহারঃ প্রীণনঃ সদ্যো বলকৃদ্দেহধারণঃ।"

আহার জীবন ধারণের প্রধান উপায়, ইহা দ্বারা শরীর পোষণ ও শরীরকে কার্য্যক্ষম করা যায়। অহারের পূর্ব্বে মন সম্পূর্ণরূপে ক্রোধ ও চিন্তাদি বর্জ্জিত করা উচিত ও ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করা উচিত। ভুক্ত বস্তু লালারস দ্বারা পরিপাক শীঘ্র হয় ও দ্রব্যের আস্বাদন ও গ্রহণ করা যায়।

২। কোন্ মুখে বসিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য?—

আয়ুষ্যাং প্রাঙমুখোভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ
শ্রিয়ং প্রত্যেঙ মুখোভুঙক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তেহ্যদঙ্মুখঃ।

৩। কি পরিমাণ খাওয়া কর্ত্তব্য?—

কুক্ষেরন্নেন ভাগৌদ্বাবেকং পানেন পূরয়েৎ।
বায়োঃ সঞ্চায়ণার্থঞ্চ চতুর্থমবশেষয়েৎ॥

উদরের দুই ভাগ অন্নের দ্বারা, একভাগ পানীয়ের দ্বারা পূরণ করিয়া চতুর্থ ভাগ বায়ু গমনাগমনের জন্য খালি রাখিতে হইবে।

৪। আহারান্তে কি করা কর্ত্তব্য?—

দন্তেচাবগতঞ্চান্নং শোচে নৈবাহরেজ্জলৈঃ।
ক্ষুধার নির্গতংতদ্ধি মন্যস্থানিষ্ট গচ্ছতাং ॥
ভুক্তা, পানিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষোর্দ্দিদীয়তে ।
অচিরে নৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি ॥

ভোজনের পর আচমন করিয়া কুক্ষিতে বাম হস্ত দিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলে হজম ক্রিয়া শীঘ্র হয়।

"ভুক্তং মহেন্দ্র হস্তেন বৈশ্বানর মুখেনচ,
গরুড়স্য চ কণ্ঠেন সমুদ্রস্যচ বহ্নিয়া।
বাতাপির্ভক্ষিতো যেন পীতো যেন মহোদধিঃ।
যন্ময়া খাদিতং পীতং তদগস্ত্যো ভবিষ্যতি ॥"

এইটী পাঠ করিয়া সুখাসীন হইয়া অনাকুল চিত্তে ক্ষণকাল অবস্থান করিবে।

ভুক্ত্বা, পাদশতং গত্বা বামপার্শ্বেন সংবিশেৎ—

তৎপরে একশত পা ধীরে ধীরে গমন করিয়া বাম পার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করিলে অন্ন শীঘ্র জীর্ণ হয়। আহারান্তে দৌড়ান কর্ত্তব্য নয়।—

'মৃত্যুর্ধাবত ধাবতঃ।"

৫। ভোজন কালে এই কয়েকটী দর্শন মঙ্গল জনক। যথা—ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, স্বর্ণ, ঘৃত, সূর্য্য, জল ও রাজা। ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে পাদুকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ভোজনকালে দীন হীন চণ্ডাল ক্ষুধার্ত্ত পাপী রোগী কুক্কুটাদির দৃষ্টি মঙ্গলজনক নয়, কিন্তু পিতা মাতা বন্ধু বৈদ্য হংস ময়ুর সারস চকোর এই সকলের দৃষ্টি শুভপ্রদ।

৬। নিজের জন্য পাক করিয়া অন্যকে না দিয়া স্বয়ং কেবল ভোজন করা উচিত নয়,—

"স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হ্যতিথিং বিনা।
অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণৎ।"

স্নানান্তে জপ হোমাদি (যাহার যাহা নিত্য ক্রিয়া) সমাপন করিয়া হস্তে রত্নাদি ধারণ করিয়া ভোজন করিবে। ভোজন সময় জল গণ্ডুষের ব্যবস্থাটী ও উত্তম। কণ্ঠনালী শুষ্ক থাকিতে কঠিন দ্রব্য খাওয়া উচিত নয়

৭। ভোজন কাল—

যাম মধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসোৎপত্তি যামযুগ্মোদ্বল ক্ষয়ঃ।
ক্ষুৎসম্ভবতি পাকেষু রস দোষ মলেষুচ।
কালেনা যদিবা কালে সেভ্যকাল উদাহৃতঃ ॥

আহার ও মল মূত্র ত্যাগ নির্জ্জনে করা উচিত, যথা—

আহারং বিজনেকুর্য্যাৎ নিহারমপি সর্ব্বদা।

৮। ভোজন পাত্র—কি কি পাত্রে ভোজনে কিরূপ ফল হয়। যথা—

দোষহৃদ্ধ ষ্টিদঃ পথ্যং হৈমং ভোজন ভাজনম্।
রৌপ্যং স্তবতি চক্ষুষ্যং পিত্তহৃৎ কফবাতকৃৎ,
কাংস্যং বুদ্ধিপ্রদং রুচ্যং রক্তপিত্ত প্রসাদনম্।
পৈত্তলং বাতকৃদ্রুক্ষমুষ্ণং কৃমি কফ প্রণুৎ ॥
আয়সে কান্ত পাত্রেচ ভোজনং সিদ্ধিকারকম্।
শোথ পাণ্ডু হরং বল্যং কামলা হমুর্ত্তমম্ ॥
শৈলজে মৃন্ময় পাত্রে ভোজনম্ শ্রীনিবারণম।
দারুজেবে বিশেষেণ রুচিদং শ্লেষ্ম কারিচ ॥
পাত্রং পত্রময়ং রুচ্যং দীপনং বিষপাপনুৎ ॥

৯। জলপাত্র কিরূপ হওয়া উচিত ?—

জল পাত্রন্তু তাম্রস্য তদভাবে মৃদোহিতম্।
পবিত্রং শীতলং পাত্রং ঘটিতং স্ফটিকেন বৎ।
কাচেন রচিতং তদ্বং তথা বৈদূর্য্য সম্ভবম্ ॥

তাম্রের জলের দূষিত বীজাণু নষ্ট করিবার শক্তি আছে, এজন্য পূজাদিতে তাম্র পাত্র ব্যবহৃত হয়।

১০। মধুরাদি ছয় প্রকার রসের মধ্যে কোন রস কোন সময়ে খাওয়া কর্ত্তব্য।—

অশ্নীয়াং তন্মনো ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরম রসম্।
মধ্যেহম্ললবণৌ পশ্চাৎ কটুতিক্ত কষায়কান্ ॥

আর প্রথমে ঘৃতপূর্ণ কঠিন দ্রব্য আহার করিবে, তাহার পরে মৃদু দ্রব্যাদি, শেষে পুনর্ব্বার দ্রবদ্রব্য এবং দধি তক্রাদি ও দুগ্ধ ভোজন করা কর্ত্তব্য ও উত্তরোত্তর স্বাদুতর দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত।

১১। শুষ্ক অন্ন ও রুক্ষ ভোজন করা দোষ—

স্বাদু সংজনয়ত্যান্নস্বাদুচ বিপর্য্যয়ম্।

অত্যুষ্ণান্নং বলংহস্তি শীতং শুষ্কঞ্চ দুর্জ্জবম্।

অতিক্লিন্নং গ্লানিকরম্ যুক্তিযুক্তং হিতোজনম্॥

অতিদ্রুতাশীতাহারো গুণান্ দোষান্ নবিন্দন্তি।

ভোজ্যং শীতমহৃস্থঞ্চ স্যাদ্বলম্বিতমশ্নতঃ॥

অতএব অতিদ্রুত বা অতি বিলম্বে আহার করা কর্ত্তব্য নয়।

১২। গুরু আহার ত্যাগ করিবে।—তিন প্রকারে হয়।

মন্দানলো নরো দ্রব্যং মাত্রা গুরু বিবর্জ্জয়েৎ।

স্বভাবতশ্চ গুরু যৎ তথা সংস্কারতো গুরু॥

মাত্রা গুরুস্তমুদগাদির্মাসাদিঃ প্রকৃতের্গুরুঃ

সংস্কারগুরু পিষ্টান্নং প্রোক্তমিত্যুপলক্ষণম্॥

১৩। ছয় প্রকার আহার। যথা—

আহারং ষড়বিধং চুষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈবচ।

ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্বং গুরু বিদ্যাদ্ যথোত্তরন্।

ইক্ষু দাড়িম্ব প্রভৃতি চুষ্য, চিনির পানা ইত্যাদি লেহ্য। ডাল ভাত ইত্যাদি ভোজ্য,—

লডডুকমণ্ডকাদি ভক্ষ্যং চিপিটকাদি চর্ব্ব্যং।

স্বভাব গুরু সংস্কার গুরুণোঃ স্বভাব লঘুনশ্চ ভক্ষ্যস্য ভোজন পরিমাণমাহ—গুরূণামর্দ্ধ সৌহিতং লঘুণাং তৃপ্তিরিষ্যতে। পেয় দ্রব্য প্রায়ই লঘু হয়, শুষ্কং বিরুদ্ধম্ বিষ্টম্ভিবহ্নি ব্যাপদমাবহেৎ।

শুষ্কং চিপিটাদি বিরুদ্ধম্ ক্ষীর মৎস্যাদি

বিষ্টম্ভি চনক মসূরাদি বহ্নিমান্দ্যং কুর্য্যাৎ।

১৪। প্রতিদিন একরূপ খাওয়া উচিত নয়। ইহাতে খাদ্যে রুচির হ্রাস হয় ও রোগ সঞ্চয় হয়। এজন্য তিথি বিশেষ ভক্ষ্যাভক্ষের ব্যবস্থা মানা উচিত।

১৫। জল বেশী পরিমাণে খাইলে জীর্ণ শীঘ্র হয় না এবং অত্যল্প খাওয়াতেও হজমের ব্যাঘাত ঘটে। সমস্থলে কৃশাভুক্ত মধ্যান্ত প্রথমাম্বপাঃ। ভোজনের প্রথমে জল পান করিলে কৃশ হয়, মধ্যে, অগ্নি বৃদ্ধি করে, অন্তে পান করিলে স্থূল হয়, আহারের কিছু পরে জল পান করাই কর্ত্তব্য। আর তৃষিত স্তন চান্নীয়াং ক্ষুধিতো নপিবেজ্জলম্, তৃষ্ণা পাইলে জলপান না করিয়া ভোজন করা

এবং ক্ষুধা হইলে কেবল জলপান করা উচিত নয়, তাহা হইলে গুল্ম ও জলোদর পীড়া হয়।

১৬। দুগ্ধ শেষে খাওয়া উচিত।—ভোজনের প্রথমে মধুররস খাইলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এবং শেষে কটুতিক্ত খাইলে কফ দমন হয়, আর অন্ন পানাদি বিদাহী দ্রব্য যাহা কিছু খাওয়া যায়, তদ্দোষ প্রশমনের জন্য শেষে দুগ্ধাদি মধুর দ্রব্য খাওয়া কর্ত্তব্য, অতএব—

"কুর্য্যাৎক্ষীরান্ত মাহারং দধ্যন্তংন কদাচন।"

১৭। আহারান্তে দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া অকর্ত্তব্য—অঙ্গারক মগস্তিঞ্চ পাবকং সূর্য্য মশ্বিনৌ যশ্চৈতান সংস্মবেনিত্যং ভুক্তং তস্যাশু জীর্য্যতি হত্যুচার্য্য স্বহস্তেন পরিমার্জ্জ্যতথোদরম অনাআস প্রদায়িনি কুর্য্যাৎ কমর্থন্য তন্দ্রিতঃ। অতন্দ্রিতঃ জাগ্রৎ তিষ্ঠেনতু স্বপ্যাৎ। অবশ্য বালক, বৃদ্ধ, কোন বিশেষ পীড়াগ্রস্ত বা যাঁহারা স্বল্প নিদ্রা যাইতে নিত্য অভ্যস্ত তাঁহাদের পক্ষে এ নিয়ম খাটিবেনা।

১৮। তাম্বুল ভক্ষণ বিধি—আহারান্তে এলাইচ গুপারি লবঙ্গাদি যুক্ত দুই একটি পান চর্ব্বণ করা মন্দ নয়।

রতে সুপ্তোত্থিতে স্নাতে ভুক্তে বান্তে চ সঙ্গরে।

সভায়াং বিদুষাং রাজ্ঞাং কুর্য্যাৎ তাম্বুল ভক্ষণম্।

১৯। আসন—বিশ্রাম করিবার আসনের গুণ—ত্রিদোষশমণী খটা তুলি বাত কফাপহী ভূশয্যা বৃংহণী বৃষ্যা কাষ্ঠ পট্ট তুবাতুলা।

২০। কাহার সহিত ভোজন করা কর্ত্তব্য—হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবে। ভার্য্যার সহিত ভোজন করা কর্ত্তব্য নয়।—পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ ভুমৌপাত্রং নিষরতু।

২১। গ্রহণকালে ভোজন করা অকর্ত্তব্য—নাদ্যাৎ সূর্য্যগ্রহাৎ পূর্ব্বমহ্নি সায়ং শশীগ্রহাৎ। গ্রহকালেতু নাশ্নীয়াৎ স্নাত্বাশ্নীয়াৎ তু মুক্তয়োঃ।

২২। ঋতু বিশেষ আহারের বিধি—সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিয়া শেষ করিব।

হেমন্ত ও শিশিরের ব্যবহার—অগ্রাহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত এবং মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাস শিশির। এই সময় বায়ু প্রকুপিত হয়, এজন্য মিষ্ট অম্ল লবণ রস নূতন অন্ন বিবিধ রস ব্যবহার করা বিধেয়। রৌদ্র সেবন করাউচিত, দিবা নিদ্রা পরিত্যাগ করা উচিত। উষ্ণ কোমল শয্যা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এইরূপ শিশির ঋতুতেও করা কর্ত্তব্য।

বসন্তকাল ।—চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস। এই সময় স্বভাবতঃ শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, উদরাগ্নি মন্দ হয়। তীক্ষ্ণ বীর্য্য ও রুক্ষ বস্তু ভক্ষণ করা উচিত, গুরুপাক দ্রব্য তৈল ঘৃতাক্ত মিষ্ট রস ত্যাগ করা উচিত।

গ্রীষ্ম ।—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুইমাস । এই সময় বায়ু বৰ্দ্ধিত হয়। সুমিষ্ট সুশীতল দ্রব্য খাওয়া কৰ্ত্তব্য। লবণ অম্ল ঝাল উষ্ণ দ্রব্য এবং ব্যায়াম ত্যাগ করা উচিত।

বর্ষা ।—শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুই মাস—এই সময় জঠরাগ্নি ক্ষীণ হইলে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা কুপিত হয়, এজন্য অগ্নিবৰ্দ্ধক লঘুপাক দ্রব্য খাওয়া উচিত।

শরৎ।—আশ্বিন ও কার্ত্তিক। এ সময় পিত্ত প্রকুপিত হয়। মিষ্ট তিক্ত কষায় রস ও পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করা উচিত। শিশির ক্ষার রস অত্যাহার দধি সরবৎ অম্ল ঝাল দিবা নিদ্রা রৌদ্র ও পূর্ব্ব বায়ু ত্যাগ করা উচিত।

গীতাতে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক আহার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন আছে—

আয়ুঃসত্ত্ব বলা রোগ্য সুখ প্রীতি বিবৰ্দ্ধনাঃ।
রস্যঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কটুম্বল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজ সস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপিচামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ং॥

প্রত্যেক ঋতুর শেষ সপ্তাহে প্রত্যহ ক্রমশঃ উত্তরোত্তর ব্যবহার্য্য সকল প্রকার রসই অধিকাধিক পরিমাণে খাইবে। নিত্য বাত পিত্ত শ্লেষ্মা দমন কারক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত। অতএব স্ব স্ব প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এই সকল কার্য্য মধ্যে মধ্যে যথাসাধ্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে পরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

অতএব বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক শাস্ত্র সম্মত আহারাদি করাই কর্ত্তব্য। হোটেলে চা ও খানা খাওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত। সাধারণে পরিচ্ছন্নতার নিয়মগুলি প্রতিপালন করা উচিত। সদাচারী এ সন্ধ্যাহ্নিক পরায়ণ হওয়া উচিত। এবং সন্ধ্যায় ঈশ্বর চিন্তা করা উচিত।

যথাকালের পূর্ব্বে বা পরে খাইলে শরীর কৃশ হয় ... নারূপ পীড়া বিসূচিকাদি জন্মে।

সংযোগ বিরুদ্ধ আহার সম্বন্ধে ... হিল।

শ্যামা—মা।

পণ্ডিত—শ্রী... শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

প্রথমাঙ্ক।

দ্বি... গর্ভাঙ্ক—প্রান্তর।

...ড়ায়ে এ...

জ্ঞান। নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধি... যভ্যঃ প্রভবতি।

...গার।

কর্ম্ম। নমো নমো মহাত্মন্ ...গো!

কৃতদাস আমি তব,

ত্রিলোকের কিঙ্কর অধম।

শ্রেষ্ঠ তুমি যে চিন্ময়!

গায় গুণ গোলকের পতি,—

জ্ঞান গতি, জ্ঞান মুক্তি ত্রিলোক পাবন।

জ্ঞান। নিজগুণে কহ সনাতন!

(নেপথ্যে গীত।)

কাতরে করুণা কর, করুণা রূপিনী তারা।
অপার ভব সাগরে হয়েছি মা দিশেহারা॥

কর্ম্ম। সত্য মিথ্যা কর দরশন,
সাধক সত্তম অই
লভি তব অপার করুণা,
নশ্বর সংসার মুখে
হাসি মুখে দিয়ে জলাঞ্জলি
কুতুহলী হয়ে কত,—
অবিরত ইষ্টনাম করিছে কীর্ত্তন।

(নেপথ্যে গীত।)

মোহ তরঙ্গ বিশাল উচ্ছ্বাস তুলি উত্তাল
ঘটালে ঘোর জঞ্জাল, হের গো দুর্গতিহরা।

জ্ঞান। কালীতত্ত্বে মত্ত ভক্ত রাজ,
শূন্য বাহ্য জ্ঞান
পূর্ণানন্দে, পূর্ণ নিরন্তর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

(নেপথ্যে গীত।)

সন্তরণ নাহি জানি, জানি তুমি নিস্তারিণী
সর্ব্ববিপদ বারিণী সর্ব্বার্থ সাধিনী তারা।

কর্ম্ম। আনন্দ বারিধি হৃদে
উথলিল হেরি সুধীবরে।

জ্ঞান। এ আনন্দ মূলাধার তুমি কর্ম্মদেব।
উত্তাল তরঙ্গ পূর্ণ—
এ অপার ভব পারাবার
তরিবার আশা যার প্রাণে,—
সে যদি অনন্য মনে,
লয় তব বারেক আশ্রয়,—
পূর্ণানন্দে পূর্ণ সে আপনি।
জনে জনে আনন্দ বিলায়,—
হেলায় চরমে যায়
নিত্যানন্দ পুরে।
তোমারি কৃপায়,
নরবর ভাসিতেছে নিত্যানন্দ নীরে।
নিত্য ধাম অচিরে লভিবে।
আসে এই ভিতে,—
চল যাই অন্তরালে থাকি দোঁহে,
ভক্ত মুখে শুনি কালীনাম।

কর্ম্ম। চল মহাশয়!
কিন্তু মোর বাসনা অন্তরে
পরীক্ষায় বুঝিবারে সাধকের মন।
ছদ্ম বেশে, শত্রুভাবে বাদে হব রত;
দেখি কিবা প্রকাশে ভাবায়।

জ্ঞান। ইচ্ছা ময়!
ইচ্ছাতব হউক পূরণ।

(উভয়ের প্রস্থান)

(গাহিতে গাহিতে সাধকের প্রবেশ)

তাই মাগো এ বিপদে, ডাকিতেছি পদে পদে,
আশ্রয় দিয়ে শ্রীপদে তার' তার' সারৎসারা।

কর্ম্ম। (দস্যুবেশে প্রবেশ পূর্ব্বক।)
কেরে তুই বিজন প্রান্তরে একা!
ঘোর অমা নিশা
দিশাচয় আঁধারে আবৃত।
কোথা যাস মোর করে এড়ায়ে এখন?
ছাড় মূঢ় প্রাণের মমতা তোর।

সাধক। কে তুমি গো! কে তুমি গো!
তুমি কি গো প্রাণময়ী শ্যামা মা আমার
তাই মোর প্রাণে এত মমতা তোমার?
কি সুন্দর! কি সুন্দর!
মরি কিবা নীরদ বরণ,—
কমল নয়ন সর্ব্ব অঙ্গ করুণা জড়িত।
বল,—বল,—
কে তুমি গো দাঁড়ায়ে হেথায়?

কর্ম্ম। যে বা হই আমি;
পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন?
জীবন বাঁচাতে যদি সাধ,—
ধন রত্ন যা আছে রে কাছে,
দিয়ে মোর করে—
যাও ত্বরা নিজগৃহে ফিরি।
কেন মিছে দস্যু করে বিঘোরে হারাবি প্রাণ?

সাধক। প্রাণ,—প্রাণ,—কোথা প্রাণ?
আছে কিরে জীবন আমার?
নিদারুণ দস্যু অত্যাচারে
বহু দিন প্রাণ শূন্য আমি।
বিকলাঙ্গ এ দেহ আমার।
গৃহে ফিরে যেতে বল মোরে?
আহা আহা—

গৃহ মোর শ্যামার চরণ,—
জন্মভূমি, স্বর্গাদপি গরীয়সী
শ্যামা মা আমার।
ওহো ওহো—
বহুদিন—বহুদিন হল'
চলে গেল যুগ যুগান্তর,—
এসেছি রে ছেড়ে সেই পূর্ণ জন্মভূমি।
অতুল অমূল্য ধনে পরিপূর্ণ গৃহ সে আমার
জানি না কি সুখ আশে
হায় কোন কর্ম্মের উদ্দেশে,
অবহেলি সে পবিত্র ধাম,—
যাত্রা ক'রে বাহিরিনু যবে,—
সেই হ'তে দস্যু মোর সাথে সাথে ফেরে।
দারুণ প্রহারে—
জর্জ্জরিত করে নিরন্তর,—
ওগো ওগো—
বড় সাধ ঘরে ফিরে যেতে,—
কিন্তু হায়! প্রাণ শূন্য আমি।
কোন্ পথে,—কেমনে ফিরিব ঘরে আর?
কি করি,—কি করি,—
দস্যুকরে এড়াতে যে নারি'!
দিশে হারা হয়ে,—
ঘুরে মরি প্রান্তরে প্রান্তরে।
চলেনা চরণ,—
অন্ধকার হেরি চারি ধার।
মা,—মা,—কোথা মা আমার!
ওগো! ওগো! জান যদি,,—
কৃপা করি বলে দাও মোরে,
কোন পথে গেলে—
পাব দেখা জননী শ্যামার?

কর্ম্ম। যাও এই পথে; পাবে তুমি শ্যামার চরণ।

সাধক। ভক্তি ভরে নমি তব পায়।
তাই মাগো এ বিপদে, ডাকিতেছি পদে পদে
আশ্রয় দিয়ে শ্রীপদে, তার' তার' সারাৎসারা।
(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

(জ্ঞানের প্রবেশ।)

জ্ঞান। সাধকের মনোভাব বুঝিলে কেমন?

কর্ম্ম। সদাত্ম প্রবর!
পবিত্র আলোকে তব
আলোকিত অন্তর যাহার,—
কি সাধ্য আমার, পরীক্ষায় পরাস্ত করিব তারে?
পরাজিত আমি দেব!
গুণাকর জ্ঞানের সাগর,—
শ্যামা পদে সঁপেছে জীবন।
নাহি মানে সম্পদ বিপদ।
ক্রোধ হিংসা করেছে বর্জ্জন।
নির্ভয় হৃদয়,
চিদানন্দে মগ্ন অনুক্ষণ।

জ্ঞান। চল ত্বরা, চল' যাই ভক্তের পশ্চাতে
আমি পুন শত্রু ভাবে,—
লব' আজি পরীক্ষা তাহার।
নিন্দা ছলে শ্যামারূপ বর্ণিব সাক্ষাতে—
শুনি তার মর্ম্ম কথা প্রকাশে কি ভাষে।
(উভয়ের প্রস্থান।)

(কর্ম্ম ফলের প্রবেশ।)

কর্ম্ম। দেখব' জ্ঞান ঠাকুর! তোমার জারি জুরিটা কতখানি! আমার প্রভু কর্ম্ম শম্মা তো গোল্লা খেয়েচেন। খোঁতা মুক ভোতা হোয়ে গেছে। বাবা! সবাই আর ষাড় সেওড়া বাবলা নয়। এই বিশাল বেহ্মাণ্ড বনে লোহার কাঠও আছে, বুঝে সুজে কোপ মেরো নইলে কুড়ুলের দাঁত পড়ে যাবে।

যাই হোক, এই আঁধার রেতে, এই মাঠ সাগরের মাঝখানে, এই

আদা পানফলের জাহাজের ঠোকাঠুকি দেখে আমি ভেবেছিলুম, বুঝি কি একটা নতুন কাণ্ডই বা বাধায়। তা নয়,—মৎলবটা আমারও যা, প্রভুদেরও তাই। অর্থাৎ কিনা বাবাজীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি। তা—সে হিসেবে প্রভুদের সাথে আমার আর তফাৎটা কি? শাস্ত্রে বলে 'যে সকল বস্তু প্রত্যেক এক নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সমান,—তাহারা পরস্পর সমান। কাজেই এ ক্ষেত্রে জানোয়ায়ত যা;—প্রভুরাও তাই। তবে তফাৎটা এই যে,—প্রভুরা বলেন, ফলং কর্ম্মায়ত্তং আর আমি বলি যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, অর্থাৎ মুড়ি আর ভাজাচাল। কিন্তু পর্ব্বতে যে আগুন আছে,—তা ধোঁয়া দেখেই চেনা গেছে। আমারপ্রভুর একটা মস্ত গুণ এই যে, তিনি সর্ব্ব ঘটেই আছেন। সেই স্বর্গ থেকে আর নরক পর্য্যন্ত যিনি যেভাবে যে দিকে যেতে চান? প্রভু আমার তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করে তাকে সেই পথেই এগিয়ে দেন। কিন্তু ঐ জ্ঞান ঠাকুরটা ভারি কটকটে একেবারে ঝেড়ে কোপনী আঁটতে না পারলে জ্ঞান ঠাকুরের সঙ্গে পিরিত করা বড় দায়। এই বাবাজীর কোপনী আটাটা ঠিক হ'য়েছে কি না তারই পরীক্ষা নেবার মৎলবে জ্ঞান ঠাকুর আজ এখানে এসেছেন। ওবিষ্যি প্রভুদের এই হাজরে 'নেওয়াটা আমিও খসড়াজাৎ কত্তে ভুলচি না বাবা। আমার আর কি,—চক্ষু আছে দেখিব। কর্ণ আছে শুনিবে। মুখ আছে পষ্টাপষ্টি বলিব। আর আমিও যেমন ছটফটে আমার এই গেঁটে কলমটীও তেমনি ঝটপটে আমার এই হস্তের সাহায্যে এই ঝটপটে কলমেও এই কুম্ভু দোতের কালিতে যিনি যাহা করিবেন, তার হুবহু নকলটী তুলে, আমার এই খসড়ায় জলজ্বলে অক্ষরে অক্ষয়কবচ প্রতিষ্ঠা করব'। আর আমার মহাপ্রভুর ব্যবস্থা পত্রমত ফলাফলের বন্দোবস্ত করব'। আর,—বেঁচে থাক আমার এই চরণযুড়ি এরই উপর ভর কোরে আমি ত্রিভুবনে লাট খেয়ে বেড়াব। ঐ যাঃ—কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল' সাধক বাবাজী অনেক দূর চলে গেলেন। এখন কোথা কার জল কোথায় মরে,—তা ত' দেখতেই হচ্ছে। আমি প্রভুদের আগেই ঠিক ঠিকানায় হাজির হয়ে "ফলং কর্ম্মায়ত্তং করবার ব্যবস্থা কচ্ছি। চরণ রে বলি সাট! বলিসাট।

(প্রস্থান।)

(গাহিতে গাহিতে আনন্দ ভৈরবীর প্রবেশ।)

প্রেমের প্রাণটী রহে কি প্রাণে গো
মনটী রহে কি মনে।
হইয়ে পাগল বিকল বিভল,—
ছোটে প্রাণ বধূ পানে গো
ছোটে প্রাণবধূ পানে॥
(লয়ে) কত আশা কত সাধ,—
কত সোহাগ সুরাগ প্রাণে,—
কত ভালবাসাবাসি নীরবের হাসি,
চ'লে যায় আন মনে গো,—
চলে যায় আন মনে॥
নাহি মানে মানা কাহার' সে,—
কোন কথা নাহি শুনে;
যেন জোয়ারেরি জল উছল উছল,
চল'-চল' টানে টানে গো,—
চল' চল' টানে॥

(প্রস্থান।)

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সাধক কহিলেন, "মহারাজ! আপত্তি কিছুই নাই, পুরাতনকে কেহ পরিত্যাগ করিতে চাহেনা, ইহাই আসক্তি। এ সংসারে একেবারে আসক্তি শূন্য হওয়া বড়ই কঠিন।" মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "গুরুদেব! প্রতাপের মানসিক উদ্বেগ দেখিয়া আমাকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে। প্রতাপ পূর্ব্বের ন্যায় বিষয় কর্ম্মে মনোযোগ করেন না, সর্ব্বদা অন্য মনস্ক থাকেন। প্রতাপ আমার একমাত্র পুত্র।

আমার সংসারের শ্রেয় ও শান্তি তাঁহার কর্ম্ম কুশলতা ও বিষয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে।" সাধক মহারাজের বাক্য শ্রবণান্তর কহিলেন, "আমি ও প্রতাপ চাঁদের মানসিক চাঞ্চল্য পরিদর্শন করিয়াছি। সংসার পরিত্যাগের বাসনা প্রতাপচাঁদ আমায় প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহার কৃপায় বৈরাগ্যের উদয় হয়, তিনি কখনও নিজ অভিপ্রায় অন্যের নিকট প্রকাশ করেনা। তিনি প্রেমানন্দে হাস্য বদনে, কোন দিকে না চাহিয়া। কাহার ও কথায় কর্ণপাত না করিয়া পরম পুরুষের উদ্দেশে সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান! আমার বিশ্বাস প্রতাপের প্রকৃত বৈরাগ্যে উদয় হয় নাই। তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য ও ধর্ম্ম বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে মাত্র। কাহারও ধর্ম্ম বুদ্ধি ও ধর্ম্ম নিষ্টায় প্রতিবন্ধক না হইয়া সাহায্যকারী হওয়া উচিত। প্রতাপ ভক্তিমান ও বিশ্বাসী। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়াছি, সংসারে থাকিয়া মোক্ষলাভ হইতে পারে। জনকাদি ঋষিগণ সংসারে থাকিয়া জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। আমি প্রতাপচাঁদের আত্মার বিশুদ্ধতা লাভ বিষয়ে চেষ্টা করিব। যথা সাধ্য তাঁহাকে ধর্ম্ম ও অর্থচিন্তায় নিবিষ্ট রাখিব। প্রাণায়াম আদি রাজসিক যোগ দ্বারা তাঁহার চিত্ত শুদ্ধির উপায় অবলম্বন করিব। প্রতাপ আমার জীবদ্দশায় সংসার পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা আমার বিশ্বাস। মহারাজ সকলেই আপন আপন অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। পুরষকার অদৃষ্টের অনুগামী। অদৃষ্ট মানবের চক্ষে সমীরণের ন্যায়, অনুমান দ্বারা অদৃষ্টের ভাবি ক্রিয়ার উপলব্ধি করিতে হয়। প্রতাপচাঁদে বাক্যে, কার্য্য কলাপ চিন্তা প্রভৃতি দ্বারা আমার অনুমান হয়, তাঁহার বৈরাগ্য স্থায়ী ও কার্য্যকর হইবে না।" সাধকের মুখে এই কথা শুনিয়া মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আপনার বাক্য বেদ ও বসুমতীর ন্যায় সত্য, যুবরাজ আপনার উপদেশে শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইবেন।" বিশু কহিল, "মহারাজ, "আমি যুবরাজকে বলেছি, আমাদের এই ঠাকুর প্রেমের সাগর। যুবরাজ তুমি জলের তৃষ্ণায় সাগর ছেড়ে কোথায় নদী খুঁজে বেড়াতে যাবে। তোমার ঘরে মাণিক জ্বলছে, তুমি মাণিকের চেষ্টায় দেশে দেশে বেড়িয়ে সাপের মাথায় মাণিক খুঁজে বেড়াবে! যুবরাজ আমাকে বলেন, "বিশু! তোমার কথা ঠিক। তোমার মনটী আমাকে দিতে পার। আমি আমার মনকে সোঝা কর্ত্তে পার্চ্ছিনা। যাহউক যুবরাজের শীঘ্র মনের গোলমাল যাবে। বর্দ্ধমান ছেড়ে যুবরাজ কোথাও যাবেনা।" মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আমারও বিশ্বাস তাই।"

এইরূপ কথপোকথন হইতেছে, এমন সময় কালা বাটীর প্রবেশ দ্বারে একটী বালকের ক্রন্দন শব্দ শ্রুত হইল। জনৈক দ্বার রক্ষক মহারাজা বাহাদুর ও সাধকের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল, "একটী স্ত্রীলোক একটী বালককে সঙ্গে লইয়া আপনাদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে। পরিচয় জিজ্ঞাসা দ্বারা জানিলাম, স্ত্রীলোকটী এই বিশু বাবার পত্নী ও বালকটী তাঁহার পুত্র।" এই কথা শুনিবামাত্র বিশু মুখ, চক্ষু ও নাসিকা বিকৃত করিয়া ঘৃণিত বস্তুর দর্শনের ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক মস্তক অবনয়ন করিল ও পরক্ষণেই মুখ উত্তোলন পূর্ব্বক দ্বার রক্ষককে কহিল, "যাও স্ত্রীলোকটীকে বল বিশুর পরিবার নাই, পুত্র নাই, বিশুর কেবল আছে মা কালী, আর এই ঠাকুর। বিশু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায় না।" ইহা শুনিয়া সাধক বিশুর পানে চাহিয়া মৃদু হাস্যে কহিলেন, "বিশু তুমি তোমার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে না চাহিতে পার, কিন্তু তোমার পত্নী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়, এখন তোমার বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবরণ পূর্ব্বক গৃহের ঐ কোণে বসিয়া থাকা ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতেছিনা।" মহারাজ বাহাদুর সহাস্য বদনে সাধকের প্রতি নিরীক্ষন করিয়া দ্বারবানকে কহিলেন, "বিশুর পত্নীকে এখানে লইয়া আইস।" বিশুর পত্নী শ্যামা গৃহের প্রাঙ্গণ দেশে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সাধক তাহাকে শ্যামা গৃহের পৃষ্ঠদেশে আহ্বান করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন ও ক্রন্দন করিতে নিশেধ করিলেন। বিশু নিজ মুখ মণ্ডলের আবরণ স্থল দক্ষিণ হস্ত মস্তক পর্য্যন্ত উত্তোলন পূর্ব্বক দেবীর পাদ পদ্মের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, পত্নী বা পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিল না, রাজা বাহাদুর বিশুর পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মা! তোমার স্বামীর বৈরাগ্য হইয়াছে, এখন তাহার পুত্র, পরিবার সংসার কিছুই মনে স্থান পাইতেছে না, যিনি এই সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তোমাকে আমাকে সকল জীব জন্তুকে প্রতি পালন করিতেছেন, যাঁহার দয়া হইলে মানুষ স্বর্গে যায়, বার বার জন্মিতে মরিতে হয় না, কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, তোমার স্বামী তোমাদিগকে ছাড়িয়া সেই মা কালীর শরণ লইয়াছে।" ইহা শুনিয়া বিশুর পত্নী গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "বাবা! তুমি দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা, লোক তোমার কাছে বিচার চায়, আমার স্বামী এই সব ছোট ছোট ছেলে দিগকে ফেলে চলে এসেছে, আমি এসব কি করে মানুষ কর্ব্বো, যদি আমার স্বামীর এ রকম মনে ছিল, তা হলে বিয়ে করেছিল কেন! আমাকে কাঁদালে কি ভাল হবে, না মা কালীর দয়া হবে!" রাজা বাহাদুর কহিলেন, "বিশু শুনিতেছ,

তোমার পত্নী কি বলিতেছে, তুমি তাহার কথায় উত্তর দাও।" ইহা শুনিয়া বিশু জগদম্বার মুখ পানে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "মা নিস্তারিণি! যে দিন ডাকাতী করে কিছু যে পেতাম, ভয়ে ভয়ে কুকুর বেড়ালের মত পাটী পাটী করে ঘরে ঢুকতে হত। চুপ করে জড় সড় হয়ে মুখ চুণ করে বসলে আমার পত্নী বুঝতো আমি সেদিন কিছু পাই নাই। সেই রাক্ষসী একমুঠো ভাত কি এক ঘটী জলও দিত না, বলতো সারা রাত মাতাল শালে পড়ে থেকে ভোর বেলা জ্বালাতে এসেছে। যে দিন ডাকাতী করে সোনার গহনা এনে দিতাম, সে দিন কত আহ্লাদ করে গহনা পরে এ ধার ও ধার করে বেড়াত, রাত তিন প্রহরে কখন বা রাত ভোরে আলো জেলে ঘরে যা থাকতো খেতে দিত, খাবার জন্যে কত জিদ কর্ত্তো বলতো মদ খেয়ে গেছ, কত কুস্তি কর্ত্তে হয়েছে, খাও। জগদম্বা আর না, নিস্তার কর তোমার নাম ঠাকুরের কথা ছাড়া যেন আমি আর কিছু শুনতে পাই।" বিশুর কথা শেষ হইবামাত্র রাজা বাহাদুর বিশুর পত্নীকে কহিলেন, "মা তোমার স্বামীর কথা শুনলে, স্ত্রীর কর্ত্তব্য তাহার স্বামীর ধর্ম্মে কর্ম্মে সাহায্য করা, স্বামী কুকাজ করিলে তাহাকে নিষেধ করা, তুমি তাহা কর নাই, বরং তাহার পাপের কাজে সাহায্য করিয়াছ, সেই জন্য তোমাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। বিশুর মনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে বোধ হয়, সে আর সংসারী হইবে না। শাস্ত্রে বলে পত্নী স্বামীর পুণ্যের ভাগ পায়। তোমার স্বামী পুণ্য করিতেছে, তুমি পুণ্যের ভাগ পাইবে।" সাধক কহিলেন, "বিশু! তোমাকে অনেক বার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, তোমার পত্নী পুত্র, বর্ত্তমান আছে, তুমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিবে না। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি গৃহে গমন কর। তুমি সৎকর্ম্মে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক ইহাদিগকে প্রতি পালন করিয়া সুখী হও, তোমার মা কালীর চরণে মন প্রাণ রাখিয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতি পালন কর। বিশু সাধকের বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্র বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া সাধকের পদতলে পতিত হইল। বিশু কহিল, 'ঠাকুর! আমি তোমাকে ছেড়ে কোথা শান্তি পাব। উহাদের কথা দিন রেতের মধ্যে আমার একবারও মনে হয় না। আমি দেখ্‌ছি, আমি রাক্ষস ছিলাম, রাক্ষসীর সঙ্গে মানুষ খেয়ে বেড়াতাম। আমি কি এক যায়গায় এসেছি, যেখানে আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই। একি আনন্দ ঠাকুর! এ আনন্দ পেলে রাজার ছেলে রাজত্ব চায় না। আমি কোন মতে এখান হতে যাব না। যদি রাজাবাহাদুরকে বলে তুমি জোর করে আমাকে তাড়িয়ে দাও

আমি জানি তা তুমি কখনও কর্ব্বে না, তুমি দয়াল ঠাকুর। আমি চির কালের পাপী যদি আমার ভাগ্যে তাই ঘটে, তা হলে আমি বাঁকা নদীর ধারে, গাছ তলায় পড়ে থাকবো, দিনরাত ঠাকুর! ঠাকুর! বলে ডাকবো। তোমাকে দেখা দিতেই হবে, যদি দেখা না দাও, আমি ঠাকুর ঠাকুর বলে বাঁকা নদীর জলে ঝাঁপ দেব।" বিশুর কথা শুনিয়া ঠাকুর কি বলিবেন, তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগিল। রাজা বাহাদুর বিশুর পত্নীকে বলিলেন, "মা! তুমি তোমার স্বামীর কথা শুনিলে। তুমি স্বামীর আশা পরিত্যাগ কর। আমি তোমার অন্ন বস্ত্রের অভাব মোচন করিতে পারি।" ইহা কহিয়া রাজাবাহাদুর কয়েকটী রোপ্য মুদ্রা বিশুর পত্নীর হস্তে দিয়া কহিলেন, 'রাজ সংসার হইতে তোমাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা হইবে।" বিশুর পত্নী মুদ্রা গ্রহণ করিল। তাহার নয়নে আনন্দ বারি দৃষ্ট হইল। সে রাজা বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সাধককে কহিল, "বাবা! আমার স্বামীর যে দশা আমারও সেই দশা, আমি ঘরে যেয়ে কি কর্ব্বো! আমি তোমার কালী বাড়ীর ধূলো গুঁড়ো মুক্ত কর্বো, মা কালীর চরণ দর্শন করে এখানেই পড়ে থাকবো।" বিশু পত্নীর কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ঠাকুর সর্ব্বনাশ হল, স্বীকার হবেন না, মতলব খারাপ, ঘটী বাটী চাল চিঁড়ের বোঝা মাথায় করব শ্রীক্ষেত্র যাওয়া হয় না। আমাদের কাজের বিঘ্ন হবে।" রাজা বাহাদুর বিশুর পত্নীকে কহিলেন, "ইহারা সন্ন্যাসী, নির্জ্জনে সাধনা ইহাদের কাজ, তোমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, তুমি নিজ ঘরে যাও।" ইহা কহিয়া তিনি বিশুর পত্নীকে বিদায় দিলেন। বিশুর পত্নী দেবী, সাধক ও রাজা বাহাদুরকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। সাধক বিশুকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, "বিশু এ সংসারে উপদ্রব অনেক, তুমি পত্নীর সঙ্গ অভিলাষ করনা সত্য, আমি কাহারও গুরু হইতে চাহি না, সত্য, কিন্তু জগদম্বার কি ইচ্ছা জানি না, দেখ ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় কি এক ব্যাপার ঘটাইয়া রঙ্গিনী তোমাকে আমার নিতান্ত শরণাপন্ন, করিয়া সঙ্গে দিলেন, যদি তোমার পত্নী মাঝে মাঝে এখানে আইসে তাহাতে ক্ষতি কি! মানুষ জগদম্বার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী ইহা কহিয়া বিশুর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে গাহিলেন,—

কেন চঞ্চল হইলে মন! অকারণ।
হবে পূর্ণ আশা, দুঃখ নাশা,
ভাব মায়ের শ্রীচরণ॥

অপার শঙ্কটে, কতবার পড়েছ বটে,
যখন বিপদ ঘটে, কালী করে নিবারণ।
কমলা কান্তের মন, সদা থাক সচেতন,
তুমি জ্ঞানহীন, বুদ্ধি তোমার সাধারণ ॥

সঙ্গীত শেষে সাধক কহিলেন, "চাঞ্চল্যই মানুষের দুঃখ। আমরা বেশ বুঝিতেছি, উপদ্রব ব্যতীত এ সংসারের অস্তিত্ব অসম্ভব। উপদ্রবকে উপেক্ষা করিতে হইবে। সেই উপদ্রবকে উপেক্ষা করিবার একমাত্র ঔষধি জ্ঞান। জ্ঞানদাত্রী আমার জ্ঞানময়ী। কৃষ্ণবর্ণের কাচ খণ্ডদ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়, দুর্গন্ধময় বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় আবরণ করিয়া যেমন কুসুম কাননে প্রবেশ ও ভ্রমণ করিলে কাননের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না, তেমনি সংসারে উপদ্রব ও অশান্তিকে উপেক্ষা না করিলে শান্তি সুখ ভোগ করা যায় না।" রাজা বাহাদুর কহিলেন, "কালের নিয়মে সময়ে সময়ে মহাত্মাদিগেরও জীবনপটে কত অকল্পিত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়া তাঁহাদের নয়নে নূতন দৃশ্য খুলিয়া দেয়, কিন্তু সে সকল তাঁহাদের প্রজ্ঞা চক্ষুকে প্রতারণা করিতে পারে না। তাঁহারা সেই সকল বিপদ ও দুঃখের ছবি হৃদয়স্থ নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে দর্শন করাইয়া হাস্য মুখে দর্শন করেন। বিশু তুমি তাহাই কর।" এইরূপ কথপোকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। দিবাকর দিবসের প্রথম মান পূর্ণ করিয়া উজ্জ্বল গতিতে নভস্তলে গমন করিতেছেন। ভুবন মণ্ডল প্রভাতের বালকত্ব ও কোমলত্ব অতিক্রম করিয়া যৌবনের ভাবে বলদর্পে বিবিধ কর্ম্মকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কোলাহল করিতেছে। রাজা বাহাদুর দেবীর চরণে প্রণিপাত ও সাধকের পদস্পর্শ পূর্ব্বক নিজ বাস ভবনে প্রত্যাগমণ করিলেন।

অনুরাগ ব্যতীত এ সংসারে কিছু হয় না, মানব যে কর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাতেই সাফল্য লাভ করিতে পারে। অনুরাগ স্বভাব সিদ্ধ, তাহা কোন কারণকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় না। পিতৃ মাতৃ হীন নিরাশ্রয় বালক জ্ঞানের উন্মুখে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী ও আসক্তি পর হইলে তাহাকে প্রকৃত বিদ্যানুরাগী বলা যায় না, কিন্তু যে বালক ভবিষ্যতের বিষয় না ভাবিয়া নিজের পরিণাম ও শুভাশুভের বিষয় চিন্তা না করিয়া, বিদ্যালাভে মনোযোগী হয়, বিদ্যা প্রসঙ্গে, বিদ্যা আলোচনায় আনন্দ লাভ করে, কেন আনন্দ পায়, সে বুঝিতে পারেনা, বুঝিবার চেষ্টা ও করেনা, তাহারি যথার্থ বিদ্যানুরাগ; প্রকৃত স্থান কাল সমাজ তাহার অনুরাগের সাহায্যকারি হয়।

সাধক কমলাকান্ত শৈশব হইতেই জলদ বরণী, মুক্ত কেশী, মুণ্ড মালিনীর রূপে মুগ্ধ। শৈশব হইতেই তাঁহার ভুবন মোহিনীর ধ্যানে অনুরাগ, তাহাতেই সুখ শান্তি অনুভব। কেন অনুরাগ, তিনি তাহা বুঝিতেন না। বালক যেমন জননীর রূপগুণ ভাল বাসার বিচার না করিয়া জননীকে দেখিবা মাত্রই সুখী হয়। ব্যাকুলতার সহিত হাস্য মুখে কোলে যাইতে চায়, সাধকের ও তদ্রূপ হইত। অন্তরে বাহিরে শ্যামা রূপ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত। সেই শ্যামারূপে মন প্রাণ ঢালিয়া দিতেন, পরমানন্দ অনুভব করিতেন। শ্যামারূপ দর্শনে তাহার কেন ভাবান্তর হইত, তিনি তাহা বুঝিতেন না। তাঁহার অধিকাংশ গানেই সেই অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কখন গাহিতেছেন,—

"কেন মন ভুলিল শ্যামা রূপ নিরখিয়ে, আমিত কিছুই জানিনা।"

তিনি কখনও গাহিতেছেন,—

"জানিনা কেমন তব রূপ নিরুপম,
নিরখিয়ে না বুঝি দিন যামিনী।"

কখন বা কি গাহিতেছেন,—

"ইন্দীবর নিন্দি তনু, সজল জলদ যিনি কায়া,
নীলাম্বুজ, নীল মরকত হিমকর দিনঝর কিবা হর জায়।"

তিনি আবার নিন্দাছলে ভাল বাসিয়া বলিতেছেন,—

"সদাই শ্মশান বাস, এলায়ে চিকুরপাশ,
তথাপি যে ভোলে মন কি লাগি জানিনা।"

ভাল বাসার আর একটু লক্ষণ এই যে যাহারে ভাল বাসে, সে কাল হইলেও পরের মুখে কাল এই কথা শুনিতে ও তাহার মর্ম্মে বেদনা উপস্থিত হয়। সাধক তাই কখন গাহিতেছেন,—

"কেন রে আমার শ্যামা মারে বল কাল,
যদি কাল বটে তবে কেন করে ভুবন আলো।"

সাধক আবার বলিতেছেন,—

'তেই শ্যামারূপ ভাল বাসি, কালি' জগমন মোহিনী এলোকেশী,
সবাই বলে কাল কাল, আমি দেখি অকলঙ্কশশী।"

সাধক অনুরাগের ভরে জগদম্বায় আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, সমুদয় কর্ম্ম ও কর্ম্ম ফল তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়া ছিলেন। শ্যামার রূপে ব্রহ্ম

জ্যোতি অবলোকন করিয়া সমস্ত জগৎ সেই জ্যোতি ব্যাপ্ত ধ্যান করিরা তিনিও ব্রহ্ম শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ দায়িনী প্রথম হইতেই তাঁহাকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তন্ময় ভাব অভ্যাস ও স্থায়ী করিবার অধিকারী করিয়া ছিলেন।

সাধক জগতের দুঃখে দুঃখিত হইতেন। কোটাল হাট কালী বাটীতে ধর্ম্ম পিপাসু অনেক লোকের সমাগম হইত। তিনি সকলের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন, নিজ উদারতার গুণে সকলকেই আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। যুবরাজ প্রতাপচাঁদ প্রতিদিনই সাধকের নিকট গমন করিতেন ও মনের কথা খুলিয়া বলিতেন। যুবরাজ সাধু সন্ন্যাসী, দার্শনিক পাইলেই কি প্রকারে পাপ মুক্ত হইয়া সংসারে চির শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেন। বিভিন্ন দার্শনিক দিগের মত সমুদয় অবগত হইয়া অনেক সময় দর্শনবিৎ দিগের সহিত তর্কে, বিতর্কে অতি বাহিত করিতেন। সেই সকল তর্ক দ্বারা তিনি সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেন না। বহু পথের সংযোগ স্থলে দাঁড়াইয়া পথ ভ্রান্ত মানব যেমন কোন পথে যাইলে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিব, ভাবিয়া ব্যাকুল হয়, যুবরাজও তেমনি কোন পথ অবলম্বন করিলে মুক্তিলাভ সুলভ হইবে, চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইতেন। আত্মার উন্নতি কল্পে কোন কর্ম্মের ব্রতী না হইয়া তাঁহার মানব অনির্দ্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত বায়ুর ন্যায় বিচলিত হইতে লাগিল। একদা যুবরাজ কোটাল হাটে সাধকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব! আমি নানাবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা ও সেই সকল শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সহিত তর্ক করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছি না। সংসারে শান্তি লাভের পথ ও নির্ব্বাচন বিষয়ে অক্ষম হইয়াছি। সংসার ও সংসার স্রষ্টা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপত্ব নিরূপণে অক্ষম হইয়াছি। শাস্ত্রের কথা সকল আমার নানা রকমে বোধ হইতেছে। সাধক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "রকমের লোক হইলেই রকমারী দেখিতে পায়। তুমি নানা রকমের হইয়াছ, কাজেই নানা রকম দেখিতে পাইতেছ, দেখ যাত্রা, কবি, পাঁচালী ইত্যাদিতে ঠাকুর দেবতারই কথা হইয়া থাকে, তবে রকম ভেদ মাত্র। যাত্রাতে যেমন একই ব্যক্তি কখন রাজা, কখন মন্ত্রী; কখন রাণী যখন যেমন প্রয়োজন হয়, সেই ভাবে সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত হয় শাস্ত্র ও তেমনি এক ঈশ্বরকে নানা রূপ বর্ণন করিয়া থাকেন। যুবরাজ কহিলেন, "গুরুদেব! শাস্ত্র ঈশ্বরকে নানা ভাবে বর্ণন করিলেও চিন্তাশীল মানব তাঁহার স্বরূপত্ব নিরূপণ করিবার চেষ্ট।

করে। আমি কয়েক দিন ধরিয়া দর্শনবিৎ দিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেছি কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দেখিতে পাই। তাঁহাদের সকলের মতে জ্ঞানই সংসারে চির দুঃখ হইতে মুক্তির একমাত্র উপায়, সেই চিরশান্তিকে কেহ মোক্ষ, কেহ নির্ব্বাণ, কেহবা অপবর্গ বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহারা সকলেই আত্মার রক্ত মাংস দেহে আবির্ভাব স্বীকার করেন। কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহাকে স্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করেন না। দেখুন বেদান্ত একমাত্র পরম ব্রহ্মকেই শাশ্বত, সর্ব্বশক্তিমান ও সচ্চিদানন্দ বলিয়া স্বীকার করেন। বেদান্তের মতে জগতের দৃশ্যমান সমুদয় পদার্থই মায়াময় ও স্বপ্নবৎ। বেদান্ত বলেন, সমুদয় পদার্থেই ব্রহ্মশক্তি বিদ্যমান আছে। যেমন সূর্য্য অস্ত হইলে জ্যোতি সকল তাহাতেই বিলুপ্ত হয়, নশ্বর পদার্থের ধ্বংশে সেই ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মেই লীন হয়। সেই ব্রহ্মশক্তি বা আত্ম অবিনশ্বরা নশ্বর দেহ ধ্বংশ হইয়া পঞ্চভূতে মিশাইলে আত্মা ঈশ্বরে লীন হন কিন্তু সকল আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন না। নশ্বর দেহে কর্ম্মানুসারে আত্মা বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ অবস্থার অবস্থান করিয়া পুনঃ পুনঃ নশ্বর দেহ অবলম্বন করেন। সৎকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, যজ্ঞ, উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ লাভ হয়। এইরূপ আত্মা বিশুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিলে তাহার মুক্তি হয়। আর উৎকর্ষের চরম অবস্থায় উপস্থিত হইলে সচ্চিদানন্দ ভাব আইসে। তখন বিশুদ্ধ আত্মাবান ব্যক্তি বুঝিতে পারেন, তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পিতা নাই, মাতা নাই, জাতি ভেদ নাই, ইচ্ছা নাই, বাসনা নাই, তিনিই পরম ব্রহ্ম। সাংখ্য বাদীরা বলেন, জগতে দুটী বস্তু নিত্য ও অবিনশ্বর আত্মা ও প্রকৃতি। আত্মা অসংখ্য। আত্মার উৎপাদিকা শক্তি নাই, প্রকৃতির উৎপাদিকাশক্তি আছে। তাঁহার জগতের অন্তর্নিহিত শক্তিকেই প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। কাষ্ঠের দাহিকা শক্তির ন্যায় জ্ঞান ও বুদ্ধি আত্মাকে অবলম্বন করিরা অবস্থান করেন। আত্মা কর্ম্মানুসারে প্রকৃতি শক্তি দ্বারা পুনঃ পুনঃ দেহান্তর প্রাপ্ত হন। সৎকর্ম্ম দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধতা আসে, উৎকর্ষের চরম অবস্থায় উপস্থিত হইলে আত্মা প্রকৃতির সহিত মুক্ত হন, তাহাই মুক্তি বলিয়া কথিত হয়। সাংখ্য বাদীরা ইহা ও বলেন, কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। ইচ্ছা ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না। ইচ্ছা থাকিলে অভাব থাকে, অভাব থাকিলে পূর্ণ বলা যায় না, অতএব জগতে কোন ব্যক্তিই সর্ব্বশক্তি মান হইতে পারেন না। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বিশুদ্ধ আত্মা দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়া দেবতা বাচ্য হন। ঈশ্বর ও

সেই রূপ। কেবল মাত্র দেবগণ বা ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা আত্মার মুক্তি হয় না। বিবিধ সৎকর্ম্ম দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ লাভ হয়। জ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র উপায় প্রকান্তরে তাঁহার প্রকৃতি, পুরুষ বা আত্মাকেই আদিভূত, নিত্য অবিনশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ সৃষ্টি কল্পনায় এক নূতন বস্তুর আবির্ভাব করেন, তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম, আত্মা প্রকৃতি ও পরমানু কেবলমাত্র নিত্য ও অবিনশ্বর। তাঁহাদেরও মর্ত্তে জন্মান্তর আছে, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। চার্ব্বাকগণ কিছুই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জন্মান্তর নাই। দেহের তৃপ্তি সাধনই পরম ধর্ম্ম। ইহা কহিয়া যুবরাজ কহিলেন, গুরুদেব! এই সকল আলোচনা করিয়া সদাসৎ কর্ম্ম কি! কোন মতে চলিলে সংসারের দুঃখ জাল হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইহা ভাবিয়া আমাকে বিচলিত হইতে হইয়াছে। যুবরাজের বাক্যাবসানে সাধক দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন, "এই যুবা পুরুষ মীমাংসাদি দর্শন শাস্ত্রের তর্কে জড়ীভূত হইয়া স্বরূপত্ব নিরূপণে অক্ষম ও নিজ বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়াছে এবং প্রকাশ্যে কহিলেন, "প্রতাপচাঁদ। দর্শনবিৎগণ নিজ নিজ মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য বেদ বাক্য প্রমাণ দিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই শ্রুতি বাক্যের বিরোধী নহেন। প্রতাপ? তোমার ভ্রম হইতেছে, কালী যে আমার বেদমাতা গায়ত্রী। মা আমার স্বাহা, স্বধা বেদের তেজোময়ী শক্তি, বেদান্তের পরম ব্রহ্ম, সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি, ন্যায়ের ব্রহ্ম, আত্মা, প্রকৃতি ও পরমানু। মানুষের যখন ভ্রম হয় তখন সে কাঁদে কুঠার রাখিয়া কুঠার অন্বেষণে সমুদয় বন ভ্রমণ করিয়া অবসন্ন ও বিষণ্ণ হয়। এই বলিয়া সাধক মৃদু স্বরে গাহিলেন। ক্রমশঃ

সমালোচনা।

শোক-শান্তি। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ পাল কর্ত্তৃক কলিকাতা ১০০ নং বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা হইতে প্রকাশিত; মূল্য চারি আনা মাত্র।

আমরা এই পুস্তকখানি আদ্যপান্ত পাঠ করিয়া শোকে শান্তি লাভ করিয়াছি। সংসারে শোকতাপ ক্লিষ্ট নরনারী মাত্রেই এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে শোকে শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। মানবের শোক-শান্তি, জীবনের গতি, শান্তি এবং মুক্তির উপায়, উপাসনার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক শোকে শান্তি লাভের অব্যর্থ মহৌষধের সুব্যবস্থা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

সর্ব্ব বিজয় কবচ মূল্য ১।০

ইহার গুণ অত্যাশ্চর্য্য, অতুলনীয়, দৈবশক্তি সম্পন্ন, বর্ণনাতীত। শাস্ত্র হইতে একটী শ্লোকের কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"সর্ব্ব গ্রহ প্রশমনী নিঃশেষ বিষনাশিনী। জয়ং সর্ব্বত্র কুরুতে ধনদা সুমতিপ্রদা॥"

অর্থাৎ ইহা দ্বারা সকল প্রকার গ্রহদোষ প্রশমিত হয়, শরীরের বিষ নাশ হয়। সর্ব্বত্র সকল কার্য্যে জয়লাভ হয় এবং সুমতি হয়। পৃথিবীতে সৎপথে সুস্থ শরীরে থাকিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন দ্বারা অল্প দিনে সুখী ও ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া যায়।

প্রশংসা পত্র।

ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম ও হেল্‌থ অফিসার মহোদয়গণের—

সুবিখ্যাত সর্ব্বজন সুপরিচিত ডাক্তার প্রোফেসার পি, কে, রায় মহাশয় ১৫৯ নং অগস্ত্যকুণ্ড কাশীধাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার কোন বন্ধু আপনার কবচ ধারণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বরকমেই দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন ও আপনার কবচ ভারতে চিরদিন সমভাবে বিরাজ করিতে থাকুক।

কলিকাতা ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের সুবিখ্যাত ডাক্তার কে, এন, বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—যখন আমি পিডং হাসপাতাল দার্জ্জিলিংএ ছিলাম, সেই সময় একটি কবচ পাইয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি।

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সেন টিপনিং টি ষ্টেট হইতে লিখিয়াছেন—আপনার কবচ ধারণে ভাগ্য বিশেষ সুপ্রসন্ন হইয়াছে।

ডাক্তার জে-এন-রায় এল আর সি-পি-এল (এডিন) ডি-পি-এইচ (লণ্ডন) আগ্রার হেল্‌থ অফিসার ২নং ট্যাংরা রোড কলিকাতা হইতে লিখিতেছেন—আপনি যে দুইটি মাদুলী পাঠাইয়াছিলেন, তাহার অতি আশ্চর্য্য ও পরমাহিতকর ফল হইয়াছে।

ডাক্তার ফামরোজ আর-কে হামিক এম-সি-বি-এস গ্র্যাণ্ট রোড বোম্বাই হইতে লিখিতেছেন—আপনি আগে যেরূপ মাদুলী পাঠাইয়া ছিলেন, সেইরূপ আর ৩টী মাদুলী পাঠাইবেন। বাস্তবিকই ইহা বিশেষ উপকারী।

ক্যাপটেন এ-সি রায় আই-এম-এস-মেডিকেল অফিসার উজিরস্থান লিখিয়াছেন—কয়েকমাস ধরিয়া সর্ব্ববিজয় কবচ ব্যবহার করিতেছি এবং কয়েক বিষয়ে সফলকামও হইয়াছি পত্র মধ্যে ১০৲ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া ২টী তামার কবচ আরও পাঠাইয়া দিবেন।

কবিরাজ শ্রীতারাপ্রসাদ সেন (সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত) কবিরঞ্জন গুরুপদতীর্থ ডিব্রুগড় লিখিতেছেন—আমি অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে অরঞ্জিত ও অতীব সত্যঘটনা এই যে, "সর্ব্ববিজয় কবচ" আমাদের পরিবারবর্গ ধারণ করিয়া আশাতীত অচিন্তনীয় সুফল পাইয়া সানন্দ চিত্তে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে—একজন বাত ও পুরাতন বিষম জ্বর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। অপর একজন অভিলষিত গচ্ছিত ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর একজন স্বীয় স্বাধীন ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে। সত্যকথা এই আবহমান কাল হইতেই "সত্যমেব জয়তে"

প্রাপ্তিস্থান—মহাযোগেশ্বরী আশ্রম।

২।৩ রামকৃষ্ণ লেন বাগবাজার, (বাজারের নিকট) কলিকাতা।

কলিকাতা, বেনারস, খুলনা প্রভৃতি স্থানের ইণ্ডষ্ট্রীয়াল এক্‌জিবিসন্ হইতে ৮ খানি গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত ও সর্ব্বজন সমাদৃত ও প্রশংসিত।

পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোম্পানীর

এসেন্স পারফিউমারী।

সদা প্রস্ফুটিত পুষ্পের সারাংশ অভিনব উ ঔষধ য় বাহির করিয়া এই সকল উপাদেয় এসেন্স প্রস্তুত হইয়াছে। সৌরভ দীর্ঘকাল-স্থায়ী, এক ফোঁটা রুমালে দিলে সৌরভে মনপ্রাণ বিমোহিত হয়।

১। কাশ্মীর-কুসুম—ভূঃস্বর্গ কাশ্মীর পুষ্পের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, তাই কাশ্মীরে চিরবসন্ত, তদ্দেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট পুষ্পের দ্বারা ইহা প্রস্তুত। মূল্য ৸৶০, ডাকমাশুলাদি ৷৷০ আনা।

২। ভুলনা আমায়—(For get me not) ইহার গন্ধ সুমিষ্ট ও বহুদিন স্থায়ী। মূল্য ২৶০, ডাকমাশুলাদি ৷৷০ আনা।

৩। মনের মতন—(As you like it) এমন প্রাণ মাতোয়ারা সর্ব্বজন বাঞ্ছিত সুমিষ্ট গন্ধ আর নাই। মূল্য ১।০, ডাঃ মাঃ ৷৷০।

৪। জেস্‌মিন্—সদ্য প্রস্ফুটিত জুঁইফুলের গন্ধ অতিশয় সুমিষ্ট ও বহুদিন স্থায়ী। ইহা অতিশয় তৃপ্তিজনক। মূল্য ৸০ আনা।

৫। রজনীগন্ধা—এরূপ সুমিষ্ট ও তৃপ্তিজনক গন্ধ আর নাই। সদ্য প্রস্ফুটিত "রজনীগন্ধের" ন্যায় গন্ধ, অথচ বহুদিন স্থায়ী। মূল্য ৸০ বার আনা।

৬। গন্ধরাজ—পুষ্পের রাজা বলিয়াই ইহার নাম গন্ধরাজ, সদ্য প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ পুষ্পের তৃপ্তিকর সৌরভ চিরদিন স্থায়ী। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

৭। বকুল—এরূপ সুমিষ্ট ও দীর্ঘকাল স্থায়ী অথচ হৃদয়ানন্দকারী প্রাণ মাতোয়ারা গন্ধ আর নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য বড় শিশি গ্লাস ষ্টপার ৸৶০, ছোট শিশি ৷৷৵০ দশ আনা।

কারখানা—৩৮, ৩৮।১ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

বটকৃষ্ণ পালের এডওয়ার্ড্‌স টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

—ক লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৶০ প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শ্বেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্ড নার্শা-প্যারিলা।

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Foamula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রতিমাখান

সুন্দর মুখখানি

কিসে হয় ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একরাশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ৵০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী ব্যাধিতে অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ॥৵০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রী শক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
9, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

২১শ, বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩০. [৮ম, সংখ্যা

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	সাধক কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২২৫
২।	আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব	শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ	২৩৩
৩।	অকাটা পণ	শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস	২২৬
৪।	শেষ স্মৃতি	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	২৪৭
৫।	ছোট পাখী	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু	২৪৯
৬।	সমর্পণ	শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস	২৫১
৭।	বিবিধ প্রসঙ্গ	.. ...	২৫২
৮।	সমালোচনা	.. ...	২৫৬

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত

Tele. Phone 388 Barabazar.

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

মূল্য ॥০, ডজন ৫৲, গ্রোস ৫০৲, পাইকারী দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

আর, গে ভিন এণ্ড কোং, হেড অফিস—১২৭ নং লোয়ার সারকুলার রোড ব্রাঞ্চ—১০৫ নং বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Telegram:—GERMALINE. Telephone No. 1382

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

এলোমেলো হয়ে যাবে

তথন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তৈল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "ফিজীশিয়ান"

টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

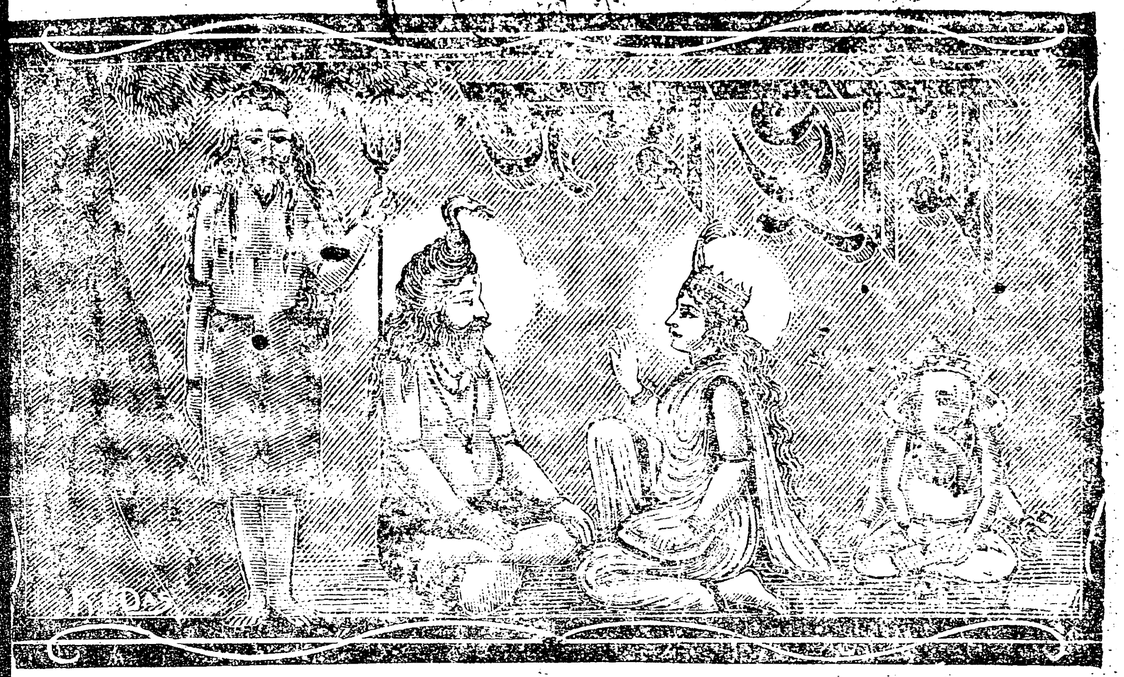

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৯শ, বর্ষ। } ১৩৩০ সাল, অগ্রহায়ণ { ৮ম, সংখ্যা।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কত রঙ্গ জান গো শ্যামা ;
সুমতি কুমতি গতি তুমি সে কারণ॥
প্রকৃতি পুরুষাকারে, নিরঞ্জনী নিরাধারে,
যেরূপ যে জনা ভাবে সে পাবে তেমন গো।
কমলাকান্তের মনে, কি আছে তারিণী বিনে,
যাকর আপন গুণে লইলাম শরণ॥

সঙ্গীত শেষে সাধক কহিলেন, "ব্রহ্ম নিরূপণ চিন্তা বিফল। যিনি অচিন্ত্য

ও নিরুপম, চিন্তা দ্বারা তাঁহার স্বরূপত্ব নিরূপণ অসম্ভব! তুমি তাঁহাকে যে, ভাবে ভাবিবে তুমি তাঁহাকে সেই ভাবে পাইবে। তাঁহার গুণ সকল তোমাকে আশ্রয় করিবে, তুমি তৎভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইবে। মানুষের মনের ক্রিয়া অসীম। ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া দৃঢ় ভক্তির সহিত ব্রহ্ম শক্তি দায়িনী জগদম্বাতেই মন ও বুদ্ধি সন্নিবেশ কর, কর্ম্মকর, তর্কে জীবন অতিবাহিত করিও না। বিশ্বাসী আত্মাকে অনেক উপদেশের প্রয়োজন হয় না।"

একমাত্র উপদেশে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইতে পারে। প্রতাপচাঁদ "গুরু বহুৎ মিলে, চেলা না মিলে এক," কর্ম্মী হও, ক্রমে কর্ম্মফল লাভে উপেক্ষা আসিবে, তুমি জ্ঞান লাভ করিবে, পরমা শান্তি তোমাকে আশ্রয় করিবে। যুবরাজ কহিলেন, "গুরুদেব! বুদ্ধিমান মানব অন্ধ বিশ্বাস করিতে পারে না, সেরূপ বিশ্বাসও তাহার পক্ষে উপযুক্ত নহে।" সাধক কহিলেন, "প্রতাপ মনের ক্রিয়া অসীম কিন্তু মানব বুদ্ধি সীমাবদ্ধ। বুদ্ধি ও ধারণার অতীত এ সংসারে অনেক বিষয় বিদ্যমান আছে। ঈশ্বরের ধ্যান ও ধারণা বাক্য ও মনের অতীত হইলেই ঈশ্বর তুরিয় বাচ্য হন। প্রতাপ তুমি সূর্য্য দেখিতেছ, সূর্য্য হইতে মহৎ তেজ সমুৎপন্ন হইয়া জগৎ আলোকিত করিতেছে। বিচার আরম্ভ হইল, সূর্য্য কি? কেহ বলিলেন, সূর্য্য মহাপুরুষ, ঈশ্বরের জ্যোতিঃতে দীপ্তমান হইয়া এই বিশ্ব প্রতিপালন করিতেছেন। কেহ বলিলেন, সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায়, ইহাতেও পৃথিবীর ন্যায় জীব জন্তু আছে, দিবসে পৃথিবী হইতে তেজ নির্গত হইয়া ইহাকে দীপ্তিমান করে। কেহ বলিলেন, সূর্য্য একটী আগ্নেয় পর্ব্বত। তুমি ইহাদের মধ্যে যাহার মীমাংসায় বিশ্বাস করিবে, তোমাকে অন্ধ বিশ্বাস করিতে হইবে, কারণ সূর্য্যের স্বরূপত্ব নিরূপন বুদ্ধি ও ধারণার অতীত। তুমি কেবল এই মাত্র বিশ্বাস করিতে পার, সূর্য্য হইতে তেজোরাশি সমুদ্ভূত হইয়া সমুদয় জগৎ জ্যোতির্ম্ময় হইতেছে। তুমি যদি সেই তেজোরাশি ব্রহ্ম জ্যোতিঃ বলিয়া ধ্যান কর, দেখিবে, তুমি ব্রহ্ম শক্তি লাভ করিবে। সূর্য্যের স্বরূপত্ব মীমাংসার ন্যায় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপত্ব নিরূপণে অক্ষম, কিন্তু তুমি দেখিতেছ, জগতের প্রত্যেক সজীব পদার্থে শক্তি আছে। নির্জীব পদার্থ শক্তি থাকিলে ও তাহা তোমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, সজীব পদার্থের বর্দ্ধন রস গ্রহণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা তুমি এক মহৎ শক্তি অনুভব করিতেছ, প্রতাপ! যদি তুমি সেই শক্তিকে ব্রহ্মশক্তি বল, তাহা হইলে তোমার অন্ধ বিশ্বাস হয় না। তুমি যদি তন্ময় হইয়া সেই পরমাশক্তির উপাসনা করিতে পার, তুমি নিশ্চয় জানিবে, তুমি তদ্ভাব ও তৎশক্তি

প্রাপ্ত হইবে। তোমার আত্মা নিষ্কাম হইয়া মোক্ষলাভ করিবে। ইহা বলিয়া সাধক গাহিলেন,—

মন! ভ্রমে ভুলেছ কেনে, তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে।
শ্রীনাথ দত্ত, প্রধান তত্ত্ব, দৃঢ় কর সেই চরণে॥
যখন যারে, ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণ।
তোমার দ্বৈত ভাবে দিবস গেল, চিদানন্দময় কেমনে॥
তন্ন তন্ন করি খোলে, কি পেলে ছয় দরশনে।
তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান, মহাবিদ্যার আরাধনে॥
কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব, অনুমানে কেবা জানে।
যার আদি অন্ত মধ্য নাহ, সে নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে॥

বিশু এতক্ষণ বিশেষ মনোযোগের সহিত সৃষ্টি ও ব্রহ্ম নিরূপণ সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মতভেদ শ্রবণ করিতে ছিলেন, এক্ষণে সাধকের বাক্যাবসান হইবামাত্র ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুর! আমি দেখছি, মানুষ বুদ্ধির জোরে, বিদ্যার বলে আসলকে নকল, নকলকে আসল করে তোলে। মানুষ উপদ্রব ঝঞ্ঝাট ছাড়া থাকতে পারে না। এক কথায় চুকে যায়, সেখানে হাজার কথা বলে। মানুষ হাজার কথা বোঝে, কিন্তু একটা সোজা কথা বোঝে না। আমার মা কালী জীব জন্তু, গাছ পাতা যা কিছু সব সৃষ্টি করেছেন, রক্ষা কচ্ছেন, পালন কচ্ছেন, এ সোজা কথা মানুষ বুঝ্‌বে না। আমার বোধ হয়, বাপ মা যেমন তাদের ছোট ছোট ছেলেদের কথার তর্ক বিতর্ক শুনে খুসী হন, ছেলেরা সাহস পেয়ে বাচালের মত বকে, দুটো একটা জ্ঞানের কথা কয়, মা বাপ শুনে হাসেন, আমার মা কালী ওই সব বিদ্বান ছেলেদের কথার লড়াই লাগিয়ে দিয়ে বসে বসে মজা দেখেন, আর হাঁসেন। ঠাকুর এখনি গাহিলেন, "কত রঙ্গ জান গো শ্যামা" এই কথাই ঠিক! আমার রঙ্গিনী রঙ্গ না করে থাক্‌তে পারে না। রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমি মূর্খ মানুষ। আমি এত কথা বুঝিনা, আমি বুঝি মানুষ কত কথা বলে, কত করে, সব ধর্ত্তে নাই মানুষে কি আছে, মানুষ আসছে, আর যাচ্ছে। রাজ পুত্র! তুমি চিরকাল যে থাকে, এমন লোক খুজছ? আমি দেখ্‌ছি, বেশ বুঝ্‌ছি, আমার মা কালী ভিন্ন আর কিছুই চিরকাল থাকবে না। দেখ তুমি আমি কেউ চিরকাল থাক্‌বোনা। কিন্তু মা আমার যেমন তেমনি থাকবে। আমার বাপ দাদা মাকে যেমন দেখেছে, আমিও তেমনি দেখ্‌ছি। আমার ছেলেরাও মা কালীকে তেমনি

দেখ্‌বে। তাহলেই বোঝ, আমার মা কালীর চেয়ে চিরকালের জিনিস আর কিছুই নাই। তুমি মনের গোলমাল ছেড়ে দাও। আমার বোধ হচ্ছে মা যেমন ছেলেকে পুতুল দিয়ে ভুলোন, তেমনি মা কালী তোমাকে কতকগুলি পুঁথি দিয়ে ভুলিয়েছেন। তুমি বই গুলি ছুড়ে ফেলে দাও, আর বল, "আর ভুল্‌লে ভুলবো নাকো।" আড় হয়ে মায়ের কাছে পড়, আর কাঁদ, মা তোমার মনটাকে ঠিক করে দেবেন। আমি ঠাকুরের কথা শুনে ঐ রকম করে পাপের জ্বালা অনেক ভুলেছি। যুবরাজ কহিলেন, "বিশু! তোমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, শুনিয়াছি. বিশ্বাসে লভয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার সে বিশ্বাস এখনও আইসে নাই। ঠাকুরের বাক্যে আমার বিশ্বাস আছে। ঠাকুরই আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সক্ষম, জানিয়া আমি তাহার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলি। দেখ, কোন কোন ব্যক্তি স্থল বিশেষে দিশে হারা হয়। তাহার অন্য কোন স্থানে দিক্‌ভ্রম হয় না, কেবল মাত্র সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিলেই সে দিকনির্ণয়ে অক্ষম হয়। আমি যখনই করাল বদন কই পরমা শক্তি ব্রহ্ম সনাতনী বলিয়া অনুধ্যান করিতেছি, তখনই পুরাণোক্ত বহু দেব দেবীর বিষয় মনোমধ্যে উদয় হইতেছে, সাকার উপাসনার সম্বন্ধেও ভ্রম জন্মিতেছে।" বিশুকে ইহা কহিয়া যুবরাজ সাধককে কহিলেন, "গুরুদেব! আমার বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন, আমি জিজ্ঞাসা করতেছি, শাশ্বত আত্মা কি নিরাকার পরম ব্রহ্মের ধ্যানে ধারণা নিরস বলিয়া কি পুরাণোক্ত সাকার দেব দেবীর উপাসনার সৃষ্টি হইয়াছে! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এ তিন মূর্ত্তির প্রয়োজন কি? নিরাকারকে রূপ রসাদি দ্বারা ধ্যান করিবার প্রয়োজন হইলে একটা মূর্ত্তির কল্পনা করিলেই ত হইত? প্রত্যেক পুরাণে এক এক দেবতাকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল কারণ শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এক ধর্ম্ম বহু সম্প্রদায় ভুক্ত হইলে ধর্ম্ম ও সমাজ বন্ধন ক্ষীণ হইবার সম্ভাবনা। আপনি আমার এই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করুন। সাধক কহিলেন, "প্রতাপচাঁদ মনের সন্নিবেশ জন্য সাকার রূপের কল্পনা। নিরাকার উপাসনা জ্ঞান যোগ ব্যতীত হয় না। জল হইতে বাষ্প হয়, আবার সময়ে বাষ্পই জলরূপে পরিণত হয়। জ্ঞান সংযোগে সাকাররূপ সর্ব্বময় নিরাকার রূপ ধারণ করেন।" প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "গুরুদেব! বিবিধরূপ কল্পনার প্রয়োজন কি? ঐ দেখুন, মায়ের মুক্তকেশ গলে মুণ্ড মালা করে অসি। আবার দেখুন, কৃষ্ণ মূর্ত্তি শিরে শিখি চূড়া, গলে বন মালা, কটীতটে ধড়া, চরণে নূপুর। কেহ বা কালী

মূর্ত্তির উপাসক কেহ বা কৃষ্ণ মূর্ত্তির উপাসক। সাধক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমাদের এ প্রদেশে এক গুড় হইতে দুবরাজ পুরের বাতাসা ও মান করের কদমা প্রস্তুত হয়। কেহ বা বাতাসা ভাল বাসেন, কেহ বা কদমার প্রিয়, কিন্তু বাবা? বাতাসা কি কদমা গুড়ের রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। ব্রহ্ম শক্তি এক, প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পূজিত হন মাত্র" এই বলিয়া সাধক হাতে তাল দিয়া আহ্লাদের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন—

জাননারে মন! পরম কারণ শ্যামা ত কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়॥
মা কভু বাঁধে চূড়া, কভু পরে ধড়া,
ময়ুর পুচ্ছ শোভিত তায়।
ব্রজ পুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
মা ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন,
করেন সৃজন পালন লয়।
মা আপনার মায়ায় আপনি আবদ্ধ, যতনে এ ভব যাতনা সয়॥
যে রূপে যেজনা, করয়ে সাধনা,
সেই রূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে কমল মাঝারে উদয় হয়॥

সঙ্গীত শেষে প্রতাপচাঁদ বিমোহিত হইয়া সাধকের মুখ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া ভাবিলেন। এই মহাপুরুষের সর্ব্বদাই প্রসন্ন বদন, আমি কখনও ইহার ভাবান্তর দেখিলাম না। ইহার বাক্য সকলের কি এক আশ্চার্য্য মোহিনী শক্তি। মনের বিকার নাশ করে। প্রতাপচাঁদ প্রকাশ্যে কহিলেন, "গুরুদেব! অরুণ উদয়ে কুজ্ঝটিকা জালের ন্যায় আপনার বাক্য শ্রবণে আমার সন্দেহ জাল দূরীভূত হইতেছে। অতঃপর আমি ব্রহ্মশক্তিকে মাতৃভাবে উপাসনা করিব। আমি জানি, মায়ের তুল্য বাক্য নাই, মায়ের তুল্য স্মৃতি নাই, মাতৃভাবে ভাবান্তর নাই। সাধক কহিলেন, "মাতৃ ভাব, পিতৃভাবে, যাঁহার যে ভাবে ইচ্ছা হয়, উপাসনা করিতে পারেন, ভাবের ভাবান্তর না হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। জপ করিতে বসিয়া নিজকৃত কর্ম্ম কি সংসার চিন্তা যাহাতে মনমধ্যে না আইসে তজ্জন্য অভ্যাস যোগ করিতে হয়। অভ্যাস যোগ দ্বারা ক্রমে চিত্ত শুদ্ধি হয়।

তুমি এখন চিন্তাপুরে কুটস্থ উপাস্য দেবতার সহিত প্রাণের সন্নিবেশ করিতে চেষ্টা কর, কিন্তু নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিও না, তাহাতে অধর্ম্ম আছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চিন্তার সময় নির্ব্বাচন কর। তুমি মোক্ষ চিন্তার কাঠিন্য যাহা অনুভব করিবে, তাহা আমাকে কহিবে।" ইহা কহিয়া সাধক যুবরাজ প্রতাপচাঁদকে কহিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা দেবগণ প্রীত হন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়, তুমি কুল ক্রমাগত প্রজাপালন ও ঐ সকল কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া চিত্তের শান্তি লাভ কর। তুমি বরাসন অবলম্বন পূর্ব্বক ষোল, বত্রিশ, চৌষট্টি ক্রমে দেবীর বীজ মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম অভ্যাস কর। রেচন ও পূরণ অতি ধীর ভাবে করিবে, যেন নাসিকায় হস্ত প্রদানে শ্বাস প্রশ্বাসের অনুভব না হয়।" যুবরাজ কহিলেন, "গুরুদেব আপনার উপদেশ আমি যথা সাধ্য প্রতি পালন করিব, কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের কাঠিন্য আপনার নিকট নিবেদন করিব, ইহা কহিয়া যুবরাজ দেবী ও সাধককে বন্দনা পূর্ব্বক নিজ বাস ভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

কথাই আছে, "অনেক মানুষ মিলে কিন্তু মন মিলেনা।" মনের মত মানুষ পাওয়া বড় কঠিন। আত্মার একভাব না হইলে মনের মিলন হয় না, সত্ত্ব গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির, তমগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তমোগুণ প্রধান ব্যক্তির মিলন হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল গুণের কর্ম্মানুসারে প্রকার ভেদ থাকায় সমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত তৎগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরও সর্ব্ব সময়ে সমান ভাবে মিলন হয় না। সেই কারণেই মনের মানুষ পাওয়া কঠিন। আত্মার বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ অবস্থার সমান ভাব না হইলে উভয় আত্মার মিলন হয় না। বর্দ্ধমান রাজসভায় অনেক গায়ক ও বাদ্য যন্ত্র বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত মনের আনন্দে সঙ্গীত করিতে সাধক অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতেন। আমি বড় গায়ক, আমি বড় যন্ত্রী এইরূপ অহঙ্কারের বিভীৎস মূর্ত্তি সাধক কখন কখন সভাস্থলে দর্শন করিতেন। শিষ্টতার অনুরোধে তিনি মনোভাব গোপন করিতেন। সাধক সভাস্থ হইলে মহারাজা বাহাদুর অনেক সময় তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন ও তাঁহার ভাবান্তর অবলোকন করিতেন। সাধকের অন্তর সরস ও বালকের ন্যায় কোমল, তিনি নির্দ্দোষ হাস্য পরিহাস প্রিয় এ কথা রাজাবাহাদুর বিদিত ছিলেন সঙ্গীত সময়ে জগদম্বার গুণ কীর্ত্তনে তাঁহার তন্ময় ভাব হইত, তখন তিনি কাহার দিকেও কোন বিষয়ে লক্ষ্য করিতেন না, কিন্তু সঙ্গীত শেষে

কখন কখন অহঙ্কারের ছবি তাঁহার চক্ষে পতিত ও তাঁহার আনন্দের বিঘ্ন হইত। মহারাজা বাহাদুর তাঁহার বিমর্ষ ভাব দর্শন করিতেন। সভাস্থলে হাস্য পরিহাসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে সমাগত জনের চারু বদন দন্তকচি কৌমুদী সুধামণ্ডিত গৃহমধ্য আলোকিত করিত, কিন্তু সাধক কখন কখন অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতেন। মহারাজা বাহাদুর কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। একদা তিনি একান্তে সাধককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব কখন কখন সভাস্থলে হাস্য প্রসঙ্গ আপনার পবিত্র বদনের হাস্য দৃষ্ট হয় না, সঙ্গীত অবসানেও কখন কখন আপনাকে আমি বিমর্ষ অবলোকন করি, কারণ কি ? যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আপনি আমাকে আপনার চিত্ত বিকারের কারণ জানাইয়া সুখী করিবেন। সাধক কহিলেন, "মহারাজ! মানব সর্ব্বদাই আপন আপন মুখপ্রিয় বস্তুর আস্বাদনে আনন্দ অনুভব করে। যে ব্যক্তি তিক্ত আস্বাদন করিতে পারে না, তিক্ত স্বাদ যুক্ত বস্তুর আস্বাদনে মুখ বিকার স্বভাবতই ঘটিয়া থাকে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন হাস্য প্রসঙ্গে ও সঙ্গীত সময়ে কখন কখন আমার রুচি বিকার ঘটিবার কারণ উপস্থিত হয়। সমুদয় জীব জন্তুর মধ্যে মনুষ্যই কেবল মনের আনন্দ হাস্য প্রকাশ করিতে পারে, হাস্য বড় উপাদেয় রস। যে লেখনীতে হাস্য রস নাই, তাহা শুষ্ক ফলের ন্যায় অপ্রীতি কর। যে বচন প্রণালীতে হাস্য নাই তাহা কাক কলরবের শ্রুতি কটু। নির্দ্দোষ হাস্য নির্ম্মল সরোবরে প্রভাত প্রস্ফুটিত কমল সকলের ন্যায় প্রীতিপ্রদ। কিন্তু আমি দোষ দুষ্ট হাস্যকে চপলা চমকের ন্যায় অবলোকন করি। এই জগতীতলে সকলেই জগদম্বার ইচ্ছায় সৃজিত ও পরিচালিত, কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। ব্যক্তি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ, ধর্ম্ম বিশেষকে অবলম্বন করিয়া যে হাস্য রসের আবির্ভাব হয়, তাহা দূষিত, অতএব পরিত্যাজ্য। সঙ্গীতের পর কখন কখন আমার বিমর্ষভাব হয়, তাহারও কারণ আছে। সঙ্গীত শেষে জগদম্বার প্রসন্নময়ী মূর্ত্তি চারি দিকে অবলোকন করিয়া বাদ্যকরের মুখপানে চাহিবামাত্র যখনই অহঙ্কারের ছায়া অবলোকন করি, তখনই অধোমুখে অন্তর্বাসিনী প্রসন্নবদনা রঙ্গিনীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শীতল হই। মহারাজ! অহঙ্কারের মূর্ত্তি বিভৎস তাই আমার বিমর্ষ ভাব ঘটে। সুর ব্রহ্ম, বাক্য ও যন্ত্র সকল সেই ব্রহ্মের আসন স্বরূপ, তাল মান সহ সেই ব্রহ্মের উদ্বোধনই সঙ্গীত বা উপাসনা। যদি গায়ক ও বাদ্যবিৎ নির্ম্মল ভক্তিসহ মন প্রাণকে সুরের সহিত মিশাইয়া সঙ্গীত ধ্যানে মগ্ন হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের সুর ও

যন্ত্রের সাফল্য হয়, অন্যথা অহঙ্কার সহ অযথা চীৎকারে চিত্ত চাঞ্চল্য কিম্বা তামসিক আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই উপস্থিত হয় না। মাঠে, গোষ্ঠে, লোকালয়ে দেবালয়ে যেখানে সেখানে প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভুবনেশ্বরীর মহিমা গানে পরমানন্দ ভোগ করা যায়, কিন্তু যদি যন্ত্র দেবতার আরাধনা হেতু ব্যক্তি বিশেষকে সেই সঙ্গীত উপাসনায় সহযোগী করিতে হয়, তাহা হইলে গায়ক ও বাদ্যকারের সমভাবাপন্ন হওয়া উচিত। বাদ্যকার অহঙ্কার শূন্য ও প্রেমিক না হইলে উপাসনার হানি হয়। দেখুন, মন্ত্র সকল স্বতঃই পবিত্র, তথাপি যজ্ঞকালে কাষ্ঠ ও হবি উভয়েরই পবিত্রতা আবশ্যক করে, সঙ্গীত সময়ে গায়ক ও বাদ্যকার উভয়েরই পবিত্রতার প্রয়োজন হয়। অন্যথা যজ্ঞ বিঘ্ন ও হবিগন্ধ দূষিত হয়। আমি অনেক স্থলে অনেক বাদ্যকারের সহিত সঙ্গীত আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু অমরার গড় নিবাসী কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সঙ্গীত উপাসনায় যেরূপ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি, সেরূপ কুত্রাপি আনন্দ অনুভব করিতে পারি নাই।" ইহা শুনিয়া মহারাজা বাহাদুর সাধককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনারাম চট্টোপাধ্যায় কে? তাঁহার পরিচয় আমি জানিতে ইচ্ছা করি।" সাধক কহিলেন, "কেনারামের নিবাস মানকরের নিকট অমরার গড়। তিনি সাত্বিক ব্রাহ্মণ, প্রেমিক, উদার, পরদুঃখ কাতর, বাদ্যযন্ত্র পারদর্শী, গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী। আমি চান্নায় থাকিতে তিনি আমার নিকট মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি এখানেও ইতিপূর্ব্বে আসিয়া ছিলেন, আপনি তৎকালে কাল্‌নায় ছিলেন। আমি প্রতি বৎসর শ্যামা পূজার পর তাঁহার গৃহে গমন করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। কার্ত্তিক মাস শেষ হইল। আমি সত্বর অমরার গড় গমন করিব। কেনারাম নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠার সহিত আমার গমন প্রতীক্ষা করিতেছেন!" মহারাজ বাহাদুর করিলেন, "কেনারাম চট্টোপাধ্যায়কে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ সহ আমি আপনার সহিত তাঁহার নিকট লোক পাঠাইতে ইচ্ছা করি। বোধ হয়, তিনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন।" সাধক কহিলেন, 'শ্রদ্ধার সহিত আহ্বান করিলে তিনি সর্ব্বত্রই আহ্লাদের সহিত যাইয়া থাকেন। তিনি আপনার অধিকার মধ্যে বাস করিতেছেন। আপনার রক্ষিত দ্রব্য সমূহে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আপনার নিমন্ত্রণ তিনি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিবেন। আমার সহিত তাঁহার নিকট কোন লোক পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। আমিই আপনার অভিপ্রায় তাহার নিকট প্রকাশ করিব। আমার বর্দ্ধমান প্রত্যাগমন সময়ে সম্ভবতঃ তিনি আমার সঙ্গে আসিয়া

আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" ইহা কহিয়া সাধক মহারাজার নিকট কিয়দ্দবসের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব।*

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ।

ভন্নাস্তোহি যশঃ প্রযুনঃ নিবহা যে স্বন্তি তেষামুভৌ —
ভূত্বা প্রস্ফুতিতৌ বিয়ত্বথোগতৌ চন্দ্রার্কনাম্না স্থিতা —
যেহন্যে কোরকিতা স্ফুটন্তি যদিতে স্থানং ন তেষাং ভবেৎ
পৃথ্যাং ত্বয়েব লোক পতিনা তারাক্ষয়া স্থাপিতা॥

রাজন!

সুযশ প্রসূনরাশি আছে যে তোমার,
তাহা হতে দুটী পুষ্প হয়ে প্রস্ফুটিত।
চন্দ্রার্ক নামাতে তারা হইয়া প্রচার,
আকাশে গমন করি আছে সংস্থাপিত॥
অপর মুকুলগুলি হলে প্রস্ফুটিত,
ধরা তাহে স্থানাভাবে হইবে তাহার।
সেই হেতু লোকনাথ হায় সঙ্কুচিত,
অক্ষয় তারকাকারে স্থাপিলা আধার॥

এ হেন মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমাগত সভ্যমণ্ডলী! প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক এবং ছাত্রগণ, আজ এই মহতী সভার অধিবেশন দেখিয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইতেছি, তাহা আমি একমুখে বর্ণন করিতে অক্ষম। যে সভায় ভারতভূষণ বর্দ্ধমানাধিপতি, লক্ষ্মী ও বাণীর বরপুত্র, মহারাজাধিরাজ

* ন্যাশন্যাল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বাৎসরিক সভায় পঠিত।

ইন্দ্রপ্রভ সার বিজয়চন্দ মহাতাপ বাহাদুর সভাপতি এবং যে সভায় সুবিখ্যাত, স্বনাম ধন্য, বদান্য যশস্বী বিবুধগণ সদস্য বা সভ্যরূপে উপস্থিত, তাহা যে ত্রিদিব আলয়ে সুরপতি পুরন্দরের সুরসভা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ সভায় আমার ন্যায় নগণ্য অকৃতি অধম ব্যক্তির বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠে অভিলাষ করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু কি করি, যখন এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত আছি, তখন বাধ্য হইয়া কলেজের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় বিশেষত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা যুক্তিযুক্ত বোধ করি।

আমাদের এই কলেজটী শুধু হোমিওপ্যাথিক কলেজ নহে, ইহাতে এলোপ্যাথিক, সার্জ্জারী, এনাটমী, আয়ুর্ব্বেদোক্ত পথ্যাপথ্য, নিদান ও রসায়ন শাস্ত্র এবং হোমিওপ্যাথিক সমস্ত বিষয়েরই গবেষণা হইয়া থাকে। যেমন গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী পূত ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন করিয়া শত সহস্র পাতকী পরিত্রাণ পাইয়া থাকে, সেইরূপ এই কলেজে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ক্ষতপুয়ঃ পূরিত, অস্থি, পঞ্জর ভেদী দারুণ অভিঘাত প্রপীড়িত ব্যক্তিকে বা আসন্ন মৃত্যু সত্বর—সান্নিপাতগ্রস্থ হতাশ হৃদয় বহু আতুরকে এবং বিসূচিকার অন্তিম অন্তক কবল প্রেরিত অবস্থাপন্ন মানবকে ব্যাধিযুক্ত করিতে সক্ষম হইবে।

১। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা যাহা বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব পালন করিতে সৃষ্টি করিতে, সংহার করিতে অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকৃতি ভেদে যাহারা বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া দেহকে রক্ষা বৃদ্ধি ও ক্ষয় করিয়া থাকে. অথবা বায়ু. অগ্নি, জল, যাহারা জীব জীবনের একমাত্র আধার, সেই বায়ু. পিত্ত, কফ. সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং এই হোমিওপ্যাথিক কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণই এই সব বিষয়ে অভিজ্ঞ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সব বিষয়ের শিক্ষা অন্য কোনও কলেজে আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

২। ইউরোপ শীত প্রধান দেশ, আর আমাদের ভারতভূমি গ্রীষ্ম প্রধান দেশ সুতরাং এই উভয় দেশ সম্পূর্ণ বিপরীত, খাদ্যাখাদ্যর সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে দেশে যেরূপ খাদ্যের প্রয়োজন, তথায় সেইরূপ শস্যাদি ও জীবগণের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন; পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে স্বদেশীয় খাদ্যই মানবের স্বাস্থ্য কর। অতএব যাহাতে শালী ধান্যাদির তণ্ডুল, মুগ মুশুরাদির ডাল, রোহিতাদি মৎস্য, পটোলাদি ফল শাক এবং দুগ্ধ. দধি, ঘৃত, মধু প্রভৃতির গুণাগুণ বর্ণিত আছে; সেই

সকল বিষয় শিক্ষা করিয়া যাহারা সাধারণকে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহারাই এতদ্দেশের চিকিৎসক ও হিতকারী। সেই জন্যই এই কলেজে দ্রব্যগুণ ও পথ্যাপথ্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়া অধিত হইয়া থাকে।

৩। আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিদান গ্রন্থে এরূপ কতকগুলি রোগের উল্লেখ আছে, যাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে এখনও উদ্ধৃত হয় নাই, যেমন রক্ত পিত্ত আনাহ প্রভৃতি এই সমস্ত রোগ এবং ঋষি মনিষিদিগের বিভিন্ন গবেষণা পূর্ণ অখণ্ড অভিমত অবগতি জন্য এখানে নিদান অধ্যায়ন করা হইয়া থাকে।

৪। নাড়ী বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সম্পূর্ণ নিজস্ব। ইহা স্পর্দ্ধা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, একজন সামান্য কবিরাজ নাড়ী দেখিয়া রোগীর রোগ নির্ণয় ও আসন্ন মৃত্যুর কালাকাল নিণয় করিতে পারেন, বলিয়া বহুদর্শী নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তানগণ অন্তিমে গঙ্গায় গতি করিবার জন্য বৈদ্য কবিরাজ মহাশয়কে সাদরে আহ্বান করিয়া থাকেন। সেই জন্য আমরা এখানে নাড়ী বিজ্ঞানটী বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়া থাকি।

৫। রসায়ন ও বাজীকরণের ঔষধাবলি মানব জীবন রক্ষায় একটী শ্রেষ্ঠ উপাদান। স্বাস্থ্যরক্ষা বয়ঃস্থাপন, দীর্ঘ জীবন ও চির যৌবন করিবার পক্ষে ইহাই স্বয়ঃপ্রদত্ত মহান সুধা। চ্যবনমুনি বৃদ্ধ বয়সে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পুনঃ যৌবনত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। তাই আজ চ্যবনপ্রাশ সর্ব্বজন বিদিত মহৌষধ। তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বিশিষ্ট তৈল. ঘৃত, মোদক প্রভৃতি ঔষধ সমূহ যাহা ধন্বন্তরী সদৃশ বিবিধ রোগে মন্ত্রশক্তিবৎ কার্য্যকারি এবং স্বর্ণ রোপ্যাদি ধাতু, হিরক, পান্নাদি রত্ন, মৃগনাভি হল হল প্রভৃতি জন্তব দ্রব্য বিবিধ প্রকারে শোধন মারণ জারণাদি দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করা মাত্র এদেশেই প্রচলিত আছে এবং তাহার গুণরাশী বিদেশেও প্রসারিত হইতেছে, তাই আমরা রসায়ন বাজীকরণ সম্বন্ধে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করি।

সাধারণতঃ এই সকল শিক্ষা দেওয়াই আমাদের কলেজের বিশেষত্ব। বাহুল্য ভয়ে এবং সভাপতি ও সভ্যগণের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় আমার মন্তব্য প্রবন্ধের শীঘ্রই উপসংহার করিব। উপসংহার সময় আমি বিশেষ হর্ষ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে যিনি স্বদেশ বৎসল সর্ব্বজন প্রিয়, গুণগ্রাহী, বিদ্যোৎসাহী যাহার সময় অমূল্য, নিমেষে অশেষ কার্য্য পণ্ড হইয়া থাকে, তিনি যে আমাদের ক্ষুদ্র সভায়, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির আহ্বানে আহূত হইয়া সভাপতিত্ব

গ্রহণ করিলেন, ইহাতে তাঁহাকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ দেই এবং আশা করি, তিনি দূরে থাকিলেও সুদূরস্থিত শশাঙ্ক ভাস্কর সম সর্ব্বদাই ইহার প্রতি সুদৃষ্টি রাখিবেন, তাঁহার ন্যায় সমাগ• দেশহিতরত কর্ত্তব্য পরায়ণ, দানশীল সদস্য-গণ নক্ষত্র নিকর-কর সদৃশ কৃপাদৃষ্টি করিলে, কালে এই কলেজ যে কলিকাতার কলেজের মুকুটমণি হইবে, এরূপ আশা করিতে পারি। ভগবান তাঁহাদিগকে আমাদিগকে এবং ছাত্রগণকে দীর্ঘ জীবন দান করুন, ইহাই প্রার্থনা। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

অকাট্য পণ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস।

কোন মহাসমুদ্রের তীরে—একটী গাছে এক টুনু দম্পতি বাস নির্ম্মান করিয়া বসবাস করিত। তাহাদের শাবকাদি না থাকায়, বড়ই দুঃখিত ছিল। তজ্জন্য ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিত, "হে ভগবান! আমাদের প্রতি সদয় হয়ে একটী সন্তান দাও?" এইরূপ বহু সাধ্য সাধনার পর—টুনুর ভার্য্যা একটী ডিম্ব প্রসব করিল। ডিম্বটিকে প্রাপ্ত হইয়া তাহারা মহা আনন্দিত হইল। জগৎ যেন তাহাদের নিকট আনন্দ ময় বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু হায়! বিধাতার কি অপূর্ব্ব খেলা, সেই আনন্দ কিছু দিন ভোগ করিতে না করিতে;—একদিন জোয়ারের, সময় প্রবল এক তরঙ্গঘাতে বৃক্ষটিকে আলোড়িত করিয়া ডিম্বটী সমুদ্র হরণ করিলেন। তখন তাহাদের আনন্দময় জগত ঘোর নিরানন্দে পরিণত হইল। টুনু দম্পতি ডিম্বটিকে হারাইয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িল এবং সেই গাছের উপর আছাড়ি পিছাড়ি করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাদের হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অপরাপর পক্ষীগণ তাহাদের নিকট আসিয়া কত মত বুঝাইতে লাগিল। তাহাতে তাহাদের শোকে কথঞ্চিত হ্রাস হইল। তখন এক বৃদ্ধ পক্ষী অগ্রসর হইয়া কহিল, "ভাই টুনু! বৃথা অধৈর্য্য হইও না! বৃথা শোক করিয়া কোন ফল নাই? বিপদের সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, যাহাতে সমুদ্র হইতে ডিম্ব উদ্ধার

করতে পার; তার জন্য যত্নবান হও?" টুনু কহিল, "এই সমুদ্র অকুল পাথার। সমুদ্র হইতে ডিম্ব উদ্ধার করা আমার মত সামান্য পক্ষীর কর্ম্ম নয়?"

বৃদ্ধ পক্ষী কহিল, "দেখ ভাই! যত্ন করিলে সকল কাজই সমাধা করা যায়। বিনা যত্নে কোন কাজ সিদ্ধি হয় না।"

যদি যত্ন ও উদ্যম থাকে, তবে কার্য্য সিদ্ধি হতে বেশী সময় লাগেনা। আরও কবিগণ বলিয়া থাকেন—

"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও, হেরি দীর্ঘ পথ; উদাম বিহনে কার পূরে মনোরথ।"

তুমি সমুদ্রকে অকুল পাথার জানিয়াও কখন উদ্যম হারাইও না। যদি তোমার যত্ন ও উদ্যম থাকে, তাহা হলে অবশ্যই এই অকুল সমুদ্র হতে তোমার ডিম্ব উদ্ধার করিতে অক্ষম হবে?"

টুনু কহিল, "বলুন আমি এই ক্ষুদ্র নগণ্য পক্ষী, কি উপায়ে অকুল পাথার মহা সমুদ্র হ'তে ডিম্ব উদ্ধার করতে সক্ষম হব?"

বৃদ্ধ পক্ষী কহিল, "তুমি মহা প্রবল সমুদ্রের শরণাগত হয়ে তাহাকে স্তব দ্বারায় সন্তুষ্ট ক'রে;—নিজ ডিম্ব উদ্ধারের প্রয়াস পাও? ইহা ছাড়া গত্যান্তর নাই। সমুদ্র পরম ধার্ম্মিক ও দয়ালু। তোমার ডিম্ব প্রত্যাপর্ণ করবেন।"

টুনু দম্পতি বৃদ্ধ পক্ষীর উপদেশ শুনিয়া আহ্লাদিত হইল, এবং সমুদ্রের শরণাগত হইয়া ডিম্বটী ফিরিয়া পাইবার প্রত্যাশয় অনেক স্তব স্তুতি করিতে লাগিল। সমুদ্র তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিলেন না। তখন টুনু ক্রোধে অধীর হইয়া কহিল, "মহা গর্ব্বিত সমুদ্র! আমারা অতি ক্ষুদ্র মনোকীট আমাদের কাতর প্রার্থনায় তোমার উপেক্ষা করা উচিত?"

এই কথা বলিয়া টুনু দম্পতি সমুদ্রের ধার হইতে উড়িয়া তাহাদের স্বজাতিগণের নিকট গমন করিল এবং তাহাদের নিকট হৃদয় বিদারক আত্ম কাহিনী বিবৃত করিল। সেই সঙ্গে সমুদ্রের নিদ্দয় ব্যবহারের কথাও তাহাদের গোচর করিল, টুনু পক্ষীরা তাহাদের কাহিনী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল।

এক বৃদ্ধ টুনুপক্ষী সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আমারা জগতের মাঝে অতি ক্ষুদ্র পক্ষী জাতি। আমাদের প্রতি সকলের বিশেষ অনুগ্রহ করা উচিত। আমাদের ডিম হরণ করা কি সমুদ্রের উচিত হইয়াছে?" যেমন করিয়া হউক ডিম উদ্ধার করিতেই হইবে।"

আর এক টুনু কহিল, "আমরা অতি ক্ষুদ্র। আমরা কখনই প্রবল সমুদ্র হইতে ডিম্ব উদ্ধার করতে সক্ষম হব না?"

অপর এক টুনু কহিল, "আমরা ক্ষুদ্র কি সে? যদি আমাদের মনবল ও জাতীয়তা থাকে, তাহলে মহাসমুদ্র হইতে ডিম্ব উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব।"

বৃদ্ধ টুনু কহিল, "বেশ ভাই বেশ! তুই ঠিক কথাই বলছিস্। একথা প্রতাই ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্ণয় করে, একথা ধ্রুব সত্য। অতএব আমরা একমনে এক প্রাণে ঐ মহা সমুদ্র হইতে ডিম্ব উদ্ধার করতে নিশ্চয়ই অক্ষম হব।"

আর এক টুনু কহিল, "আর কোন বিলম্বে কাজ নাই। অদ্য হতেই কার্য্য আরম্ভ করা যাক?"

বৃদ্ধ টুনু কহিল, "ভূমণ্ডলে আমাদের স্বজাতির সংখ্যা অগণিত যদি এক মনে এক প্রাণে কাজ করি, তবে কৃত কার্য্য হতে কত সময় লাগে।" এই বলিয়া জ্ঞাতি ভায়েদের সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইবার জন্য চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রেরণ করিল।

পরদিন প্রভাতে নানা দিক হইতে অগণিত টুনু পক্ষী সমুদ্রের তীরে আগমন করিতে লাগিল। দেশ দেশান্তরে যে যেমন ছিল, দ্বারা পুত্র কন্যা লইয়া সকলে আসিয়া জড় হইল। তখন কি উপায় অবলম্বন কারয়া ডিম্ব উদ্ধার করা যায় তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ;—টুনু পক্ষীর এক মহা সভা হইল। ঐ বৃদ্ধ টুনু সে সভার সভাপতি হইল।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সভাপতি সকলকে সম্বোধন করিয়া কি উদ্দেশ্যে তাহাদের আহ্বান করা হইয়াছে, তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিল এবং কহিল, "বহু পুণ্য ফলে আজ আমরা এই শুভ সম্মিলনে সকলে একত্রিত হইয়াছি। এমন শুভদিন আমাদের ভাগ্যে কখনও হয় নাই। অতএব ভাই ভগ্নিগণ! আমরা অতি ক্ষুদ্র নগণ্য পক্ষী বলিয়া মহাসমুদ্র গর্ব্ব পূর্ব্বক আমাদের ডিম হরণ করেছে। এই নগণ্য পক্ষীকুল মহাসমুদ্র হইতে ডিম উদ্ধার করে ক্ষুদ্র পক্ষীজাতির বিশেষত্ব জগতকে দেখাতে হবে। আমাদের অন্য কোন বল নাই, কেবলমাত্র মনবল ও একতার দ্বারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। এক্ষণে সকলের নিকট নিবেদন, কোন উপায় অবলম্বন করিলে আমরা ডিম উদ্ধার করতে কৃতকার্য্য হতে পারি, তাহার পন্থা সকলে মিলে নির্ণয় করুন?

একটুনু কহিল" সকলে মিলে স্তব স্তুতি করে সমুদ্রের নিকট হতে ডিম উদ্ধার করা যাক?"

অপর টুনু প্রতিবাদ করিয়া কহিল" ক্ষুদ্রের স্তব স্তুতি প্রবলে কখন কর্ণপাত করেন না।"

যদি ডিম উদ্ধারের বাসনা থাকে, তবে অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন।"

অপর টুনু কহিল, "ভাই? আমাদের বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়া। অকূল সমুদ্রের সঙ্গে বিবাদ করে কখনই কৃতকার্য্য হতে পারবো না?"

এইরূপ নানা জনে নানা উপায়ের কথা কহিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও পরামর্শ সন্তোষ জনক হইল না।

তখন এক টুনু ক্রোধে কম্পিত কলেবরে কহিল, "ভাই সব! অনেকের কথা শুনিলাম, কিন্তু আমার মনে কাহারও পরামর্শ সন্তোক জনক বোধ হইল না।

যদি প্রকৃত ডিম উদ্ধারে সকলের বাসনা থাকে, তাহলে ঐ মহা অকূল সমুদ্রকে সেচে ডিম উদ্ধার করতে হবে।

এই কথা শুনিয়া চুতুর্দ্দিক হইতে ধন্য ধন্য রব উঠিল। তখন সকলেই এক বাক্যে সমুদ্র সেচে ডিম উদ্ধার করা অনুমোদন করিল।

এমন সময় মহামতি নারদ বীণায় হরি গুণ গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। টুনু পক্ষীরা তাঁহাকে আগত দেখিয়া সকলে উঠিয়া প্রণাম করিল এবং বসিতে আসন দিল। নারদ ঋষি আসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "আমি সারা জগত ঘুরে এলাম, কোথায় তোদের একটীকেও দেখিতে পেলাম না?"

মনে মনে ভাবলেম, এরা গেল কোথায়? তাই তোদের খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে উপস্থিত হলাম? আজ তোদের একটা বিরাট সভা দেখেছি? এত বড় সভা আমি কোথাও দেখিনি। ব্যাপার কি বল দেখি?"

সভাপতি বৃদ্ধ টুনু আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা নারদের নিকট বিবৃত করিল, এবং কহিল, "ঠাকুর আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। এখন একটা সদ্যুক্তি যা হয় বলুন।

নারদ কহিলেন, "তোরা কি সমুদ্রকে এ সম্বন্ধে জানাইয়া ছিস?"

বৃদ্ধ টুনু কহিল, হা ঠাকুর! আমরা অনেক স্তব স্তুতি করেছি; কিন্তু সমুদ্র আমাদের ক্ষুদ্র জানিয়া একটী কথায়ও কর্ণপাত করেন নাই। তাই আমরা সকলে মিলিত হয়ে সমুদ্র সেচে ডিম উদ্ধার করবো মনস্থ করেছি। এখন আপনি যদি আশীর্দাবাদ করেন তবেই কৃতকার্য্য হতে পারি?"

দেবর্ষি নারদ কহিলেন, "আমি আন্তরিক আশীর্দাবাদ করছি তোরা কৃত কার্য্য হবি। সমুদ্রের চুরী করা স্বভাবটা আমি চির কাল হতে দেখে আসছি। যদি কাহার জিনিষ ভুল ক্রমে সমুদ্রের জলে পড়লো সে যদি কেন্দেও মরে যায়

কিছুতেই ফিরায়ে দিবেনা। আর ও সমুদ্রের মত লোভী জগতে দুটী নাই। এই বড় বড় জাহাজ গুলা সমুদ্র দিয়ে চলে যেতে দেসিস্ না— সমুদ্র লোভ সামলাতে না পেয়ে, জলের উপর এক প্রবল ঝড় তুলে। সেই সঙ্গে সঙ্গে এত বড় ঢেও তুলে যে জাহাজগুলা সামলাতে না পেরে; সেই ঢেউর উপর কাত হয়ে পড়ে যায়। অমনি সমুদ্র তাকে ডুবায়ে নিয়ে অতল জলধি তলে নামায়ে নেয় এবং এমন স্থানে রাখে যে, বড় বড় ডুবারু নামায়ে তাহার কোন কিনারা করা যায় না। তোরা যে সমুদ্র সেচে ডিম উদ্ধার করার জন্য উদ্যোগ করছিস তা শুনে আমি বড়ই খুসী হলাম। তাতে তোদেরও ডিম উদ্ধার হবে এবং অপরাপর যাদের জাহাজ মারা গিয়াছে, তাহারাও সে জাহাজের খোঁজ পাবে?"

একটী টুনু কহিল, "ঠাকুর আমরা পারবো কি?"

নারদ কহিলেন, "যদি তোমাদের একগ্রতা থাকে, তা হলে খুব পারবি? যাতে তোদের কেও কিছু করতে না পারে ,সে সম্বন্ধে আমি ঠিক করে দেবো। তবে একটা কথা তোদের বলি শোন। যেই তোরা সমুদ্র সেচতে আরম্ভ করবি,—অমনি দেখতে পাবি, কত দেবতা কত ভঙ্গিতে তোদের কাছে এসে উপস্থিত হবে এবং তোদের নিরস্থ করবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করবে। কেও এসে তোদের মিঠে কথা বলবে, কেও এসে তোদের মত ক্ষুদ্র পক্ষীর কর্ম্ম নয় বলবে; কেও এসে কত হিত উপদেশ দেবে, কেও এসে তোদের মারতে যাবে; কেও বা বিশ্ব সংহারক মূর্ত্তিতে এসে কত বিভীষিকা দেখাবে। এই রূপ এক এক জন এক এক মূর্ত্তিতে আসবে! তোরা ত দেবতাদের চিনিস্ নে! আমি সর্ব্বদা দেব লোকে থেকে তাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি খুব ভাল রকম জানি। তোরা তাদের কোন কথায় ভুলবি না এবং কোন চোক রাঙ্গানী তে ভয় পাবি না। আপন মনে সমুদ্র সেচতে থাকবি। তাদের চোক রাঙ্গানী কেবল আড়ম্বর মাত্র। কোন কিছু তোদের করতে পারবে না। ডিম উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত এক তিলও বিরাম দিবি না। যা এখন সকলে মিলে এক মনে এক প্রাণ হয়ে সেচতে লেগে যা?"

টুনুরা কহিল, 'ঠাকুর! আপনার কথা মতই কাজ করবো। আমরা কোন ভয়ও পাব না; কারু কথাও শুনবো না, ডিম্ব উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত সেচতেই থাকবো? জয় গুরু নারদের জয়।"

নারদ কহিলেন, "যা এখন জয় শ্রীহরি বলে আরম্ভ কর? আমি এখন

হরিনাম করতে করতে গমন কার। এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ অন্তর্হিত হইলেন।

টুনু পক্ষীরা জয় গুরু নারদের জয়, "বলিয়া দলে দলে সমুদ্র সেচতে আরম্ভ করিল। সেই সমুদ্র সেচা অতি অদ্ভুত। ছো মেরে এক ঠোঁট করে জল আনে আর বনের উপর ঢালে। এইরূপ অবিশ্রান্ত ভাবে সেচিতে লাগিল। তিলার্দ্ধ সময়ও বিরাম নাই। মাত্র খাওয়ার সময় টুকু বাদ পড়ে।

এইরূপ কিছুদিন গত হইতে না হইতে দলে দলে টুনু পক্ষীরা কাল কবলে পতিত হইতে লাগিল। অন্যান্য টুনু পক্ষীরা সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একমনে জল সেচিতে লাগিল। টুনু পক্ষীর সংখ্যা হ্রাস হইতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন, "এই ক্ষুদ্র পক্ষীর দল অসাধ্য সাধন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছে। ইহারা কোটী কল্পেও সমুদ্র সেচিতে সক্ষম হইবে না। এইরূপ ভাবে সমুদ্র সেচিলে অচিরাৎ ইহাদের বংশ লোপ হইবে। অতএব ইহাদের নিরস্থ করিতে হইল।"

এই বলিয়া বরুণকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

বরুণ আসিয়া কহিলেন, "ওরে! তোদের মত ক্ষুদ্রপক্ষীর এই অকুল সমুদ্র সেচা কর্ম্ম নয়। যদি তোরা মঙ্গল চাস এবং তোদের বংশ রক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তবে এখনি নিরস্থ হ?"

টুনু পক্ষীরা কহিল, "বলে কি মহাশয়! আমাদের কাজ নয়ত কার কাজ? যাকে অগস্ত মুনি এক গণ্ডুষে পান করেছিল, সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সমুদ্রকে আমরা অর্ব্বুদ বিন্দ সংখ্যক টুনুতে সেচতে পারবো না—নিশ্চয়ই পার্ব্বো?"

বরুণ তাহাদের হিত কথার দ্বারা বহু উপদেশ দিলেন এবং বারম্বার নিরস্থ হইতে কহিলেন; কিন্তু টুনুদের অকাট্য পণ। তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিল না, বরং তেজের সহিত সমুদ্র সেচিতে লাগিল। অবশেষে বরুণ তাহাদের নিকট পরাজিত হইয়া দেবরাজের সভায় গমন করিয়া সকল বিবরণ কহিলেন। দেবরাজ তাহা শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। ক্ষণকাল চিন্তার পর যমকে নিরস্থ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। যম ভীষণ কাল দণ্ড হস্তে লইয়া তাহাদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "ওরে বেটা টুনুর দল? সমুদ্র সেচা তোদের কাজ? এখনও থাম বলছি। নচেৎ এই ভীষণ যম দণ্ড দেখছিস এই দণ্ডাঘাতে তোদের চুর্ণ বিচুর্ণ করবো?"

টুনুরা কহিল, "আমরা ডিম উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত এক তিলার্দ্ধও থামবো না। আমরা তোমার ঐ যম দণ্ডের ভয় একটুও করি না। কারণ—

জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু শাস্ত্রের লিখন।

আমরা যে দিন ভূমণ্ডলে জন্মিয়াছি, সেই দিনই মরিতে হবে, এই ধারণা করে রেখেছি। মহাশয় যদি ইচ্ছা করেন, এখনি আমাদের চুর্ণ বিচূর্ণ করতে পারেন? যাবত দেহে প্রাণ থাকবে তাবত সেচা এ মুহূর্ত্তও বন্ধ করবো না।"

যম মনে মনে কহিলেন, "না। বেটাদের সঙ্গে পারা গেল না। যদি যম দণ্ড ঘুরাই তাহা হলে এদের বংশ লোপ হয়। দেবরাজ কহিয়াছেন, ভয় দেখাইয়া এদের নিরস্থ করিতে;—বংশ লোপ করিতে বলেন নাই। এদের এই অকাট্যপনের কাছে আমার যম দণ্ড বৃথা হল।" এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। এইরূপ একে একে বহু দেবতা আসিয়া; তাহাদের নিরস্থ করিবার জন্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। কিন্তু সকলেই অকৃত কার্য্য হইয়া ফিরিয়া গেলেন। অবশেষে দেবরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের নিরস্থ করিবার জন্য প্রিয় বচন দ্বারা বহু প্রকার বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু টুনুদের অকাট্য ধনুকভাঙ্গা পণের নিকট তাঁহাকেও পরাজিত হইতে হইল। তখন টুনুর বংশ রক্ষার্থে সকল দেবতা মিলিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "এই একটা ক্ষুদ্র পক্ষীর পণ তোমরা ভঙ্গ করতে পারলে না? দেখ! আমি এখনি যেয়ে নিরস্থ করে আসছি?"

ভগবতী কহিলেন, "তুমি সহজ মনে করেছ—তা নয়। তোমার সম্বল ত ঐ একটা ভোঁতা ত্রিশূল, নিয়ে তাদের কাছে গেলে আরও ভোঁতা হয়ে যাবে। যাও একবার সেখানে মজা দেখে এস?"

মহাদেব কহিলেন, "কি আমার বিশ্ব সংহারক ত্রিশূল ভোতা হ'ল? দেখ! আমি এখনি তাদের নিরস্থ করে আস্‌ছি। ভগবতী শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। মহাদেব দেবগণকে কহিলেন, "আমি যাবত ফিরে না আসি, তাবত তোমরা এই স্থানে থাক? তখন সেই বিশ্ব সংহারক ত্রিশূল হাতে লইয়া, বৃষের উপর আরোহণ করিয়া বম্‌ বম্‌ বোম্‌ করিতে করিতে গমন করিলেন। দুর হইতে ত্রিশূল হস্তে মহাদেবকে আসিতে দেখিয়া একটুনু কহিল, "ওরে দেখ দেখ ভাই। একটা লোক কত বড় এক ত্রিশূল নিয়ে ষাঁড়ের উপর চড়ে এই দিকে আসছে।"

অপর টুনু কহিল, "ওরকম কত জনের ভেলকীবাজী নিয়ে আসতে দেখলাম, তার ইয়ত্তা নাই। ও দিকে চোক দিয়ে কাজ নেই আমাদের বড় কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে?"

মহাদেব তাহাদের নিকট আসিয়া জগদ্‌ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ওরে টুনুর দল থাম্‌ বল্‌ছি! নইলে এই প্রলয়ঙ্করী ত্রিশূলের দ্বারায় তোদের এখনি ভস্মিভূত করবো?"

টুনুরা কহিল, "কেন থাম্‌বো মহাশয়! আমরা ত অন্যায় কার্য্য কর্‌ছি না যে থামবো? ন্যায় সঙ্গতই কার্য্যই করছি।"

মহাদেব কহিলেন, "কি তোরা অন্যায় কার্য্যই করছিস না?"

টুনুরা কহিল, "কখনই না? আমাদের ডিম সমুদ্র হরণ করেছে; আমরা সেই ডিম উদ্ধারের জন্য সমুদ্র সেচছি? এতে কি অন্যায় কার্য্য হলো মহাশয়? যদি সমুদ্র আমাদের ডিম ফিরায়ে দেয় তবে এখনি নিরস্থ হই।"

মহাদেব কহিলেন. "জানিস্‌ না তোরা? সমুদ্রের জলে যা পড়ে সবই সমুদ্রের হয়ে যায়। সে ডিম এখন সমুদ্রের হয়ে গিয়েছে?"

টুনুরা ব্যঙ্গভাবে কহিল, "আমরা ভগবানের নিকট কত আরাধনা করে, একটা ডিম পেয়েছি, সেই ডিম এই সমুদ্রে পড়লো অমনি তার হলো? মহাশয় খুব বিবেচক বুদ্ধিমান দেখ্‌ছি?

মহাদেব দাঁত কিড়ি মিড়ি করিয়া চক্ষু পাকাইয়া কহিলেন, "জানিস্‌। আমি কে? এত বড় আস্পর্দ্ধা, এত বড় যোগ্যতা, আমাকে ঠাট্টা? দেখ আমি তোদের এখনি ভস্ম কর্‌ছি?"

টুনুরা কহিল, "দেখুন মহাশয় বীর যে সে কখন মুখে আস্ফালানী করে না; যদি আপনার ক্ষমতা থাকে, তবে আপনি কার্য্যে দেখান। আমরা মহাশয়ের চোক রাঙ্গানিতে ভয় করি না?

মহাদেব কহিলেন, "কি, আবার আস্পর্দ্ধার কথা? এই দেখ তবে তোদের কি করি। এই বলিয়া টুনুদের ভস্ম করিবার জন্য তীর বেগে ত্রিশূল ঘুরাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া টুনুদের আরও আনন্দ বাড়িয়া গেল। তাহারা তখন জোরে জোরে সমুদ্র সেচিতে লাগিল। এক টুনু মহাদেবের ত্রিশূলে ঠোক্কর মারিয়া কহিল, "কই মহাশয়। ভস্ম হওয়া দুরে থাক, আমার একটা পাখাও পুড়ল না যে! ত্রিশূল ঘুরাইয়া কাজ নাই।"

মহাদেব টুনুর কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং মনে মনে কহিলেন, "একি ব্যাপার। আমার এই প্রলয়ঙ্করী ত্রিশূল এই ক্ষুদ্র নগণ্য পক্ষীদের নিকট ব্যর্থ হ'ল? এর কারণ কি। এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে কৈলাসে গমন করিলেন।

ভগবতী মহাদেবকে মুখ ভার করিয়া আসিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "কি প্রাণ নাথ! মুখ বিমর্ষ করে ফিরে এলে যে?

মহাদেব কহিলেন, "বেটাদের সঙ্গে পারা ত গেলই না, উপরন্তু দুই চারটা মিষ্ট ভৎর্সনা শুনে আসতে হল। দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা বল্‌তে পার বেটাদের গুরু কে?"

দেবগণ কহিলেন, "তাত আমরা বলতে পরি না প্রভু!"

ভগবতী কহিলেন, "উহাদের গুরু কে তা আমি জানি?"

দেবগণ কহিলেন, "মা উহাদের গুরুর কথা বলে আমাদের চরিতার্থ করুণ?"

ভগবতি কহিলেন, "নির নাস্থি·রদ যস্য—সেই নারদ উহাদের গুরু। সেই জন্য বলিয়া ছিলাম, মহাদেবের ভোতা ত্রিশূল। যদি উহাদের মনে রদ থাকিত, তবে মহাদেবের ত্রিশূল দেখিয়া ভয় পাইত। রদ নাই বলিয়া দেবাদীদেবের বিশ্ব প্রলয়ঙ্করী ত্রিশূল উহাদের কিছুই করিতে পারে নাই।

মহাদেব কহিলেন, "অ্যা। নারদ উহাদের গুরু! একথা তুমি আগে বল নাই কেন? তাহা হলে আমার এই অপদস্থটা হতে হত না?" দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে দেবগণ। পার্ব্বতীর মুখে গুরুর কথা শুনিলে ত। অতএব উহাদের নিরস্ত করা আমাদের সাধ্যাতীত। এক শ্রীহরি ব্যাতীত আর কেহই নিরস্ত করতে সক্ষম হবেন না। কারণ শ্রীহরির প্রিয় ভক্ত নারদ। সেই নারদের শিষ্য টুনুর দল। আমরা যত যা করি না কেন, শ্রীহরি তাঁর প্রিয় ভক্তের শিষ্যগণকে রক্ষা করবেনই করবেন। কিছুতেই আমরা উহাদের পরাভুত করে নিরস্ত করতে সক্ষম হব না? চল এখন প্রজাপতিকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীহরির নিকট গমন করি?"

তখন সকল দেবগণ প্রজাপতিকে সঙ্গে লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। শ্রীহরি সর্ব্ব দেবগণের আগমন দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বসিতে আসন প্রদান করিলেন। দেবগণ আসনে উপবেশন করিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনা শ্রীহরির গোচর করিলেন। তৎশ্রবণে শ্রীহরি কহিলেন, "আমি সে বিষয় অবগত আছি। আমি টুনু পক্ষীদের একগ্রতা ও একতা দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। এখন চিন্তা করিতেছি, কি উপায় এই টুনুদের নিরস্ত করি। নারদ তাহাদের যে ভাবে মন্ত্র দিয়া আসিয়াছে; তাহাতে তাহারা ডিম্ব উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই নিরস্ত হইবে না। অতএব আমি যাইয়া তাহাদের ডিম্ব

উদ্ধার করিয়া দিয়া নিরস্ত করিয়া আসিব। তোমরা এখন নিজ নিজ বাসে গমন কর?" দেবগণ শ্রীহরির কথায় আহ্লাদিত হইয়া স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন।

শ্রীহরি টুনু পক্ষীদের নিকট গমন করিয়া অতি মধুর বচনে কহিলেন, "ওরে টুনু পক্ষীরা, তোরা ক্ষান্ত হ?" টুনুরা তখন ডিম্বের জন্য উন্মত্ত পাগলের প্রায় হইয়া গিয়াছে; শ্রীহরির কথায় কর্ণ পাতও করিল না—সমভাবে সমুদ্র সেচিতে লাগিল।

পুনঃরায় শ্রীহরি কহিলেন, "ওরে তোরা ক্ষান্ত হ?"

এক টুনু কহিল, "আপনার মত অনেক লোক এসে আমাদের ক্ষান্ত হতে বলে, কেও ভয় দেখায়, কেও মারিতে আসে, কিন্তু আমাদের ডিমের কথা কেও বলে না। অতএব মহাশয়! যতদিন আমাদের ডিম উদ্ধার করতে না পারি, ততদিন আমরা তিলার্দ্ধও ক্ষান্ত হব না?"

শ্রীহরি কহিলেন, "তোরা ক্ষান্ত হ? আমি তার উপায় করে দিব?"

টুনুরা কহিল, "যান মহাশয় যান। আপনার আর উপায় করতে হবে না? আমরা সাগর সেচেই ডিম উদ্ধার করবো?"

শ্রীহরি মনে মনে কহিলেন, "ইহাদের যেরূপ একাগ্রতা এরা ডিম উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ক্ষান্ত হবে না। এই মনে করিয়া টুনুদের কহিলেন, "ওরে তোরা ক্ষান্ত হ! আমি এখনি তোদের ডিম উদ্ধার করে দিচ্ছি?"

যাবত আমাদের ডিম হস্তগত না হবে, তাবত আমরা কিছুতেই ক্ষান্ত হব না।"

শ্রীহরি কহিলেন, "তোরা ক্ষান্ত হলেই ডিম এনে দিচ্ছি?"

টুনুরা কহিল, "আপনি যেখানে ডিম এনে দিচ্ছি বারংবার বলছেন, অতি অল্প সময় কাল আমরা বিশ্রাম করিতেছি।"

শ্রীহরি তাহাই কর, বলিলেন। টুনুরা ক্ষান্ত হইল। অমনি শ্রীহরি সাগরকে আহ্বান করিলেন। সাগর শ্রীহরির আহ্বানে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি একটা সুবর্ণ থালে ডিম্বটী রাখিয়া তাহা হাতে লইয়া, শ্রীহরির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ডিম্বটীকে তাঁহাকে দিলেন। টুনুরা ডিম্বটীকে দেখিয়া মহানন্দে জয় গুরু নারদর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং আনন্দে ঢলাঢলি করিতে লাগিল। শ্রীহরি ডিম্বটীকে হাতে লইয়া কহিলেন, "এই তোদের সেই ডিম্ব ধর এখন গ্রহণ কর?

টুনুরা কহিল, "প্রভু! আমরা ইহা গ্রহণ করিলাম। কিন্তু একটী কথা আমাদের গুরু নারদের মুখে শুনিয়াছি, সাগরের হরণ করা স্বভাবটা বড়ই বেশী। যাহাতে পুনরায় আমাদের ডিম হরণ না করে, তার একটা উপায় করে দিন?"

এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। নারদকে দেখিয়া, শ্রীহরি কহিলেন, "ভাল পাগলদের ক্ষ্যাপায়েছ?"

নারদ কহিলেন, "কি করি বলুন? পাগল না হলে ত আপনার সাড়া পাওয়া যায় না? আজ ইহারা ডিমের জন্য পাগল হয়েছে বলে, আপনার টনুক নড়েছে। তাইতে এরা ডিম উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে। এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক এদের সহিত সাগরের একটা পাকাপাকী সন্ধি করে দেন? ভবিষ্যতে সাগর যেন এদের ডিম আর হরণ না করে। কারণ সাগরের হরণ করা স্বভাব বড়ই প্রবল?"

সাগর নারদকে কহিলেন, "প্রভো। কেন আমাকে অকারণ দোষ দেন। জগতবাসী সকলেই জানে, আমার জলে যাহা পড়ে সমস্তই আমি কুলে তুলে দিয়া থাকি?"

নারদ কহিলেন, "তা আর বলতে! তোমার জলে কিছু পড়লে যে, জলে থাকে না, তা আমি বিলক্ষণ জানি? কি রকম জিনিষ ডেঙ্গার তুলে দেও শুনবে? এই ধর এটো কলাপাত, কলার মোনা, মড়ার পাটী, মড়া পুড়ান বাঁশ, নারকেলের ছোবড়া, পোড়া কাঠ ইত্যাদি কত নাম করবো? অর্থাৎ যাহা লোকে ছুতে ঘেন্না করে এবং জগতের কোন কাজে লাগে না, এইরূপ জিনিষ কুলে তুলে দেও না? বলি ও সাগর! তোমার গর্ভে যে অনন্ত রত্ন রয়েছে, তার কোনটা তুলে দিয়েছ বল ত?, ডুবা জাহাজগুলো যদি কুলে তুলে দেও, তবেই বলি তোমার হরণ করা স্বভাব নয়?"

শ্রীহরি নারদকে বাধা দিয়া কহিলেন, "থামো থামো নারদ! বৃথা কোন্দলে কাজ নাই। তোমার কার্য্য ত সমাধা হয়েছে? আমিই তোমার শিষ্যগণকে অহরহ রক্ষা করবো! জগতে কেহ অনিষ্ট সাধন করতে সক্ষম হবে না?"

নারদ কহিলেন, "প্রভো! যদি এতই অনুগ্রহ হ'ল, তবে এই মৃত টুনু গুলির পুনঃ জীবিত করে দেন?"

শ্রীহরি দেবর্ষি নারদের কথা শুনিয়া, দেবরাজকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্রে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীহরি কহিলেন, "দেবরাজ! অমৃত বর্ষণ দ্বারা এই মৃত টুনু গুলির এখনি জীবিত করে দেও?

শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে দেবরাজ তৎক্ষণাৎ আবর্ত্ত নামক মেঘকে অমৃত বর্ষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র আবর্ত্ত অমৃত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মৃত টুনুর দেহে অমৃত লাগিবা মাত্র দলে দলে জয় গুরু নারদ বলিয়া উঠিল এবং মহানন্দে লম্ফ ঝম্ফ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল। শ্রীহরি তখন টুনুর ডিম্বটীকে বাসায় স্থাপন করিয়া কহিলেন, "আজ আমি তোদের একাগ্রতা দেখিয়া যতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি, এমন আর কখনও হই নাই? আমি তোদের আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোদের যেন এই একাগ্রতা চিরকাল বর্ত্তমান থাকে? এখন তোমরা পুত্রাদি লইয়া স্ব স্ব ভবনে গমন কর। আমিও নিজ ধামে গমন করি।" টুনুরা শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ ভবনে গমন করিল, শ্রীহরিও অন্তর্ধান হইলেন।

ক্রমিক নং
শ্রেণী নং

শেষ-স্মৃতি।

লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,

(১)

মোরা সবে কুলাঙ্গার
জ্ঞানহীন দুরাচার—
রাখিতে নারিনু তাঁর সুবিমল খ্যাতি।
অকলঙ্ক পূর্ণ শশী—
কলঙ্কে করিনু মসী—
আঁধারে ডুবিয়ে গেল স্বরগের জ্যোতি॥

(২)

নাম তাঁর "শরচ্চন্দ্র"
যেন সে শরৎ-চন্দ্র
শোভিত উজল করি শরৎ গগন।

তাহাতে কলঙ্ক রেখা
ছিলনা মোটেই লেখা
ছিল মাত্র স্নিগ্ধ শুভ্র চাঁদের কিরণ ॥
সে মুখের সেই বাণী
শুনি কি অকুল প্রাণী।

(৩)

শ্রীমুখের বাণী তার
শুন্‌লে কেউ একবার
বিকাইত হৃদিটুকু সে রাজীব পায়।
তার সেই সরলতা
জানিত কি মাদকতা
মাতাল করিয়া দিত সবার হৃদয় ॥

(৪)

হৃদয়ের সমাচার
জানিতাম আমি তার
সরল উদার প্রাণ, দীন বিমোহন।
বলেছে সে বারে বারে
স্বজন হিতের তরে
জল করি দেব এই মাটীর গড়ন ॥

(৫)

পুরাইতে সাধ তার
না মিলিল অবসর
অকালে চলিয়া গেল স্বরগ নিবাস।
কিন্তু তার ভালবাসা
মোর বুকে বাঁধি বাসা
রয়েছে জাগিয়া সদা পুরাইতে আশ ॥

(৬)

শেষ স্মৃতি তার যাহা
লুপ্তপ্রায় আজ তাহা
দেখিয়ে হৃদয় মোর ফেঁটে যেতে চায়।

ভাণ্ডার উজাড় করি
যদি পাই স্মৃতি ফিরি
করিব তাহাই আমি কিবা ক্ষতি তার ॥

(৭)

তার সে কলঙ্ক রেখা
যাতে নাহি যায় দেখা
তার তরে পাতি দিব বক্ষ আপনার।
বুকের শোণিত দিয়ে
সে কলঙ্ক দেব ধুয়ে
তাহে যদি ফিরে পাই পুণ্য স্মৃতিটুকু তার ॥

(৮)

সে ভাল বাসিত মোরে
তাই মোর ফিরে ফিরে
মনে পড়ে তার সেই শেষ স্মৃতিটুকু।
সেই টুকু মোর সব
তা বিনে যে আমি শব
জীর্ণ দীর্ণ শান্তিহীন দুঃখ ভরা বুক—
ভিক্ষা দেহ মোরে তার শেষ স্মৃতিটুকু ॥

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ছোট পাখী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কমলকান্ত বসু।

হড়্ হড়্ করিয়া কেদারা টানিয়া বারাণ্ডায় বসিলাম। সারা দুপুর হুড়াহুড়ি করিয়া গায়ে বড় ব্যথা হইয়াছে—বড় ক্লান্তি বোধ হইতেছে। বারাণ্ডার চারিদিকে ফাঁকা, চতুর্দ্দিকে আম্র কাননে ঘেরা। বসন্ত কাল—দক্ষিণ মলয় অবাধে বহিয়া যাওয়ায়, ক্লান্তি কিয়ৎ পরিমাণে তিরোহিত হইল,—কিন্তু গায়ের বেদনা সেই প্রকারই রহিল। সন্ধ্যার আর বেশী বিলম্ব নাই,—পশ্চিম দিকে

আরক্তিম আকাশে দিননাথ ঈষৎ উজ্জ্বল আভায় বিদ্যমান—পক্ষিরা নিজ নিজ কুলায় প্রত্যাগমন করিতেছে। এই সব প্রকৃতির ললামভূত সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে ক্লান্তির উপশম হইল। এমন সময়ে কোথা হইতে শুনিতে পাইলাম, কে, মধুরকণ্ঠে গাহিতেছে.—

"আনাগোনা এই কাজ
সারাটী দুপুর আজ
ব্যাকুলিত মনো মাঝ
বিরাজ ঋতুর রাজ" .....

উন্মত্তপ্রায় হইয়া ছুটিলাম,—কাননে—বাগানে—কোথায় কে গান গাহিল, ধরিতে পারিলাম না—গানের শেষটুকু শুনিতে পাইলাম না। ছুটিয়া ছুটিয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল—পুনরায় ফিরিলাম।

দুঃখে আনমনে বারাণ্ডায় কেদারার উপরে আবার বসিলাম। ক্ষণপরে এক প্রবল ঝটিকা দেখা দিল—ধূলিতে বারাণ্ডা ভরিয়া গেল—ভীমগর্জ্জনে বাতাসের বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। এই সময় বারাণ্ডায় বসা দুষ্কর হইয়া উঠিল, কি করি, বারাণ্ডা ছাড়িয়া ঘরে প্রবেশ করিতে, মন বার বার আস্ফালন করিতে লাগিল।

কেদারা পরিত্যাগ করিয়া উঠিতেছি, এমন সময় আবার শুনিতে পাইলাম, কে বাউলের সুরে গাহিছে.—

"আনাগোনা এই কাজ
করিয়া করিয়া আজ
ব্যাকুলিত মনোমাঝ,
বিরাজ বসন্ত রাজ।
পেওনাক মনে লাজ,
হানিওনা হৃদে বাজ,
স্মরিও পরাণ রাজ,
পাবে শান্তি বুক মাঝ॥"

এই সুস্পষ্ট স্বর শুনিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। সাগ্রহে এদিক ওদিক করিতেছি, এমন সময়ে পিছুন ফিরে দেখিলাম, এক জনকে—কাকে? পাঠকগণ! জান কি? সে আমার—আমারই প্রণয়ের ভাল বাসার, হৃদয়ের—ছোট পাখী।

সমর্পণ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস।

(১)

লহ লহ মোর সকলি লহ গো তুমি।
আমার বলিতে কিছু যেন আর—
রহেনা, সঁপিনু সকলি তোমার—
ও দুটী চরণ চুমি॥

(২)

লহ স্নেহ মোর, লহ লহ আশা,
কামনা, বাসনা, প্রীতি ভালবাসা,
লহ অনুরাগ, লাজ, ভয়, রাগ,
নিরাশা বিরাগ ঘোর।
অধরের হাসি, নয়নের জল,
তোমারি লাগিয়া ঝরিবে কেবল,
তব তনু ভাতি, কিবা দিবা রাতি,
ফুটিবে মরমে মোর॥

(৩)

ছুটিত একদা ধরণী বিপুল,
মরু মাঝে যথা হরিণী আকুল,
আমি বন্ধু হীন, ভাসি নিশি দিন,
দুখ সিন্ধু মাঝে।
ফুটিত না ফুল বনে বনে তার,
ঝরিত না বুকে নিঝরের ধার,
ঘেরিয়া তিমির, গভীর গভীর,
দিবস রজনী রাজে॥

(৪)

তোমারে যেদিন পাইলাম,

ও চারু চরণে, জীবনে মরণে,
যাচিয়া আমারে সঁপিলাম।
সে দিন আমার, হরষ পাথার,
নূতন জগত দেখিলাম॥

(৫)

সে জগতে তুমি, রবি কেন্দ্র ভূমি,
তোমারে ঘেরিয়া ঘেরিয়া!
সুর লয় মিত, তুলিয়ে সঙ্গীত,
মরি কিবা দৃশ্য, এ মানস বিশ্ব,
ছুটিছে নাচিয়া নাচিয়া,
ঘিরি শতদল, ভ্রমরের দল,
গুঞ্জরে যথা উড়িয়া॥

(৬)

কিরণ পরশে, আঁখি হতে খসে,
নিরাশা তিমির রাশি।
ফোটে ফুল দল, ছোটে পরিমল,
প্রাণের হরষ হাসি॥

(৭)

এ নূতন ভবে, সুখ দুঃখ সবে,
ছুটিছে তোমাতে মিশিতে।
কি বাঁধন দিয়া, বেঁধেছ এ হিয়া,
তোময় হেরি মহীতে॥

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বানরের চক্ষু অন্ধ মনুষ্যের দৃষ্টিশক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।—আমেরিকার একজন বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক ডাক্তার মেক্স থোরেস্ক্ রোমের আন্তর্জাতিক, অস্ত্রচিকিৎসকগণের মহাসভায় সভাপতিত্ব করিতে আসেন। তথায় তিনি প্রচার করিয়াছেন যে, শীঘ্রই "অন্ধ মানুষের চক্ষুপুটে বানরের চক্ষু জোড় কলম বাঁধিয়া

তাহার দ্বারা ঐ লোকের দৃষ্টিশক্তি পূর্ণ স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন;" ইহা ঘোষণা করিতে পারিবেন, এইরূপ আশা করেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা এইরূপ মৎস্যের ও ইন্দুরের মধ্যে সম্ভব করিতে পারিয়াছেন এবং ঐ কৃতকার্য্যতার উপর নির্ভর করিয়া তিনি আশা করেন যে, মনুষ্য ও বানরের মধ্যে ঐরূপ করা নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে। এ বিষয় লইয়া বহু পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে।

কলাগাছের রসের উপকারিতা।—পত্রান্তরে প্রকাশ, কোন ভদ্রলোকের কন্যা একটী সন্তান প্রসব করিলে, দাই এসে নাড়ি কেটে ছেলেটীর নাভিদেশটী বেশ করে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া যায়। ২।৩ ঘণ্টা পরে ব্যাণ্ডেজ খুলেই হোক বা অন্য যেরূপেই হোক, ছেলেটীর নাভি হইতে রক্ত পড়িতে আরম্ভ হয়। বাড়ী শুদ্ধ সকলেই বিব্রত হয়ে ডাক্তার আনিতে ছুটেন। এর মধ্যে আর একটী ভদ্রলোক ব্যাপার কি শুনিয়া একটী কলার ডগা নিয়া তাহা থেঁতো করিয়া ৮।১০ ফোঁটা রস নাইয়ের উপর ঢেলে দেন। তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, আর সকলেই স্বস্তি বোধ করেন। তারপর আর ডাক্তারকে কিছুই করিতে হয় নাই। কলাগাছের এত অদ্ভুত ক্ষমতা রহিয়াছে। এই নির্য্যাস কোনরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে যথেষ্ট উপকার হইবে।

উপবাসের উপকারীতার প্রমাণ।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কোন কয়লার খনির ভিতরে ধস পড়িয়া পাঁচজন খনির লোক মাটির নীচে একটা স্থানে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। নয়দিন অনবরত চেষ্টার পর তাহাদিগকে উদ্ধার করা হয়। তাহাদিগের এই নয়দিন বিশেষ কিছুই আহারের ছিল না। অর্দ্ধ টুকরা রুটি এবং কিয়ৎ পরিমাণ অপরিষ্কৃত জল সেবন করিয়াই তাহারা এই কয়দিন বাঁচিয়াছিল। ইতিমধ্যে তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করার জন্য একদল লোক মাটি খুঁড়িয়া তাহাদিগকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এই সকল লোক যদিও এই কয়দিন আহার পায় নাই; কিন্তু তাহাদের পরিশ্রম না থাকায় শরীর ক্ষয় কম হইয়াছিল, এবং তাহাদিগের শরীরে যে শক্তি ও উদ্যম সঞ্চিত ছিল, তাহাই তাহারা ব্যয় করিয়াছে। উপবাসের অধিকাংশ সুফল নির্ভর করে মনের অবস্থার উপর। অনাহারের জন্য যে এক বিভীষিকা আমরা পুরুষ পরম্পরায় মনে ধারণ করিয়াছি, ইহা যে ভুল এবং ইহা অনেক বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে, যদি একবার বুঝিতে পারা যায়, তবে আর উপবাসের জন্য মানসিক কষ্ট থাকে না। যখন এই সকল লোকের আবদ্ধ অবস্থা হইতে

উদ্ধার করা হইল, তখন তাহাদিগকে স্বাস্থ্যবান ও ক্লান্তিহীন দেখাইতেছিল বলিয়া সকলেই আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে যে, উপবাসের দরুণ মানুষ দুর্ব্বল হয় ও নানারূপ কষ্ট পায়, সেই জন্য এই সকল লোককে বহন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া তাহারা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া হাঁটিয়া স্বস্ব গৃহে চলিয়া গেল।

উপবাসের দ্বারা যে উপকার হইয়া থাকে, সম্প্রতি আমেরিকায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রীর প্রতি তাহার পরীক্ষা হইয়াছিল। একপক্ষকাল উপবাস করিয়া তাহাদিগের গড়ে প্রায় ১৫ সের ওজনে কমিয়া গিয়াছিল। আহার আরম্ভের ৭ দিন পরে তাহাদিগের ওজন পূর্ব্বের ন্যায় হইয়াছিল। যে কয়দিন তাহারা উপবাস করিয়াছিল, সে কয়দিন কেবল জল পান করিয়া তাহারা থাকিত এবং সকলেই আপন নির্দ্দিষ্ট কাজ কর্ম্ম করিয়াছে। এই পরীক্ষায় বেশ ভাল করিয়া বুঝা গেল যে, যাহারা শরীর শুধরাইতে ও অজীর্ণ রোগ দূর করিতে চাহে, তাহাদিগের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায়। দরিদ্র বাঙ্গালী দিন দিন রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে এবং ব্যয়সাধ্য ঔষধ সেবন করিয়া ও তদুপরি ক্রমবর্দ্ধনশীল চিকিৎসকের দর্শনী প্রদান করিয়া আরও নিঃস্ব হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও তাহারা স্বাস্থ্যবান হইতেছে না। কবে তাহারা উপবাসের মর্ম্ম বুঝিবে? কত পুরাতন কাল হইতে আমাদিগের দেশে উপবাস করিবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, ভোগের দেশ পাশ্চাত্যে পর্য্যন্ত উপবাস প্রচলন হইতে চলিল, তথাকার চিকিৎসকগণ ইহার উপকারীতা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু এদেশবাসীর সেদিকে দৃষ্টিই নাই।

যক্ষ্মা চিকিৎসার নূতন উপায়।

সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনিভা সহরে ডাঃ স্পালিঙ্গারের এক পরীক্ষাগার আছে। তিনি নিজে যক্ষ্মারোগের ভীষণ আক্রমণ ও মানুষের নিরাশা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন এই রোগ দূর করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং এই জন্যই দিনরাত্রি ধরিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। অবশেষে এক প্রকার টিকা তৈয়ার করেন এবং তাহার শক্তি পরীক্ষা কতকগুলি পশুর উপর করিয়াছিলেন।

একদিন এক আশ্চার্য্য ঘটনা দেখিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহারা প্রদত্ত টিকায় একটা যক্ষ্মারোগগ্রস্ত জন্তু আরাম হইয়াছে এবং তাহার কিছুদিন পরে ঐ জন্তুর রোগের সকল চিহ্ন দূর হইয়া গেল। ইহার পর হইতেই

মানুষের উপর এইরূপ চিকিৎসার পরীক্ষা চলিল, তাহারাও আরোগ্য হইল, তিনি যত লোককে তাহার মতে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহার শতকরা আশী জন রোগী আরোগ্য হইয়া গেল। তিনি বর্ত্তমান সময়ের এমন সকল রোগী চিকিৎসার জন্য লইতেছেন, যাহাদিগকে চিকিৎসকগণ আরোগ্য হইবে না, বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। ডাঃ স্পালিঙ্গার দরিদ্র হইয়াছেন, তাঁহার সকল ধন সম্পত্তি এই চিকিৎসা আবিষ্কারের জন্য ব্যয় করিয়াছেন এবং রোগীকে আরোগ্য করিতে তিনি অর্থ লন না, এবং কেবল পৃথিবীকে এই রোগ হইতে মুক্ত করাই তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায়। আশা করা যায়, তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইবে।

মস্তিষ্কে আঘাত।

মানুষের কপালের পিছনেই মস্তিষ্কের যে অংশ থাকে, তথায়ই বুদ্ধির প্রধান কেন্দ্র। এই স্থানের মস্তিষ্ক অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম ও জটিল। মানুষের মস্তিষ্কের উৎকৃষ্টতা, রক্ত সঞ্চালন, পুষ্টি এবং শরীরের যন্ত্র সকলের অবস্থার উপরই মানুষের মানসিক শক্তি নির্ভর করে। কপালের দুই পার্শ্বে যে একটু উচ্চ স্থান থাকে, তাহাতে আঘাত লাগিয়া তৎস্থানে স্থিত মস্তিষ্ক কেন্দ্র নষ্ট হইলে মানুষের মনের অবস্থা অতি অদ্ভুত হয়। অনেকে যাহা শিক্ষা করিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যায় এবং নূতন কিছু শিখিতে পারে না, কেহ বা বিগত ৫ বৎসরের সকল কথা ভুলিয়া যায় এবং কেহ বা কেবলমাত্র তাহার নিজের ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল কথা ভুলিয়া যায়। এমনও দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ আঘাতে কেহ অত্যন্ত আমোদ ও হাস্যপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

এক নূতন চিকিৎসা।

আমেরিকার অন্তর্গত সানফ্রানসিস্‌কো সহরের ডাঃ এলবার্ট এব্রাম্‌স এক নূতন উপায়ে রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কিম্বা তাঁহার প্রণালীর দ্বারা তিনি চিকিৎসক সমাজকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অনেক রোগী তাঁহার মতে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিতেছে।

তিনি দুই প্রকারে রোগ নিরূপণ করেন, প্রথম রকমে রোগী নিজে উপস্থিত থাকে এবং দ্বিতীয় রকমে রোগীর রক্ত অথবা নির্ব্বাচনের নমুনা তাঁহাকে দিতে হয়। ঐ নমুনা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি এক চুম্বক দ্বারা দূর করা হয়। তৎপরে উহা ঐ চিকিৎসকের এক যন্ত্রের মধ্যে স্থাপিত হয়। তৎপরে ঐ যন্ত্রে তরঙ্গ

উত্থিত করিয়া রোগ আরামের ব্যবস্থা হয়। নানা প্রকার অদ্ভুত উপায়ে তথায় চিকিৎসা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে একটি হইল, সাদা কাগজে রোগী কর্ত্তৃক পেন্সিল দিয়া এক লাইন টানা। রোগীর শরীরস্থ বিদ্যুৎ ঐ পেন্সিল চাহিয়া নাকি কাগজের রেখা উপস্থিত হইয়া অবস্থান করে।

সমালোচনা।

শান্তি। আদি ব্রাহ্মসমাজের এবং "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি-এ কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য বার আনা মাত্র।

কালের বাতাস গ্রন্থকারের অঙ্গে লাগিয়াছে; গ্রন্থকার শিক্ষিত সমাজের ও সাহিত্য সংসারে সর্ব্বত্রেই সুপরিচিত; নামের পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় গুলি মুদ্রিত না করিলে বোধ হয় কোনই ক্ষতি হইত না।

শান্তি পুস্তকের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"দেশে বিদেশে সংসারের দুঃখ শোকে কণ্টকের আঘাতে অন্তঃস্থল যখন ক্ষত বিক্ষত হইবার উপক্রম হইত, অশান্তি যখন মন প্রাণ অধিকার করিয়া বসিবার উপক্রম করিত, তখন এই সকল কবিতা লিখিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি। তাই ইহার নাম "শান্তি" দিয়াছি! এই কারণে বলা বাহুল্য, এই সকল কবিতার অধিকাংশ প্রাণের আরামস্থল ভগবানের উদ্দেশ্যেই লিখিত। সংসারের কঠিন আঘাতে আমার মত যাঁহাদের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের কেহ যদি এই গ্রন্থের কোন কবিতায় এতটুকু শান্তি পান, তাহা হইলেই আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক হইবে।" আমরা "শান্তি" গীতিকাব্য খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি, গ্রন্থকারের ভাব, চিন্তা এবং মতি গতি যে আমাদের সহিত "একসূত্রে গাঁথা"—সীমাবদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট মায়ামুগ্ধ জীব আমরা, আমাদের হৃদয়ে তখন এ সত্যের স্ফূর্ত্তি প্রস্ফুটিত হয় নাই। যিনি জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে আকর্ষণরূপে বিদ্যমান, যিনি জগতের প্রত্যেক জীব হৃদয়ে শান্তি ও প্রীতিরূপে বিরাজিত, তাঁহারই অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে যথা সময়ে সুহৃদে সুহৃদে সম্মিলন হয়। অজ্ঞ অদূরদর্শী মানব আমরা তাহা পূর্ব্বে জানিতে বা বুঝিতে পারি না।

সপ্তদশ শতকের কবি লিখিয়াছিলেন,—"চির সুখীজন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদনা বুঝিতে পারে?"

গীত ও কবিতা যে পরিমাণে প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভাষায় লিখিত হয়, সেই পরিমাণেই ব্যথিত প্রাণে মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে; শান্তির গীতি কবিতাগুলি ভাবে, ভাষায় প্রাণস্পর্শী,—"শান্তি" পাঠে প্রত্যেক শোক তাপ ক্লিষ্ট নরনারী সান্ত্বনা লাভ করিবেন।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বটকৃষ্ণ পালের এডওয়ার্ডসটনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১।৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শ্বেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্‌।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Foamula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৷৵০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রীতিমাখান
সুন্দর মুখখানি

কিসে হয় ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ৵০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিনী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন। এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী ব্যাধিতে অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১৷০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ৷৵০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

২৯শ, বর্ষ] পৌষ, ১৩৩০, [৯ম, সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। বিমান	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৫৭
২। প্রভাতী	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	২৬৯
৩। সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৭০
৪। পয়লা আষাঢ়	শ্রীযুক্ত জীবঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	২৭৬
৫। সমালোচনা	... ...	২৮৭
৬। প্রাপ্তি স্বীকার	... ...	২৮৮

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত

Tele. Phone 388 Barabazar. 10-1-24

জ্বরেরযম জারমলীন [illegible]

মূল্য ৷৷০, ডজন ৫৲, গ্রোস ৫০৲, পাইকারী দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

আর, গোস্তিন এণ্ড কোং, হেড্ অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Telegram:—GERMALINE. Telephone No. 1388

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর

যখন চখের সামনে লেখাগুলি

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

কিসে হয়
একরাশি পা।
কেশরঞ্জন

জবাকুসুম তৈল

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা : "ক্লিনীশিয়ান"

টেলিফোন নং : ২৭৩৭ কলি :

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

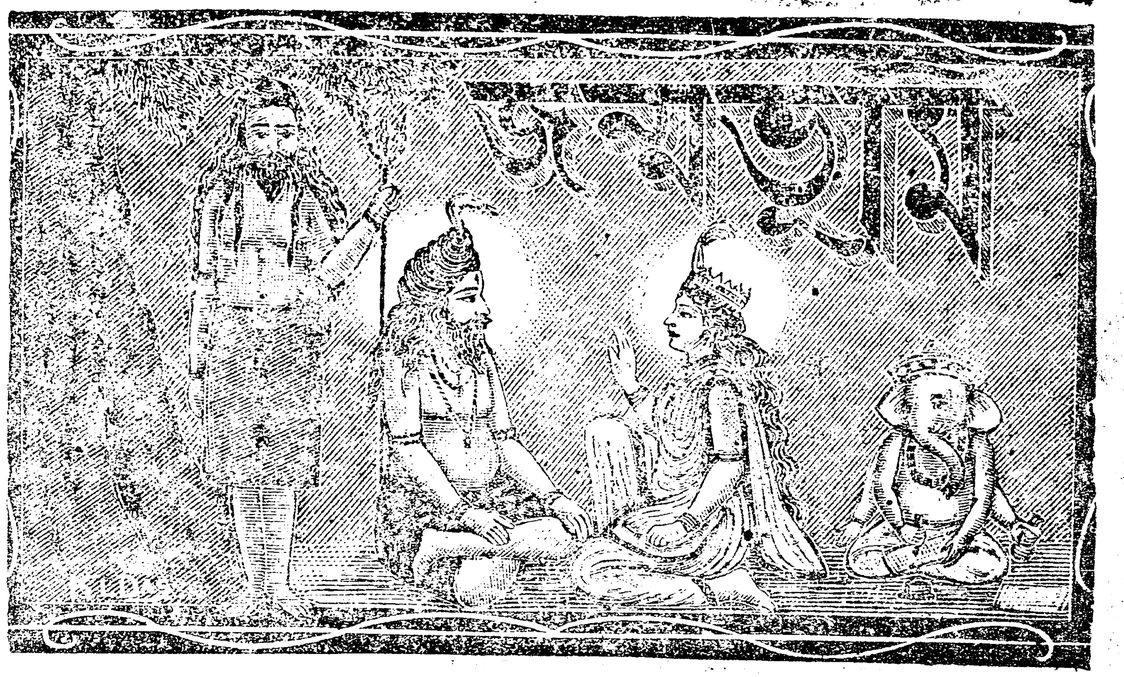

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৯শ, বর্ষ। | ১৩৩০ সাল, পৌষ। | ৯ম, সংখ্যা।

বিমান।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি "নায়ক" পত্রে বিমান (aeroplane) সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল যে, যে জেপেলিন প্রভৃতির আবির্ভাবে ইদানীং সমগ্র জগত বিস্মিত, লোকে শতমুখে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানোন্নতির প্রশংসা করিতেছে, এই বিমানাদি যান আধুনিক বিজ্ঞানযুগের নব-সৃষ্টি নহে— আর্য্যঋষিগণ ইহার ব্যবহার, নির্ম্মাণ কৌশল প্রভৃতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই অবগত ছিলেন। বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে।

আমার ঐরূপ উক্তিতে তখন অনেকেই উপহাস করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, ব্যোমযানাদি আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণের অপূর্ব্ব গবেষণার অত্যাশ্চর্য্য ফল—বেদে ইহার উল্লেখ থাকা নিতান্ত অসম্ভব।

এরূপ বলিবার যে কোন কারণ নাই, আমার তাহা মনে হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষায় আমাদিগের মস্তিষ্ক বিকৃত—বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত। আমারা দেবভাষার অনুশীলনে পরাঙ্মুখ—ঘরের রত্নের খোঁজ রাখি না, বেদকে কৃষকের গীত বলিতে সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করি না।

এক্ষণে বেদে বিমানাদি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে—তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিব।

বিদ্ ধাতুই জ্ঞানার্থ, সত্যার্থ লাভার্থ ও বিচারার্থ অর্থ বাচক হইয়া থাকে। ঐ বিদ্ ধাতু করণ এবং অধিকরণ করকে'ঘঞ' করিলে 'বেদ' শব্দ সিদ্ধ হয়। যাহা অধ্যয়ন করিলে মনুষ্য যাবতীয় সত্য বিদ্যার বিজ্ঞতা প্রাপ্ত হন, যাহা পাঠ করিলে মানুষ বিদ্বান হইতে সমর্থ হন, যাহা পাঠে লোকের সত্যাসত্য বিচার করিবার ক্ষমতা হয়। তাহাকেই বেদ বলে। ব্রহ্মা, মনু জৈমিনী প্রমুখ সকল ঋষিই বেদকে পরা বিদ্যা বলিয়া গিয়াছেন।

মনু বলিয়াছেন,—

"এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনং।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষয়েণ পৃথিব্যাং সর্ব্ব মানবাঃ।

ইহার মর্ম্মার্থ এতদ্দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে পৃথিবীস্থ তাবৎ লোক নিজ নিজ কর্ম্ম কলাপাদি শিক্ষা করিত।

"সর্ব্বেষাং তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক পৃথক।
বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক সংস্থাশ্চ নিম্যামে॥"

অর্থাৎ সমগ্র পদার্থের পৃথক পৃথক গুণ কর্ম্ম, স্বভাব ও তদনুযায়ী নাম বেদস্থ শব্দ সমূহ দ্বারা আদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। যথা ঘৃতাচি ধীঃ—জল—নির্ম্মাণ বিদ্যা।

অপ্—ইহা স্বাধীন বহুবচন ইহা স্থুল ভূতের মধ্যে দ্বিতীয়। বৈদিক ও লৌকিক অর্থ জল। 'অপ্' পঞ্চভূতের মধ্যে একটী মাত্র স্বাধীন বস্তু নহে বলিয়া বহুবচন হইয়াছে। 'অপ্' এক বস্তু নহে কেন, তাহা দেখুন:—

মরুৎ—পবনবাচক—বাষ্প সাধারণ (gas)। মরুৎ ও তেজের অণুর মিলনে অপ্। আবার মরুৎ একরূপ নহে। সুতরাং অপ্ = মরুৎ × তেজ। জলে দুই প্রকার মরুৎ আছে। মরুৎ = বিদ্যুৎ

এখন দেখা যাউক বেদ কি বলেন,—

"মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসম।
ধিয়ং ঘৃতাচিং সাধং তা॥"

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১ম অষ্টক ২ সূক্ত ৭ম মন্ত্র।

ইহার অর্থ—আমি শিল্পবিদ্যা চিকীর্ষু মনুষ্য যে দুইটী বস্তু ঘৃতাচী নামক ধীঃ অর্থাৎ জল নির্ম্মাণক সাধন করে, সেই পূতদক্ষ মিত্র ও রিশাদস্ (অর্থাৎ রোগ নাশক ও শোষক) বরুণকে সুযুক্ত করি।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে জল = মিত্র × বরুণ।

এখন প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে, মরুৎ দুইটী কি না।

প্রত্যেক বৈদিক শব্দই বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্ম্ম অর্থ বোধক। বেদের শব্দ উচ্চারণ করিলেই সেই শব্দের বাচ্য পদার্থের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব প্রকাশিত হয়।

মিত্র = মি + ত্র অমিচিমি শসিভ্যঃ ত্রঃ উনাদি কোষ ৪।১৬৫॥

মিনোতি মান্যং করোতি ইতি মিত্রঃ। যাহা পদার্থের পারিমাণিক, তাহা মিত্রঃ (Standard) অতএব মিত্র- hydrogen।

"মিত্রঃ ইতি পদপামাসু পঠিতম্।"

নিঘণ্টু ৫।৪।

সুতরাং মিত্র শব্দের দ্বিতীয় অর্থ প্রাপ্তি, What approaches or seeks association, অর্থাৎ যাহা প্রাপ্তি কামনা করে ও সঙ্গাভিলাষী। ইহাও hydrogen এর গুণ।

মিত্র একটী বসু। মিত্র ও উদান বেদে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উদান লঘুত্ব ও পদার্থ উন্নয়ন জন্ম প্রসিদ্ধ। hydrogen এরও এই গুণ। মিত্র—ঞ মিদা স্নেহনে × ক্ত—মিত্র। যেদ্যতে মিহ্যতে বাস মিত্র। যাহা স্নেহ করণ যোগ্য, তাহা মিত্র। "শব্দ কল্পদ্রুম্।"

স্নেহঃ—রসভেদঃ, জলীয় পরমাণময়ং নিত্যঃ তৈলান্তরে তৎ প্রকর্ষং দহনস্যানুকূলতা। মিত্র—স্নেহবান। স্নেহ—জলের অণু, ইহা তৈলাকারে দহনে বিশেষ সহায়। All mineral only contain large proportion of hydrogen সুতরাং মিত্র hydrogen।

এখন এই মিত্র কিরূপ পূতদক্ষম্ তাহাই দেখা যাউক। পূত অর্থাৎ পবিত্র free from all impurities.

দক্ষ অর্থাৎ বল (energy)।

মিত্র—pure and possessed of kinotic energy—hydrogen.

মিত্র × inflamable air—hydrogen.

বরুণ—বৃঞ্ বরণে বর ঈপ্সায়াম ঔণাদিক।

কুবৃদারিভ্য উনন্—বরুণ। যাহা অপর পদার্থকে স্বীকার করে ও অপরের গ্রহণীয়। অথবা বরুণো নাম বরঃ শ্রেষ্ঠঃ বায়বীয় পদার্থ সকল ও জীবন ধারণোপযোগী পদার্থের মধ্যে বরুণই প্রধান Oxygen। বরুণ জল দেবতা। Oxygen—রিশাদস্। It eats away or rusts all base metals, it burns all bones, purifies the blood by oxidizng it and thro by keeping the body alive.

মিত্র বরুণ—জল—H=O, কিন্তু জিজ্ঞাস্য কি পরিমাণে?

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃধাবৃতস্পৃশ। এতুং বৃহা ওমা শাথে॥ ঋ, ১মং অ। অ, ৪র্থ সূ, ৮ম মন্ত্র।

মিত্রা—মিত্র শব্দের দ্বিবচন পাণিনি ৬।৩।২৬।

মিত্রাবরুণ—H2 O,

মিত্রাবরুণ—ঋতা বৃধৌ—জল বর্দ্ধক, বর্ষক।

ঋতস্পৃশা—জল প্রাপক।

"তুবি জাতৌ উরক্ষয়ৌ কবী।" ঋ ৯ম মন্ত্র।

তুবি—বহুনামান্থ পঠিতম্। নির্ঘণ্ট্।

তুবিজাত—যাহা বহু পদার্থ হইতে পাওয়া যায়—যাহা প্রচুর।

উরক্ষয়—যাহার অবস্থান বহু পদার্থে। কবী—একান্ত দর্শনৌ অর্থাৎ সর্ব্ব ব্যবহার দর্শন হেতু।

কবিঃ—ক্রান্ত দর্শনোভাতি কবতে বা নিরুক্ত ১২।১৩॥

এতন্নিরুক্তা ভিপ্রায়েন কবি শব্দেন সুখসাধক মিত্রাবরুণৌ গৃহ্যেতে। অর্থাৎ যাহা সুখসাধক ও দর্শনাদি হেতুভূত, তাহা কবি মিত্রাবরুণ।

সা ১ম মণ্ডল ৫অ সূ ২৩ মন্ত্র ৫ম।

মৃহাতে মিত্রাবরুণকে ঋতস্য জ্যোতিষীষ্পতি—জলপতি ও প্রকাশপতি বলা হইতেছে।

বরুণকে সর্ব্ব পদার্থ ও জীবের রক্ষক ও সুখপ্রাপক ও মিত্রকে সুরাধসঃ—উত্তম ধনদাতা বলা হইয়াছে। যথা "বরুণ প্রাবিতা ভুবন্মিত্র বিশ্বাভিরুতিভিঃ। কবতাং ন সুরাধস। ম ১।—অ ৬। সূ ২৩। ম ৭ম।

বরুণ oxygen কে রাজা (প্রকাশক) স্তপবান্ (কিরণবান) বলা হইয়াছে।

কেবল ঋকে নহে, সকল বেদেই মিত্র বরুণকে H2O বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্যোমযানাদি পরিচালনায় যে সকল পদার্থ ব্যবহৃত হয়, তাহার বেদোক্ত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা বিবৃত হইল। এখন অন্যান্য প্রকরণের বৃত্তান্ত আলোচনা করা যাউক।

নৌবিমানাদি বিদ্যালাভে ঐহিক সুখপ্রাপ্তি হয়। যাঁহারা উত্তম বিদ্যা ও সুবর্ণাদির আকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদিগের পক্ষে ধনাদির কিরূপে পালন ও ভোগসাধন করিতে হয়, তাহার বর্ণনা করা হইতেছে।

তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বি নোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাং অবাহাঃ।
তমহথূর্ণাভিরাত্মন্বতীভি রন্তরিক্ষ প্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ॥ ১॥
তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রি রহাতি ব্রজাদ্ধির্ণাসত্যা ভুজ্যুমূহথুঃ পতঙ্গৈ।
সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে ত্রিভীরথৈঃ শতপদ্ধিঃ ষড়শ্বৈঃ"। ২॥

ঋ অ ১। অ ৮। ব ৮ মং ৩৪।

"তু (গ্রাহ্য) তুজি ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় করিলে 'তুগ্র' পদ সিদ্ধ হয়। ইহা হিংসক বলবান গ্রহণকারী ও স্থানকারী এই চারি প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার নিমিত্ত তুগ্র শব্দের অর্থ এইরূপ যিনি শত্রুকে হিংসা বা হনন করিয়া নিজ বিজয় ও পরাক্রম দ্বারা বলবান হইয়া ধনাদি পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং যিনি অশ্ব নৌকা ও বিমানাদি যান গুলিকে পাইবার ইচ্ছা করেন।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পূর্ব্বে বিমানাদি যুদ্ধ কার্য্যেও প্রযুক্ত হইত।

'রয়িং' অর্থে উত্তম বিদ্যা ও সুবর্ণাদি কামনাকারী ইত্যাদি—অশ্বিনা শব্দের অর্থ নিরুক্ততে এইরূপ পাওয়া যায়।

অথাতো দুস্থানা দেবতাস্তাসামশ্বিনৌ প্রথমগামিনৌ ভবতোহশ্বিনৌ যদ্ব্যশ্নুবাতে সর্ব্বং রসেনান্যো জ্যোতিষাহন্যোহশ্বৈরশ্বি নাবিত্যৌর্ণবাভস্তৎ কাবশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যা বিত্যেকিন সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে।" নিরু অ ১২ খং ১॥

অর্থাৎ বায়ু ও অগ্নিকে অশ্বি বলে; কারণ বায়ু ধনঞ্জয়রূপে এবং অগ্নি বিদ্যুৎরূপে সমস্ত পদার্থ মধ্যে ব্যাপ্ত আছে। এইরূপে জল ও অগ্নিকে অশ্বি বলে, কারণ অগ্নি জ্যোতিঃ দ্বারা এবং জল রস দ্বারা যুক্ত হইয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

অশ্বে: অর্থাৎ উহারা বেগাদি গুণ বিশিষ্ট। যাঁহার বিমানাদি যানের সিদ্ধির ইচ্ছা হইবে, তাঁহার পক্ষে বায়ু, অগ্নি ও জল দ্বারা উহা সিদ্ধি করা কর্ত্তব্য, ইহা ঔর্ণবাভ নামক আচার্য্যের মত।

অপর ঋষি বলেন, অগ্নির জ্বালা ও ক্ষিতিকে অশ্বি বলে, কারণ ক্ষিতির বিকার স্বরূপ অলাৎশিলা ও লৌহাদি দ্বারা কলাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া চালাইলে নানা প্রকার বেগশালী যান প্রস্তুত করা যায়।

কোন কোন পণ্ডিতের মত, দিবারাত্রিকে অশ্বি বলে, কেন না দিবা রাত্রিতে উক্ত পদার্থের সংযোগ বিয়োগ ঘটিয়া থাকে এবং তজ্জনিত বেগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পুনশ্চ অন্য শিল্পীরা বলেন সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে "অশ্বি" বলে, যেহেতু সূর্য্য ও চন্দ্রমার আকর্ষণাদি গুণ জন্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিব্যাদি সংযোগ বিয়োগ, ক্ষয় বৃদ্ধি প্রভৃতি হয়।

"তথাশ্বিনৌ চাপিভর্ত্তারৌ জর্ব্ভরীত্তারা বিতার্থস্তুর্করী তু হন্তারৌ। উদন্যজেৎ নেত্রাদকজে ইব রত্নে সামুদ্রে॥ নিরু অ ৩ খং ৫।

জর্ভরী ও তুর্করী অর্থে অশ্বি। জর্ভরী বিমানাদি যানের ভর্ত্তা বা ধারণকারী ও তুর্করী কলা যন্ত্রের নিয়ন্তা অর্থাৎ ইহাদ্বারা বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর বিচারাদিকে যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিল বিমানাদি aeroplane যানের ধারণ, পোষণ ও গমনবেগ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যেরূপ ঘোটক ও বলীবর্দ্দকে কশাঘাত করিলে বেগে গমন করে তদ্রূপ কলাকৌশল দ্বারা বায়ু আদিকে কলাযন্ত্রাদিতে প্রেরণা করিলে সর্ব্বপ্রকার শিল্পবিদ্যা সিদ্ধ হয়।

উদন্যজে অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি ও জলের প্রয়োগে সমুদ্রে গমনাগমন করা যায়।

এখন পূর্ব্বোদ্ধৃত বেদমন্ত্রের মর্ম্ম বুঝা যাউক। যে কেহ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, পিত্তল ও কাচাদি পদার্থ দ্বারা বিবিধ প্রকারের কলাযুক্ত নৌকাদি যান ও বিমানাদি রচনা করিয়া তাহাতে যথাবৎ অগ্নি, বায়ু ও জলাদি দ্রব্য প্রয়োগ পূর্ব্বক তন্মধ্যে বাণিজ্য দ্রব্যাদি পূর্ণ করিয়া ব্যাপারার্থে সমুদ্রাদিতে যাত্রা করিয়া দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমনাগমন করেন, তাঁহাদিগের উন্নতি ঘটে, যে কেহ এইরূপ পুরুষকারে রত থাকেন, তিনি পদার্থ লাভ ও রক্ষা করণে সমর্থ হইয়া দুঃখ বা ঐহিক ক্লেশ ভোগ করিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন না; কারণ তিনি পুরুষাকার-যুক্ত হওয়ায় অলস হন না। নৌযানাদির সিদ্ধি দ্বারা লোকে বিভবশালী হইয়া থাকেন। অগ্নি, বায়ু ও পৃথিব্যাদি পদার্থে শীঘ্র গমনাদি করিবার

গুণ বিদ্যমান আছে বলিয়া উহাকে অশ্বি বলে। ঐ সকল পদার্থ দ্বারা নৌ ও অন্যবিধ যানাদি প্রস্তুত করিলে, ঐ পদার্থ নিচয়ের স্বভাবতঃ ত্বরিত গমনা গমনের গুণ থাকায় ঐ সকল যানও বেগশালী হইয়া থাকে। বেদোক্ত বিদ্যা ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ এবং বিধ নৌ, বিমান, রথাদি (Stemer. Aeroplane and Railway trains) দ্বারা মনুষ্যের দেশ দেশান্তরে গমনাগমন সহজে ও সত্বর সম্পাদিত হয়।

(নৌভিঃ) সমুদ্রে গমনাগমন হেতু শ্রেষ্ঠ নৌযান (আত্মন্বতীভিঃ) যদ্দ্বারা উক্ত নৌকার বা তদীয় ভৃত্যগণ উক্ত অর্ণবযানাদিকে সমুদ্রাদি চালাইয়া লইয়া যান। ব্যবসায়ীরা ও রাজপুরুষেরা ঐরূপ যানারোহনে সমুদ্রে গতায়াত করিবেন।

(অন্তরিক্ষ প্রুদ্ভিঃ) যদ্দ্বারা আকাশে গমনাগমন কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহাকে বিমান বলে।

(অপোদশাভিঃ) বিমান এরূপ শুদ্ধ ও চিক্কণ হওয়া উচিত, যেন উহাতে জল লাগিলে গলিয়া বা ফাটিয়া না যায় বা কোনরূপ ছিদ্রযুক্ত না হয়।

পূর্ব্বোক্ত যে অশ্বি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নানারূপ সুখভোগ করাইয়া থাকে উহা এরূপ গতিশীল হইতে পারে যে, তিন দিবস ও রাত্রিতে নৌকা বিমান ও রথদ্বারা সুখের সহিত সাগর আকাশ ও পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উপস্থিত হইতে পারা যায়। উপরি উক্ত তিন প্রকার বাহন দ্বারা মনুষ্যের গমনাগমন করা উচিত। (ষড়শ্বৈঃ) ছয় অশ্ব অর্থাৎ উক্ত যানাদিতে অগ্নি ও জলাদির জন্য ছয়টী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, যদ্দ্বারা উক্ত যানাদি দ্বারা তিন প্রকার মার্গে অনেক প্রকার যাতায়াত করিতে পারা যাইবে।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে নৌবিমানাদি বিদ্যা বিষয়ক বেদের কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। উহা পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, বৈদিক যুগে বাষ্পীয় পোত, ব্যোমযান বাষ্পীয় রথ প্রভৃতি বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে পরিচালিত হইত। যে তাড়িৎশক্তি প্রভাবে আমরা এক্ষণে নানারূপ নব নব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির আবিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, সেই বিদ্যুৎ বলের প্রয়োগ বৈদিক কালে অধ্যাপক মণ্ডলীর অপরিজ্ঞাত ছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিন প্রকারের যান নির্ম্মাণের ব্যবস্থা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমে জাহাজ তাহার পর বিমান তাহার পর রেলগাড়ী। জাহাজ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

" + + শতারিত্রাং নাবমাতস্থিরাং সম্ ।
যমশ্বিনা দদথুঃ শ্বেতমশ্বমঘাশ্বায় শশ্বদিৎস্বস্তি ॥"

ঋ অষ্ট ১ অ ৮ ব ৮। । মং ৫ । ১॥

অর্থাৎ ঐ সমুদ্রযানে এরূপ শত প্রকার লৌহময় কল থাকিবে যদ্বারা বন্ধন ও স্তম্ভনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। উক্ত নৌকায় জলের গভীরতার মাপ লও-বার যন্ত্র এবং ব্যাত্যা ও উর্ম্মাদির বিঘ্ন হইতে পোতকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লৌহের নঙ্গর ও অন্যান্য যন্ত্রাদি প্রস্তুত রাখা কর্ত্তব্য। ঐ সকল যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিলে মনুষ্যগণ পার্থিব স্থায়ী অভ্যুদয় উপভোগ করিতে সমর্থ হন। জল ও অগ্নির সংযোগ দ্বারা (শ্বেতসক্তঃ) শুক্লবর্ণ বাষ্পরূপী অশ্ব অত্যন্ত বেগশালী হইয়া থাকে এবং উহাদ্বারা শিল্পীগণ যানাদিকে শীঘ্র গমন জন্য বেগযুক্ত করিতে পারেন এবং যে যানে বসিয়া সমুদ্র ও অন্তরীক্ষ মধ্যে বসিয়া নিরন্তর সুখভোগ করিয়া থাকেন। যে বেগ ও গুণ বায়ু, অগ্নি ও জলাদি দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা যেন মনুষ্যগণ সুবিধারদ্বারা গ্রহণ করেন। যাঁহারা আধুনিক এয়ারোপ্লেনে aeroplane আরোহণ পূর্ব্বক আকাশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, অনবরত ঘর্ঘরশব্দে অনভ্যস্ত আরোহীদিগের কর্ণ বধির প্রায় হয়, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ করে, বমনেচ্ছার বিশেষ উদ্রেক হয়। কিন্তু বেদে যে বিমানের উল্লেখ আছে, তাহা সুখোৎপাদক ছিল, সুতরাং বর্ত্তমান বিমানাদি অপেক্ষা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত যানগুলির নির্ম্মাণ কৌশল কিরূপ হইবে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ এক্ষণে দিতেছি।

"ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে সোমস্য বেনামনু বিশ্ব ইদ্বিদুঃ।
ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃ স্কভিতান আরভে ত্রির্ণক্তং যাথস্ত্রির্বাশ্বিনা দিবা ॥"

ঋ অষ্ট ১ অ ৩ বর্গ ৪ মং ১॥

ইহার সার মর্ম্ম এইরূপ এই অশ্বিরথে তিনটী চক্র থাকিবে। উহা দ্বারা উহা জল, স্থল, অন্তরীক্ষে যাতায়াত করিতে পারিবে। চক্র বা নেমিগুলি যেন প্রচুর বেগশালী হয়। ঐ গুলির অঙ্গাদি বজ্রের ন্যায় কঠিন হইবে। কলাযন্ত্র অত্যন্ত দৃঢ় থাকিবে। উহাতে তিন তিনটী করিয়া স্তম্ভ এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা আবশ্যক যাহার আধারে কলা যন্ত্রগুলি সংযুক্ত থাকিতে পারে। ঐ স্তম্ভ পুনঃ অপর কাষ্ঠ বা লৌহের সহিত সংলগ্ন থাকিবে। (আরা) যাহা নাভির সমান মধ্য কাষ্ঠ হইয়া থাকে, উহাতে সমস্ত কলাযন্ত্র সংযুক্ত থাকিবে। এই নাভি যন্ত্র

সাহায্যে কলগুলি বিঘূর্ণিত হইবে ও রথও চালিত হইবে। এই রথে বিবিধ ক্রীড়া সুখ লাভ হয়। আরম্ভনে জল ও অগ্নি মুখ্য। এই যান দ্বারা তিন দিবসের মধ্যে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে* যাওয়া যায়।

"ত্রিবিধ শিক্ষতম" অর্থাৎ যান নির্ম্মাণ, চালন ও স্তম্ভন শিক্ষা দাও। ৫ মং।

রথ চালাইবার জন্য গার্ড ও ড্রাইভারের প্রয়োজন। শাস্ত্রে ইহাদিগকে ঋত্বিজৌ দেবতাভৌ নামে অভিহিত করিয়াছেন। পাণিনানি দস্ত্রম ত্রির্ণে অশ্বিনা বহতম।" অর্থাৎ লৌহ, তাম্র ও পিত্তল নির্ম্মিত গৃহ বহন কর। ৭ মং।

"ত্রির্নো অশ্বিনা যজতা দিবে দিবে পরিত্রিধাতু পৃথিবী মশায়তম।
তিস্রো নাসত্যা রথ্যা পরাবত আত্মেব বাতঃ স্বসরানি গচ্ছতম।"

ঋ অষ্ট ১ অ ৩ ব ৫ মং॥ ৭॥

"অরিত্রং বাংদিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধুনাং রথঃ।
ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবঃ॥ ৭॥ ঋ অষ্ট ১ অ ৩ ব ০ ৩৪ মং ৮॥

"বিষ্ট ভ্রাজন্তে সুক্ষমান ঋষ্টিভিঃ প্রচাবয়ন্তো অচ্যুতাচিদোজসা।
মনো জুবো যন্মরুতো রথেষা বৃষব্রাতাসঃ পৃষতীর যুগধম ॥" ৮॥

ঋ অং ১ অং ৬ বং ৯ মং ০ ৪॥

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—ভূমি সমুদ্র ও অন্তরীক্ষে গমনার্থ কিরূপ যান প্রস্তুত করা উচিত। (পরিত্রিধাতু) অর্থাৎ লৌহ তাম্র রৌপ্যাদি তিন প্রকার ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হয়; এবং যেরূপ নগরাদির কোন কোন স্থানে সত্বর উপনীত হইবার জন্য দূরত্ব নিবর্ত্তক (short cut) পথ থাকে, তদ্রূপ দূরদেশে গমনাগমন পক্ষে উক্ত যানাদি শীঘ্রগামী বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপে শিল্পবিদ্যা প্রয়োগ দ্বারা যানাদি প্রস্তুত করণ বিদ্যাকে অশ্বি বলে। মনের ন্যায় দ্রুতগামী এবংবিধ যানাদি দ্বারা সুখে ভূগোল বিচরণ করা যায়। পূর্ব্বোক্ত অরিত্র বা স্তম্ভন সাধন জন্য যে যন্ত্র নির্ম্মাণ করা হয়, তাহা বিশাল সমুদ্রের পারাপার করিবার পক্ষে অতি শ্রেষ্ঠ উপায় স্বরূপ। যিনি এইরূপ রথাদির যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ, তিনি সুখ সম্পদের অধিকারী হইয়া থাকেন। যানাদি বেগশালী করিবার নিমিত্ত উহার মধ্যে জলাশয় (boiler) প্রস্তুত করিয়া জল রাখিতে হইবে। বায়ু ও অগ্নিকে মনোবেগের ন্যায় চালিত কর এবং যেরূপ জলের বাষ্প ধূমপুঞ্জকে বেগবান করে, তদ্রূপ রথাদিকেও চালয়মান কর। যেহেতু

* এখানে সম্ভবত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর দ্বীপগুলির উল্লেখিত হইয়াছে। সঃ।

শিল্পবিদ্যা বিশারদ সর্ব্বপ্রকার সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। বায়ু ও অগ্ন্যাদি পরিচালিত কলাযন্ত্র দ্বারা মনুষ্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে মনোবেগরূপী যানারোহণে যাইতে সমর্থ হয় বলিয়া সুখভাগী হয়। এ নিমিত্ত উত্তম যান প্রস্তুত করণ বিদ্যা লাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

"আনো নাবা মতীনাং যাতং পারায় গণ্ডবে।
যুঞ্জাথামশ্বিনা রথম॥" ৯ ঋঅষ্ট, ১ অ, ৩ ব, ৩৪ মং ৭॥

"কৃষ্ণং নিযানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপোবসানা দিবমুৎপতন্তি।
ত আববৃত্রন্ত্সদনাদৃতস্যাদিদ্ ধৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে॥ ১০॥
দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উতচ্চিকেত।
তস্মিন্ত্সাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাস্॥" ১১॥
ঋ, অষ্ট, ২অ, ৩ব, ২৩।২৪ মং ৪৭।৪৮॥

অর্থ—মতিমান ব্যক্তি দ্বারা সুগঠিত যানাদিতে পূর্ব্বোক্ত বায়ু আদি অগ্নি সংযোগ পূর্ব্বক অত্যন্ত সুগতির সহিত সমুদ্রাদির পারে যাওয়া যায়। এবংবিধ যানাদি রচনা কার্য্যে সকল মনুষ্যের যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। অগ্নি জল সংযুক্ত যানাদিতে গতিবান যে অগ্নি আছে, তাহাতে জল সেচন পূর্ব্বক বাষ্প সৃষ্টি করতঃ কাষ্ঠ লৌহাদি নির্ম্মিত বিমানকে আকাশে উড্ডীয়মান করিয়া পরিচালিত করিতে পারা যায়। উক্ত বিমানাদি জল সংযোগে বেগযুক্ত হইলে বস্তুতঃ সুখদায়ক হয়! এবংবিধ যানাদির ভিতর ও বাহিরে এরূপ কল প্রস্তুত করা আবশ্যক যে, উহা ঘুর্ণায়মান করিলে সমস্ত কল ঘুরিতে থাকিবে। উহাতে এরূপ ভাবে তিনটী চাকা প্রস্তুত করিবে যেন একটী চলিলে অন্য গুলি বন্ধ হইয়া যায়; দ্বিতীয়টী চালাইলে সম্মুখভাগে অগ্রসর হওয়া যায় এবং তৃতীয়টী চালাইলে পশ্চাৎগামী হয়। সমগ্র যানকে একত্রিত করণোদ্দেশে তিন শত কীলক এরূপ ভাবে লাগাইবে যেন উক্ত কীলক (screw) খুলিয়া লইলে আবার সমস্ত যন্ত্রটী পৃথকীভূত করিতে পারা যায়। প্রত্যেক যানে ৬০টি করিয়া কলাযন্ত্র থাকিবে। উহার মধ্যে প্রয়োজনানুসারে কতকগুলি চলিবে, কতক গুলি বন্ধ থাকিবে। যখন বিমানকে আকাশাভিমুখে ঊর্দ্ধগামী করিতে হইবে, তখন পুঞ্জীভূত বাষ্পের ঊর্দ্ধদিকের মুখ রুদ্ধ রাখিবে, আবার পৃথিবীর অভিমুখে নিম্নগামী করিবার সময়, ঊর্দ্ধদিগের মুখ অনুমানানুযায়ী খুলিয়া দিবে ও নিম্নদিগের মুখ বন্ধ রাখিবে। এইরূপে পূর্ব্বাভিমুখে যান পরিচালিত করিতে হইলে পূর্ব্বের মুখ রুদ্ধ ও পশ্চিমের মুখ খুলিয়া দিতে হইবে। সাবধান ইহাতে যেন কোনরূপ ভুল না হয়।

এই বিমান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু এটর্ণী শ্রীযুক্ত গৌরহরি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এ নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

তিনি বলেন, শাস্ত্রে যে "ত্রিবৃতঃ রথস্য" তিন প্রকার যানের, রথ, পোত ও বিমানের উল্লেখ আছে, তাহার বিভিন্নরূপ প্রস্তুত প্রণালীরও বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। জলযানের মধ্যাকর্ষণাদি শূন্যযানের বিপরীত। শাস্ত্রে সপ্তবিধ জলযানের বর্ণনা আছে। যথা—হংস, মৎস্য, মকর, নক্র, শুশুমার, তিমিঙ্গল ও কূর্ম্ম।

বিমানও সপ্তপ্রকার! চকোর, চাতক, ময়ূর, ময়াল, কারণ্ডব, শুক ও হরিতালিকা (ঘুঘু বিশেষ)।

এই সকল যান আবার ভিন্ন ভিন্ন রূপ গুণ ও গতিবিশিষ্ট। যথা—(১) মধুচ্ছন্দ—গভীর শব্দবিশিষ্ট, স্বল্পায়ব। (২) অনিলাণ্ড—সুখসেব্য, পর্ব্বত উলঙ্ঘন সহায়ক। ইহা স্থলে কর্ষণাদি কার্য্যোপযোক, জলে পোতাদি গুণ বিশিষ্ট, শূন্যে পক্ষশূন্য মরুৎ সাহায্যে পরিচালনশীল। (৩) মেধাতিথি—ঈষদুষ্ণ, শীঘ্রগামী শব্দবিশিষ্ট, জল স্থল অন্তরীক্ষ গতিশীল, দুই পক্ষ বিশিষ্ট, ষটচক্র সংযুক্ত। রথের এক তৃতীয়াংশ সম্মুখস্থ চক্রের বাহিরে, দুই তৃতীয়াংশ চক্রের উপর অবস্থিত। ৩টী ভ্রামণ যন্ত্র, ঊর্চ্চ নীচ পক্ষে ১টী এবং দক্ষিণ বামাবর্ত্তে ২টী রক্ষিত।

যান যত লঘু হইবে, ততই ভাল। উহার নির্ম্মাণোপকরণ অভ্র ৫, কাষ্ঠ ৪, ঊর্ণ জাল ১, গাব নির্য্যাস ৮, এবং দ্রাবক ২ ভাগ হইবে।

বিমান ও পোত নির্ম্মাণে অলাতশিলা (লৌহ বা লৌহবিকার) প্রধান উপযোগী। অভ্রচূর্ণ ১০০ বৎসরের দেবদারু কাষ্ঠ চূর্ণ অতি সূক্ষ্মরূপে ছাঁকিয়া পীত ও ঔর্ণজাল সমভাবে পেষণ করিয়া গাবের আটাও এক প্রকার দ্রাবক রসে মিশ্রিত করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। ঐরূপ মণ্ড জলে গলিবে না, রৌদ্রে ফাটিবে না বা অগ্নিতে পুড়িবে না। উহা দুশ্ছেদ্য, দুর্ভেদ্য নমনশীল, লঘু ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে। ঐ মণ্ডকে কলাযন্ত্র দ্বারা চাপ দিয়া এক যবোদর স্থূল আস্তরণে পরিণত পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া যানগৃহ প্রস্তুত করিবে। ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণে দেড় যবোদর স্থূল ও দুই যবোদর প্রস্থে লম্বালম্বী বড় কীলক মারিবে। পরে গাব, খদির, হরিতকী, নিম্ব, আমলকী, সুপারি ও তালমূল সমভাগে ১২ গুণ অধিক জলে ভিজাইয়া উক্ত জল দ্বারা উক্ত রথগৃহ ২০ বার ভিজাইবে। ২০ বার

শুকাইয়া লইবে। বিমান গৃহ যত দীর্ঘ হইবে তাহার দুই তৃতীয়াংশ প্রস্থ করা উচিত।

বিমানের পক্ষ গৃহের এক ষষ্ঠাংশ ছাড়িয়া দুই তৃতীয়াংশ প্রস্থে হইবে। বিমানের ছাদের উপর বিমান গৃহের উচ্চতার দুই তৃতীয়াংশ তিন গুণ দীর্ঘ হইবে। যানগুলি নামানুযায়ী জন্তুর বা পক্ষীর আকৃতিশালী হওয়া উচিত। রজ্জুগুলি ঊর্ণতন্তুর হইবে। পরিচালকের অবস্থানের সহিত আরোহীর বসিবার স্থান স্বতন্ত্র হইবে। ত্রিবিধ যানের অগ্নি স্বতন্ত্র হইবে। যথা—রথের বীতহোত্র ধনঞ্জয়, কৃপীটযোনি, জ্বলন, জাতবেদা, তনুলুপাৎ ও তনুপা।

পোতের বহিঃশুষ্মা, বর্হি কৃষ্ণবর্ত্মা, শোচিষ্কেশ, ঊষর্বুধ, অশ্রয়াশ ও বৃহদ্ভানু।

বিমানের—আসয়াস, রোহিতাশ্ব, আশুশুক্ষণি, হিরণ্যরেস, দমূনা, চিত্রভানু ও অপপিত্তম্।

যাঁহারা বিমানে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন, চালকের পরিচ্ছদ, কর্ণাবরণ চক্ষুর আচ্ছাদন প্রভৃতির কিরূপ প্রয়োজন। শাস্ত্রে তাই এ সকল প্রসঙ্গে প্রণালাদি সম্বন্ধেও নানা কথা বিবৃত হইয়াছে।

আমরা এই প্রবন্ধে কেবল বেদের মন্ত্রাদি উদ্ধৃত করিয়াছি। পুরাণাদিতেও ইহার উল্লেখ আছে। রামায়ণ ও মহাভারত যাঁহারা মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থে ইহার ভূরি উল্লেখ দেখিয়াছেন। ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয় কুরু সমরের পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই সময় হইতে বহুবিধ অমূল্য শাস্ত্র গ্রন্থাদি বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগের বিগত গৌরবের অনেক চিহ্নই কালের কুক্ষিতে নিহিত। যে কিছু রত্ন ইদানীং পরিলক্ষিত হইত, তাহারও আর বড় দেখা যায় না. ইহার উপর গবেষণার অভাব শাস্ত্রচর্চ্চার হতাদর দেবভাষার অননুশীলন অধঃপতনের চরম সীমায় আমাদিগকে উপনীত করিয়াছে।

প্রভাতী।

লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,

(১)

নিশার আঁধার গ্রাসি,
ছড়ায়ে অমিয়া রাশি,
উষা রাণী হইলা উদয়।
জগৎ-নলিন মুখ,
উদিল অতুল সুখ,
রোগ শোক সব পেল লয়॥

(২)

ফুল ফুটি শত শত,
মোহিয়া মধুপ কত,
নিজরূপে হইল অধীর।
চুরি করি পুষ্প রেণু
মাখিয়া আপন তনু;
পবন মোহিল চরাচর॥

(৩)

পাঁপিয়া ডাকিয়া গেল,
জগত জানায়ে গেল,
রজনীর অবসান কথা।
পতিপাশে কুলবধু,
ত্যজিতে হইবে বঁধু,
ভাবিয়া পরাণে পে'ল ব্যথা॥

(৪)

ভগিনীর আগমনে,
আকুল অধীর প্রাণে,
বাদী বক্ষ উঠিল ফুলিয়া।

নিজবুক ভগ্নিবুকে,
মিশাইয়া অতি সুখে,
দোঁহে দোঁহা ধরিল চাপিয়া ॥

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সাধক বিশুর সহিত পুনর্ব্বার অমরার গড়ে যাইতেছেন। সাধক এখন মাতৃদ্বারে বিশিষ্টরূপ সম্মানিত হইলেও তাঁহার বেশ পূর্ব্বের ন্যায়। পরিধান মোটা বসন, গিরিমাটী রঞ্জিত, উত্তরীয় গল দেশে লম্বিত। গাত্র মার্জ্জনা বদ্ধ তৃতীয় বস্ত্রখণ্ড বগলে। তাঁহারা বড় রাস্তায় (গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে) চলিতেছেন। অমরার গড় বড় রাস্তার অদূরে অবস্থিত, বর্দ্ধমান ঐ রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী, অতএব বর্দ্ধমান হইতে অমরার গড় গমনের বড় রাস্তাই সুন্দর ও সহজ পথ। অগ্রহায়ণ মাস, রবিকর জাল প্রচণ্ড নহে। প্রকৃতি পুঞ্জ শিশির মণ্ডিত। পথের উত্তর পার্শ্বে স্থানে স্থানে অনতিদূরবর্ত্তী থাকিয়া অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বনস্পতিগণ প্রকাণ্ড শাখা জাল বিস্তার পূর্ব্বক অতি দর্শনীয় হইয়াছে। নভঃস্তলে রজত কান্তিতে দিবসপতি কিয়ৎদূর উত্থিত হইলেও পত্রাবলি হইতে শিশির বিন্দু ধীরে ধীরে নিপতিত হইতেছে। বর্দ্ধমানের রাঙ্গামাটী বিখ্যাত। কাঁকর চূর্ণ রাঙ্গামাটী দ্বারা প্রতি বৎসরই বড় রাস্তার অঙ্গ সংস্কার করা হয়, সেই জন্য রাস্তাটী লাল ধূলায় পরিপূর্ণ। এখন ধূলিজাল শিশির সিক্ত হইলেও গমনে জানু পর্য্যন্ত উত্থিত হইতেছে। বিশু কহিল, "ঠাকুর! রাস্তার রাঙ্গা ধূলা আপনার কোমর পর্য্যন্ত উঠ্‌ছে, আপনি আমার কাঁদে চড়ুন। আপনার পা দুখানি আমার বুকের বাঁয়খানে ধরে আমি শীতল হই।" সাধক কহিলেন, "বিশু! তুমি কি আমাকে রাস্তায় সং সাজাইতে চাও। তোমার কাঁদে আমাকে যে দেখিবে, সেই জিজ্ঞাসা করিবে এ ঠাকুরটি কে? ইহার কি হইয়াছে? তুমি কত লোকের কথায় উত্তর দিবে।" ঠাকুর আবার হাসিয়া

কহিলেন, "বিশু যদি তুমি আমাকে লইয়া রোজগার করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাকে কাঁদে করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ফের, আর বল এই ঠাকুর বড় গুণী, সব রোগ ভাল করিতে পারে, আমি বলি, তোমার এ ব্যবসা কিছু দিন মন্দ চলিবে না, তুমি এই মতলবই ঠিক কর।" বিশু হাসিয়া কহিল, "ঠাকুর! যে সব লোক মঙ্গলচণ্ডী মাথায় করে, লোকের বাড়ী বাড়ী ফেরে, তারা আমার চেয়ে ভক্তিমান। তারা মঙ্গলচণ্ডীকে স্নান করায়, চন্দন মাখায়, কাপড় পরায়, পায়ে মাথায় ফুল দিয়ে সাজায়, প্রাণভরা হৃদয় খোলা কথায়—মহামন্ত্রে পূজা করে, ভাল যা কিছু খাবার পায়, তাঁরে নিবেদন করে, প্রসাদ পায়, লোকের বাড়ী বাড়ী মাথায় করে তাঁরি গুণ গেয়ে ভিক্ষে করে, মাথার কাছে রেখে শোয়, মনের কথা, প্রাণের কথা, চোকের জলে জানায়, আবার তারি ধ্যান করে সকালে উঠে, ঠাকুর! আমি বলি, তারা আমার মাথার মণি। আমি ত আপনার ওরূপ ভাবে সেবা কর্ত্তে পাই না।" সাধক কহিলেন, "বিশু তাহাদের ভক্তি ভাল, ভক্তির সহিত কপটতা থাকিলেই পোল। ঠাকুর আবার হাসিয়া কহিলেন, "আমার প্রতি তোমার অতি বড় ভক্তি দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে, পাছে তুমি আমাকে মঙ্গলচণ্ডীর মত সজ্জিত করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ফের, কিন্তু তুমি জাননা ভক্তির ক্ষমতা অসীম। দেবতারাও ভক্তের। আমি জানিনা আমার কপালে কি আছে।" বিশু হাসিয়া কহিল, "ঠাকুর কত রঙ্গ জান। আমি মায়ের রঙ্গও বুঝতে পারি না, আমি আপনার রঙ্গও বুঝ্‌তে পারি না, ঠাকুর আমি কিছু চাই না, ঠাকুর ভক্তি দেন, আপনার উপর ভালবাসা দেন। তোমার কষ্ট দেখে আপনাকে কাঁদে কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছিল। মহারাজ বাহাদুর সঙ্গে পাল্‌কী, লোক লস্কর দিতে চাইলেন, আপনি হাতীর পিঠে চড়্‌তে স্বীকার কল্লেন না। আমার ইচ্ছা, আপনার পাল্‌কীতে আসিলেই ভাল হত, আমি পাল্‌কীর একধার এক। বইতাম।" সাধক কহিলেন, "বিশু জননীর এই সংসারে সকলেই আপনার লোক, কেহ ভ্রাতা, কেহ পুত্র, কেহ কন্যা, কেহ অমাত্য। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জগদম্বার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, অতএব কাহার স্কন্ধে চড়িব। মানুষের মধ্যে কর্ত্তা, প্রভু, দাস দাসী প্রভৃতি ভেদ জ্ঞান মায়া ও অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়, অহঙ্কারই আত্মাকে কলুষিত করিয়া অধোগামী করে। তুমি কি হাতীর পিঠে ঘাড় উচু করিয়া অহঙ্কারে চারি দিককে ক্ষুদ্র দেখিয়া গমন করিতে ইচ্ছা কর? তুমি কি হাতীর গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া মহাহট্টগোলে গমন করিতে ইচ্ছা

কর? তুমি কি দল বল সঙ্গে লইয়া, রাজার লোক বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা কর, যদি তাহাই তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে এ বেশ পরিত্যাগ কর। দেখ বিশু লজ্জা নিবারণের জন্য এই বস্ত্র খণ্ড। যে দিন লজ্জা ত্যাগ করিতে পারিব, দিগবসনে লোকালয়ে, সস্মিত বদনে চারিদিকে কেবল জগদম্বার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিব, বিশু সেই দিনই জানিবে মা আমার সব জ্বালা ঘুচাইয়া প্রিয় সন্তান বলিয়া চরণে স্থান দিবেন। ধূলি আমার অঙ্গ রঞ্জিত করাতে তুমি ব্যথিত হইতেছ, কিন্তু এই সকল রঞ্জিত ধূলিকে আমার রাগ বস্তু বলিয়া বিবেচনা হয়। বিশু! দেখ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, তাহার মধ্যে এই প্রশস্ত রঞ্জিত বর্ত্ম, হরিদ্রা রঞ্জিত ব্রাহ্মণ গলে উপবীতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পথ-পার্শ্বে এই প্রকাণ্ড বট বনস্পতি, ইহার পাদদেশ কি সুন্দর। কিন্তু তুমি রাজ ভবনে বিবিধ সুন্দর বস্তু দেখিয়াছ, সজ্জিত দাস দাসীগণ দেখিয়াছ, প্রাসাদ শ্রেণী দেখিয়াছ, সেই রাজসভা দেখিয়াছ, সুগন্ধ জাল জড়িত বৃন্ত জালের চপলতা নিরীক্ষণ করিয়াছ, এস এক্ষণে আমরা এই বনস্পতির তলে রমণীয় তৃণাসনে ক্ষণেক উপবেশন করি। দেখ, এই বনস্পতি শাখাজাল বিস্তার পূর্ব্বক সরস বল্লী দলকে ক্রোড় দেশে স্থান দিয়া কি অপূর্ব্ব আবাসের সৃজন করিয়াছে। সমীরণ লতা জালের প্রস্ফুটিত সুরভি সংযুক্ত কুসুম সকলকে চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ওই শোন পক্ষীগণের কলধ্বনি, ওই দেখ, বিচিত্র বর্ণের বিহঙ্গমগণ আহ্লাদের সহিত নৃত্য করিয়া শাখা হইতে শাখান্তরে গমন করিতেছে। কিন্তু বল দেখি, সেই রাজভবন আর এ বৃক্ষতল তোমার কোন স্থান রমণীয় বোধ হয়। পরমা প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব শোভা, অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া কি তোমার হৃদয় প্রেমরসে পূর্ণ হয় না?" ইহা কহিয়া সাধক সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন,—

কালি! আজু নীল কুঞ্জ, তেজঃপুঞ্জ লতা শোণিত নূতন মুঞ্জরী।
কিঙ্কিণী ঝনননে, মধুকর গুঞ্জরে, কোকিল বচন সুমাধুরী॥
মুকুট শিখণ্ডী, শ্রবণ বিহঙ্গী, নাভি সরোজহি পুঞ্জরী।
লোচন খঞ্জন, শ্রীবদন ভ্রমরী, পিয়ে মকরন্দ কাদম্বরী॥
চরণ তমাল ন্যালদ্বয় নূপুর শিব রজতাচল তদুপরি।
কমলাকান্ত দেখরে পরমাদ্ভুত, শঙ্কর উরু পরে শঙ্করী॥

বিশু এতক্ষণ তন্ময় হইয়া সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছিল, সঙ্গীত শেষে

কহিল, "ঠাকুর! রাজার ঘরে সকলি ধন দৌলতের খেলা, সকলি মানুষের করা, মানুষের বাহাদুরীর বাজার, কিন্তু এখানে সব মা কালীর খেলা, তাঁর গড়া জিনিস, তিনি এ সকলকে কত ভাবে, কত রঙ্গে যে সাজিয়ে রেখেছেন, তা মুখে বলা যায় না। এই গাছের তলাটিকে আমার স্বর্গ বলে বোধ হচ্ছে। এখানে রোগ নাই, চিৎকার নাই, অহঙ্কারের হাঁক ডাক নাই, আছে কেবল নয়ন ভরা মনের মত জিনিস, শান্তি, আনন্দ, চারি দিকে আনন্দময়ীর নৃত্য।" বিশু আবার কহিল, "ঠাকুর! দেখুন! এই বট গাছটী কতদূর পর্য্যন্ত ডাল পালা মিলেছে, এক একটী নামালে নেমে থামের মত ডাল গুলিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ধরে রেখেছে। গ্রীষ্ম কালে এই গাছ তলাটী বড় মনোরম স্থান। মাঠের হাওয়া সরস পাতায় লেগে ঠাণ্ডা হয়ে, পথিকের মাথায় লাগে। আবার মা কালীর এত ভালবাসা, এত বন্দোবস্ত দেখেও লোকের চৈতন্য হয় না, ভক্তি আসে না, এই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি আর একটী দেখ্‌ছি, ওই দেখুন, বাবলা গাছ, খেজুর গাছ, কাঁটার বন, গায়ে কাঁটা, মাথায় জটা, কিম্ভূতকিমাকার, হাঁ ঠাকুর, গাছ পালার মধ্যেও সত্ত্ব, রজ, তম আছে নাকি? এদের কাছে কোন লোক আশ্রয় লয় না, পাখীরাও এদের ডালে বস্‌তে ভয় করে, দেখে যেন বোধ হয়, এরা যেন রেগে চোক রাঙ্গিয়ে বসে আছে। বারোওয়ারীর জায়গায় যেমন নানা রকমের ছবি থাকে, আমার বোধ হয়, মা কালীর সংসারে মানুষ, পশু, পাখী, গাছ পালাও নানা রকমের। আমি রাস্তার দু-ধারে গাছ পালা দেখে আস্‌ছি, কেউ কুঁজো, কেউ দাঁত বার করে আছে, কেউ মাথা হেঁট করে গম্ভীর হয়ে ধ্যান কচ্ছে, আবার কেউ মাথা উঁচু করে, হাত দুই ছড়িয়ে ফলে ফুলে সৌরভে গৌরবে চারিদিক আলো করে হাস্‌ছে।" সাধক একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বিশু! তুমি খেজুর ও বাবলা গাছ দেখিয়া ইহাদিগকে তমোগুণ বিশিষ্ট মনে করিতেছ, কিন্তু তাহা নহে। বৃক্ষ সকলের মধ্যে তোমার চক্ষে ইহারা কদাকার হইলেও ইহারা অতি বিনীত। ইহারা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ও বড় শ্রদ্ধাস্পদ। দেখ বাবলার বীজ গো মহিষাদির প্রিয় খাদ্য। ইহার কাষ্ঠে সুন্দর হল প্রস্তুত হয়। ইহার রস ও আঠা মনুষ্যের বিশেষ উপকারে লাগে। এই খেজুর গাছ দেখিতেছ, ইহাদের আবরণ কঠিন হইলেও ইহারা রসের কূপ। "যুনা নারিকেল ভিতরে রস।" মনুষ্যের রসনা তৃপ্তি কর অতি উপাদেয় রস ও শর্করা অন্তর্নিহিত রাখিয়া ইহারা কণ্টক শিরে অতি সুমিষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে। বিস্তর্নবিশ্ব নিয়ন্তা প্রেমময় প্রভু

ধরকে ভূগর্ভে নিহিত রাখিয়াছেন। কণ্টকাকীর্ণ লতাজালের অভ্যন্তর পরিমল পরিপূর্ণ প্রসূন সকলকে প্রস্ফুটিত করিয়া রচনাতীত রচনা কৌশল প্রকাশ করিতেছেন। জটাজুট সমাযুক্ত, ভস্ম কলেবর সন্ন্যাসীর হৃদয়ে প্রেমের কলসী স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার খেলা কে বুঝিবে? মানব চতুষ্পদ, কীট পতঙ্গ, উদ্ভিদ কাহাকেও ঘৃণা করিওনা। সকলেই জগদম্বার সৃজিত, তাঁহার পরম প্রিয়। সকলেই সৃষ্টি রক্ষার যন্ত্র স্বরূপ।" বিশু সাধক কিয়ৎক্ষণ বট বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়া অমরার গড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দেহ ধারণ করিলেই শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সাধক গাহিয়াছেন,

"এ তনু ধারণে, এ তিন ভুবনে,
যাতনা নাহিক কার রে।
কিন্তু হেরিলে ওমুখ, দূরে যায় দুঃখ,
এই গুণ শ্যামা মার রে।"

সেই দৈহিক যাতনা ক্ষুৎপিপাসা ও রোগ হইতে উৎপন্ন হয়। যিনি সেই যাতনাকে উপেক্ষা করিয়া সন্তোষ অবলম্বন করিতে পারেন, তিনি যোগী। সন্তোষ হইতে শান্তি ও সমাধি আইসে, চাঞ্চল্য হইতে অশান্তি ও দুঃখ আইসে। লভ্য ও ভোগ্য বস্তুর বিয়োগে ঔদাস্য যোগীর ধর্ম্ম, ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্য বদ্ধ জীবের প্রকৃতি। শান্তি ও সন্তোষ না থাকিলে শান্তিময় পরমেশ্বরে মনোনিবেশ নিতান্ত অসম্ভব। রোগাদি সংসারের দুঃখ জাল সন্তুষ্ট ব্যক্তির নিকটবর্ত্তী হইতে ভয় করে। পূর্ণিমার শশী পূর্ণানন্দময়ী পরমা প্রেম সুধা সহ সাধকের হৃদয় আকাশে বিরাজ করিতেছেন, তাহার মন চকোর সেই সুধা পানে সর্ব্বদাই প্রমত্ত। ক্ষুৎ পিপাসা দৈহিক যন্ত্রণা তাঁহার মনকে ব্যথিত করিতে পারিত না। বর্দ্ধমান হইতে আসিবার সময় সাধক কালীনামামৃত ভিন্ন ভোগ্য বস্তু সঙ্গে গ্রহণ করেন নাই। ক্রমে বেলা অধিক হইল। স্নান আহারের সময় উপস্থিত। পথ প্রান্তে এক দিবা সরোবর দেখিয়া বিশু কহিল, "ঠাকুর! বেলা হয়েছে, দেখুন, এই পুকুরটীর কি সুন্দর জল! স্নানের ঘাটটীও পরিষ্কার, আসুন আমরা স্নান করে একটু জল খাই।" সাধক কহিলেন, "বিশু! তোমার মুখ দেখিয়া আমার অনুমান হইতেছে, তুমি ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়াছ। বর্দ্ধমান হইতে কোন আহারীয় সংগ্রহ করিয়া আনা হয় নাই, এখন কি প্রকারে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে?" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমি ক্ষুধা তেমন বোধ করিতেছি না, কিন্তু

আমার জল পানের ইচ্ছা হয়েছে।" সাধক কহিলেন, "বিশু! সংসার ত্যাগে কষ্ট বিস্তর। নিজের উদর পূরণের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। পরিব্রাজকের কষ্টও বিস্তর। যদি তুমি আমার সঙ্গে না আসিতে ও যদি তোমাকে দূরস্থ স্থানান্তরে যাইতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার পত্নী বাসী ভাত, লবণ, লঙ্কা, পিয়াজ তোমার সঙ্গে দিত, তুমি এই ঘাটের ধারে সেই ভাত পেট ভরিয়া খাইয়া গায়ে জোর করিয়া রাস্তা চলিতে পারিতে। বিশু! ঠিক করিয়া বল দেখি, এখন তোমার সেই খাবার মনে করিয়া রসনায় জল আসিতেছে কিনা?" বিশু কিঞ্চিৎ হাসিয়া কহিল, "ঠাকুর! কত রঙ্গ জান, আমার মদ মাংস খাওয়া ধাত, লোকে বল্‌তে পারে বিশে বেটা চোরের যাত, শুয়োর খেয়ে জন্ম গেছে, আজ গেরুয়া কাপড় পরে সাধু হয়েছে। কিন্তু ঠাকুর! তুমি ত অন্তরের কথা জান, আমার কুকাজ কুখাদ্যে বড় ঘৃণা হয়েছে, স্মরণাকে পাগল ভিন্ন কেহ পরিত্যাগ কর্ত্তে পারে না, সেই স্মরণইত আমাকে মাঝে মাঝে বড় কষ্ট দেয়, যা হক আপনার চরণের বলে আমি মনটাকে অনেক ঠাণ্ডা কর্ত্তে শিখেছি। মা কালীর স্মরণে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা বড় বেশী বোধ হয় না।" সাধক কহিলেন, "না হে বিশু! তুমি রাগ করিও না। অভ্যাস বড় প্রবল জিনিষ, মদ্য মাংস মৈথুন প্রভৃতিতে জীবের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি। যে ব্যক্তি একদিন মদ্য পান করিয়াছে, মদ্য দেখিলেই তাহার মদ্য পানের ইচ্ছা হয়; সেই জন্য ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

"প্রবৃত্তিরেষা জীবানাং নিবৃত্তিচ মহাফলা।"

যাহা হউক আমি বুঝিতেছি তুমি নিবৃত্তি মার্গে উঠিতেছ। এস আমরা এই পুষ্করিণীর ঘাটে স্নান পূজাদি সম্পন্ন করি।' ইহা কহিয়া সেই পুষ্করিণীর ঘাটে স্নান পূজাদি সম্পন্ন করিলেন।

ক্রমশঃ

পয়লা আষাঢ়।

(গল্প)

লেখক,—শ্রীযুক্ত জীবঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

(১)

বর্ষাকাল, সকাল হইতেই টীপ্ টীপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সৈকাল হইয়া আসিল, তবুও জল ছাড়িবার কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছিল না। কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে কোনও বিখ্যাত কলেজের একটী মেসের ঘরে বসিয়া কতক গুলি ছাত্র জটলা করিতেছিল। সে ঘরে যতগুলি ছাত্র ছিল একজন ভিন্ন সকলেই B A, Class এ পড়ে। তাহাদের মধ্য হইতে রমেশ নামক এক যুবক উদ্বিগ্ন ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "না ভাই আর ভাল লাগে না। সেই সকাল থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, এখনও থাম্‌বার নামটী নেই গা! এঃ—আজকের রবিবারটা বৃথাই গেল দেখ্‌ছি। সীনেমায় আজ চার্লী চ্যাপ্‌লীনের সিনটা দেখে আসব মনে করেছিলুম, বাদলায় তা' আর হল উঠ্‌ল না দেখ্‌ছি।"

"তুই সীনেমা সো-ই দেখ্‌বি; এই বছরেই তুই Science থেকে arts এ এসেছিস কিনা, বর্ষা তোর ভাল লাগ্‌বে কেন? বর্ষার মধ্যে যে কতটা কবিত্ব আছে, কতটা প্রাণ আছে, তা তোর মত fool কি appreciate কর্ত্তে পারে! আহা! কবি যথার্থই বলেছেন—

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়॥"

একজন যুবক চৌকীতে আড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া পা নাচাইতেছিল। এক্ষণে সে লাফাইয়া শয্যায় বসিয়া বলিল, "বেশ বলেছিস, কালিদাস Bravo! তোর মুখে রবিবাবুর Poetry শুনলে আমার মনে হয়, আমি যেন ঠিক তাকে চোকের সাম্‌নেই দেখ্‌ছি। ওটার সঙ্গে কথা কয়ে কি হবে ভাই, ও কি একটা মানুষ? চিরকালটা Cos আর Log করেই কাটিয়েছে।"

কালিদাস চেয়ারে হেলান দিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হীরেন এ লোকের মধ্যে তুইই কেবল আমায় discover করেছিস্, দুঃখ এই যে, আ কেউ চিন্‌লে না।"

সম্মুখেই অন্য ঘরে কয়েকটী ছাত্র একটী থালা বাদলা দিনের খাবার' চাল কড়াই ভাজার সদ্ব্যবহার করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে 'হার্ট' ডায়মণ্ড' প্রভৃতি শব্দে চীৎকার করিতেছিল। বিজয় তাহাদের দিকে একবার লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া রমেশের পক্ষে বলিয়া উঠিল, 'ওরে Cos আর Log বলে ত ঠাট্টা কচ্ছিস্, কিন্তু এই Cos আর Logই এই twentieth centuryর জগৎটাকে চালাচ্ছে তা জানিস? একটা জাতির সভ্যতা আজকাল বিজ্ঞানের মাপ কাঠিতে মাপা হয়। তোদের কথার কি কোনও দাম আছে, A set of idies! আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে যে বলিস্—

What are all those kissings worth
If thou kiss not me.

বলত দেখি, এতে কার কি উপকার হবে?"

আর একটু খোঁচা দিবার জন্য রমেশ বিজয়ের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "অথবা ঐ যে শ'চে হতভাগাটা উঠমুখো হয়ে টেবিল চাপ্‌ড়ে গাধার মত চেঁচাচ্ছে—

"যদি তুমি না দেখা দাও কর আমায় হেলা।
কেমন করে কাটবে বল আমার বাদল বেলা॥"

বলত দেখি, জগতের এতে কি মহদুপকার সাধিত হবে?"

গায়ক এতক্ষণ তন্ময় হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া প্রাণের আবেগে গাহিতেছিল। এক্ষণে নিজেকে কোন জন্তু বিশেষের সমশ্রেণীভুক্ত শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল; রমেশের দিকে একটা রোষ কষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "বিজয়, তোর উপাধি 'হাতী' বলে ঈশ্বর তোর বুদ্ধিটাকেও হাতীর মতন করে দিয়েছেন। B. A. পড়ছিস এখন, মানুষ হ'বার চেষ্টা কর। Science ছেড়ে Artsএ এসেছিস, একবার বর্ষাটাকে চিন্তে শেখ। বর্ষার অপরূপ beauty appreciate কর্ত্তে পারিস বা না পারিস, অন্ততঃ লোকের সামনে তুই নিজেকে বর্ষা ভক্ত বলে প্রচার করিস। সেই আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" থেকে আরম্ভ করে যুগে যুগে কত কবি যে বর্ষার রূপ বর্ণনা কর্ত্তে গিয়ে তাঁদের কবিতা ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজী বর্ষার পায়ে ঢেলে দিয়ে ধন্য হয়েছেন, তা আগে জান, তার পর আমার গানের মর্ম্ম বুঝবি।" বসিয়া পড়িয়া শচীন বাতায়ন পথে উদাস দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া টেবিলের উপর পা দুইখানি তুলিয়া দিয়া পুনরায় গাহিতে লাগিল,—

"হেরিয়া শ্যামল ঘন নীলগগনে,
(কার) সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।"

বিজয় প্রতিশোধ লইবার জন্য সারসের মত লম্বা ঘাড়টাকে উঁচু করিয়া যোড়করে বিনীত ভাবে বলিল, "শচিন, ভাই — রবিবাবুর এ গান গুলো লেখা স্ফূর্ত্তি রঞ্জনের জন্য, শ্রুতি বিদারনের জন্য নয়।"

বিজয় একটুতেই চটিয়া যায়; সুতরাং তাহাকে চটাইবার জন্য শচীন কিছু উত্তর করিবার পূর্ব্বেই বন্ধুরা হাত তালি দিয়া বলিল, "Bravo শচীন! hear! hear! শচে, তুই ভাই একখানা গীতাঞ্জলি লিখে ফেল, আমরা চাঁদা করে ছাপিয়ে দেব।"

বন্ধুদের এই উল্লাসে বিজয় আরও চটিয়া উত্তর করিল, "তোদের সব dispeptic nature কিনা, তাই বসে বসে কতকগুলো আজগুবী খেয়াল দেখিস আর Acqua Ptychotis এর শ্রাদ্ধ করিস। আমার ত আর সে গোল নেই তাই ওসব গাঁজাখুরী কথা ভাবি না।"

রমেন বলিল, আচ্ছা, আমায় বুঝিয়ে দে দিখিন্ কিসে তোরা Poetryর এত ভক্ত। বুঝতে পাল্লে নিশ্চয়ই আমিও তোদের দলে যোগ দেব। আমার মতে — Poetry is nothing but a collection of sweet sonorous words arranged in rythmical order, to gratify our sence of hearing.

কালী তখন তাহার কামান গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, এ তো তোর Geometry নয় যে বুঝিয়ে দেব, এ কবিতা। কবিতা বুঝতে গেলে প্রাণ চাই। তোদের যে সেই জিনিষটারই অভাব।"

কালীর কথা শেষ হইতে না হইতেই হীরেন বলিল, তোর মত অরসিককে কবিতা বোঝাব কি করে? অরসিকেষু রসং বিধি মা লিখ।' কবিতা কি তুই বুঝবি? আহা, পণ্ডিতেরা যথার্থই বলেছেন, —

কবিতা কোমল বণিতা —
স্বসম্মতি রসিকং রসেন মিলিতা।"

এইরূপ ঝগড়া যে কতদূর গড়াইত, তাহা বলিতে পারি না, সহসা Water-proof গায়ে ভিজা জুতা পায়ে এক দীর্ঘ যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ভিজা Water-proof হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছিল। Water-proofটী একটি হুঁকে টাঙাইয়া রাখিয়া সম্মুখস্থ একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া আগন্তুক যুবকটী বসিয়া পড়িল।

কালিদাস যুবকটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "কি বাবা দ্বিজু Homoeopathy dose এর মতন এত dilluted হয়ে এলে কি করে? তা দেখ, ও গরম আসরে তোমার Pulsatila জমছেনা, Mother tintureখাকে ত বের কর।"

দ্বিজু ওরফে দ্বিজেন্দ্র কোনও উত্তর না করিয়া পকেট হইতে একখানি Photo বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। Photo খানি এক আনন্দা সুন্দরী কিশোরীর। একখানি লালপেড়ে শাড়ী পরিয়া, সদ্যস্নাত চুলগুলি এলাইয়া দিয়া সাজি হাতে ফুল তুলিতে যাইতেছে — এই অবস্থায় কিশোরীটীর ফটো তোলা হইয়াছে। ফটোটীর এক কোণে ছোট করিয়া লেখা — 'কনক-লতা।' ফটোটী হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল। যুবকবৃন্দ হাঁ করিয়া ফটো খানি দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হীরেন বলিল, "আহা — সুন্দর বটে। 'জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।"

দ্বিজেন্দ্র পাঞ্জাবীর আস্তেন গুটাইতে গুটাইতে বলিল, "রাস্কেল, ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে বুঝে কথা ক।"

কালী বলিল, "কেন, ও আর এমন কি বলেছে? ভগবান মানুষকে সৌন্দর্য্য উপভোগের যে, প্রবৃত্তি দিয়েছেন ও সেই ক্ষমতাই ব্যবহার কচ্চে বৈত নয়। গোলাপ গাছে একটী সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটেছে, তোমার সৌন্দর্য্য উপভোগক্ষম চক্ষু অমনই বলে উঠল, "বাঃ — কি সুন্দর ফুল। তাতে তোমার কোনও দোষ হয় না। দোষ হয় কখন, না যখন সকলের সৌন্দর্য্য উপভোগে বাধা দিয়ে ফুলটীকে তুমি নিজস্ব করে নিতে চাও। যেখানেই স্বার্থ, সেই খানেই দোষ। তা যাক, এখন জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি যে, এই অপূর্ব্ব সুন্দরী কিশোরীটি কে?"

নবীন গোঁফের কোণে একটু খানি হাসি খেলাইয়া চোখ দুটা মিট্ মিট্ করিতে করিতে দ্বিজেন বলিল, "বলব কেন? তুই guess কর না।"

শচীন নব বিবাহিত, তাহার প্রাণে সর্ব্বদাই আনন্দের ঢেউ খেলিতেছে। চট করিয়া সে বলিল, "ওরে Photo খানা দ্বিজের would-beর।"

'তাই নাকি রে, তাই নাকি রে' — করিতে করিতে প্রায় ডজন খানেক যুবক উৎসাহ ভরে দ্বিজেনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, দ্বিজেন তখন পরম উদাসীন্য সহকারে বলিতে লাগিল, "হাঁ, আমার would-beরই বটে। ১১ই আষাঢ় আমার ripe-seeing আর ২১শে বিয়ে। তোদের ভাই কিন্তু সকলকেই যেতে হবে। বেশী দূর নয়, এই ভবানীপুরে।"

যুবকবৃন্দ চীৎকার করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! Hip—Hip—hurrah; three cheers for our Dwiju—three cheers for our Dwiju's would-be. Dwiju and his would-be for ever.

তাহাদের এই আনন্দ কোলাহল শুনিয়া পার্শ্বের ঘর হইতে কয়েকজন যুবক তাহাদের ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে তোদের কি হয়েচে?" দ্বিজেনের বিবাহ শুনিয়া এই নবাগতরাও আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্য হইতে সুধীর নামক একজন যুবক বলিল, ভাই দ্বিজু তোর বিয়েতে কিন্তু আমরা Play কর্ব্ব, তোকে ভাই সব খরচ দিতে হবে। 'পদ্মিনী' খানা আমাদের Re-hearshal দেওয়াই আছে। এমনি উজীরের Part কর্ব্ব দেখবি যে Parilion ও সে রকম কর্ত্তে পার্ব্বে না।"

তারক সম্প্রতি University Instititute এ Recitation competition এ প্রাইজ পাইয়াছে, সে গর্ব্বোন্নত শিরে বলিল, "আমি নসীবনের Part কর্ব্ব।"

তখন আর আর সব Part selections হইতে লাগিল। কবি কালিদাস তখনই একটা পকেটবুক ও পেন্সিল লইয়া জানালার দিকে হা করিয়া চাহিয়া কবিতা লিখিতে বসিল। অমনি দ্বিজেনের সহপাঠি সে আসিয়া তাহাদের মিত্র স্কুলে কিছু চাঁদা দিবার জন্য দ্বিজেনকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। নানাপ্রকার গণ্ডগোলে ঘরটি বেশ সরগরম হইয়া উঠিল। সেই কোলাহলের মধ্যে হোষ্টেলের দরওয়ান একটী চিঠি আনিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া গেল। রমেন চিঠিটা খুলিয়া পড়িল,—

To the Fourth year Student,

College—Hostel.

No ..., Cornwallis Street,

Local.

প্রাণের বন্ধুরা—

১লা আষাঢ় আমার বিয়ে। হঠাৎ তাড়াতাড়ি হয়ে গেল ভাই। নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ কর্ব্বার সময় পেলুম না। এ জন্যে তোরা কিছু মনে করিস্ না ভাই। ১লা তারিখে সন্ধ্যা ৭॥• মধ্যে ... নং চোরবাগান লেনে আমার বাড়ীতে অবশ্য অবশ্য আসবি। মেয়ের বাড়ী খুব কাছেই। আসা চাই, ইতি—

তোদের স্নেহমুগ্ধ—ভবেশ।

শচীন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "দ্যাখ, একটা কথা আছে না, misfortune never comes alone—আমি বলি যে এর converseটাও true—good fortune never comes alone.

রমেন বলিল, "তা হলে ঠাকুরকে ডেকে আমাদের চাল নিতে বারণ করে দিই?"

'অবশ্য অবশ্য' বলিয়া বিজয় চীৎকার করিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিল।

কালিদাস পেন্সিল ফেলিয়া উঠিয়া মুখ ভেঙ্গচাইয়া বলিল, "দ্যাখ দিখি বিজয়, তোরা Science man, Poet এর সম্মান দিতে জানিস্ না; বিকট চীৎকারে আমার সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলি। কি রকম Poetry লিখচি শোন দেখি,—

চির নির্জ্জন শয্যায় তুমি নবালতা, এযে নূতন সোনালী স্বপ্ন।
তবে জাগলো রূপসী! বহিয়া যায় যে গোলাপ জাগানো লগ্ন॥

নবাগতদের মধ্যে তারাপদ নামক এক যুবক বলিয়া উঠিল, "আহা, এ যে Unique production. Tagore would have been proud of such a production."

এমন সময় মেসের ঠাকুর আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বিজয় মুরুব্বী চালে Order pass করিল, দ্যাখ ঠাকুর, আজ আমাদের এক বন্ধুর বিয়ে। এ ঘরে যে কজনকে দেখচ, সকলেই নেমতন্ন যাবে। আমাদের জন্য আজ আর রাঁধতে হবে না, বুঝলে?"

অমূল্য বলিল, "ওরে, রাঁধতে ত বারণ করে দিলি, Superintendant এর permission পাবি ত?"

সুনীত বলিল, "ওহে বীরু, তুমি একটু চেষ্টা কর না ভাই।"

সুধীর বলিল, "না, না—এ কারুর কাজ নয়। চৈতন Superintendant এর favourite Student। চৈতনই এ কাজ পার্ব্বে। যা না ভাই চৈতন।"

চৈতন ওরফে চৈতন্যচরণ একজন Science Student। এত গুলি Arts Student এর মধ্যে তাহার নীরব থাকাই শ্রেয় বুঝিয়া সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে সুধীর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সে চিঠিখানা লইয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ মধ্যেই permission লইয়া আসিল।

যুবকদল permission পাইয়া স্নো, ক্রীম পাউডার, লোশন, তায়েল প্রভৃতি লইয়া বকরব করিতে করিতে বনতেরার দিকে চলিয়া গেল। যাইবার সময় কালী জিজ্ঞাসা করিল, চৈতন, তুই যাবি ত?"

ছোট্ট একটা 'হু' বলিয়া চৈতন পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বেশভূষা করিয়া বন্ধুরা দলবদ্ধ হইয়াবাহির হইয়া গেল।

(২)

হেদুয়ার মোড় হইতে বিডন ষ্ট্রীট ধরিয়া আমাদের পূর্ব্বোক্ত দলটী গল্প গুজব করিতে করিতে এসেন্সের গন্ধে দশদিক আমোদ করিতে করিতে চলিতেছিল। তাহাদের উচ্চ হাস্যরোলে রাস্তাটী সরগরম হইয়া উঠিতেছিল। সেন্‌-টাল এভিনিউএ পড়িয়া তাহারা ধীরে ধীরে দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; আজব সহর কলিকাতা তখন এক অপরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সমস্ত দিন বর্ষণের পর কিছুক্ষণ হইল বৃষ্টি ধরিয়াছে। সুদীর্ঘ সেনটাল এভিনিউএর বুকে তাড়িতালোক গুলি শোভা পাইতেছে।

সহসা [redacted] রৌশন চৌকী বাজিয়া উঠিল। যুবকেরা কথা বার্ত্তা বন্ধ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে শুনিতে যাইতেছিল। রৌশনচৌকী তখন সাহানার তান ধরিয়াছে; মিলনের সেই মধুর রাগিণী বিরহীদের প্রাণে হাহাকার জাগাইয়া দিতেছিল। আলাপনটী থামিয়া গেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুধীর কতকটা আপন মনেই গাহিয়া উঠিল,—

"তুমিও একাকী, আমিও একাকী, আজি এ বাদল রাতে।"

হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে কালিদাস বলিল, "আহা হা কি দুঃখু, তা ভাই আমাদের কাছে কেঁদে কি হবে? বাপ্ মাকে বলে একটা বিয়ে কর্ব্বার বন্দোবস্ত করে ফেল না?"

সুধীর ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "আর ভাই সে চেষ্টা কি না করেছি? মাকে একটু এ বিষয়ে hint দিয়েছি, ঝগড়া করে যশোর পর্য্যন্ত পালিয়ে দেখেছি কোনও ফল হয় নি। বাবা আমার বিষয়ে বড় obstinate।"

হীরেন নাকিসুরে বলিয়া উঠিল, "আহা হা—

"আমার সে আশালতা অকালেই শুখাল।
আকাশ কুসুম সম আকাশেই লুকাল॥
বাইশ কাটিয়া গেল
তবু বিয়ে না হইল
বিফলে বসন্ত গেল বৃথা যায় বরষা"—

last lineটা কিরে? ভুলে গেছি।"

বন্ধুবর্গ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুধীর একটু লজ্জিত হইয়া উত্তর করিল, "তা ভাই তোরা হাসিস আর ঠাট্টাই করিস, যে ছেলে বিয়ে বিয়ে করে অন্ততঃ একবার মা ক্ষেপে, সে ছেলেই নয়।"

বন্ধুদের মধ্যে পুনরায় উচ্চ হাসির রোল উঠিল। ইতি মধ্যে যে বাটী হইতে রৌশনচৌকী বাজিতেছিল, যুবকেরা সেই বাটীর নিকট উপস্থিত হইল। বাটিটি কন্যাপক্ষীয়ের বাটী, কেননা ঠিক সেই সময় বর উপস্থিত হইয়াছে দেখা গেল। বাড়ীটা যে বড়লোকের তাহা সাজ সজ্জা দেখিয়াই বোধ হইতেছিল। প্রকাণ্ড আট ঘোড়ায় জুড়ী করিয়া বিপুল বাদ্যভাণ্ড ও আলোক সহকারে বর আসিয়াছে; সঙ্গে বরযাত্রীও বিস্তর। কন্যার পিতা মহাসমাদরে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া বরকে নামাইতে আসিলেন। বর গাড়ী হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল; অমনি উপর হইতে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আর এক ব্যাপার ঘটিল। বর নামিবামাত্রই একজন পুলিশ ইনপেক্টর দুইজন পাহারাওয়ালা সমেত বরের নিকটস্থ হইয়া এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরের নাম কি প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়?"

"আজ্ঞে হ্যা।"

"বাপের নাম হেমন্তকুমার?"

"আজ্ঞে হ্যা—কেন?"

ইনসপেক্টর আর কোনও কথা না বলিয়া বরের সম্মুখে আসিয়া বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাপ কর্ব্বেন প্রশান্তবাবু—চুরির অপরাধী বলে আমি আপনাকে arrest কল্লম, আপনি এখন আমার বন্দী, এই দেখুন আপনার arrest warient।"

দুইজন পাহারাওয়ালা বরের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল।

যদি সেই স্থানে সহসা বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও সমগ্র লোকেরা ততটা আশ্চর্য্য হইত না, যেমন এই অদ্ভুত খবর পাইয়া স্তম্ভিত হইল। সমবেত জনতার আনন্দ কোলাহল এক নিমিষেই অন্তর্হিত হইয়া গেল—জনতা চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। গবাক্ষপথে ও ছাদের আলিসায় ঝুঁকিয়া যে সমস্ত পুরমহিলারা উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতেছিল, তাহাদের হাতের শাঁখ হাতেই রহিল, মুখের উলু মুখেই মিলাইয়া গেল। সানাইয়ের উচ্চতান সহসা বিকট আর্ত্তরবে থামিয়া গেল। আর সব চেয়ে শোচনীয় অবস্থা হইল কন্যাকর্ত্তার। তিনি খানিকক্ষণ উদাস ভাবে ইনসপেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট ভাবে বলিলেন, "কি বল্লেন, প্রশান্ত—আমার জামাই কি করেছে?"

ইন্‌সপেক্টর বাবু বলিলেন, "আর জামাই বল্‌বেন না মশাই, ভগবানকে ধন্যবাদ দিন যে, আপনার কন্যা এক চোরের হাতে পড়েনি। সব কথা খুলে বলি শুনুন। এই প্রশান্তকুমার কলেজের ছাত্র ছিল। Academical Career এর খুব ভালই ছিল, কিন্তু B A. পাশ করে চুরি বিদ্যাকে বড় বিদ্যা বলে জেনেছিলেন, দলের সকলেই ধরা পড়েছে, কেবল দীনেন্দ্রকুমার কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তিকে পাওয়া যায় নাই। দলের লোকের কাছে দীনেন্দ্রের সন্ধান কর্‌লুম কেউ ত কিছু বলে না। শেষে অনেক কষ্টে জান্তে পার্‌লুম দীনেন্দ্র এখন নিরুদ্দেশ! তাদের কাছ থেকে আরও জান্তে পার্‌লুম যে দিনেন্দ্রের বাপের নাম হীতেন্দ্রনাথ এবং দীনেন কল্‌কাতার একটা কলেজ থেকে B. A. পাশ করেচে। সেই থেকেই ত মশাই দু বছর চারিদিকে খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে কলকাতায় এসে Collegeএ Collegeএ Enquiry কর্ত্তে লাগ্‌লাম। অনেক খোঁজাখুঁজীর পর কি রকম করে খবর পেলাম তা আর আপনাকে জানিয়ে কাজ নাই। খবর নিয়ে জানলুম যে ওরা নাম আর জাত ভাঁড়িয়ে ঐ বাড়ীতে বাস কর্চ্ছে, আর আজকে রাত্রে আপনার মেয়ের সঙ্গে দীনেনের বিয়ে। খবর নিয়ে আজকেই আপনার মেয়ে ও জাত রক্ষা কর্ত্তে ছুটে এসেছি। সমস্ত ঘটনা এখন শুনলেন ত? আশা করি এখন আর আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না।"

কন্যাকর্ত্তা হা করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "এ্যাঁ কিছু ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তবে কি আমার জাত ও মেয়ে দুইই যাচ্ছিল?"

ইনসপেক্টর বাবু বলিলেন, "বুঝুন মশাই, এখন যদি আমি arrest না কর্‌তুম, তবে দুঘণ্টা পরে আপনার দশা কি হত। সেই জন্যই কোনও Sacred perfomance রত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা নিয়ম না হলেও আপনার জন্যে আমি করেছি।"

কন্যাকর্ত্তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনৈক কন্যাযাত্রী বলিলেন, "বরের বাপ, বেটা গেল কোথা?"

বরের বাপ ও জনকয়েক বরযাত্রী ততক্ষণ গা ঢাকা দিয়াছেন। কন্যাযাত্রী তখন "মার মার" শব্দে অবশিষ্ট বরযাত্রীদের ঘিরিয়া দাড়াইলেন। গোল যোগ দেখিয়া ইনসপেক্টর ও পাহারাওয়ালাদ্বয় সহ তাঁহার বন্দী বরকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। চারিদিকে মহা কোলাহল হইতে লাগিল। বরযাত্রীরা বলিলেন, "মশাই, আমাদের ওপর ভার ঝাড়লে কি হবে? আমরা পাড়ার

লোক, নেমতন্ন হয়েছিল তাই এসেছি। বরত মশাই আমাদের পাড়ার লোক নয়, মাস খানেক এসে বাস কর্চ্ছিল। আচ্ছা আমরাই না হয় জান্তুম না, কিন্তু মেয়ের বাপ কি খবর না নিয়েই বিয়ে দিচ্ছিলেন?"

কন্যাকর্ত্তা বলিলেন, "কি জান মশাই, ঘটকটা বলেছিল নিকষ-কুলীন, তাই বিশ্বাস করে ছিলুম। আর ছেলেটাও লেখা পড়া জানে, দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল বলে পছন্দও হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে যে এত তা কেমন করে জানব মশাই।"

কন্যাপক্ষের পুরোহিত নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। এক্ষণে তিনি বলিলেন, "যা হবার তা ত হল; এদিকে লগ্ন যে উত্তীর্ণ প্রায়, জাত ত রক্ষে কর্ত্তে হবে?"

কন্যাকর্ত্তা বলিলেন, "তাইত কি করি, ভটচায্যি মশাই, আমার যে হাত পা এগুচ্ছে না।"

"তা বল্‌লে ত চল্‌বে না। দেখ এখানে স্বজাতীয় কে আছে। তার হাতে পায়ে ধরে তাকে কন্যা সম্প্রদান কর।"

"যা কর্ত্তে হয়, আপনি করুন, মশাই, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনা।" এই বলিয়া কন্যার পিতা বসিয়া পড়িলেন।

পুরোহিত মহাশয় তখন সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়রা এই ভদ্রলোক কিরূপ বিপন্ন হয়েছেন তা দেখতে পাচ্ছেন। এখন এই ভদ্রলোকের জাতি রক্ষা করা আপনাদের কর্ত্তব্য। আপনাদের মধ্যে যিনি এর স্বজাতি, তিনি দয়া করে এর জাতি রক্ষা করুন।"

সকলেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমাদের পূর্ব্বোক্ত যুবকদলটীও সেখানে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল। তাহাদের যে বরযাত্র যাইবার সময় হইয়া গিয়াছে, ইহা একবারও তাহাদের খেয়াল হয় নাই! পুরোহিত বার বার বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। তখন নিরাশ হইয়া তিনি বলিলেন, "তবে আর হোল না, লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়, আর মিনিট পনের বাকী।"

কন্যার পিতা হতাশ ভাবে বলিলেন, "এ্যাঁ আর পনের মিনিট আছে। কি কর্ব্ব ভট্‌চায্যি মশাই? ওঃ—ছবিরে, ছেলে বেলায় তুই মরে যাসনি কেন? তারপর জনতার দিকে চাহিয়া যোড়করে বলিলেন, "মশাইরা, আমি—আমি রমাপতি মুখুজ্যে, বাঙ্গলার সেরা কুলীন, আজ আপনাদের কাছে যোড় হাত

করে বল্‌ছি—আপনাদের মধ্যে যিনি আমার স্বজাতি—তিনি দয়া করে আমার জাত রক্ষা করুন।"

সমবেত জনতা তথাপি নীরব! সহসা আমাদের পরিচিত যুবকদল হইতে চৈতন্য অগ্রসর হইয়া কন্যাকর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মশাই আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন? আমার নাম শ্রীচৈতন্য চরণ চট্টোপাধ্যায়। আমার পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু নিতাইচরণ চট্টোপাধ্যায়, তিনি খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি কলেজে B. Sc 4th year Classএ পড়ি। আমার যতদূর ধারণা, তাতে আমার বোধ হয়, আমরা আপনাদের পাল্‌টি ঘর।" এই বলিয়া সে আপনাদের বংশ পরিচয় প্রদান করিল।

ইতি মধ্যে চৈতন্যের সঙ্গীরা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। তাহারা চৈতন্যের কথার সমর্থন করিল। রমাপতি বাবু বলিলেন, "বাবা, এ কথা যে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার ছবির কি এমন ভাগ্যি হবে?"

চৈতন্য বলিল, "দেখুন, আমি প্রস্তুত আপনার অমত না থাকলেই হল।"

"অমত? সেকি বাবা? আজ তুমি যে কাজ কচ্ছ, তাতে আমি আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি তুমি রাজরাজেশ্বর হবে।"

পুরোহিত বলিলেন, "তবে আর বিলম্বে কাজ নাই।" 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই' বলিতে বলিতে সকলে বরকে আসনে লইয়া গিয়া বসাইলেন। শুভক্ষণে রমাপতি বাবুর কন্যা ছবির সহিত চৈতন্যের বিবাহ হইয়া গেল। যখন কন্যা সম্প্রদান হইতেছিল, তখন সুধীর বন্ধুদের বলিল, "দ্যাখ, তোরা ত Poetry আর Romance নিয়েই কাল কাটাস কিন্তু তোদের নিজের জীবনে কি কোনও Poetry বা Romance আছে। চৈতন Science Studeut, Poetry কিম্বা Romance এর ধারও ধারে না, কিন্তু বল দেখি, আজ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" ওর জীবনে Poetry ও Romance এর কত বড় সার্থকতা দেখা গেল। এমন কি আমাদের বরাতে কখনও কি ঘটবে? ভাগ্যি চাই—ভাগ্যি চাই। কি বল্‌ব আমি কায়েত নৈলে চৈতন্‌কে ফেলে দিয়ে আমি ঐ পীড়ের গিয়ে বসতুম!"

সকলে নীরবে কথাটা স্বীকার করিয়া লইল।

* * * * * *

তারপর দিন সকলে বরবধু লইয়া চৈতন্যদের খুলনার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বন্ধুরা মনে করিয়াছিল যে চৈতন্যর পিতা মাতা উহাকে খুব তিরস্কার

করিবেন। কিন্তু তাহাদের ভুল ধারণা। নিতাই বাবু সমস্ত শুনিয়া পুত্রের মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তুমি মানুষের কাজই করেছ বাবা! বিপন্ন ব্রাহ্মণের জাত রক্ষা করেছ। আজ পুত্র গর্ব্বে আমার বুক খানা ফুলে উঠ্‌ছে।" চৈতন্যের মাতাও যোগ্য স্বামীর যোগ্যা স্ত্রী। তিনি আদর করিয়া বধূবরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। বাড়ীর আত্মীয় স্বজনও বধূর অলোকসামান্যরূপ ও প্রচুর অলঙ্কার প্রভৃতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল।

আর আমাদের যুবকদলটী সাতদিন খুলনায় থাকিয়া প্রচুর ভোজন ও আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

ভবেশ প্রথমে বন্ধুরা না যাওয়াতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল কিন্তু সমুদয় ঘটনা শুনিয়া তাহার রাগ পড়িয়া গেল।

সমালোচনা।

অঞ্জলি। (গীতি কাব্য) বৈদ্যাচার্য্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায় এম, বি, বিরচিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

আমরা এই পুস্তকে প্রকাশিত কবিতা গুলি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম! কবিতা গুলি সুখপাঠ্য নব্য-কবি সম্প্রদায়ের আদর্শে কষ্ট-কল্পনা প্রসূত নহে। অঞ্জলির একটি কবিতা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

আমি—চাহিনা তোমার সিদ্ধি মুক্তি চাহিনা'ক তব বর।
আমি—জানিনা'ক প্রভু কৃষ্ণ বিষ্ণু জানিনা'ক হরি হর॥
নাহিক হৃদয়ে ভেদাভেদ মম নাহিক আপন পর।
আমি—অসীমে সসীম করেছি ভুবন করেছি বিজন ঘর॥
বুঝিনা ধরার স্নেহ ভালবাসা বুঝিনাক দু'খ সুখ।
আমি—ধরেছি তোমার করুণার ধারা ধরেছি পাতিয়া বুক॥
ঝরিছে অমিয় অবিরল ধারে ঝরিছে করুণা রাশি।
আমি—তোমার নামেতে তোমার গানেতে ভাবের সাগরে ভাসি॥
ত্রিকুটী হইতে উঠিছে সতত মধুর মুরলী তান।
আমি—যতনে ধরিয়ে গেঁথেছি হৃদয়ে মিলায়ে মধুর মান॥
মুরলী সুতান শুনিয়া পরাণ আকুল হইয়া ছুটে।
আমার—মনের প্রবল প্রবাহ সকল ভাসিয়া আসিয়া টুটে॥

দীন ভাবে আছি দীন ভাবে যা'ব শেষের সে দিনে চ'লে।
আমি—লইব শরণ তোমার চরণ দীন দয়াময় ব'লে॥
মায়ার মায়ায় জড়িত ধরায় নহেক আমার গেহ।
মিলি—ক্ষিতি অপ-তেজে-মরুত আকাশে নহেক আমার দেহ॥
বিদেশ হইতে বিদেশে আসিয়া বিদেশী হয়েছি আমি।
আমার—অবনী আবাস নহেক নিবাস সুদূর প্রবাস ভূমি॥
কঠোর কুলিশ সমান প্রবাসে সারাটী জীবন থাকি।
তুমি—ভিষক্-কবির পূরাও বাসনা ত্রিদিব নিলয়ে রাখি॥

এরূপ কবিতাপাঠ করিলে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়, প্রাণ উদার ও বিশ্ব প্রেমে পরিপূর্ণ হয়।

দিক্‌ভুল। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লেখকের নাম নাই। পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। প্রত্যেক হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির এই পুস্তকখানি পাঠ করা ও আচার অনুষ্ঠানে যাহাতে দিক্‌ভুল না হয়, তদনুসারে চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রাপ্তি স্বীকার।

স্থায়ী দেওয়াল পঞ্জিকা। সুবিখ্যাত কাগজ বিক্রেতা ভোলানাথ দত্ত কোম্পানীর নিকট হইতে আমরা দৈনিক পরিবর্ত্তনীয় তারিখ, বার, মাস-যুক্ত একখানি স্থায়ী ক্যালেণ্ডার উপহার পাইয়াছি। এরূপ সুদৃশ্য প্রয়োজনীয় পঞ্জিকা গৃহে থাকিলে গৃহস্থের সর্ব্বদাই উপকারে আইসে; আমরা এই পঞ্জিকা দাতা ভোলানাথ দত্ত কোম্পানির ব্যবসায়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

Medical Diary 1924. আমরা ভুবন বিখ্যাত মিষ্টার বি, কে, পাল এণ্ড কোম্পানীর উক্ত মেডিকেল ডায়েরী উপহার পাইয়াছি। ডায়েরী খানির ছাপা, বাঁধাই অতি সুন্দর, নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। রোগের ঔষধ ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের নাম ও ঠিকানা এই ডায়েরীতে প্রকাশিত হইয়াছে। চিকিৎসক ও গৃহস্থের এই ডায়েরী খানি যে বিশেষ উপকারে আসিবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

সর্ব্ব বিজয় কবচ মূল্য ১।০

ইহার গুণ অত্যাশ্চর্য্য, অতুলনীয়, দৈবশক্তি সম্পন্ন, বর্ণনাতীত। শাস্ত্র হইতে একটী শ্লোকের কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"সর্ব্ব গ্রহ প্রশমনী নিঃশেষ বিষনাশিনী। জয়ং সর্ব্বত্র কুরুতে ধনদা সুমতিপ্রদা॥"

অর্থাৎ ইহা দ্বারা সকল প্রকার গ্রহদোষ প্রশমিত হয়, শরীরের বিষ নাশ হয়। সর্ব্বত্র সকল কার্য্যে জয়লাভ হয় এবং সুমতি হয়। পৃথিবীতে সৎপথে সুস্থ শরীরে থাকিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন দ্বারা অল্প দিনে সুখী ও ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া যায়।

প্রশংসা পত্র!

ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম ও হেল্‌থ অফিসার মহোদয়গণের—

সুবিখ্যাত সর্ব্বজন সুপরিচিত ডাক্তার প্রোফেসার পি, কে, রায় মহাশয় ১৫৯ নং অগস্ত্যকুণ্ড কাশীধাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার কোন বন্ধু আপনার কবচ ধারণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বরকমেই দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন ও আপনার কবচ ভারতে চিরদিন সমভাবে বিরাজ করিতে থাকুক।

কলিকাতা ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের সুবিখ্যাত ডাক্তার কে, এন, বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—যখন আমি পিডং হাসপাতাল দার্জ্জিলিংএ ছিলাম, সেই সময় একটি কবচ পাইয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি।

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সেন টিপনিং টি ষ্টেট হইতে লিখিয়াছেন—আপনার কবচ ধারণে ভাগ্য বিশেষ সুপ্রসন্ন হইয়াছে।

ডাক্তার জে-এন-রায় এল আর সি-পি-এল (এডিন) ডি-পি-এইচ (লণ্ডন) আগ্রার হেল্‌থ অফিসার ২নং ট্যাংরা রোড কলিকাতা হইতে লিখিতেছেন—আপনি যে দুইটি মাদুলী পাঠাইয়াছিলেন, তাহার অতি আশ্চর্য্য ও পরমহিতকর ফল হইয়াছে।

ডাক্তার ফামরোজ আর-কে হামিক এম-সি-বি-এস গ্র্যাণ্ট রোড বোম্বাই হইতে লিখিতেছেন—আপনি আগে যেরূপ মাদুলী পাঠাইয়া ছিলেন, সেইরূপ আর ৩টী মাদুলী পাঠাইবেন। বাস্তবিকই ইহা বিশেষ উপকারী।

ক্যাপটেন এ-সি রায় আই-এম-এস-মেডিকেল অফিসার উজিরা-স্থান লিখিয়াছেন—কয়েকমাস ধরিয়া সর্ব্ববিজয় কবচ ব্যবহার করিতেছি এবং কয়েক বিষয়ে সফলকামও হইয়াছি পত্র মধ্যে ১০৲ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া ২টী তামার কবচ আরও পাঠাইয়া দিবেন।

কবিরাজ শ্রীতারাপ্রসাদ সেন (সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত) কবিরঞ্জন গুরুপদতীর্থ ডিব্রুগড় লিখিতেছেন—আমি অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে অরঞ্জিত ও অতীব সত্যঘটনা এই যে, "সর্ব্ববিজয় কবচ" আমাদের পরিবারবর্গ ধারণ করিয়া আশাতীত অচিন্তনীয় সুফল পাইয়া সানন্দ চিত্তে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে—একজন বাত ও পুরাতন বিষম জ্বর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। অপর একজন অভিলষিত গচ্ছিত ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর একজন স্বীয় স্বাধীন ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে। সত্যকথা এই আবহমান কাল হইতেই "সত্যমেব জয়তে"।

প্রাপ্তিস্থান—মহাযোগেশ্বরী আশ্রম।

২।৩ রামকৃষ্ণ লেন রাগবাজার, (বাজারের নিকট) কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রাণিমাখান

সুন্দর মুখখানি

কিসে হয়, ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। এককাশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৶০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী ব্যাধিতে অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ॥৶০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

২৯শ, বর্ষ] মাঘ, ১৩৩০. [১০ম, সংখ্যা

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুড়ানো মাণিক	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়	২৮৯
২।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৯৩
৩।	বিশ্বদেব বাদ	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ	২৯৮
৪।	শ্যামা-মা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	৩০৭
৫।	কাব্যে-সংযম	শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ	৩১৩
৬।	স্বর্গীয় পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	...	৩১৮
৭।	সমালোচনা	...	৩২০

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত

Phone 388 Barabazar. 10-5-24

রেরম জারমলীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

মূল্য ॥০, ডজন ৫৲, গ্রোস ৫০৲, পাইকারী দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

আর, গোভিন এণ্ড কোং, হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Telegram:—GERMALINE. Telephone No. 1388

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "জিজীপিরান"

টেলিফোন নং: ২৭১৫ বলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

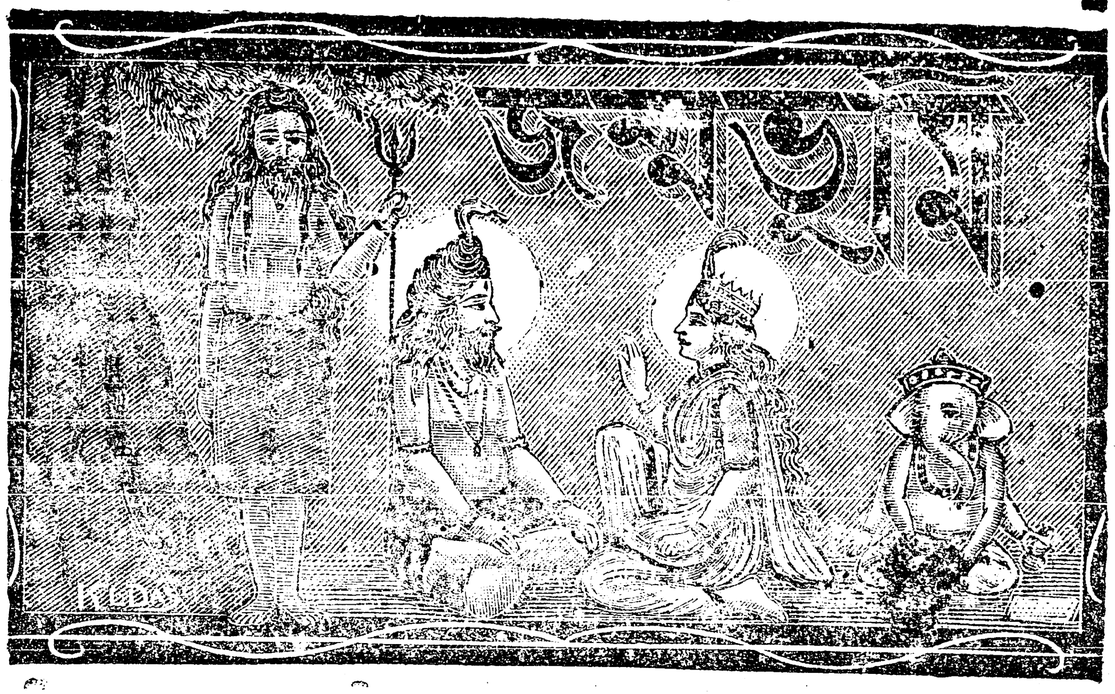

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৯শ, বর্ষ। } ১৩৩০ সাল, মাঘ। { ১০ম, সংখ্যা।

কুড়ানো মানিক।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়।

(Imitation of Christ অবলম্বনে।)

কাজ করিবার সময়ই ভাবিবে সেই সর্ব্বজ্ঞ বিচারকর্ত্তার সম্মুখে যে দিন দাঁড়াইতে হইবে, সেদিন তজ্জন্য তোমাকে ভয়-বিহ্বল হইতে হইবে কিনা। মিথ্যাছলনা তাঁর নিকট ধরা পড়ি,, তিনি তোমার দানে তুষ্ট হইবার নহেন।

ওহে হতভাগ্য পাপাধম—মানুষের ভ্রুকুটিতে তুমি স্থির হইয়া থাকিতে পারনা, আর যিনি তোমার সমুদায় পাপের সংবাদ জানেন তাঁহার নিকট তুমি কি জবাব দিবে?

তুমি শেষ দিনের সম্বল কেন দিন থাকিতেই বাঁধিয়া লওনা,—সে দিনত

তোমায় কেউ সাহায্য করবে না, যার যার নিজের বোঝা লইয়াই সে ব্যস্ত থাকিবে।

তুমি এখন যদি পরিশ্রম কর সেটা বিফলে যাইবে না। তোমার কাতর ক্রন্দন তাঁহার কর্ণে এখন সহজেই পৌঁছিবে। দুঃখ কষ্টেই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যে যত সহিষ্ণুতার সহিত উৎপীড়ন সহ্য করিবে এবং আত্ম নির্য্যাতনের কথা না ভাবিয়া অপরে যে তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া অন্যায় কর্ম্ম করিতেছে তজ্জন্য চৈতন্যদেবের ন্যায় দুঃখ প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হইবে, এবং শত্রুরও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিবে, যে অন্যের নিকট ক্ষমা চাহিতে ইতস্ততঃ করিবে না,—যে ক্রোধের পরিবর্ত্তে ক্ষমা প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছে, যে দেহটীকে পবিত্র রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারই সর্ব্বাগ্রে প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। ইহকালে দেহটী পাপযুক্ত করা যত সহজ, পরকালে তাহা করা কখনই তত সহজ নহে।

এই দেহটার প্রতি আমাদের অতিমাত্র আসক্তি বশতঃ আমরা নিজেই প্রতারিত হইতেছি।

সেই দিন পাপের দণ্ড ভোগ অবশ্যম্ভাবী। বন্ধু বান্ধব কেহই সেখানে তোমার সান্ত্বনার জন্য দণ্ডায়মান হইবে না। কাজেই এখন তোমার পাপ কর্ম্মের জন্য অনুশোচনায় যত অধিক সময় দিতে পার ততই তুমি শেষ বিচারের দিন তুমি তত বুক ফুলাইয়া ভাগ্যবান পুরুষদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে।

সেদিন যাহারা সংসারে ধর্ম্ম ও সত্যপথে বিচরণ করিয়া নির্ব্বোধ আখ্যা লাভ করিয়াছে, তাহারাই বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত হইবে, ধর্ম্মের জন্য যে যত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে, সেদিন তার তত আনন্দ জন্মিবে, সেদিন ধার্ম্মিকেরই আনন্দ হইবে, এবং অধার্ম্মিকের দুর্গতির একশেষ হইবে। সেদিন যাহারা দৈহিক নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে, তাহারাই বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিক আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করিবে।

সেদিন হর্ম্ম্যবাসী অপেক্ষা কুটীরবাসীরই অধিক আদর হইবে, সেদিন মলিন পরিচ্ছদই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এবং উজ্জ্বল পরিচ্ছদ মলিন দেখাইবে।

সদা-সহিষ্ণুতার নিকট জগতের সকল শক্তিই পরাজয় স্বীকার করিবে। সেদিন সংসার বুদ্ধি অপেক্ষা বিনম্র বশ্যতাই অধিক প্রশংসিত হইবে। সেদিন বিশুদ্ধ এবং সরল অন্তরই মানুষকে উচ্চ দর্শন অপেক্ষা অধিক আনন্দ দান

করিবে। সেদিন ধনতৃষ্ণাই ঐহিক সকল ধন অপেক্ষা আমাদের অধিক কাজে আসিবে। সেদিন সুস্বাদু দ্রব্য ভক্ষণ অপেক্ষা ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনাই আমাদিগকে অধিক তৃপ্তি দান করিবে। সেদিন তুমি দীর্ঘকাল বৃথা বাক্যব্যয় অপেক্ষা বাক সংযমের জন্যই অধিক আনন্দ লাভ করিবে। সেদিন মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ অপেক্ষা পবিত্র কার্য্যের জন্যই অধিক লাভবান হইবে।

এখন সামান্য কারণেই ক্লেশ সহ্য করিতে চেষ্টা করিও, যেন ভবিষ্যতে অধিক ক্লেশ সহ্য করিতে না হয়।

ভগবৎ প্রেম ও তাঁহার সেবাই একমাত্র কাজের কাজ। কায়মনোবাক্যে যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসিতে জানেন, তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণার ভয় কি, নরকের নাম শুনিলে তাঁহার প্রাণে আতঙ্ক আসিবে কেন? প্রকৃত প্রেম আমাদিগকে ভগবানের দিকেই টানিয়া তুলিবে। পাপে যাহার আনন্দ, মৃত্যুতে তাহার ভয় স্বাভাবিক।

যা হউক, যদি ভালবাসা তোমাকে পাপমুক্ত না করিতে পারে তবে ভয়ই তোমাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করুক। তবে ভগবানে প্রেম না থাকিয়া যদি ভয় থাকে তবে সে সব লোককে একদিন সয়তানের হাতে পড়িতেই হইবে।

ভগবৎ সেবায় সর্ব্বদা তৎপর হইবে ও তজ্জন্য সতত প্রস্তুত থাকিবে, এবং সময় সময় চিন্তা করিবে তুমি কেন এখানে আসিয়াছ, আর কেন তুমি সংসার ছাড়িয়া যাইবে। ঈশ্বরের আদেশে এখানে আসিয়া তুমি একটা ধর্ম্মজীবন যাপন করিবে ইহাই ইহ জীবনের উদ্দেশ্য নয় কি?

এমন কাজ কর যাহাতে পরিণামে তোমার লাভ হইবে, তবেই কোন দুঃখ ভয় তোমার পথে দণ্ডায়মান হইবে না। এখানে সামান্য পরিশ্রম করিলেই অন্তিমে চরম শান্তি লাভ করিবে। যদি তুমি তোমার সে কাজে তন্ময় হও, তবে পরমেশ্বরও অকাতরে মুক্তহস্তে তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন।

তুমি পরিণামে বিজয়ী হইবে এই আশা মনে পোষণ করিবে, কিন্তু বেশী আশা করিয়া বসিয়া থাকিলে তোমার কার্য্যে অলসতা আসিয়া পড়িবে, সাবধান।

একটা দুঃখভারাক্রান্ত-অন্তর লোকের হৃদয়ে ভয় আশার একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। শেষে দুঃখ ভার সহ্য করিতে না পারিয়া একটা ভজনালয়ে বেদীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া রহিল, ভাবিল আচ্ছা ঈশ্বর যদি আমাকে এযাত্রা রক্ষা করিতেন।

ঈশ্বর উত্তর করিলেন, "আচ্ছা যেন তুমি রক্ষা পাইলে, তাহা হইলে তুমি করিবে কি? তখন যাহা করিতে এখন তাহাই কর, তুমি নিরাপদ হইবে।" সে তাহাই করিল এবং সেই দিন হইতে আরাম বোধ করিতে লাগিল এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ করিল। সেদিন হইতে সে পার্থিব পদার্থের সন্ধানে ব্যস্ত না থাকিয়া ভগবানের প্রীতিকর কি তাহারই চিন্তায় মনোনিবেশ করিল, আর প্রতি কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে তাঁহাকেই সকল নিবেদন করিতে লাগিল।

ভগবানে বিশ্বাস কর এবং সৎকার্য্য করিয়া যাও, পৃথিবীতে তোমার ধনৈশ্বর্য্যের অভাব হইবে না।

অন্যের মধ্যে যাহা দেখিলে তোমার মনে বিরক্তির সঞ্চার হয়, তোমাকে যেন তাহাই কোন দিন ধরিয়া না বসে। অন্যের দোষ দেখিয়া নিন্দা করিবার পূর্ব্বে তোমার সেই দোষ আছে কিনা তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, অন্যের চক্ষে কিন্তু তোমার সামান্য দোষও গুরুতর বলিয়া ঠেকিবে।

ভগবানে সমর্পিতপ্রাণ ব্যক্তিদিগের কিছুরই অভাব থাকে না, ভগবানই তাহার একমাত্র কাম্যবস্তু।

ধর্ম্মজীবন যাপনে যাহারা অগ্রসর তাহারা যদি নিজেকে নিজে সংযত না রাখিতে পারে, তবে তাহার উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিই তাহার পতনের মূল হইবে!

কত ধার্ম্মিক লোক কঠোর জীবন যাপন করিয়া বাসনাকে সংযত রাখিতেছে, তাহারা নির্জ্জনতা ভালবাসে, সাধারণ খাদ্যে জীবন ধারণ করে সামান্য পরিচ্ছদ পরিহিত থাকে, অসাধারণ শ্রম করে, অল্প কথা বলিয়া থাকে, সামান্য নিদ্রা যায়, প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে, অধিকাংশ সময় পাঠে নিযুক্ত থাকে যতরূপে পারে আত্মশাসনে নিজকে সংযত রাখিয়া থাকে। ধার্ম্মিক লোকেরা আলস্যে দিন কাটায় না তবে আমরা জড়ভাবে বসিয়া থাকিব কেন?

আহা আমাদের যদি খাওয়া পরার দরকার না হইত আমরা ভগবানের নাম কীর্ত্তনে ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় দিন কাটাইতে পারিতাম তাহা হইলে এই রক্তমাংসপিণ্ড দেহটার সেবায় আমরা যে আনন্দ লাভ করিতাম ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক আনন্দ লাভ করিয়া আমরা জীবন ধন্য জ্ঞান করিতে পারিতাম!

যখন মানুষের এই অবস্থা ঘটে যে নিজের আরামের জন্য সে অপরের কাছে যাইতে চায় না, তখনই তন্মধ্যে ভগবৎভাব অঙ্কুরিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তখনই সে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। সুখে দুঃখে তখনই তাহার সমজ্ঞান হয়।

তুমি যদি আরামের মধ্যেও অস্বস্তি জ্ঞান কর, তুমি যদি কখনও শ্রমবিমুখ না হও, তবেই তোমার ধর্ম্ম লাভ হইবে. শারীরিক পরিশ্রমে ঘর্ম্ম বাহির হয় সত্য, কিন্তু পাপ প্রলোভন দমনে আরও অধিক শ্রম জন্মে।

সামান্য দোষও অবহেলা করিবে না, পরিণামে তাহাই ভীষণাকার ধারণ করিতে পারে, সতত সতর্ক থাকিবে, নিজকে পরীক্ষা করিবে যেন কোনরূপে দুষ্ট শনি তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই স্থলে একটী প্রবাদ আছে। সাধক স্নান পূজাদি সম্পন্ন করিয়া বিশুকে কহিলেন, "বিশু! কিঞ্চিৎ জল পান করা কর্ত্তব্য, ইহা কহিয়া পুনরায় কহিলেন, তাইত হে! শুধু জল কি করিয়া খাইবে। ঐ আম ও আতা গাছ দেখা যাইতেছে, দেখ দেখি দুই একটা ফল পাওয়া যায় কিনা?" বিশু কহিল, "ঠাকুর! এ যে অঘ্রাণ মাস, এখন কি আম পাওয়া যায়!" সাধক কহিলেন, "ভাল দেখই না। জগদম্বার ইচ্ছায় কিনা হয়! তাঁহার ইচ্ছায় শুষ্ক তরু মুঞ্জরিতে পারে, কলা গাছে ফল ফলা কি বিচিত্র কথা!" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আপনার বাক্য কখনও মিথ্যা হবার নয়। আপনি মা কালীর আদরের ছেলে, আপনি অসময়ে ফল চাইলে তিনি আপনাকে ফল দেবেন তার আর বেশী কথা কি! সে দিন ধর্ম্মপুরাণ পড়্‌ছিলাম, দেখ্‌লাম লাউসেনের কথায় সূর্য্যি পশ্চিম দিকে উদয় হয়েছিল। মা চিরকালই ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই কথা বলিয়া বিশু সেই আম্রবৃক্ষ তলে উপস্থিত হইল, উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল কতকগুলি সুপক্ক ফল। সুবর্ণকান্তিতে শ্যামল পল্লব মাঝারে, শোভা পাইতেছে। বিশুর হৃদয় বিচলিত হইল, প্রেমের তরঙ্গ ভক্তির উচ্ছ্বাসসহ হৃদয় প্লাবিত করিয়া নয়ন যুগলে উঠিতে লাগিল। বিশু ফতলে জানু পাতিয়া ইচ্ছাময়ীর চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কহিলেম, "মা! তুমি

ভক্তের জন্য না কর কি, ঠাকুরকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিল, "ঠাকুর! তুমিই ধন্য!" ইহা কহিয়া বিশু আম্র বৃক্ষকে নমস্কার পূর্ব্বক বৃক্ষে আরোহণ করিল, নিজ অঞ্চলে ফল গুলি গ্রহণ করিয়া অবরোহণ করিল, বৃক্ষকে পূর্ব্ববৎ নমস্কার পূর্ব্বক আতা বৃক্ষতলে গমন করিয়া দেখিল কয়েকটা আতা সুপক্ক অবস্থায় শ্যামসুন্দর বদনে ভদ্র দর্শন কান্তির শোভা বিস্তার করিয়া বৃক্ষটীকে পরম রমণীয় করিয়াছে। বিশু আতাগুলিকে গ্রহণ করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে সাধকের নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রেমাশ্রু নয়নে কহিল, "ঠাকুর! লোকে বলে ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ভগবান মানুষকে কত ভাবে দেখা দেন, তা মানুষ বুঝতে পারে না। হায় হায়! যার ইচ্ছায় অসময়ে গাছে ফল ধরে, আঁধার রেতে চাঁদ উঠে, নদী পাহাড়, গাছ, পাতা, যার কথা শোনে, সেকি মানুষ? ঠাকুর! তুমি কে? আমাকে বল, তুমি দেবতার মধ্যে কোন দেবতা! না স্বয়ং ভগবান। সুজ্জি উঠ্‌লে আঁধার থাকে না, তোমার দর্শনে পাপ থাকে না।" সাধক একটু হাসিয়া কহিলেন, "বিশু! আমি কিছুই নয়, আমি কমল ঠাকুর, আম গাছটা দুফলা গাছ হইতে পারে, তুমি জাননা অগ্রহায়ণ মাসেও আতা পাওয়া যায়।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! মাঠের মাঝে গাছ, গাছের রাখা নাই, রাখালরা এর আম কাঁচাতেই খায়, তারা আম পাকৃতে দেয় না, আমিও রাখালি করেছি, আমি সব জানি ঠাকুর! আমাকে ভোলালে কি আমি ভুলি। বড় লোকের স্বভাব সহজে ধরা ছোঁয়া দেয় না। বিশে আপনার দাস বিশের মন, বিশের প্রাণ, বিশের দেহ সব তুমি। সাধক কহিলেন, বিশু! যদি তুমি আমাকে কৃষ্ণ, বিষ্ণু মনে কর। কৃষ্ণ বিষ্ণুর গুণময় ভাবিয়া আমাকে চিন্তা কর তাহা হইলে কৃষ্ণ বিষ্ণু স্বরূপ আমাকেই পাইবে। তাঁহাকে সগুণ ভাবে যেমন নির্ম্মাণ করিবে তুমি তাঁহাকে সেই ভাবেই পাইবে।" ইহা কহিয়া সাধক কহিলেন, "এস বিশু! ফল গুলি মাকে নিবেদন করিয়া আমরা তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করি। এ সংসার তাঁহার তাঁহার ফল তাঁহার জল তাঁহারি পুষ্প তথাপি অন্তর্বাসিনীকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য উদরস্থ করা উচিত নহে।" বিশু কহিল, ঠাকুর! আমি দেখ্‌তেপাই লোকে ফল ফুল ভাল খাবার নিয়ে দেবস্থানে যায়, দেবতাকে সেই সকল দ্রব্য নিবেদন করে। মা যখন সকলের অন্তরে আছেন তখন তায় একটি পৃথক স্থান রাখ্‌বার প্রয়োজন কি? আমাদের কালী বাড়ীরইবা কি দরকার?" সাধক কহিলেন, দেখ বিশু! মানুষ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ জী

মাত্রেরই একটী নির্দ্দিষ্ট আবাস আছে। বিশেষতঃ মানুষ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিতে বড় ভাল বাসে, তাই সব নিজ প্রিয়তম উপাস্য দেবতার জন্য মনের মত আবাস নির্ম্মাণ করাইয়া সুখী হয়। যদি তুমি তোমার মা কালীমাকে রূপ, রস, গন্ধ দিয়া মায়ের মত মা ভাবিয়া, হৃদয় মন্দিরে রাখিতে পার, তাহা হইলে তাঁহার তোমার পৃথক আবাস নির্ম্মাণের প্রয়োজন কি! কিন্তু যদি সংসারী লোক অনেক সময় অর্থ চিন্তায় জড়ীভূত থাকেন, তাঁহাদিগকে কিয়ৎক্ষণের জন্য সংসার চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য দেবস্থান ও উপাসনা মন্দিরের প্রয়োজন হয়। দেখ বিশু! মানুষ যখন হাটে, বাজারে কি দোকানে দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য গমন করে, তখন তাহার তত্রস্থ বস্তু সকলের বিষয়ই মনে অইসে। যখন মানুষ রঙ্গালয়ে গমন করিতে থাকে তখন তাহার রঙ্গালয়ের ভাব মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে। কিন্তু যখন মানুষ দেবালয় কি উপাসনা মন্দিরে যায়, তখন তাহার উপাস্য দেবতা মনোমধ্যে বিরাজ করেন। দেবস্থান ও উপাসনা মন্দিরের সঙ্গী ভক্তি, বিশু! ভক্তি দেবদত্ত সুধা, মানুষ ক্ষণেকের জন্য সেই ভক্তি সুধা পান করিয়া সুখী হয়। যেখানে ভক্তি সেই খানেই ভগবান। দেবস্থান বহু ভক্তিমান ও পুণ্যবান লোকের সমাগমে তীর্থ বলিয়া অভিহিত হয়। দেবস্থানে ও তীর্থস্থানে মনের বিকার থাকে না, মানুষ প্রেমানন্দ অনুভব করে। বিশু এই জন্য দেবস্থান ও উপাসনা মন্দিরের প্রয়োজন। বিশু! এস এখন আমরা এই ফল গুলি মাকে নিবেদন করিয়া দি।" সাধক পুনশ্চ কহিলেন, "তাইত বিশু! মিষ্টান্ন ব্যতীত কেবল ফল গুলি মাকে নিবেদন করিয়া দিতে আমার কেমন মন উঠিতেছে না।" বিশু ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "ঠাকুর! এখানে মিষ্টান্ন কোথায় পাবেন, অথবা আপনার খেলা কে বুঝিবে এখনি হয় ত বলিবেন, যাও বিশু! দেখ ওই খেজুর গাছে সন্দেশ ফলেছে, ঠাকুর! তোমার মুখের কথাতে না হয় কি? আমি বুঝলাম তুমি কোন গাছে সন্দেশ ফলাবে।" সাধক কহিলেন, "বিশু! তোমার ভ্রম, খেজুর গাছে কি সন্দেশ ধরিতে পারে? আম গাছে আম হয়, খেজুর গাছে খেজুর ধরে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।" এমন সময় বিশু দেখিল দুইজন ভারবাহী মিষ্টান্নের ভারসহ গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া দুলিতে দুলিতে ঘাটের দিকে আসিতেছে। ভারবাহীদিগের সঙ্গে একজন ভদ্রলোক। সাধকেরও তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বিশু কহিল, "ঠাকুর! কতই রঙ্গ জান, ওই দেখুন দুজন বাঁকীদার বর্দ্ধমানের মিহিদানা, সীতাভোগ, কাঁদে করে আস্‌ছে, একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা

ভগবান বন। ঠাকুর! তুমি কি ভক্তিতেই মাকে বেঁধেছ, কি প্রিয় ছেলেই হয়েছ, যখন যা চাচ্ছ, তিনি তাই দিচ্ছেন। ইতি মধ্যে ভারবাহীরা সেই ঘাটে আসিয়া ভার নামাইয়া কহিল, পুকুরটীর বেশ জল, আপনারা কোথায় যাবেন? বিশু কহিল, "জগদম্বা যেখানে নিয়ে যান সেই খানেই যাব।" ভারবাহীরা কহিল, "আপনারা সন্ন্যাসী।" এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ভদ্রলোকটী সাধকের মুখ পানে চাহিয়া জানু পাতিয়া, পাদস্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি এভাবে কোথায় যাইতেছেন? আমি কোটাল হাটে আপনার সঙ্গীত শ্রবণ ও চরণ দর্শন করিয়াছিলাম, আজ আমার সুপ্রভাত, আজ আমি আমার গ্রামের নিকট আপনার দর্শন পাইলাম। এখান হইতে আমার বাড়ী এক ক্রোশ মাত্র। কাল আমার বাৎসরিক মাতৃশ্রাদ্ধ, তদুপলক্ষে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার বাসনা আছে, আপনাকে আমার বাটিতে পদার্পণ করিতে হইবে, আমার অতিবড় সৌভাগ্য আমার পিতৃ মাতৃ পুণ্যফলে আমার মাতৃশ্রাদ্ধে আপনার গমনে আমি জানিব স্বয়ং শ্রীহরির শুভাগমন হইল, আপনাকে আমার বাসনা পূর্ণ করিতেই হইবে, আপনি আমার গৃহ পবিত্র করিতে স্বীকার না করিলে আমি আপনার পদ যুগল পরিত্যাগ করিব না। সাধক ভদ্র লোকটীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া কহিলেন, "আমি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিব। ভদ্র লোকটীর সম্মুখস্থ আম গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আপনারা অসময়ে এ ফলগুলি কোথায় পাইলেন?" বিশু কহিল, "এ ফলগুলি এখানকার নয়। সাধক ইঙ্গিৎ দ্বারা এ বিষয়ে আর অধিক আন্দোলন করিতে নিষেধ করিলেন। ভদ্র লোকটী কহিলেন, "আপনারা বর্দ্ধমান রাজবাটি হইতে আসিতেছেন মহারাজা বাহাদুরের বাগানে অনেক ফুফলা গাছ আছে।" ইহা কহিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, স্নানাহারের সময় উপস্থিত, দেখিতেছি আপনাদের স্নান হইয়াছে, অধীনের প্রতি দয়া করিয়া আপনারা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। মিষ্টান্ন গুলি শুদ্ধাচারে প্রস্তুত হইয়াছে। দেবতুল্য যোগী সন্ন্যাসী এই সকল মিষ্টান্ন প্রথমে গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব।" ইহা কহিয়া ব্রাহ্মণ কতকগুলি মিষ্টান্ন বাহির করিয়া সাধকের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সাধক ব্রাহ্মণের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আপনারাও অবগাহন করুন আমরা সকলে জগদম্বার প্রসাদ গ্রহণ করিব।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মিষ্টান্ন গুলি একটি শালপাত্রে ফলগুলির নিকট রাখিয়া স্নান পূজাদি সমাধা পূর্ব্বক সাধকের নিকট

উপস্থিত হইলেন। সাধক ফল ও মিষ্টান্ন জগদম্বাকে নিবেদন করিয়া সকলকে প্রসাদ বিতরণ ও স্বয়ং কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ফল আস্বাদন করিয়া কহিলেন, "দেব! আমি বোম্বাই, ন্যাংড়া, ফজলী, রাঢ়ী অপেক্ষা এই ফল গুলির মধুরত্ব অধিকতর অনুভব করিতেছি, আহা! ইহা কি স্বর্গের সুধা? দেব! আপনার প্রসাদ আজ অমৃত আস্বাদন করিলাম। অতঃপর সকলে জল পান করিয়া স্নান ঘাটে উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ সাধককে তাঁহার গৃহ পবিত্র করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাধক পূর্ব্বেই তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকারে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন। এক্ষণে বিশুর সহিত ব্রাহ্মণের গৃহে গমন পূর্ব্বক একরাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া অমরার গড় গমন করিলেন।

সাধক বিশুর সহিত অমরার গড় কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে আগমন করিলেন। কেনারাম ও তাঁহার পরিবার বর্গের আনন্দের সীমা রহিল না। গ্রামবাসীরা তাঁহার পুনর্ব্বার দর্শন লালসায় দলে দলে আগমন পূর্ব্বক সাধকের চরণ স্পর্শ করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সাধক প্রসন্নবদনে পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের সহিত আলাপ ও পরিচয় করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। এক্ষণে সাধক মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর কর্ত্তৃক পূজিত হওয়াতে কেনারামের কালীগৃহে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের সমাগম হইতে লাগিল। কেনারাম সাধককে বর্দ্ধমান হইতে আগমনে পথের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে বিশু আম্র ও মিষ্টান্ন প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিয়া ছিল। এক্ষণে যেখানে সেখানে সাধকের সেই অসাধারণ শক্তির গল্প হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

বিশ্বদেব বাদ ।*

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ।

ভারতের ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়—বিশ্বদেব বাদ বা বিশ্বে আত্ম বাদই, ভারতের প্রথম ও প্রাচীন ধর্ম্মমত। নিখিল বেদ সমূহ সেই বিশ্বদেবগণের স্তুতি গানে পরিপূর্ণ। তন্ত্র সেই বিশ্বদেবগণের উপাসনা পদ্ধতি, পুরাণ তাহাদেরই গল্পের কথা, স্মৃতি ও পুরাণ সমূহের বার ব্রত সকল তাঁহাদেরই রূপক কথা, ভারতের সমগ্র কাব্য সেই বিশ্বদেবগণের প্রশংসাতেই পরিপূর্ণ। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে আত্ম সত্তা উপলব্ধি করিয়াই ভারতের প্রথম ধর্ম্ম ভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

বৈদিক ঋষিগণ কি ভাবে প্রথমে বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে আত্মসত্ত্ব অনুভব করিয়াছিলেন—তাহা বলিতেছি। তাঁহারা বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুকেই মহান বা দেবতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, অগ্নি অশ্বি, ঊষা, পূষা, অর্য্যমা, ইন্দ্র, অরুন বরুন মরুৎগণ প্রভৃতি সকলকেই মহান বা দেবতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন বা স্তুতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর সহিতই আত্মীয়তা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জলে স্থলে অনলে অনিলে অন্তরীক্ষে, জগতের সর্ব্বত্র মহত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেক বেদ মন্ত্রে জীবন্ত ভাষায় তাঁহাদের প্রাণের মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ভাষায় যেন মৃত সঞ্জীবনী শক্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

ঋক বেদের একটি মন্ত্র তুলিয়া দেখাই—তাঁহারা জগতের প্রত্যেক বস্তুকে কিরূপ মধুময় ভাবে বা আত্মীয়তার চক্ষুতে দেখিতেন। এ মন্ত্র আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন।

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধি।
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুদৌরস্তু নঃ পিতা।

* কসবা হরিসভায় দ্বাত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনের বিশ্বদেব সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

মধুমান্নো বনস্পতি মধুমাং অস্তুনঃ সূর্য্যো
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ ॥

অনুবাদ—

বায়ু মধু বহিতেছে, সিন্ধু মধু ক্ষরিতেছে
মধুময় ওষধি হউক।
মধুরাত্রি উষা আর মধু ধূলি এ ধরার
হন মধু স্বর্গীয় জনক ॥
মধুযুক্ত বনস্পতি মধুময় সে দিবাস্পতি
মধুমতী ভাব গাভী পাক।
হয়ে যেন মধুময় এ বিশ্বের সমুদয়
মধুময় মোদের করুক ॥

হৃদয় কতটা উন্নত হইলে তবে মানব, জগৎকে মধুময় ভাবে দেখিতে পারে। এই একটি মন্ত্রে তাহা পরিস্ফুট হইতেছে। এই মন্ত্রের ভাবার্থে পরিস্ফুট হইতেছে—তাহারা অনুভবকরিতেন—জগতের প্রত্যেক বস্তুই যেন আত্মবান, যেন তাহারা শত সহস্র হস্তে তাহাদের সাহায্য করিতেছেন। যেন তাঁহারা তাঁহাদের হাত ধরিয়া দাড়াইয়া আছেন। তাহারা যেন তাহাদের নিকট শত সহস্র ঋণে আবদ্ধ। বেদের সমুদয় মন্ত্রে মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষিদের এই ভাব যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহারা বিশ্বকে আত্মীয় ও কুটুম্ব রূপে অনুভব করিয়া, কেমন ভাবে তাহাদের মহত্বে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন সমগ্র বৈদিক সংহিতার স্তুতি সমূহে এই সব ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

এই মন্ত্রটি একটি কবিতা, একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা একটি দার্শনিক তথ্য রূপেও মনে প্রতিভাত হয়। আমি কেবল ইহার দার্শনিক প্রতিপাদ্য টুকুই মাত্র ব্যাখ্যান করিলাম।

আমি আবার এখানে হিরণ্যগর্ভের স্তুতির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার নাম মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র। এই মন্ত্র পাঠ করিলে মরা মানুষ বাঁচে। আপনাদের কাহারও যদি উৎসাহ হয়, তবে কোনও রুগ্ন, আলস্য অলস, বিষাদ ক্ষিপ্ন, অবসাদগ্রস্ত, নিরাশাগ্রস্ত এবং মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে ঝাড়াইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, যে তাহাতে মরা মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার হয় কিনা? আজ কসবা হরিসভায় নব জীবন সঞ্চার হইয়াছে। সেই সভায় এই মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র পাঠ শুনিয়া, বাঙ্গালীর অবসাদ ক্লিষ্ট দেহে নব বলের সঞ্চার হউক।

মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র।

(এই মন্ত্র বলিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য যুদ্ধে মৃত দৈত্যদের সঞ্জীবিত করিতেন)।

হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ
সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ;
য প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈকইদ্রাজা জগতো বভূব
য ঈশে অস্য দ্বিপশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়াসহাহুঃ
যস্যেমা প্রদিশো যস্য বাহুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃহ্লা যেন স্বঃ স্তম্ভিতং যেন নাকঃ
যো অন্তরীক্ষে রজসো বিমানো কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

হিরণ্যগর্ভ সে হন আদিভূত ক্রিয়ারম্ভে যিনি ভুবনৈক পতি,
স্থাপিলা স্বস্থানে আকাশ পৃথিবী কোন দেবতারে করি গো প্রণতি॥ ১ ॥
আত্মদা বলদা যিনি বিশ্বে উপাসনা করে সকল দেবতা
ছায়া যার মৃত্যু ও অমৃত কোন দেবতারে করি গো প্রণতি॥ ২ ॥
প্রাণী নিমেষীর মহিমার বলে হইলেন রাজা এক জগতের
ঈশ এক যিনি দ্বিচতুষ্পদের কোন দেবতারে করি গো প্রণতি॥ ৩ ॥
যাহার মহিমা হিমবান সব সনদী সমুদ্রা ধরা সৃষ্টি যার
দিগ্বিদিক যত যার বাহু হয় কোন দেবতারে করি গো প্রণতি॥ ৪ ॥
স্বর্গ ও পৃথিবী দৃঢ়িলেন যিনি স্বর্গ ও নরক স্তম্ভিলেন আর
অন্তরীক্ষে যিনি জ্যোতির্ম্ময় যান কোন দেবতারে করি গো প্রণতি॥ ৫ ॥

এই মন্ত্রটি মানব জাতির আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভের স্তুতি বিষয়ক। এই মন্ত্রটির ভিতর কি সৌন্দর্য্য বা অসাধারণ বর্ণবিন্যাস আছে, তাহা বৈদিক ভাষায় অসামান্য প্রবেশাধিকার না থাকিলে সহজে বুঝা যায় না। এই মন্ত্রটীকে বহুলোকে বহু অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। অদ্বৈত বাদীরা এই মন্ত্রটিকে "অবাং মনস গোচর" ঈশ্বর পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ "হিরণ্য গর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে" ইত্যাদি শ্লোকটি বাদ দিয়া "য আত্মদা" ইত্যাদি শ্লোক হইতে এই মন্ত্রের আরম্ভ দেখাইয়া এই মন্ত্রটিকে বেদে অদ্বৈত বাদের প্রমাণ স্বরূপ ইহা উদ্ধৃত করেন। Max Mullar এই মন্ত্রটি Unknown God পক্ষে ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই দেখিবেন এই মন্ত্রটি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার ভক্তিপূর্ণ স্তুতি গীতি মাত্র।

এ পর্য্যন্ত অদ্বৈত বাদীগণ, বা একেশ্বর বাদীগণ, বৈদিক সমুদয় মন্ত্রকে ঘুরাইয়া একেশ্বর বা নিরাকার ঈশ্বরের পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। যেখানে আর তাঁহাদের রূপান্তরী করন প্রতিভায় কুলায় না, সেখানে তাঁহারা বলেন—বেদে ইনি ঈশ্বর ইনি ঈশ্বর ইনি ঈশ্বর—এইরূপ করিয়া একেশ্বর বাদে পৌছান হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের ব্যাখ্যায় বেদে অগ্নি ঈশ্বর, ইন্দ্র ঈশ্বর, বরুণ ঈশ্বর এইরূপ ভাব ভাবিতে ভাবিতে নিরাকার পূর্ণব্রহ্মের সত্তা অনুধাবন করিয়া, বৈদিক জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। একেশ্বর বাদীদের এই কথার হাঁড়ি "চতুর্ব্বেদের" ব্যাখ্যাতা বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী সাহিত্য বিভূষণ মহাশয় তৎকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা ভবের হাটে সম্প্রতি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত ঋকটি তুলিয়া দেখাইয়াছেন—বৈদিক মন্ত্রগুলি কিছুতেই একেশ্বর পর নহে, ইহা বহু দেব পর বা বিশ্বদেব পর। এই মন্ত্রটি এখনও পর্য্যন্ত কেহ ঘুরাইয়া একেশ্বর পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এই মন্ত্র ও তৎকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, অদ্বৈত বাদীদের করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এই মন্ত্রটি হাওড়ার "বেদ সভার" প্রত্যেক মাসিক বা বার্ষিক অধিবেশনে সানুবাদ তানলয় সংযোগে গীত হইয়া থাকে। আমি অগ্রে এখানে মুল মন্ত্রটি উদ্ধার করিতেছি।

বিশ্বদেব গীতি।

নমো মহদ্ভো নমো অর্ভকেভ্যঃ
নমো যুবভ্যো নমো আশিনেভ্যঃ।
যজাম দেবান যদি শক্ত বাম
মা জ্যায়সঃ শংস মা বৃক্ষিদেবাঃ॥

শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের অনুসরণে এই মন্ত্রের মংকৃত অনুবাদ এইরূপ—

সর্ব্বত্র দেবত্ব আছে হের অগণন
বিশ্ব দ্রব্যে জড় দৃষ্টি ভ্রান্তির লক্ষণ॥
(তাই) প্রণতি করিয়া ডাকি—
"নমো মহদ্ভো"
মহৎ অবস্থা স্থিত যারা অনুক্ষণ
"নমো অর্ভকেভ্যঃ"

শিশুসম বিরাজিত জগতেতে হন ॥
"নমো যুবভ্যো"
বুদ্ধি শীল মূর্ত্তি যারা সর্ব্ব ব্যাপি রন।
"নমো আশিনেভঃ"
বিকাশের পরাকাষ্ঠা যারা সনাতন
মন) যদি সিদ্ধি চাও কর সংকল্প এমন
"যজাম দেবান যদি শক্নবাম"
হয় শক্তি যে প্রমাণ এই দেবগণ
পূজিতে নিযুক্ত যেন থাকি চির ক্ষণ ॥
(আর) যদি শ্রেয় চাও কর প্রার্থনা মনন।
"মা জ্যায়সঃ সংশম্মা কৃক্ষিদেবাঃ
যেথানে যে আছ হেথা যত জ্যেষ্ঠগণ।
তা সবে পূজিতে যেন না ভুলি কখন ॥

এই মন্ত্রের ভাবার্থ আরও বিশদ করা আবশ্যক—মহদবস্থা গর্ভস্থ শিশুর চৈতন্য বা সুষুপ্তের জ্ঞান, অথবা স্থাবর বস্তুস্থ আত্মাও মহত্ত্ব। এখানে উপনিষদের "সর্ব্বং প্রাণ ময়ং জগৎ"—অর্থাৎ জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই প্রাণ আছে। এই কথাটি মনে করিয়া, তবে এই মন্ত্রের ভাবার্থ বুঝিতে হইবে। (ডাক্তার জগদীশ বসু এক্ষণে স্থাবরের প্রাণ যন্ত্রযোগে দেখাইতেছেন) মনু ও কালিদাস স্থাবরের প্রাণ সত্ত্বা স্বীকার করিয়াছেন।

এখানে শিশু শব্দে - মানব শিশু ও ইতর প্রাণী লক্ষ্য। অথবা অহংকারাত্মক জ্ঞান সম্পন্ন বস্তু বুঝিতে হইবে। এই মন্ত্রে যুবা শব্দে পঞ্চতন্মাত্র জ্ঞান সম্পন্ন বস্তু বুঝিতে হইবে। আশিন—শব্দে পূর্ণব্রহ্ম বা পূর্ণ সামর্থ্যাবস্থা।

আরও সংস্কৃত ভাষায় মহস শব্দ, এইরূপ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১ম দার্শনিক মহস—অস্পষ্ট চৈতন্য। তাহা ভিন্ন সাধারণ ভাষায় মহান শব্দে বৃহৎ বস্তু (Grandour)।

এখানে এই মন্ত্রের আর একটি ভাবার্থের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহারা চিরদিন মহদাদি অবস্থায় আছেন ও থাকিবেন, আমি তাহাদের নমস্কার করিতেছি। এবং পূর্ব্বে যাহারা মহদ্ স্থায় ছিলেন, এক্ষণে অর্ভকাদি অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতেছেন, আমি তাহাদিগকে প্রণাম করিতেছি। এখানে জ্যায়স শব্দও দেববাচক। জ্যায়স শব্দের ইংরাজী অনুবাদ Presbiter বা Elder,

যেমন Presbetirean Church or Church of the Elders. এই মন্ত্রের ভিতর সাংখ্য দর্শনের মুলতত্ত্ব নিহিত আছে। যাহারা বিশেষ ভাবে বুঝিতে চান, তাঁহারা সংখ্য কারিকার "প্রকৃতের্মহান, তত্তো অহংকারঃ, অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রং" ইত্যাদি কারিকা দেখিবেন। এই মন্ত্র সম্বন্ধে বহু বক্তব্য আছে, আমি সংক্ষেপ মাত্র দিলাম।

এই মন্ত্রে, মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষিগণ যে, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে মহত্ব, শিশুত্ব যৌবন ও পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া, প্রণাম করিতেছেন—এই ভাব সর্ব্বথা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এখানে চারিবার বহুবচনান্ত প্রয়োগ করায় বুঝা গেল—ঈশ্বর এক নহেন। তিনি আকারে বহু, প্রকারে বহু, ভাবে বহু, ভঙ্গিতে বহু, অবস্থায় বহু, ব্যবস্থায় বহু। বহু লইয়াই তাহাদের সংসার।

বাল্যে আমার জন্মভুমিতে আচার্য্যদিগের মুখে শুনিয়া ছিলাম—সার্দ্ধ ত্রিকোটী দেবগণ। পরবর্ত্তী কালে নগরে আসিয়া শুনিলাম—তেত্রিশ কোটি দেবতা। ইহাদের ব্যাখ্যা এইরূপ—ভারত সাম্রাজ্যের ৩২ কোটি লোকের ৩৩ কোটি রকমের দেবতা (Idea of Deity)! এখানে দেবতা শব্দে ভগবৎ ধারণা। হন্টার সাহেবের ব্যাখ্যায় বৈদিক জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, তিন একাদশ দেবতাই পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় সাহিত্যে তেত্রিশ কোটি দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। এই কথাটির শব্দ বিদ্যার মতে কিয়দংশে সত্ত্বা আছে। যেহেতু দেবগণ "ত্রিদশাঃ" তিন দশক—৩×১০—৩০। এই তিন দশক দেবতাই পরবর্ত্তীকালে বাচ্চা কাচ্চা লইয়া, ৩০ কোটীতে পরিণত হইয়াছেন। এখানে কোটি শব্দ বহুত্ব বা অনন্ত বাচক। তাঁহাদের দশ দিক বিভাগানুযায়ী অনুভূতি হইল, প্রত্যেক দিকেই কোটী দেবতা, অনন্ত পরিমাণ দেবতা। তাহাদের আবার মহত্ব, শিশুত্ব, যৌবন ও পূর্ণ বিকাশ আছে!

বৈদিক সাহিত্যের পর পুরাণেও বহু দেবতার উল্লেখ আছে। যেমন আদিত্য, বিশ্বাবসু, স্তুষিত, ভাস্বর, ৪৯ বায়ু, মহারাজিক, সাধ্য, একদেশ রুদ্র, বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ, ভুত, নবগ্রহ, দশদিকপাল, দশাবতার, অষ্ট মনু, সপ্তকুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত নদী, ছয় ঋতু, ছয় রাগ, ৬৪ রাগিণী, পাঞ্চশর প্রভৃতি।

তন্ত্রেও বহু দেবতা আছেন—দশ মহাবিদ্যা, অষ্ট নায়িকা, ৬৪ যোগিনী, অষ্ট ভৈরব, অষ্ট বটুক, অষ্ট মাতৃকা, সপ্ত মাতৃকা, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা, ভুত প্রেত, বেতাল ব্রহ্মদৈত্য।

উপপুরাণও স্নাতের ব্রত কথা সকলেও বহু দেবতার উল্লেখ আছে—অনন্ত দুর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী, ষষ্ঠী, মনসা, মাকাল, ষেটু, ইথু সুবচনী, ওলাবিবি, শীতলা পঞ্চানন্দ, ক্ষেত্রপাল বাবাঠাকুর, ধর্ম্মরাজ, বিষহরি, ভাদু প্রভৃতি।

আমাদের দুর্গোৎসবও একটি বিরাট বিশ্বদেবের আরাধনা। রম্ভা কচ্চা হরিদ্রা জয়ন্তী বিল্ব দাড়িম অশোক মান ধান্য এই নয়টী উদ্ভিদে নবপত্রিকা বন্ধন করিয়া তাহারই পূজা করা হয়। মহা স্নানের কত ঘটা! আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সরযু গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা, কৌষিকী, পাতালের ভোগবতী, স্বর্গের মন্দাকিনী, বিশ্বের কোনও নদী আর বাদ যান নাই। তাহা ব্যতীত জল শুদ্ধিতে প্রথমেই সাতটি নদীর উল্লেখ করা হইয়াছে। গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী—ইহারাত বার মাসের জলশুদ্ধিতে আছেনই। দেশবাসিনী পূজায় ভারতের বা পৃথিবীর কোনও দেব প্রতিমার নাম এই উৎসবে ত্যাগ করা হয় না। তাহার উপর ৫২ পীঠ ও অনন্ত তীর্থ-গণ ত আছেনই।

আমাদের তর্পণে, বিশ্বদেব বাদ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেবতা, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রূর সর্প, সুপর্ণ, তরুগণ, জৃম্ভগ খগ, নিরাহার জীব এই সকলকেত আমরা জল গণ্ডুষ দিয়াই থাকি, এমন কি আমরা পাপে এবং অধর্ম্ম রত জীবকে পর্য্যন্তও এক গণ্ডূষ জল দিয়া তর্পণ করিয়া থাকি।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় বিভুতি যোগাধ্যায়টি আবার আর এক প্রকারের বিরাট বিশ্বদেব বাদ। আদিত্য জ্যোতিষ্ক মরুৎ নক্ষত্র, বেদ দেব ইন্দ্রিয়, ভূত রুদ্র, যক্ষ রক্ষ বায়ুঃ পর্ব্বত পুরোধা, সেনানী সরোবর, সপ্তর্ষি বাক্য যজ্ঞ, স্থাবর বৃক্ষ দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ অশ্ব, গজেন্দ্র, নর অসুর, ধেনু প্রজান সর্প, নাগ, যাদব, পিতৃ, সংযমী দৈত্য কলয়ত মৃগ পক্ষী পর্ব্বত শস্ত্রভৃৎ মৎস্য, নদী সর্গ বিদ্যা, প্রবাদ অক্ষর সমাস মাস ঋতু প্রভৃতি সর্ব্বত্র ভগবৎ সত্ত্বা আছে।

কাব্যে এই বিশ্বে দেবত্বের ভাব আরও পূর্ণভাবে পরিস্ফুট। অভিজ্ঞান শকুন্তলার একটি শ্লোক শুনাই—

কভু জল পান যিনি নাহি চান
আপনারা সিক্ত না হবে,
কভু ছিড়িত না যে প্রিয় মণ্ডনা
স্নেহে যাহাদের পল্লবে।
যাহাদের আগে কুসুম উদ্‌গোগে
যিনি মাতিতেন উৎসবে,

সেই শকু যায় পতির নিলয়
অনুমতি দেহ সবে॥

মেঘদূত কাব্যখানিতে আগাগোড়া বিশ্বেদের বাদেই পরিপূর্ণ। একটু শুনাই—

স্বাগত সুন্দর নবমেঘ বর
ব্যথাত পাওনি পদেতে,
শুভ এ আষাঢ় প্রথম দিবস
তব তরে আছি পথেতে।
এই অর্ঘ্য নব তব কৃপা ভব
কুটজ কুসুমে করেছি,
লহ পাদ্য লহ ধর অর্ঘ্য ধর
আশার আশ্বাসে এসেছি॥
জন্মিয়াছ বংশে ভুবন বিদিতে
পুষ্কর আবর্ত্ত যথাতে
জানিগো তোমায় কর্ম্মঠ পুরুষ
কামরূপ ইন্দ্র সভাতে।
তাই অর্থী আজি তোমা বিধিবশে
দূর বন্ধু স্থিতি মোর যে
যাচ্ঞা বিফলা হোক অধিগুণে
নাহোক অধমে পূর্ণা সে॥
সন্তপ্ত দিগের তুমি হে শরণ
তাইহে পয়োদ সে প্রিয়ার
সন্দেশ আমার বহ ধনপতি
ক্রোধ বিশ্লেষিত জনার।
যেতে হবে তোমা বসতি অলকা
নাম সে যক্ষেশ নৃপতির
বহিস্থ উদ্যানে স্থিত হর শির
চন্দ্রিকায় ধৌত হর্ম্ম্য যার॥

একটি কবির গান শুনাই—

কোথায় সে জন জানে কোন জন
যে জন সৃজন লয় করে

নিকটে কি দূরে ভিতরে বাহিরে
প্রবাসে পাথারে প্রান্তরে ॥
কে বলিতে পারে পরে কোন বাস
পেণ্টুলে কিম্বা ইজেরে উল্লাস
ব্যালে কি বাকলে গুঘুড়ি কম্বলে
কৌপীনে কি বাঘাম্বরে।
"নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে
নমস্তে অস্তস্বনে যেন দুরাহ মস্যসি।" ঋকবেদ।

অনুবাদ—

জলেতে রেখেছ জগৎ জীবন
জ্বলন্ত অক্ষরে হয় দরশন,
জলদে গম্ভীর ভাবেতে লিখন
দয়াময় নাম সবে দেখাতেছ ॥

রামপ্রসাদ—

দ্বিজ রাম প্রসাদে রটে
মা বিরাজেন ঘটে ঘটে ॥

"যা দেবী সর্ব্ব ভুতেষু বিষ্ণু মায়েতি শব্দিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ
যা দেবী সর্ব্ব ভুতেষু ছায়া রূপেন সংস্থিতা ॥ ইত্যাদি চণ্ডী।

এখানেও সেই বিশ্বদেব প্রণতি।

এইরূপ ভারতের তেত্রিশ কোটী দেবতার কথা আর কত লিখিব। দেবতা যদি একজন হন, তবে তাঁহার মহিমা বর্ণনা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ব হয়। যে দেশের লোকেরা বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে ভগবৎ সত্তা অনুভব করিয়া, তাহাদের সহিত আত্মীয়তা করিয়া গিয়াছে—তাহদের নামের পুঁথি কত বড়, আমি আর কত লিখিব ?

এইরূপে আমি বেদ পুরাণ, তন্ত্র উপপুরাণ ব্রতপদ্ধতি পূজাপদ্ধতি তর্পণ কাব্য ও লৌকিক গান সকল হইতে দেখাইলাম, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য বিশ্বেদেব-গণের গীতি ও স্তুতিতে পরিপুর্ণ। তাঁহাদের একটি ক্ষুদ্র গানের ভিতর তাহাদের দেবতত্ত্ব পরিস্ফুট।

"জলে হরি স্থলে হরি,
অনলে অনিলে হরি
অন্তরীক্ষে হের হরি
হরিময় এ সংসার ॥"

এই ভাবটি লইয়াই তাহারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, এইরূপে তাঁহাদের সাহিত্য পড়িয়া মনে হয়, তাহারা ভূগর্ভে, পর্ব্বতে, আকাশে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র. বিদ্যুৎ মেঘ উল্কাপাত ও বজ্রধ্বনিতে, অনলে অনিলে, জলে নদী হ্রদ তড়াগে স্থলে উদ্ভিদে প্রাণীতে ও মনুষ্যে, বিদ্বান ব্যক্তিতে ও মহাপুরুষে, মহৎ ব্যক্তির বংশে, জ্যেষ্ঠে এবং গুরুজনে—এইরূপ প্রত্যেক বস্তুতে মহত্ত্ব বা দেবত্ব দর্শন বা অনুভব করিয়া গিয়াছেন। ইহারই নাম তাহাদের বিশ্বে দেবাত্মক জ্ঞান। মহাভারতে ইহাই পরীক্ষিতের বিশ্বময় হরি দর্শন রূপে বর্ণিত। ভগবান হরি ব্রহ্ম, ঈশ্বর বিশ্বরূপ প্রভৃতি শব্দ এক উদ্দিষ্ঠ। দ্বন্দ কেবল অক্ষর লইয়া।

কাজেই বিশ্বে আত্মবাদ, মহত্ত্ববাদ, ব্রহ্মবাদ, দেববাদ প্রভৃতি সমস্ত পদোচ্চয় একই ভাব ব্যঞ্জক। বিশ্বে বা জগতের প্রত্যেক বস্তুতে যে আত্মা চিৎ বা মহত্ত্ব আছে, তাঁহারই বৈদিক সংজ্ঞা দেবত্ব। সেই দেবত্বের—প্রত্যেক বস্তুস্থ আত্মার সত্তা ও কার্য্য শৃঙ্খলার অনুধাবন করার নাম বিশ্বেদেব বাদ।

জড়ধীগণ বলেন,—আমরা জড়ের উপাসনা করি। যাহাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তাহারা জগৎকে জড় মনে করে। জড়ে যে আত্মা চিৎ বা মহত্ত্ব আছে, তাহা তাঁহারা দেখিতে পান না, তাহা তাহারা বিশ্বকে জড় বলেন, আর আমাদের জড়ের উপাসক বলেন। যাহার অধ্যাত্ম দৃষ্টি আছে, সে দেখিবে, আমরা জড়োপরি ভাসমান বহুত্বেরউপাসনা করিতেছি। জড় একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

শ্যামা-মা।

পণ্ডিত — শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—বন পথ।

(বিবেকের প্রবেশ।)

বিবেক। স্বর্গসুখে অধিকারী,—
নহে শুধু স্বর্গবাসী দেবতা-মণ্ডলী

নর-নর, অমর চরিত,—
মর্ত্ত্যে বসি স্বর্গসুখ করে অনুভব
নতুবা যাহারা,—
মিথ্যাবাদী, প্রতারক, পাপাশয়,—
স্বর্গসুখ লভে কিগো তা'রা ?
দ্বেষ, হিংসা, আত্ম-অভিমানে,—
চিত্ত যার প্রমত্ত সতত,
ভ্রমে কভু স্বর্গসুখ লভে কি সে জন ?
পিতা মাতা গুরুজনে,—
যেই মূঢ় করে অপমান,
নশ্বর সংসার সুখে
মতি যার সতত চঞ্চল,—
মতি,—পাপ কামিনী কাঞ্চনে,
সেই দুষ্ট মতি,—
স্বর্গসুখ পারে কি ভুঞ্জিতে ?
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ বর্জ্জিত যে জন,
ক্ষণমাত্র নাহি করে ইষ্টের সাধনা,
কিবা অধিকার—
শান্তিময় স্বর্গসুখে তার ?
জন্মজন্মান্তর ব্যাপি পুণ্যপুঞ্জ করিয়া অর্জ্জন,—
লভে নর, মর্ত্ত্যে স্বর্গসুখ।
স্বর্গসুখে সুখী,—
এ বিজনে অভ্যাগত,
শ্যামা-গত চিত্ত এই সাধু সদাশয়,
সদানন্দে করি বাস,—
সাধকের সুপবিত্র হৃদয় মন্দিরে
স্বর্গ-সুখ লভি অনুক্ষণ।

(নেপথ্যে গীত)

আমার মতন কে জানে এমন
প্রাণের খেলা খেলিতে রে।

কে জানে এমন মোহন ফাঁদে
জগতের প্রাণ বাঁধিতে রে ॥

বিবেক। একি একি !
মায়াদেবী কেন আসে হেথা ?
নাহি জানি এ বিজনে,—
হতভাগ্য কেবা,
পড়ে বুঝি মায়ার ছলনে।

(গাহিতে গাহিতে মায়ার প্রবেশ।)

আমার খেলার ছাঁদন বাঁধন,
নিরেলায় বিধি ক'রেছে গঠন,
পাষাণ গলাতে আমার মতন
কে পারে এ তিন ভুবনে রে ॥
বুকে বুকে বসে খেলি লুকোচুরি,
কে পারে ধরিতে আমার চাতুরী,
ধরা দেয় সবে ধরি ধরি করি
ঠকে যায় শেষে ঠকাতে রে ॥
'আমি' 'আমার' 'তোমার' ভাবে
মেতে যায় জীব আমারি প্রভাবে
তাই ঘুরে ফিরে আসে যায় ভবে
কে পারে আমারে ভুলিতে রে ॥

বিবেক। প্রণমামি মহাদেবি !
সহসা এ বিজন কাননে
কি কারণে শুভ আগমন ?

মায়া। কারণ ছাড়া কার্য্য কোথা
বিবেক মহারাজ ?
এই বিজন বনে, আসছি মেনে
সার্ত্তে মস্ত কাজ।
ওগো কারণ আছে—
কারণ আছে, তোমার কাছে
বলতে বাধা কি !

এই নিজনে কোন সাধু সুজন
এসেছে নাকি ?
(শুনি) জীবন পণে আপন মনে
ইষ্ট সাধন করে,
(হেরে) সাধনা ত'ার,—
কর্ম্ম দাদার
(নাকি) মাথা গেছে ঘুরে ?
(আজ) দেখ্‌তে তারে,
এ কান্তারে ঢুকেছি এসে ;
(পার) বলতে আমায়, বিবেক মশায়
কোথায় আছে সে ?

বিবেক। মহাদেবি !
ত্রিলোক ঈশ্বরী তুমি।
অনুক্ষণ নয়নে নয়নে.
ঘুরাইছ ত্রিলোক মণ্ডল।
চরাচর, স্থাবর জঙ্গম,
সুরাসুর নর,—
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
তোমা ছাড়া কে আছে জগতে ?
সাধ তব সাধকে হেরিতে ?
কহ দেবি !
নয়নের অন্তরালে আছে কি সে তব ?

মায়া। ওমা একি জ্বালা !
একি জ্বালা ধরলে ছলা,
তুচ্ছ কথা নিয়ে ?
বল্লেই হতো "নলব নাত"
খুঁজে দেখ গিয়ে।
তক্ক জীবন !
পক্ক বচন: কথায় কথায় নাড়
ছুতো পেলে প্যাচে ফেলে

আকাশ ধরে নাড়'।
ভাব,—আপনি সবার বড় !
আটে ঘাটে দড়।
আব,—বুদ্ধিটা খুব গাঢ় ;

বিবেক। একি কথা কহ মহাদেবি !
প্রতিভা শালিনী গরীয়সী প্রভাবতী তুমি !
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ কেবা আর ?
তুচ্ছ বিধি বেদ প্রবর্ত্তক,
তুচ্ছ বিষ্ণু— ত্রিলোক তারণ
জ্ঞানাকর যোগেশ্বর ভব ভোলানাথ
আত্মহারা তোমারি প্রভাবে।
কি সাধ্য আমার,—
তোমা সনে করিব ছলনা ?
হীন আমি—নির্ব্বোধ, অধম,
তৃণ হ'তে তুচ্ছ গণি মোরে।
সত্য যাহা করিনু প্রকাশ,—
মায়াদৃষ্টি বহির্ভূত কে আছে জগতে।

মায়া। তোমার মিছে তক্ক।
(ঐ) মিছে তক্ক পিত্তি বাক্য।
শুনতে নাহি চাই।
(আমি) আপন তালে যাচ্ছি চ'লে
ভুণ্ডুলে গোঁসাই।
(পূর্ব্ব গীতটী গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

বিবেক। অনুমানি,—
সাধকেরে ছলিবারে আজি
মায়াদেবী ক'রেছে মনন।
নাহি জানি,
কিসে কি ঘটায়,
কিবা মোহ মন্ত্রে আজি ভুলায় সাধকে।
কিন্তু অসম্ভব,—

পরাভূত কর্ম্ম যার পাশে,
সকাম নিষ্কাম হ'তে বর্জ্জিত যে জন,
ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি প্রাণে যার,
মায়া তারে নারিবে ভুলাতে।
দেখি এবে,
টলাইতে সাধকের মন,
কত শক্তি ধরে মায়াদেবী।

(প্রস্থান)

(কর্ম্মফলের প্রবেশ।)

কর্ম্মফল। আহা হা হা! এ আবার কি? গোদের ওপর বিষ-ফোড়া! এ মাগী কোথা থেকে এসে জুটল! দেখ বাবা; যা ব'লেছি ঠিক তাই, এই পায়ার জোর না থাক্‌লেই অন্ধকার দেখেছিলাম আর কি? তা বিধেতা পুরুষ আমার ওপর যতই নির্দ্দয় হোন না কেন, আমার এই পায়ার জোরটী দিয়ে খুব দয়া দেখিয়েছেন! তা নৈলে আজ এই মায়া বেটীর নাগালই ধ'রতে পারতেম না। সাধক বাবাজী এই দিকটায় এসেছেন ভেবে, কাল সেই নিশিভোর রাত্রে বাবাজীর পেছু নিয়েছি, তাতে ক'রে কাল সমস্ত রাত, আর আজ এই সারা দিনটা ধরে বাবাজীকে গরু খোঁজা ক'রে বেড়িয়েছি। তার পর এখানে এসে আড়ালে থেকে বিবেক ঠাকুরের কথাগুলো শুনে যেন আবছা আবছা বোধ হ'ল যে বাবাজী এই বনেই ঢুকেছেন। শেষটা এই মায়াবেটীর বুকনিতে বেশ বুঝে নেওয়া গেছে যে বাবাজী এই বনেই চরা কছেন। আরে উনি যখন মায়া, তখন উনিই তো হলেন কায়া, আর এই সারা জগৎটা হল ওনার ছায়া। উনি যখন বাবাজীর সন্ধানে এই বনে এসেছেন, তখন কি আর শর্ম্মার কৈফিয়ৎ ভুল হ'তে পারে? বেটী বড় ধড়িবাজ! ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই দুষ্টুমি আছে। তা না হলে বেটী বাবাজীর জন্যে এত ক্ষাপ্পা হয়েছে কেন? বিবেক ঠাকুর ঠিক বিবেকের মতই কথা বলেছেন। বেটী বলে, "সাধক কোথায়?" ঠাকুর বলে, 'তোমার

চোকের তারায়।" বেটীর ছেনালী দেখ, যেন চোকে ঢ্যালা পড়েচে। দেখ্‌তে আর পাচ্ছেন না। জ্ঞান ঠাকুরটা এখন কোন চুলোয় ঘুরপাক খাচ্ছেন তার ঠিকানা নেই। আমি কিন্তু আগের ভাগেই এই চুলোয় এসে পড়েছি, কিন্তু বাবাজীর ওপোর বেটীর টঁাক দেখে, আমার যেন একটা উঠকো ভাবনা এসে জুটলো। কি জানি,—বহুরূপী বেটী, কি ছলে কি কোরে বসে। তবে এই ঘুপ্‌ড়ির ট্যাঁকে পড়ে যদি তরী বাঞ্চাল হয়, তা হলেই তো সব গুড়ে বালী। এখন দেখা যাক ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।

কত রঙ্গ দেখ্‌বি রে মন!
(এই) ভবের হাটে এসে;
(শেষ) বদ্‌রং না বোনে যাও
(এই) রং দেখতে ব'সে।

চরণরে চলি পাট চলি পাট।

(প্রস্থান)

কাব্যে-সংযম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

যে বিশ্ববিশ্রুত কবি বীণাপাণির বরে বাগর্থকে সম্পূর্ণরূপে স্ববশে আনয়ন করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন, বীণাপাণির পূজার আয়োজনের মধ্যে সেই কবি বরের জন্মপীঠে সহিত্য-সভার অনুষ্ঠান অতি সুশোভন হইয়াছে। এবং এই আনন্দবাসরে বাগ্দেবীর কৃপাই আমার ন্যায় মূককে বাচাল করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজ দুইটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

আজ কাল যে রকম দিন-সময় পড়িয়াছে, তাহাতে সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিতে গেলেই ভয় হয়, এই বুঝি টিট্‌কারী পড়িল, এই বুঝি 'ধিক ধিক' শব্দে অথবা পাদুকাবর্ষণ রবে সভামণ্ডপ (তথা গগন মণ্ডল) বিদীর্ণ হইয়া গেল,

এই বুঝি কেহ বলিয়া উঠে, "তুমি কে হে বাপু, তুমি ত কখনও দেশের কোন
কাজ কর নাই, তোমার বক্তৃতা আমরা শুনিতে চাই না।" এই বুঝি কোন
দিক হইতে চটির একটি পাটী সজোরে শূন্যপথে উড়িয়া আসিয়া মুখবন্ধেই বক্তার
মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। তাহার উপর আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের জন্য যে গুরুগম্ভীর
বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছি, তাহার নাম শ্রবণ মাত্রেই হয় ত কেহ কেহ ধৈর্য্য
হারাইবেন। তবে এক্ষেত্রে এরূপ [illegible] প্রমাদ না ঘটিবার দুইটি বিশিষ্ট
কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ স্থানটা কলিকাতার বাহিরে এবং কলিকাতার
নিতান্ত নিকটেও নহে। দ্বিতীয়তঃ সভার উদ্দেশ্য রাজনীতি বা সমাজনীতির
চর্চ্চা নহে, নিছক সাহিত্যের চর্চ্চা। কিন্তু তাহাতেও যদি ভাগ্যদোষে অঘটন
ঘটন পটীয়সী কোন পৈশাচিক শক্তির প্রভাবে সংক্রামক ব্যাধিটা এখানেও
প্রসারলাভ করে, সেই ভয়ে 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' (যদিও এক্ষেত্রে 'দারৈ-
রপি ধনৈরপি' নহে) নীতি অনুসারে নিজে গা ঢাকা দিয়া তাল সামলাইয়া
লইলাম, যাহা ঘটিবার পরোক্ষেই ঘটুক, 'যাক্ শত্রু পরে পরে।' ইতি গৌর
চন্দ্রিকা।

কোন একটা যুগের সাহিত্য হইতে সেই যুগের মানুষের রুচি ও প্রকৃতি
অনেকটা জানিতে পারা যায়, এ কথাটা বহু পুরাতন এবং পূর্ব্বে বহুবার উক্ত
হইলেও প্রয়োজন বিধায় এক্ষেত্রে ইহার পুনরুক্তি করিতে হইল। আজকাল
লোকে 'সংযম' 'সংযম' করিয়া যতই কেন গলাবাজি করুক না, বস্তুতঃ ও
জিনিষটা অধিকাংশ লোকের মধ্যেই নাই, এ কথা বলিলে বোধ হয় মিথ্যা কথা
বলা হইবে না। সুতরাং আজকাল যে সকল কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি
রচিত হইতেছে, সেগুলির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক কয়েকখানি বাদ দিলে বাকী
সব গুলিতেই সংযমের একান্ত অভাব এবং উচ্ছৃঙ্খলতার পূর্ণ প্রভাব পরিদৃষ্ট
হয়,—যেন স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার বাড়াবাড়ি না করিলে কবিত্বের
বিকাশই হয় না। সে দিন একখানি মাসিক পত্রে একটি ছোট গল্প পড়িতে-
ছিলাম। গল্পের বিষয়টি এই—এক যুবক জমিদারের যুবতী স্ত্রীর কঠিন অসুখ
হয়। এক দিন অবস্থা এমন হইল যে, সকলেই মনে করিল, রোগিনীর প্রাণ
দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে! এই দৃশ্য দেখিয়া পত্নীগত-প্রাণ স্বামী মূর্চ্ছিত
হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সে মূর্চ্ছা অনেক কষ্টে ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু তিনি
উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলেন। রোগশান্তির জন্য তাঁহাকে কোন এক স্বাস্থ্যকর
স্থানে পাঠান হইল। তিনি সেখান হইতে নিরুদ্দেশ হইলেন। কিছুদিন পরে

তিনি স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তখনও শোকে ম্রিয়মাণ। রাত্রিতে শয়নকক্ষে বসিয়া স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় পাশের ঘরে তাঁহার স্ত্রীর চির আদরের পিয়ানোটি মধুর স্বরে বাজিয়া উঠিল। এ স্বর যে তাঁহার বড় পরিচিত। একজন ছাড়া আর কেহই ত এ রকম বাজাইতে পারে না। তবে কি তাহার অশরীরী আত্মা আসিয়া বাজাইতেছে? এই ভাবিতে ভাবিতে তিনি আবার মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইলেন। প্রাতে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে অবসন্ন দেহ ও মন লইয়া তিনি গৃহসংলগ্ন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া করুণকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এ ত প্রেতমূর্ত্তি নহে—এ যে রক্ত মাংসের শরীর। তবে কি—? এমন সময়ে বৃদ্ধ দেওয়ান আসিয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। বৌমা মারা গিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে গিয়া দেখা গেল যে, তাঁহার দেহে প্রাণ রহিয়াছে। যাহারা সৎকার করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই 'দানো পাইয়াছে' মনে করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। দেওয়ান মহাশয় বৌমাকে লইয়া আসিয়া নিজের বাটীতে রাখিয়া শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার স্বামী নিরুদ্দেশ সুতরাং দেওয়ান মহাশয় এ ব্যাপারটা গোপন রাখিলেন, বৌমা তাঁহার বাটীতেই রহিয়া গেলেন। পূর্ব্ব রাত্রিতে হঠাৎ সকলের অজ্ঞাতসারে বৌমা নিজগৃহে চলিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর এই ব্যাপার। বড় আনন্দেই স্বামি-স্ত্রীর পুনর্মিলন হইল। দেও-য়ান মহাশয় তাঁহাদিগকে নিভৃতে এই মিলনের সুখ উপভোগ করিবার অবসর দিবার নিমিত্ত সেখান হইতে সরিয়া গেলেন, এবং কি ঘটে জানিবার নিমিত্ত অন্তরালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে একটা উচ্চ চুম্বনের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। ইহাতে তিনি বুঝিলেন, আর নূতন বিপদের কোন আশঙ্কা নাই, স্বামি স্ত্রী উভয়েই প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন।

গল্পের উপসংহারে এই সশব্দ চুম্বনের অবতারণা করিয়া লেখক মহাশয় কতটা সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিবেচ্য। অবশ্য বিলাতী সমাজে এরূপ চুম্বন ও আলিঙ্গন (সর্ব্বসাধারণের সম্মুখেও) আদৌ দোষের নহে। কিন্তু আমাদের সমাজে দেশকাল জ্ঞান না করিয়া এরূপ চুম্বন ও আলিঙ্গনের ছড়াছড়ি করিলে সকল পাঠক সেটা পরিপাক করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু হায়! আজকাল কাব্য নাটক ও উপন্যাসে এ সবের বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিতেছে।

চুম্বনের কথায় মনে পড়ে, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র সেই দৃশ্য—যেখানে দুষ্মন্ত শকুন্তলার রমণীয় বদনখানি কোন রকমে তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে গৌতমীর কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া তিনি শকুন্তলাকে ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহার আর চুম্বন করা হইল না, সুদমের বাসনা হৃদয়েই রহিয়া গেল। ইহার জন্য পরে তাঁহাকে আক্ষেপ করিতেও দেখা যায়। কিন্তু তিনি আক্ষেপই করুন আর যাই করুন, কবি রঙ্গমঞ্চে চুম্বনের অবতারণা না করিয়া যথেষ্ট সুরুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কার শাস্ত্রের মর্য্যাদাও রক্ষা করিয়াছেন। যদি বলেন, অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম বিরুদ্ধ হইবে বলিয়াই কালিদাস উক্ত দৃশ্যে চুম্বনের অবতারণা করিতে পারেন নাই, ইহাতে তাঁহার নিজের সুরুচি বা কবিত্বের পরিচয় কিছুই নাই,—তাহার উত্তরে বলিব, যে কারণে অলঙ্কার শাস্ত্র রঙ্গমঞ্চে চুম্বনাদি ব্যাপারের অবতারণা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এখন—এই বিংশ শতাব্দীতে কি সেই কারণ অপসৃত হইয়াছে? যদি তাহা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখনকার কবিগণও নিয়ম মানিয়া চলেন না কেন? ঐ সকল ব্যাপারের অবতারণা করিলে একটা বীভৎস রসের আবির্ভাব হইয়া [illegible] রসের অঙ্গহানি হয়, এটা কালিদাসের কালে যেমন সত্য ছিল [illegible] এখনই সত্য নাই? আর একটা কথা। নিয়মত শাস্ত্রে বাধা [illegible], তবু কবি যদি সে নিয়ম না মানিয়া গায়ের জোরে কলম চালান, [illegible] কে তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিবে? ইহাতে তিনি অলঙ্কারিকগণের [illegible] নিন্দনীয় হইলেও সকল সময়ে পাঠকগণের (বা দৃশ্যকাব্যের দ্রষ্টাগণের [illegible] নিন্দনীয় হয়েন না—বরং অনেক সময় তাঁহাদের অধিক মনোরঞ্জন কা[illegible] করেন। এই ধরুন গৌতমী আসতে আসিতে দুষ্মন্ত যদি লাজমান [illegible] দিয়া তাড়াতাড়ি চুম্বনের কাযটা সারিয়া লইতেন, তাহা হইলে কি 'শকুন্তলা' নাটককে লোকে একেবারে বয়কট করিত? মোট কথা শাস্ত্রের নিয়ম যতই কঠোর হউক না কেন, কবির নিজের মধ্যে সুরুচি বা সংযম না থাকিলে তিনি কখনও সে নিয়ম মানিয়া চলিতে পারেন না,—গ্রাম্য ভাষায় তাঁহার দড়ি ছিঁড়িয়া যায়।

স্বামী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, অথচ স্ত্রী (তাহার শুশ্রূষা না করিয়া) বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া আত্মীয় পরিজনের সহিত প্রেমালাপে মসগুল, অথবা রেলে বা ষ্টিমারে ভ্রমণ করিয়া প্রাণের আবেগ মিটাইতে ব্যস্ত, এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিবার স্বাধীনতা কোন সভ্যজাতির অলঙ্কারশাস্ত্র কোন কবিকে দিয়াছেন কি? অথচ আজকাল যে সকল গ্রন্থে এইরূপ চিত্র অঙ্কিত হইতেছে, সাহিত্য পরিষৎ বা সাহিত্যসম্মিলন কর্ত্তৃক সেই সকল গ্রন্থের প্রচার বন্ধ হওয়া দূরে থাকুক, সে গুলি পরম সমাদরে উচ্চমূল্যে বাজারে বিক্রীত হইতেছে এবং পাঠাগারে স্থাপিত হইতেছে। 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ' এই মহাবাক্যের যে এইরূপ পরিণতি হইবে, তাহা কে জানিত? হায় কালিদাস! আজ তোমার স্বর্গস্থ আত্মা এই সকল লেখকের কলমের দৌড় দেখিয়া হাসিতেছে কি কাঁদিতেছে, কে জানে?

আজকাল অনেক গল্পে ও উপন্যাসে দেখা যায়, যুবক ও যুবতীর মধ্যে প্রথম দর্শনে প্রণয়সঞ্চার (Love at first sight) হইলে সেই প্রেমকে চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হয়, কোন বাধাবিঘ্ন মানে না, লজ্জার মাথা খায়, বিবেকবুদ্ধি হারায়, এবং তাহাদের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় ও সমস্ত যুক্তিতর্ক উৎকট লালসার বন্যায় ভাসিয়া যায়। কিন্তু মহাকবি কালিদাস এইরূপ একটি চিত্র কেমন মনোহর অথচ নিপুণ ও সংযত ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন দেখুন। শকুন্তলার দর্শন মাত্রেই দুষ্মন্ত তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হৃদয় মন অর্পণ করিয়া ফেলিলেন! কিন্তু তথাপি তিনি ধর্ম্মভাব ও বিবেকবুদ্ধি হারান নাই। হারাইলে কখনও তাঁহার মুখ দিয়া এ কথা বাহির হইত না—

অসংশয়ং ক্ষত্র পরিগ্রহক্ষমা
যদার্য্যামস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহ পদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃকরণ প্রবৃত্তয়ঃ॥

হায়! আজকালকার কয়খানি নাটক বা উপন্যাস প্রেমমুগ্ধ নায়কের মুখে এইরূপ বিবেকের বাণী, এইরূপ আত্মসংযম ও আত্মবিশ্বাসের কথা শুনিতে পাওয়া যায়?

আর একটি দৃশ্য দেখুন—মহাকবির 'কুমারসম্ভবে।' গৌরীর কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। এ অবস্থায় যে সে কবি হইলে গৌরীর মুখ দিয়া 'প্রাণনাথ' জীবন সর্ব্বস্ব, কত আরাধনার ফলে তোমায় পাইয়াছি' এই ভাবের কতকগুলি উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথা বলাইয়া তাঁহাকে অচিরে তাঁহার দয়িতের সহিত আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করাইতেন। কিন্তু গৌরী কেমন ধীরে, কেমন সংযতভাবে, মহাদেবের নিকট

আত্ম নিবেদন করিতেছেন, তাহা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, প্রাণে এক অপূর্ব্ব শান্তি অনুভূত হয়।

কালিদাসের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে আর শেষ করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু দেশকাল বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। কালিদাস! তুমি আদিরসের কবি হইয়াও তোমার কাব্যে যে সংযমের পরিচয় দিয়াছ, আজকালকার অনেক নীতিবাদীর রচিত কাব্যেও সে সংযমের পরিচয় পাই না, এ দুঃখ রাখিব কোথায়? লোকে বলে তুমি মদ্যপ ছিলে, তুমি লম্পট ছিলে, কিন্তু তোমার কাব্য পাঠ করিয়া ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে ধারণা মনে উদিত হয় না। বরং মনে হয়, তুমি একজন পরম জ্ঞানী, পরম ভক্ত, শুদ্ধ চরিত্র, সংযমী অথচ সুরসিক মহাপুরুষ ছিলে। হে বাণীর বরপুত্র, হে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী ব্রাহ্মণ, এই অধমের কোটি কোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কর।

স্বর্গীয় পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

আজ আমরা ৺বিশ্বনাথের পদেরত, বঙ্গের গৌরব, ব্রাহ্মণ্যের জলন্তমূর্ত্তি, বহুশাস্ত্রবেত্তা, বর্ত্তমান যুগযোগী, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পঞ্চ যজ্ঞপরায়ণ, বাগ্মী, সুকবি, পণ্ডিত ভূষণ স্বর্গীয় জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের জীবনচরিত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের গুণের ব্যাখ্যা আমরা কি করিব। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অদম্য অধ্যবসায়, গভীর গবেশনা, শাস্ত্রে বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ্যে নিষ্ঠা, ইত্যাদি জনসাধারণের অনুকরণীয়। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় নোয়াখালী জেলান্তর্গত ঘোষকমতা গ্রামে ব্রাহ্মণ্য পরায়ণ ক্রিয়াবান ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ঠাকুর পরিবার নোয়াখালী ব্রাহ্মণ সমাজে কুলশীলতায় ক্রিয়া ও পাণ্ডিত্যে সবিশেষ বিখ্যাত। উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের জীবন সমালোচনায় তাহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ পূর্ব্ব-পুরুষের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। উক্ত মহোদয়ের প্রপিতামহ একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

তাঁহার নাম ছিল ৺কালীদাস চক্রবর্ত্তী, কালীদাস চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাহার পাদপদ্ম ক্রোড়ে ধারণ করিয়া জলন্ত হুতাশনে হাসিতে

হাসিতে উপবিষ্ট হইয়া, শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করতঃ আত্মাহুতি দিয়াছিলেন, উক্ত সতীর শ্মশানে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমানেও বহু প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ রহিয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র, রামরতন ও রামলোচন। রামরতন অত্যন্ত সুধী ছিলেন বলিয়া নোয়াখালীর প্রাচীন জমিদারের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র মহামহোপাধ্যায় ৺রামলোচন সিদ্ধান্ত পঞ্চানন। ইনি সে কালে বঙ্গবিজয়ী বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় নাটোরের মহারাজের দ্বার পণ্ডিত ছিলেন। ৺রামলোচন সিদ্ধান্ত পঞ্চাননের একমাত্র পুত্র, পণ্ডিত ৺জয়গোপাল বিদ্যাভূষণ, জয়গোপাল বিদ্যাভূষণের সাত পুত্র ও ছয় কন্যা। যথা—(কালী, কাশী, অভয়, জয়, ভুবন, যাদব, দয়াময়। জুনী, টুনী, করুণা, কমল, বিমল, দক্ষিণা)। জয়গোপাল বিদ্যাভূষণের পুত্র কন্যাগণের ঐ লহরী নোয়াখালীর জন সাধারণের মুখস্থ আছে। ঐ সাতপুত্রের মধ্যে জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহোদয়ই অত্যন্ত বিখ্যাত। উক্ত প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকরণ সাহিত্য ও শব্দ পাণ্ডিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশ হইতে বিদেশ যাত্রা করেন। প্রথমতঃ মিথিলায় যাইয়া স্মৃতি, দর্শন কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। অনন্তর বিক্রমপুর যাইয়া ন্যায় শাস্ত্রের কতেক অধ্যয়ন করিয়া স্বকীয় মেধা ও অধ্যবসায়ের জোরে সমস্ত শাস্ত্রে সবিশেষ বিজ্ঞ হইয়া পড়েন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া অনেক বড় বড় পণ্ডিতের সহিত বিচার করিয়া সকলেরই শ্রদ্ধাদৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। অনেক বড় বড় সভায় তিনি অনর্গল প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া জন সাধারণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র চন্দ্রমাধব ঘোষ, গুরুদাস বানার্জ্জি মহোদয়গণ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি উক্ত মহোদয়গণের বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতার অনেক খ্যাতনামা বড় বড় লোক তাঁহাতে ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। এবং অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

পণ্ডিত সমাজে তাঁহার মত সম্মান অনেকেই অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণ্য ও নৈষ্ঠিকতা তদীয় পাণ্ডিত্যকেও পরাস্ত করিয়াছিল। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় প্রথমজীবনে "সংস্কৃত চন্দ্রিকা" ও "ব্রাত্য কায়স্থ চন্দ্রিকা" পত্রিকার প্রতিষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত আরও দুই একখানা গ্রন্থের নাম আমরা উল্লেখ করিতেছি। জীবন শিক্ষা, নিত্যকৃত্য শিক্ষা, আর্য্য স্ত্রী শিক্ষা, বৃহৎ মহাভারতের সূচি, শব্দশক্তি প্রকাশিকার স্বকীয় টীকা, কুলবালিকা

কুলবধূ, কুলগৃহিণী বিজ্ঞান কুসুম, স্তুতিমালা), লক্ষ্মী পরিণয় মহাকাব্য ৮ সর্গ রচনা করিয়া তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে সর্ব্বদাই অধ্যয়ন করিতেন। প্রাচীন পুরাণ, সংহিতা, উপপুরাণ, তন্ত্র জ্যোতিষ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে তিনি বিশারদ ছিলেন। বৃহৎ মহাভারতের সূচী তাঁহার জ্বলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ। "জীবন শিক্ষা ও নিত্যকৃত্য শিক্ষা"র সদৃশ হিন্দুর উপকারী গ্রন্থ অদ্য পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় প্রকাশিত হয় নাই। জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় ১৩১৩ সালে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হন। ২০ বৎসর কাশী বাস করিয়া ৭৮ বৎসর বয়সে কাশী লাভ করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন, আমরা ভরসা করি তাঁহার স্ববংশধরগণ তাদৃশ নৈষ্ঠিকতা ও পাণ্ডিত্যে তাঁহার মুখোজ্জ্বল করিয়া কীর্ত্তি রক্ষা করিবেন।

সমালোচনা।

১৩৩১ সালের পি, এম, বাকচির পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও সর্ব্ব প্রথমে ২রা মাঘ এই পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে, পঞ্জিকার গণনা প্রভৃতি নির্ভুল করিবার জন্য প্রকাশকগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, পি, এম, বাকচি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় কিশোরীমোহন বাকচি মহাশয় প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কৃতবিদ্য পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া এ পঞ্জিকাকে সর্ব্ব সাধারণের আদরের সামগ্রী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সেই ভাবেই পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্জিকা খানি কাগজে মুদ্রণে আকারে প্রকারে বড়ই নয়ন মনোরঞ্জন হইয়াছে, মুল্য পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় প্রত্যেক খানি ।০ আট আনা, প্রাপ্তি স্থান ১৬।এ সুকিয়াস্ লেন, মৃগিহাটা, কলিকাতা।

সর্ব্ব বিজয় কবচ মূল্য ১।০

ইহার গুণ অত্যাশ্চর্য্য, অতুলনীয়, দৈবশক্তি সম্পন্ন, বর্ণনাতীত। শাস্ত্র হইতে একটী শ্লোকের কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"সর্ব্ব গ্রহ প্রশমনী নিঃশেষ বিষনাশিনী। জয়ং সর্ব্বত্র কুরুতে ধনদা সুমতিপ্রদা ॥"

অর্থাৎ ইহা দ্বারা সকল প্রকার গ্রহদোষ প্রশমিত হয়, শরীরের বিষ নাশ হয়। সর্ব্বত্র সকল কার্য্যে জয়লাভ হয় এবং সুমতি হয়। পৃথিবীতে সৎপথে সুস্থ শরীরে থাকিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন দ্বারা অল্প দিনে সুখী ও ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া যায়।

প্রশংসা পত্র।

ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম ও হেল্‌থ অফিসার মহোদয়গণের—

সুবিখ্যাত সর্ব্বজন সুপরিচিত ডাক্তার প্রোফেসার পি, কে, রায় মহাশয় ১৫৯ নং অগস্ত্যকুণ্ড কাশীধাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার কোন বন্ধু আপনার কবচ ধারণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বরকমেই দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন ও আপনার কবচ ভারতে চিরদিন সমভাবে বিরাজ করিতে থাকুক।

কলিকাতা ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের সুবিখ্যাত ডাক্তার কে, এন, বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—যখন আমি পিডং হাসপাতাল দার্জ্জিলিংএ ছিলাম, সেই সময় একটি কবচ পাইয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি।

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সেন টিপনিং টি ষ্টেট হইতে লিখিয়াছেন—আপনার কবচ ধারণে ভাগ্য বিশেষ সুপ্রসন্ন হইয়াছে।

ডাক্তার জে-এন-রায় এল-আর সি-পি-এল (এডিন) ডি-পি-এইচ (লণ্ডন) গ্রার হেল্‌থ অফিসার ২নং ট্যাংরা রোড কলিকাতা হইতে লিখিতেছেন—আপনি দুইটি মাদুলী পাঠাইয়াছিলেন, তাহার অতি আশ্চর্য্য ও পরমাহতকর ফল হইয়াছে।

ডাক্তার ফামরোজ আর-কে হামিক এম-সি-বি-এস গ্র্যাণ্ট রোড বোম্বাই হইতে লিখিতেছেন—আপনি আগে যেরূপ মাদুলী পাঠাইয়া ছিলেন, সেইরূপ আর ৩টী মাদুলী পাঠাইবেন। বাস্তবিকই ইহা বিশেষ উপকারী।

ক্যাপটেন এ-সি রায় আই-এম-এস-মেডিকেল অফিসার উজিরাবাদ লিখিয়াছেন—কয়েকমাস ধরিয়া সর্ব্ববিজয় কবচ ব্যবহার করিতেছি এবং সকল বিষয়ে সফলকামও হইয়াছি পত্র মধ্যে ১০৲ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া ২টী তামার কবচ আরও পাঠাইয়া দিবেন।

কবিরাজ শ্রীতারাপ্রসাদ সেন (সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত) কবিরঞ্জন গুরুপদতীর্থ ডিব্রুগড় লিখিতেছেন—আমি অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে অরঞ্জিত ও অতীব ঘটনা এই যে, "সর্ব্ববিজয় কবচ" আমাদের পরিবারবর্গ ধারণ করিয়া আশাতীত সুফল পাইয়া সানন্দ চিত্তে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে—একজন ও পুরাতন বিষম জ্বর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। অপর একজন অভিলষিত ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর একজন স্বীয় স্বাধীন ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতি লাভ তেছে। সত্যকথা এই আবহমান কাল হইতেই "সত্যমেব জয়তে।"

প্রাপ্তিস্থান—মহাযোগেশ্বরী আশ্রম।

২।৩ রামকৃষ্ণ লেন বাগবাজার, (বাজারের নিকট) কলিকাতা।

কলিকা

সোহাগভরা প্রীতিমাখান
সুন্দর মুখখানি

কিসে হয়, ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একাশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপান যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৶০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী-ব্যাধিতে-অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ॥৵০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

২৯শ, বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩০. [১১শ, সংখ্যা

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	হিন্দুধর্ম্ম ও অনুদারতা	শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	৩২১
২।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩২৬
৩।	শ্যামা-মা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	৩৩১
৪।	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়োগে	...	৩৫০
৫।	মেঘের অভিসার	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ,	৩৫১

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত 5-7-24

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বপ্রাপক

একদিনে জ্বর ছাড়ে। পথ্যের বিচার নাই।

মূল্য ৮০, ডজন ৭॥০, গ্রোস ৭৪৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলান লিমিটেড।

হেড আফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. 1388

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
ঝাপ্সা হ'য়ে যাবে
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তৈল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা : "জিবাশিয়ান"

টেলিফোন নং : ২৭১৫ কলি :

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

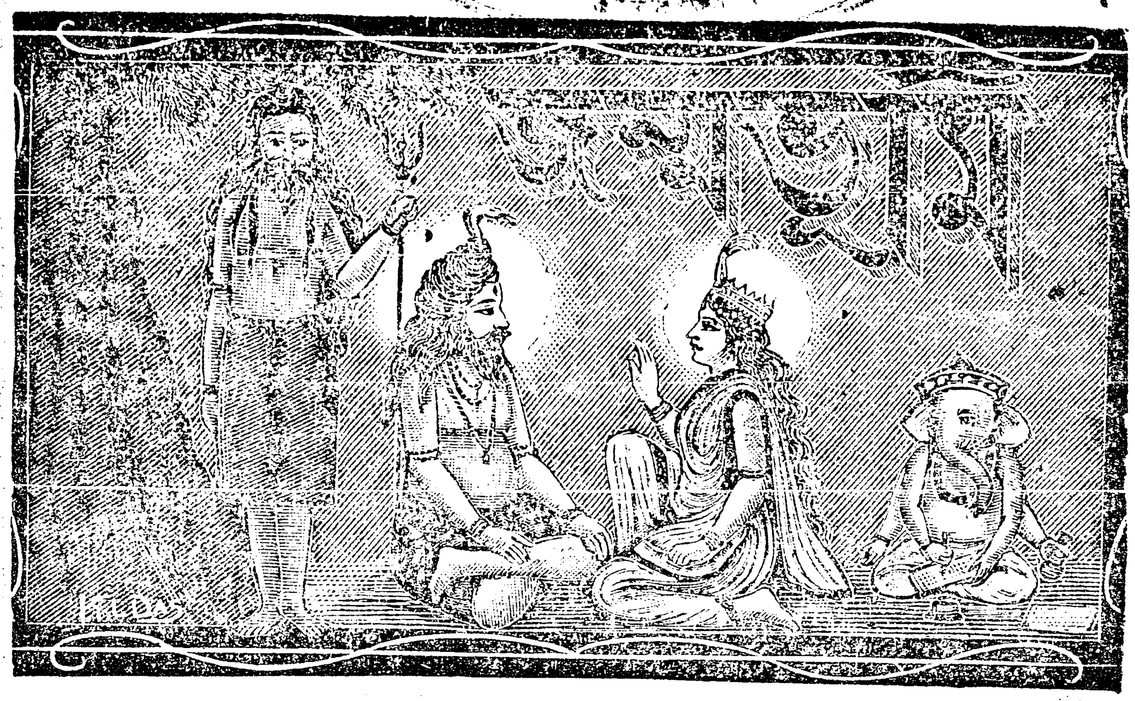

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৯শ, বর্ষ। | ১৩৩০ সাল, ফাল্গুন। | ১১শ, সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও অনুদারতা।

লেখক;—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই হিন্দুধর্ম্মের নামে একটা না একটা অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্ম এখন বেওয়ারিস মালের সামিল, সুতরাং কি হিন্দু, অহিন্দু, সকলেই এই ধর্ম্মের কর্ত্তা এবং [illegible]। অতএব ইহার মধ্যের কুসংস্কার স্বরূপ আবর্জ্জনা রাশি দূর করিয়া ইহাকে মাজিয়া ঘসিয়া সংস্কৃত করিয়া সুসভ্য করিতে সকল জাতিই মাথা ঘামাইতেছেন এবং যতক্ষণ ইহাকে বর্ত্তমান কালের উপযোগী সৌখিন সুসভ্য করিয়া তুলিতে না পারিতেছেন, ততক্ষণ সকলের উচ্চ মহৎ উদার হৃদয়ে কতই যে ব্যথা পাইতেছেন, তাহা তাঁহারা কত ভাবেই না ব্যক্ত করিতেছেন—কত সভা সমিতিতে বক্তৃতাকালে গলা চিরিয়া ফেলিতেছেন, কত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকায় কবিতা প্রবন্ধ লিখিয়া লোকের

মনে ধোঁকা ধরাইয়া দিতেছেন, এমন কি লাট সভায় নূতন নূতন করাইয়া লইতেছেন ও করাইবার চেষ্টার কসুর করিতেছেন না। এইরূপে বেওয়ারিস হিন্দুধর্ম্মের নব নব সংস্কারের জন্য সকলে কষ্টই স্বীকার করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম এখন স্বামী হীন। এই জন্য ইহাকে অনাথ দেখে সকলেই ইহার প্রতি দয়া করিতেছেন এবং ইহাকে স্বনাথযুক্ত করিবার জন্য সকলেই ইহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের এই অযাচিত করুণারসসিক্ত ভালবাসার জন্য হিন্দুধর্ম্ম ইহাদিগকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেছে, যে তোমাদের ঐ অযাচিত প্রেমে আমি এমন ভাবেই মজিতে বসিয়াছি যে, আর কিছুকাল তোমাদের অপার প্রেম আমার প্রতি জাগরুক থাকিলে আমার জন্য তোমাদের শেষটা বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে, কেন না, যেখানে চলাচলি সেখানেই গড়াগড়ি—তোমরা আমাকে এতবেশী ভালবেসে ফেলেছ যে, ঐ ভালবাসার ধমকের অতি আমোদে অনতিকাল মধ্যে আমার অনঙ্গ না হয়ে দেহান্তর থাকবে না, তখন তোমরা তোমাদের অতি আদরের আমাকে হারিয়ে কত কষ্ট পাবে। তাই বলি সোহাগ কম কর্‌লে হয় না!

হিন্দুধর্ম্মের যখন এই অবস্থা, তখন ইহার পর কটাক্ষ অভিযোগ না আসিবে কেন? হিন্দুধর্ম্ম কি বস্তু, তাহা বুঝিয়া যদি কেহ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিত, তাহা হইলে দুঃখের কারণ থাকিত না কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সমালোচক ও তথাকথিত সংস্কারকগণ হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম না, বুঝিয়া যা তা বলেন ও যা তা করেন ইহাই ঘোর দুঃখের বিষয়। ইহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পায় না। হিন্দুরা এখন একতাবিহীন সহায় শূন্য সুতরাং সমস্তই সহ্য করিতেছে। বস্তুতঃ যিনি হিন্দুধর্ম্ম বুঝিবেন তিনি ইহার সমালোচনা বা সংস্কার করিতে চাহিবেন না, তিনি দেখিবেন, হিন্দুধর্ম্ম সমালোচনা ও সংস্কারের অতীত পদার্থ, তবে তিনি কেবল ইহাই দেখিতে পাইবেন যে, বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি অহিন্দু আবরণ প্রবেশ করিয়াছে এবং ঐ গুলি সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের খোলোস ধারণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে একরূপ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু হিন্দুর চক্ষে ধরা পড়িয়াছে। আমাদের দরকার এই অহিন্দু ব্যবহারগুলি রূপ কণ্টক হিন্দুধর্ম্মের গাত্র হইতে তুলিয়া ফেলা। ইহা করিতে অপরে আসিবে কেন? আর হিন্দুরাই বা তাহা সহ্য করিবে কেন? হিন্দুধর্ম্মের কথা যেখানে হইবে তাহাতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কথা বলা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কাজ "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" হইবার আবশ্যক কি?

হিন্দুর যাহা আবশ্যক তাহা হিন্দুই করিবে। যাহা হউক হিন্দুধর্ম্ম এখন নানা ধর্ম্মীদিগের হাতে নানাভাবে নাস্তানাবুদ হইতেছে এবং তাঁহারা বর্ত্তমানে সুসভ্য ও সুশিক্ষিত অভিমানে অভিমানিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলোচ্ছেদে ব্রতী হইয়াছেন। জানি না, তাঁহারা নিজেদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হিন্দুধর্ম্মের হন্তারক হইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাল উদ্দেশ্যেই করুন বা কূট উদ্দেশ্যেই করুন তাঁহাদের কার্য্য হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আর তাঁহাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তাঁহাদের চটকে অভিভূত বর্ত্তমান হিন্দুযুবক সম্প্রদায় উহাদের ঐ বিষোদ্গার হজম করিয়া ফেলিতেছে, তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম উচ্ছেদের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই সকল শিক্ষিত সুশিক্ষিত সভ্য সুসভ্য মহল হইতে হিন্দুধর্ম্মের উপর কত ঘোরতর অভিযোগ আরোপিত হইয়াছে এবং নব নব কত অভিযোগও উঠিতেছে। এই সকল অভিযোগের মধ্যে একটি অভিযোগ হইতেছে যে, "হিন্দুধর্ম্ম বড় অনুদার।" আমি এই অভিযোগ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব, তাহাতে দেখাইব, অভিযোগটির মধ্যে সত্য কতটুকু. কিন্তু এই প্রসঙ্গে অন্য ধর্ম্মের প্রতি এই অভিযোগ খাটে কি না তাহা আমারা আলোচনার বিষয় করিব না, কিম্বা কাহারও প্রতি কটাক্ষপাতও করিব না; পরের ছিদ্র দেখিয়া লাভ নাই, নিজের ছিদ্র রোধ করিতে পারিলেই যথেষ্ট, সেইজন্য আমি এখানে কেবল আমাদের ধর্ম্মেরই আলোচনা করিব।

হিন্দুধর্ম্ম অনুদার—বাস্তবিক কি হিন্দুধর্ম্মে উদারতা নাই? এ কথা উঠে কেন? যখন উঠিয়াছে তখন ইহাতে নিশ্চয়ই কোন গলদ আছে বা ঘটিয়াছে। ফলতঃ যিনি হিন্দুধর্ম্ম বুঝেন, তিনি বলিবেন, এই অভিযোগ একেবারেই অসত্য ও ভিত্তিহীন, কিন্তু যাহার হিন্দুদিগের বর্ত্তমান আচরণে দৃষ্টি আছে, তিনি বলিবেন, ঐ অভিযোগের কারণ দেখা যাইতেছে; আসল হিন্দুধর্ম্মে ঐ অভিযোগের কারণ না থাকিতে পারে কিন্তু বর্ত্তমানের হিন্দুধর্ম্মে গলদ প্রবেশ করিয়াছে যাহাতে ঐ অভিযোগ উঠিয়াছে।

অতি সামান্য অনুসন্ধানেই অভিযোগের কারণ ধরা পড়িয়া যায়। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণদিগের অন্যবর্ণের প্রতি হতাদর—ইহাই ঐ অভিযোগের উৎপত্তি স্থল। বস্তুতঃ শূদ্রবর্ণকে ব্রাহ্মণ যে চক্ষে দেখিতেছেন, তাহা যেমন কষ্টের তেমনই লজ্জার। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শূদ্রকে ত ব্রাহ্মণ পশু অপেক্ষাও হীন চক্ষে দেখেন. সেখানে ব্রাহ্মণ যে পথ দিয়া যাইবেন শূদ্র সে পথে চলিতে পারিবে না। বাঙ্গালাদেশে যেখানে অন্য দেশ অপেক্ষা শূদ্রের মান্য বেশী সেখানেই স্মার্ত্ত

শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এক কলমের আচড়ে স্থির নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন যে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া আর অন্য বর্ণ নাই। এইরূপে শ্রেষ্ঠ বর্ণদিগকেও শূদ্র করিয়া ফেলিয়াছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া কিছুকাল প্রভুত্ব জাহির চলে বটে, কিন্তু পরিণামে দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। এখানে তাহাই হইয়াছে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ সকলকে শূদ্র করিয়া ফেলিয়া অন্য বর্ণের শিক্ষা লোপ করিয়া দিয়া উহা একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ফলে বিদ্যাশিক্ষা ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই আবদ্ধ হয়। অন্যত্রও ব্রাহ্মণগণের কৃপণতায় বা উদাসীনতায় অন্যবর্ণের শিক্ষার চ্যুতি ঘটে। তখন প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে ও দোষ ধরিবার লোক না থাকা ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ শিক্ষাবিষয়ে শিথিল প্রযত্ন হইতে লাগিলেন, তাহাতে বেদ, নীতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিদ্যা লোপ পাইল এবং কেবল লোক লোচনে ধূলি দিয়া প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার মত স্মৃতি, ফলিত জ্যোতিষ, ন্যায় প্রভৃতি বিদ্যার প্রচলন থাকিল। ক্রমশঃ তাহার শিক্ষাও সীমাবদ্ধ হইতে লাগিল। ফলে যে, ভারতে ঘরে ঘরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই শিক্ষিত ছিল সেখানে প্রায় সকলেই অশিক্ষিত হইয়া পড়িল। শিক্ষার খর্ব্বতায় সভ্যতার হানি হইল। তখন লোক আচার ভ্রষ্ট হইল; এই সুযোগে ব্রাহ্মণ নিজের সুবিধামত কতকগুলিকে অনাচরনীয় করিয়া ফেলিলেন। এখন ঐ অনাচরনীয়গণ অস্পৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ইহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই—দেশকাল পাত্র ভেদে এই কার্য্য সাধিত হইয়াছে হিন্দুধর্ম্মে যাহা নাই তাহা হিন্দুধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অভিযোগ আসিয়াছে। বস্তুতঃ এখন অন্যরূপ কাল পড়িয়াছে। বিংশশতাব্দীতে ভারত নানা দেশীয় লোকের সংস্পর্শে আসিয়া দেখিতেছে যে, তাহারা কত নীচে আসিয়া পড়িয়াছে। লোকের প্রাণে এক জাগরণের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। যাহারা অস্পর্শীয় রহিয়াছে, তাহারা আর তাহাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না। তাহারা দেখিতেছে, তাহারা হিন্দু হইয়াও ব্রাহ্মণাদির অস্পৃশ্য, আর ম্লেচ্ছগণ সেই ব্রাহ্মণাদির অস্পৃশ্য হইতেছে না। এত অসম দর্শিতা অসহ্য হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ঐ অস্পৃশ্যগণ কিরূপে তুষ্ট থাকিবে। বর্ত্তমান কালে হিন্দুগণ যেখানে খৃষ্টান মুসলমানের সহিত অস্পৃশ্য রূপ ব্যবহার রাখিতে পারিতেছে না, সেখানে স্বধর্ম্ম স্বদেশবাসীকে ত অস্পৃশ্য রাখা চলিবে না। এই অস্পৃশ্যতা এখন বিষয় সমস্যা, অথচ ইহাকে রাখিতে যাওয়া দুঃখেরও কারণ। যুক্তি ও কাল ধর্ম্ম এখন আর এই অস্পৃশ্যতা বরদাস্ত করিতে পারে না। হিন্দু ধর্ম্মের এ বিষয়ে রায় কি, তাহা দেখিতে হইবে—হিন্দুশাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলে?

হিন্দুধর্ম্মে অস্পৃশ্যতা নাই। হিন্দুশাস্ত্র তর্পণ ব্যাপারে আমরা দেখিতে পাই, যে সেখানে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত যা কিছু আছে, সকলকেই হিন্দুধর্ম্মে আপনার ভাবিতে হয়। পিতা মাতা, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগের ত কথাই নাই, দেব যক্ষ নাগ গন্ধর্ব্ব অপ্সরা অসুর সর্প বিহঙ্গ তরু অনাত্মীয় অবান্ধব প্রভৃতি ত্রিভুবনে যা কিছু আছে, সকলের তৃপ্তির জন্য হিন্দুরা তর্পণ কালে জলাঞ্জলি দিয়া তাহাদের তৃপ্তি সাধন করে। এ দেখিয়া কি হিন্দুদিগের মধ্যে উদারতা নাই এ কথা বলা চলে। ইহা কি কম উদারতার পরিচয়। প্রাণ কত উদার হইলে তবে ইহা আসে। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" সমস্ত পৃথিবীকে যে ধর্ম্মে কুটুম্ব মনে করে সে ধর্ম্মে উদারতার অভাব—ইহা নূতন কথা বটে! রামায়ণে দেখিতে পাই রামচন্দ্রের মিতা হইতেছেন, গুহক চণ্ডাল। মহাভারতে দেখি, ধর্ম্মব্যাসের প্রদত্ত পাদ্য অর্ঘ্য ঋষিকুমার স্বীকার করেন। হিন্দুধর্ম্মে গুণ কর্ম্ম অনুসারে বর্ণত্ব বিচার হয়। কত ব্রাহ্মণ বংশের কুমার ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ পাইয়াছে; আবার কত ক্ষত্রিয় কুমার ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত পুরাণে ভুরি ভুরি বর্ত্তমান। যদিও বর্ত্তমানে বর্ণত্ব বংশগত হইয়াছে, বলিয়া দেখা যাইতেছে. কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র বা হিন্দু ধর্ম্ম তাহা স্বীকার করে না। কালচক্রে ধর্ম্মের এই হীনাবস্থা হইয়াছে, বলিয়া হিন্দুধর্ম্মকেও কথা শুনিতে হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুধর্ম্ম অনুদার নহে, ইহা উদারতার আশ্রয় ভূমি, ইহাতে অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি অনুদার ভাব আদৌ নাই। যে যতই অন্যায় কার্য্য করুক না কেন, হিন্দুধর্ম্ম তাহাকে কোলে টানিয়া লয়, কেবল ঐ অন্যায় কার্য্যের জন্য তাহাকে শাস্তি গ্রহণ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় মাত্র। এত বড় উদার ধর্ম্ম জগতে আর নাই। যে ধর্ম্ম সমস্ত ধর্ম্মের জনক, তাহার নামে যে এই বদনাম ইহা আমাদের স্বার্থ প্রণোদিত কুকর্ম্মের ফল—ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। আমরা কতকগুলি অসদাচারকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেছি বলিয়া আজ হিন্দুধর্ম্মকে জবাবদিহি করিতে হইতেছে। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্ম অতি নির্ম্মল এবং উদারতার আশ্রয় স্থল। এখন আমাদের কর্ত্তব্য সকল হিন্দুর একমত হওয়া এবং হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে আবর্জ্জনা জমিয়াছে তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলা। ইহার জন্য অন্য জাতির মুখাপেক্ষী না হওয়া ও অন্য জাতিকে আমাদের ধর্ম্ম কথা কহিতে না দেওয়া, আর কথা বলিতে আসিলে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে দণ্ডায়মান হওয়া।

হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারের কিছু নাই, ইহা সনাতন, ইহাতে নূতন কিছু নাই, পুরাতন কিছু নাই, যাহা চির সত্য চির অনিশ্বর চির অপরিবর্ত্তনশীল তাহাই আমাদের হিন্দুধর্ম্ম।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—অমরার গড় রাজধানী ছিল। রাজা মহেন্দ্র রায় এই নগরের অধিপতি ছিলেন। তিনি নিজ ভুজবলে ও তাঁহার গুরু শিবরাম স্বামীর প্রসাদে তৎকালিন বঙ্গের রাজা সুদর্শনকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। মহাত্মা শিবরাম স্বামীর দেহান্তে তাঁহার সমাধির উপর করাল-বদনা মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, রাজা মহেন্দ্র তাঁহার গুরু শিবরাম স্বামীর নির্দ্দিষ্ট তাঁহার সমাধির পার্শ্বস্থিত আসনে বসিয়া যোগ সাধনা পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই করাল বদনা মূর্ত্তির নাম সিদ্ধেশ্বরী! ইহাও প্রবাদ আছে, রাজা মহেন্দ্রের পর অনেকে সেই সিদ্ধাসনে যোগ-সাধনা করিয়া সংসারের পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিবরাম ভট্টাচার্য্য, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, বৈদ্যনাথ সেন গুপ্ত, কেণারাম চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অমানুষিক কর্ম্ম সম্বন্ধে মানকর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে নানা প্রকার জনশ্রুতি আছে। মহাত্মা শিবরাম ভট্টাচার্য্যের একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে নিরক্ষর ছিলেন, কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু উপবীত ধারণের পর হইতে শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। যৌবনে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য উদয় হয়। দার পরিগ্রহ না করিয়া তিনি কঠোর যোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। তিনি অল্পদিন মধ্যে যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন, যোগবলে এক মুর্ত্তিতে এক সময়ে নানা স্থানে বিচরণ করিতে পারিতেন, ইচ্ছা ভোজন করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার জননী ভিন্ন সংসারে অন্য কেহই

ছিল না। তিনি একদা জননীর চরণ প্রান্তে বসিয়া কহিলেন, "মা বিশ্বজননী সংসার দেখিবার আমার বাসনা হইতেছে। আপনি আমাকে তীর্থ গমনে অনুমতি দেন। আপনার অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে আমি নিশ্চয় আপনার চরণ-দর্শন করিব। আপনাকে গঙ্গাতীরে অন্তর্জ্জলি করিব।" পুণ্যস্বভাবা জননী পুত্রকে সত্যবাক বলিয়া জানিতেন। তিনি পুত্রকে তীর্থ-পর্য্যটনে অনুমতি দিলেন। কথিত আছে, তিনি জননীর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। তৎকালে জননীর অসুখই ছিল না। শিবরাম গৃহে আসিয়া কহিলেন, "মা! আপনার গঙ্গা প্রাপ্তির সময় উপস্থিত। আপনি আমার সহিত মোক্ষদার তীরে চলুন। ইহা বলিয়া তিনি মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গ্রামবাসীদিগকে ইচ্ছা ভোজন করাইয়া পদব্রজে জননীর সহিত গঙ্গাতীরে গমন করেন। গঙ্গাতীরে তৃতীয় রাত্রি মাত্র অবস্থানের পর জননীর সাঙ্ঘাতিক পীড়া উপস্থিত হয়, তিনি তাঁহাকে অন্তর্জলি করেন ও জননীর শব দেহের সৎকার করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। কথিত আছে, তদবধি তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিছু দিন পরে সংবাদ সত্রে বদরিকা আশ্রমের প্রবন্ধ উপলক্ষে তাহার নাম ও অসাধারণ ক্ষমতার উল্লেখ হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, কেনারাম চট্টোপাধ্যায় সাধক কমলাকান্ত নির্দ্দিষ্ট দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরস্থ সিদ্ধাসনে বসিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

দেবী সিদ্ধেশ্বরীর পূর্ব্বতম মন্দির অনেক দিন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান রাজবৈদ্য স্বর্গীয় রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র পবিত্র আত্মা ঈশ্বরচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের আনুকূল্যে ও উদযোগে পরবর্ত্তি সময়ে যে মন্দিরের সংস্কার করা হইয়াছিল, তাহাও এখন বিনষ্ট প্রায়। এখন এই স্থানটা জঙ্গলে পরিণত হইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে এই সিদ্ধ পিঠস্থানে অনেক যোগী সন্ন্যাদী উপস্থিত হইতেন। দেবীর মন্দির লোকালয়ের অনতিদূরে অবস্থিত। চারিদিকে শস্য ক্ষেত্র, পার্শে শ্মশান ও একটী কেদার বাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী।

"একবার অমরার গড়ে অবস্থান কালে একদা সাধক কমলাকান্ত ভক্তবৃন্দের সহিত দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে গমন করিলেন। বেলা অবসান প্রায়। দিবসপতি জ্যোতি জাল সঙ্কীর্ণ করিয়া ঘোর লোহিত চক্রের রূপধারণ করিয়া অদৃশ্য হইতেছেন। লোহিত রেখা জাল ও নভোমণ্ডহ ও প্রকৃতি পুঞ্জের মুখ মণ্ডপে পতিত হইয়া লোহিত বর্ণের ছবির অভিনয় খুলিয়াছে। শীত ঋতুর প্রথম মাস। শিশির সেবিত স্নিগ্ধ সমীরণ রবিশস্ত সকলকে ধীরে ধীরে চুম্বন করিয়া প্রবাহিত

হইতেছে। সাধক অনুগামীগণের সহিত দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক দেবীরদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মানুষ যাহার বিষয় চিন্তা করে, যাহার মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করে, তাহার দর্শন পাইলে যেমন আনন্দে বিভোর হয় দেবীর দর্শনে সাধকেরও সেই ভাব হইল। তিনি উচ্চস্বরে গাহিলেন—

শঙ্কর উরে বিহরে শ্যামা রঙ্গিণী।
সৌদামিনী সহিত, সুধাংশু মিলিত,
নীল কাদম্বিনী॥
(মা আমার) না বাঁধে চিকুর, না পরে বাস ও বিধু বদনে মধুর হাস,
চিন্তামণি মিলায় প্রকাশ, সশিব শিব সিমন্তিনী,
তারণ কারণ, চরণ মন্ত্র, যে জন না জানে সে জন ভ্রান্ত,
নিতান্ত শান্ত করে কৃতান্ত, কমলাকান্ত বন্দিনী॥

সঙ্গীত শেষে সকলেই প্রফুল্ল নয়নে বিমলার মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেনারাম অনুগামী অপরাপর সকলকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাইরে আমাদের ঠাকুরের প্রত্যেক বাক্যই ভক্তিপ্রদ সারগর্ভ, রমনীয়।" রঙ্গিণী শঙ্করের উপরে চরণ বিন্যাস করিয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছেন। নীল কাদম্বিনীর মধ্যে সুধাংশু ও বিদ্যুতের অপূর্ব্ব সন্নিবেশ। মায়ের চরণের রুধির ধারা বিদ্যুতের শোভা ধারণ করিয়াছে সুধাংশু সম শব শিব কাল চরণের সহিত মিলিত হইয়াছে। মায়ের একি ভাব। এলোকেশ, দিগবসন, চারুদশনে অট্টহাস। ভাইরে! তোমরা মাকে আমার পাগলিনী ভাবিও না। একবার ধ্যানস্থ হইয়া চিন্তামণি পুরে মাকে দেখ, সৃজন পালন লয় কারণ শক্তি অভেদরূপে বিরাজ করিতেছেন। ভাইরে মায়ের এই চরণ ভব তারণ মন্ত্র, শমন ভয় নিবারণের একমাত্র উপায়। ইহা কহিয়া কেনারাম পুনশ্চ কহিলেন, "আজ আমরা পরম পবিত্র স্থানে আগমন করিয়াছি। মহাত্মা শিবরাম স্বামীর সমাধির উপর এই সিদ্ধেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কথিত আছে, যে স্থানে স্বামীর বামপদ স্থাপিত হইয়াছিল সেই স্থানে সিদ্ধাসন আছে। তথায় সপ্তরাত্রি নিরাপদে সাধনা করিতে পারিলে আর দেহ ধায়ণ করিতে হয় না। পঞ্চ রাত্রির যপে শিব লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিরাপদে একরাত্রি যপ করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ হয়। সংযম ও সাধনাহীন ব্যক্তি ঐ আসনে উপবেশন করিলে তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না, মহাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। সাধক,

কহিলেন, "মহাত্মারা পর হিতার্থেই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন।" যে ব্যক্তি নিজ সোপার্জ্জিত সম্পত্তি কেবল মাত্র নিজ ভোগ সুখে ব্যয় করেন তিনিই বঞ্চিত হন। যে ব্যক্তি বহু পরিশ্রমে লব্ধ সম্পতি পরোপকারে ব্যয় করেন সেই সম্পত্তিই তাহার মোক্ষ পথের সম্বল হইয়া থাকে। সংসারিকগণ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, পান্থশালা নির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা পুণ্য উপার্জ্জন করেন। যোগী সাধকগণ উপার্জ্জিত পুণ্য অক্ষয় ভাবে সংসারে দান করিয়া থাকেন। কেহ তপদ্বারা সিদ্ধ মন্ত্রের সৃষ্টি, কেহ রোগ নিবারণের ঔষধ আবিষ্কার, কেহবা উপদেশ দ্বারা বিপথগামী মানবকে স্বধর্ম্মে স্থাপন, কেহবা স্থান বিশেষকে পরম পবিত্র করিয়া রক্ত মাংসময় মানব দেহ ধারণের স্বার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক ইহধাম পরিত্যাগ করেন। পিপাসু মানব যেমন দিব্য সরোবর দেখিয়া আহ্লাদিত হয় শোক দুঃখ পীড়িত মানব এই স্থানে আসিয়া সর্ব্বসন্তাপ হারিণী জগদম্বার ঐ রাঙ্গাচরণ দুটি নিরীক্ষণ করিয়া সেই রূপ আনন্দিত হন। দেখ স্থানটী অতি নির্জ্জন, সাধনার উপযুক্ত। নানা তীর্থ পর্য্যটন অপেক্ষা এই পবিত্র স্থানে সাধনায় অধিক ফল লাভ হইতে পারে। ইহা কহিয়া সাধক আবার গাহিলেন,—

কেন! অকারণ কিসের চিন্তা কর মন।
তুমি সাধিলে সাধিতে পার শিবের সাধের ধন॥
এস না বিরলে বসি, ভাবি শ্যামা মুক্তকেশী,
গয়া গঙ্গা বারাণসী, মায়ের শ্রীচরণ॥
ভাবিলে ভবানী ভবে, ভবের যাতনা যাবে,
তোর পাপ পুণ্য কোথা রবে, শমনের দমন।
কমলা কান্তের আশা, নাম ব্রহ্ম কর্ম্ম নাশা,
সে তো কঠিন নয়, কেবল মুখের ভাষা, সুসাধ্য সাধন॥

সঙ্গীত শেষে কেনারাম কহিলেন, "ঠাকুর কালীনাম মহামন্ত্র সাধনা অনায়াস সাধ্য আপনার একথা বেশ বুঝিতে পারিলাম না। আপনিই বলেন, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত মানব সাধনায় প্রবৃত্তিলাভ করিতে পারে না, চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন।" সাধক মৃদু হাস্য কহিলেন, "লৌহকে পোড়াইবা মাত্র তাহার ময়লা দূর হয়। মনকে কর্ম্ম কাণ্ডে সত্বর নিশুদ্ধ করা যায়। কিন্তু লৌহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা কর্ষণ করিলেও তাহার ময়লা দূর হইতে পারে। নাম জপিতে জপিতে চিত্ত ক্রমে প্রসন্ন হয়, উদার ভাব আইসে, সংসার হইতে

ক্রমে ক্রমে মনকে পৃথক করা যায়। নাম সাধনা তাদৃশ কষ্ট সাধ্য নয়। সংসারী সহজেই সেই সাধনার পক্ষপাতী হয়। নাম গ্রহণের উপদেশ সর্ব্বত্র ফলবান না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সমাজ কি ধর্ম্মের গ্লানির সম্ভাবনা নাই নাম গ্রহণে অকৃত কার্য্য আত্ম বঞ্চনা আছে মাত্র। সুকৃতি বলে, প্রকৃতি বিশেষে, সেই মহামন্ত্র ফলবান হয়। দেখ বৃক্ষের বীজ নানা স্থানে পতিত হয়; কিন্তু মৃত্তিকা বিশেষে দুই চারিটীর অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, বৃক্ষ ক্রমে বৃক্ষ হইয়া ফল পুষ্পে সুশোভিত হয়। কাহার অঙ্কুর হইবে, কাহার অঙ্কুর না হইবে, এ কথা প্রকৃতি ভিন্ন কেহই বলিতে পারেন না। বহু বালক বিদ্যালয়ে যায়, শিক্ষক সকলকেই উপদেশ দেন, কিন্তু সকলেই কি পণ্ডিত হইয়া থাকে। জয় কালী বলিয়া সর্ব্বত্রই নাম মহামন্ত্র ছড়াইবে, মৃত্তিকার বিচার করিও না। পুরুষের প্রকৃতি, স্বভাব, কর্ম্মের কাঠিন্য বিবেচনা করিয়া তান্ত্রিক কর্ম্ম কাণ্ডে নিয়োগ করা উচিত। কর্ম্মকাণ্ডে অধিকারী নির্ব্বাচন করা কঠিন। অপাত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও তৎকর্ত্তৃক সেই কর্ম্ম অবিধিরূপে সম্পাদিত হইলে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কালী নাম মহামন্ত্র স্থাপনের পাত্রাপাত্র নাই। অপাত্রে পতিত হইলে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, তাই কালী নাম মহামন্ত্র সুসাধ্য সাধনা। ইহা শুনিয়া কেনারাম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর! এই স্থানে বসিয়া সাধনা করিবার আমার বড় বাসনা হয়। আমি অতি অধম, সংযম সাধনা হীন। সিদ্ধাসনের নির্দ্দেশ আপনার কৃপা ভিন্ন হওয়া অসম্ভব। যোগ বিঘ্ন ভয়ে এই স্থানে সাধনা করিতে আমার সাহস হয় না। সাধক কহিলেন, "আপনার সন্দেহ সুসার নহে। তান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা দেহ বন্ধন পূর্ব্বক চিন্ময়ীর চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিবেন, আপনার কোন বিঘ্ন হইবে না।" এই কথা শুনিয়া কেনারাম সাধকের চরণ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "আমার উদ্ধারের ভার আপনাকেই লইতে হইবে। অদ্য অমাবস্যা দেব সিদ্ধাচরে ভূত, প্রেত, পিশাচগণের সন্তোষ সাধনের দিন। আমার ইচ্ছা অদ্যই আমরা নিশীথ সময়ে এই স্থানে আগমন করিব। সাধক কহিলেন, "তাহাই হইবে।" ওই দেখ দিবসপতি অদৃশ্য হইয়াছেন। ম্লানমুখী সন্ধ্যা সমাগত। বিহঙ্গগণ তরুশিরোপরি বসিয়া অংশুমালীর অদৃশ্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া কলরব করিতেছে।"

এমন সময় পুরোহিত ব্রাহ্মণ আসিয়া দেবীর সন্ধ্যা বন্দন ও আরতি আরম্ভ করিলেন। ঘণ্টা ও কাঁশর শব্দে দেবীর মন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ

শস্য ক্ষেত্র সকলকে মুখরিত করিতে লাগিল। সাধক ও অন্যান্য সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। আরতি শেষে সাধকের সহিত সকলে কর যোড়ে গাহিতে লাগিলেন.—

শঙ্করি শিবে শ্যামে উমে ভবাণী।
বরদে সারদে আশু হররাণী॥
দুঃখ হর, ভয় হর, রিপু হর, স্মর হর, মন মোহিনী।
চরাচর নাগ নর শূর পালিনী,
ভবে অম্বিকে, অনুগত সুত বিহিত কারিণী,
মৃত্যুঞ্জয় হৃদয় চারিণী, শরণাগত কলুষ নাশিনী,
কমলাকান্ত হৃদয় বিহারিণী।

সঙ্গীত শেষে সকলে দেবীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া সাধকের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্যামা-মা।

পণ্ডিত — শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য — বন।

(তরুতলে বেদিকোপরি সাধক সমাধি মগ্ন।)

সাধক। (সমাধি ভঙ্গে)
দিবা অবসান,
অস্তাচলে চলে দিনকর;
বলে যেন রক্ত হা স মুখে,—
"জীবনের এক দিন ফুরা'ল তোমার।
পুনর্ব্বার উদয় আমার,—
একটি দিনের আয়ু গ্রাসিতে তোমার।"

এইরূপে আয়ু সনে ফুরাইবে দিন,
যাবে মাস,—বর্ষ যাবে চ'লে,
হবে ক্রমে জীবনের চির অবসান।
আরে মন! কি দেখিছ আর?
হায় হায়! এ জীবন হেলায় ফুরায়!
কি করিলে, কি করিলে!
সারাৎসারা শ্যামা-মারে নারিলে মিলাতে?
মাতৃ হারা হ'য়ে ঘুরে ম'লে প্রান্তরে প্রান্তরে!

(নেপথ্যে গীত।)

আড় নয়নে হান্‌বে কত ফুল বাণ।
জ্বলে মরি সইতে নারি রয়না যে আর প্রাণে প্রাণ।

সাধক। একি একি!
গীতধ্বনি আসে কোথা হ'তে!
ধ্বনি শুনি, বামাস্বর অনুমানি মনে।

(নেপথ্যে উক্ত গীত।)

সাধক। সত্য অনুমান,—
গাহে বামা বিজন কাননে।
মরি মরি কি সুন্দর সুঠাম মুরতি,
দিব্য জ্যোতি বিকাশিছে কায়,
যেন কোন অমর নন্দিনী,
স্বর্গ হ'তে উতরি কাননে,
দিশাচয় করে আলোকিত।

(পূর্ব্ব গীত গাহিতে গাহিতে মায়ার প্রবেশ)

সাধক। এই যে, এই যে, বামা আসে এই ভিতে,
তবে কিগো এই বামা প্রাণময়ী শ্যামা?
তবে কি গো এত দিনে,
মার প্রাণে জাগিল করুণা?
সদানন্দময়ী শ্যামা,
তাই কি আসিছে হেথা নাচিতে নাচিতে,
কৃতার্থ করিতে আজ অধম সন্তানে?

মায়া। (গীত।)
"তোমার তরে প্রাণ বঁধু সকল ভুলেছি,
সাধের সুখ ভাসিয়ে দিয়ে প্রাণে ম'জেছি;
রস-রাজ তোমারে আজ হাতে পেয়েছি,
পালাবে কোথায় আর হৃদয় কর দান॥

সাধক। কে তুমি গো,
কে তুমি গো অমর মোহিনী!
তুমি কি গো প্রাণময়ী শ্যামা মা আমার?

মায়া। (পুনর্গীত।)

সাধক। একি একি!
একি ভাব হেরি!
আরে মন! কেন তুমি হতেছ চঞ্চল?
এই বামা মহাদেবী শ্যামা।
মহামায়া করিয়া বিস্তার,
ছলনা করিছে মোরে।
মন সাবধান।
হেরি লীলা লীলাময়ী মা'র,
বিমনা হয়োনা হেন।
ভক্তি ভরে স্মর' শ্যামা-পদ।
এবে যদি অনুমান মিথ্যা হয় মোর,—
এই বামা ভিন্ন হতে শ্যামা,
জিজ্ঞাসায় জানি তবে,
কাহার ললনা,
কোথা হতে আসিল হেথায়।
কে তুমি গো,—
কাহার ললনা?
করুণায় পরিচয় দেহ অভাজনে।

মায়া। কিবা কাজ রসরাজ! পরিচয় শুনে,
তুমিই আমার প্রাণের আধার
সার ভেবেছি মনে।

(আমি) বনের পাখী বনে থাকি
বনের ফল খাই।
(এমন) রূপের ঘটা মোহন ছটা
কভু হেরি নাই।
কাতর প্রাণে শ্রীচরণে
করি নিবেদন।
কৃপা কর কৃপাকর !
দাসীরে এখন।

সাধক। একি কথা কহ মহাদেবি !
হর মনোরমা শ্যামা তুমি গো তারিণী,
আমি তব অধম কিঙ্কর।
কৃপা কণা লভিতে তোমার,
যুগ যুগান্তর ধরি ভ্রমিতেছি ভবে।
দাসে যদি কৃপা বশে দেখা দিলে আজ,
কেন তবে করিছ ছলনা ?
কেন বীপরীত ভাষে সম্ভাষিছ' মোরে ?
শান্তির বারিধি মাঝে,
কেন গো তুলিছ হেন অশান্তি তুফান ?

মায়া। প্রাণেশ্বর। প্রেমিক প্রবর !
অশান্তি গণিছ কি কারণ ?
ভ্রান্ত কি হইলে তুমি কমল লোচন ?
এ বিজনে যেই শুভক্ষণে,
মোর সনে মিলাইলে নয়নে নয়ন,
তখনি যে অধীনার হরেছ' জীবন।
সেই হতে এ দাসী তোমার,
সঁপিয়াছে শ্রীচরণে জীবন যৌবন।
সেই হতে হৃদয় ঈশ্বর !
বিষম মন্মথ-শরে জর্জ্জরিত হতেছে জীবন।
ধরি শ্রীচরণ,—

প্রেম ভিক্ষা দেহ মোরে ত্বরা ;
পূর্ণ কর' অধীনার জীবনের সাধ।

সাধক। (জানু পাতিয়া)
মা ! মা ! ক্ষমা কর অধম সন্তানে,
সাধ তব নারিব পূরাতে।
মহা দেবি !
হেরি তোমা এ বিজনে আজ,
সহসা জাগিল মনে,—
সাধনের ধন তুমি শ্যামা মা আমার ;
সে কারণে আকুল নয়নে
তোমা পানে চেয়েছিনু মাতঃ !
ছিঃ ছিঃ—ছিঃ ছিঃ—
ভাবান্তর তাহে মাগো ছিল না অন্তরে।
সাক্ষী করি রবি শশী,
সাক্ষী করি দেবকুল,
এখনো মা কহি গো তোমারে,—
"যাঁহার পবিত্র গর্ভে লভেছি জনম,
স্বর্গাদপি গরীয়সী সেই সে জননী,
জীবন রূপিণী শ্যামা জগত ঈশ্বরী,
শ্যামার প্রতিমা যত নারী এ জগতে,
মাতৃসমা গণি সবাকারে।
যেবা হও, ভিন্ন তুমি নহ মা তা' হ'তে।"
পুত্র ভাবে আশীষ আমারে,
ভক্তি ভরে প্রণমি তোমায়,—
চলিনু মা স্বকার্য্য সাধনে।

মায়া। (উন্মত্ত ভাবে গীত।)
যেওনা যেওনা চরণে ঠেল'না,
নাথ হে আজি আমায়।
দিওনা দিওনা মরমে বেদনা,
অকূলে ফেল' না হায়॥

(ত্রিশূল আস্ফালন সহকারে সহসা শিবের প্রবেশ)

শিব। যাস্‌নে পিশাচী মায়া ভক্তের পশ্চাতে।
সত্যযোগে নাহি দিস বাধা।
না করিস্ অবহেলা আদেশ আমার!
সংসারের সুখে মত্ত যেই পাপাশয়,
আশ্রয় কর'গে তারে,—
যাও ত্বরা, দূর হও মায়া মায়াবিনি!

(মায়াকে তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান।)

(কর্ম্মফলের প্রবেশ)

কর্ম্ম। (হাত তালি দিতে দিতে) হাঁ হাঁ বাবা, যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর। বেটা!—কেবল হাড় গোড় ভাঙ্গা "দ" নিয়ে ভাঁটা খেলাও, দেখ বাবা,—কেমন কাঁদে বাড়ী "ধ।" বাবা!—একেই বলে,—তেতো মিঠে বুঝলে নাকে যৈবনের ভরে। আকেরে ঝাড়ুর ঝোল পহরে পহরে॥ পালানে কেন বাবা, পালানে কেন? ব্যাপার দেখে আমি কিন্তু তাজ্জব বনে গিছি! যে প্রভাবতী মায়ার পাল্লায় পড়ে ভোলানাথ অন্ধকার দেখেন, তিনি যে আজ কটাকট মূর্ত্তি ধরে মায়ার বুকে শূল বিঁধতে এলেন তার কারণটা কি? ওাবশ্যি এর ভেতর ভাব টিপ্‌নী আছে। যাই হক আর দেরি করা হবে না। এই বেলা আমিও বাবাজীর পেছু নিই। এখন জ্ঞান ঠাকুরটা কি রঙ্গ করে দেখা যাক। চরণরে চলিলাট। (প্রস্থান)

(গাহিতে গাহিতে প্রমথ ও যোগিনীগণের প্রবেশ।)

জয় শিব শঙ্কর হর দুখহারী।
জয় পঞ্চানন জয় ত্রিপুরারি॥
শশি-ভাল ত্রিলোচন; জয় ভুজগ ভূষণ,
পরশু মৃগ শোভন বরাভয় ধারী॥
রজত গিরি বরণ, গিরিজা মনোমোহন,
জয় সৃজন কারণ, স্থিতি-লয়কারী॥ (প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—শ্মশান।

(রুদ্ধদ্বার দেবমন্দির সম্মুখে কর্ম্মফল কালি ঘুটিতে ব্যস্ত।)

কর্ম্মফল। ঘট',—ঘট',—'ঘট',—এতে ওতে ঘট', ওতে তাতে ঘট', হাতে হাতে ঘট', দাঁতে দাঁতে ঘট', পাতে পাতে ঘট', রাতে রাতে ঘট', দিনে দিনে ঘট', দিনে রাতে ঘট', চোকে চোকে ঘট', নখে নখে ঘট', স্বর্গে ঘট', মর্ত্তে ঘট', পাতালে ঘট', ঘট',—ঘট',—ঘট'। (কলম দেখিয়া)

উঁহু হল না,—আর একবার ঘুঁটী। ঘট' ঘট' ঘট'। ভায়ে ভায়ে ঘট', জায়ে জায়ে ঘট', পায়ে পায়ে ঘট', বেয়ে বেয়ে ঘট, জামায়ে জামায়ে ঘট', নাৎজামায়ে নাৎজামায়ে ঘট', ঘরজামায়ে ঘরজামায়ে ঘট', বোনে বোনে ঘট', ননদভাজে ঘট', ঘট',—ঘট',—ঘট',—। (কলম তুলিয়া দেখিয়া)

উহুঁ হ'লনা—আর একবার ঘুঁটী। ঘট', ঘট', ঘট'। ঘরে ঘরে ঘট', পরে পরে ঘট', সদরে অন্দরে ঘট', দরবারে ভাণ্ডারে ঘট', চোরে কামারে ঘট', আঁধারে আঁধারে ঘট', আলোয় আলোয় ঘট', আলোয় আঁধারে ঘট, হাওয়ায় হাওয়ায় ঘট, ছন্দে ছন্দে ঘট, গন্ধে গন্ধে ঘট, ঘটনে ঘট, অঘটনে ঘট, দুর্ঘটনে ঘট। ঘট,—ঘট,—ঘট—। হাঁ হাঁ বাবা কালি দেখেছ, কেমন জ্বল্ জ্বল্ কোচ্ছে। যেন মেঘের কোলে লঙ্কাকাণ্ড।

এইবার কৈফিয়ৎটা আঁটী। (চিন্তা করিয়া) হাঁ, বিবেক আর মায়াবেটা (লিখন), তারপর সাধক আর মায়া-বেটী (লিখন)। হাঁ বেটী লেজে গোবরে হয়ে গেছে। ব্যাস্ বাবা, গরম গরম কৈফিয়ৎ আঁটা গেল। এইবার জ্ঞান ঠাকুরকে তো বিশেষ দরকার। কিন্তু ঠাকুরের তো পাত্তাই পাচ্ছি না। ঠাকুর গেল কোথা! গতিক দেখে সোরে প'ড়লো নাকি? তা, না পড়্‌বেই বা কেন, কর্ম্ম যখন চুলোয় গেলেন, আর মায়া যখন সরে পড়লেন, তখন জ্ঞান ঠাকুর আর বাবাজীকে বেশী কি পরখ করবেন। মোটের ওপর রঙ্গখানা দেখা চাই।

(নেপথ্যে গীত ধ্বনি)

আর কত ঘুমাবি তারা।
(আমায়) দোর খুলে দে ভব দারা।
খেল্‌তে আমায় পাঠিয়ে ভবে মা
আপনি ঘুমে হ'লি সারা,—
(তোর) ছেলে রইল বাহিরে পড়ে,
ভাব্‌লি নে তোর একি ধারা ॥

কর্ম্মফল। এই যে বারাজী এই দিকেই আসছেন। ওঃ—কি প্রাণঢালা ব্যাপার! বাড়ী, ঘর, টাকাকড়ি, দাসদাসী অতুল ঐশ্বর্য্য,—সব যেন বিষের মত অগ্রাহ্য ক'রে, "মা" "মা' ব'লে পাগল হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্চে! বাবা এমন না হলে কি আর তপিস্বে? কেবল ধনং দেহিং যশং দেহিং দেহিং দেহিং কোল্লে কি কখন তপিস্বে হয়?

আরে বাবা, মা কি কারো কিছু চাইবার অপিক্ষে রাখে? যার যা দরকার তা আগে থেকে মা সব ঠিক্ কোরে রেখে দেয়, তুমি কেবল 'মা' বল, আর দুধ খাও। বাবা,— মা'র পেট থেকে যখন ভূমিষ্ট হ'য়েছিলে তখন, খিদে পেয়েছে ব'লে মার কাছে আব্দার কর্‌বার কিছু ক্ষ্যামতা তোমার ছিল কি? তুমিও ম্যাঁ ম্যাঁ ক'রে চেঁচিয়েছ, আর মাও ঢক্ ঢক্ কোরে দুধ খাইয়ে দিয়ে তোমার পেট্‌টা ড্যাগরা কোরে দিয়েছে। ব্যাস্ তুমিও ঠাণ্ডা, মাও ঠাণ্ডা। বাবা, যত বড়ই সব হওনা কেন, মার কাছে সেই আঁতুড়ের বাচ্ছাটী। আর বেশী কিছু নও। এখন তোমার কাজ শুধু 'মা মা' ব'লে ডাকা। তারপরই আমার খস্‌ড়াঘাৎ "ফলং কর্ম্মায়ত্তং।" এই যে,—বাবাজীও এসে পৌঁছুলেন দেখছি। আমিও ততক্ষণ বাবাজীর ফলং কর্ম্মায়ত্তং কর্‌বার ব্যবস্থা করি।

(নেপথ্যে গীত।)

এমন খেলা খেল্‌তে আমি আর কভু যাবনা তারা।
(তোর) কোলে ব'সে তোর মুখে মা দেখবো জগৎ সায়াৎসারা ॥

কর্ম্মফল। (খাতাদি লইয়া উঠিয়া) বাবা! এঁকে টলান এখন জ্ঞান ঠাকুরের বাপেরও সাধ্যি নেই। আমি ততক্ষণ ঐ ঝোপ্‌টার ভেতর ব'সে ঠাকুরদের রঙ্গখানা দেখি, তার পর দরকার বুঝি ত বাগমা

একটা পাগলা ছাগ্‌লা সেজে সশরীরে আসোরে নামা যাবে। তবে ঐ জ্ঞান ঠাকুরটা আমায় ধোরে ফেল্‌বে। তখন সাপে ছুচো গেলার মত একটু আম্‌তা আম্‌তা কোর্‌বে আর কি। তা করুক চরণ রে! চলিলাট। (প্রস্থান)

(গাহিতে গাহিতে সাধকের প্রবেশ)

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যে হ'ল মা,
(উঠল) আকাশে কাল নিশির তারা।
(এখন) কোন্ পথে যাই ভেবে না পাই,
হোয়েছি যে দিশে হারা ॥
কাতরে ডাকি মা তোরে, সাড়া দেগো ভয় হরা!
(আমি) সাড়ায় সাড়ায় তোর কাছে যাই,
(হ'য়ে) মহানন্দে মাতোয়ারা ॥

(সহসা মন্দির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হওন। পাষাণময়ী মূর্ত্তি কালী অধিষ্ঠিত।)

সাধক। (গীতান্তে চমকিত ভাবে)
শ্মশান মাঝারে কেরে ও কার ললনা?
ঘোর, বীরা, হুহুঙ্কারা করাল বদনা!
আধ শশিভালা, ঘনা, জ্বলদগ্নি ত্রিনয়না,
নিজ্জীব শিশু শ্রবণা, বিকট দশনা!
স্কন্ধে রক্ত নিঝরিণী বিলোল রসনা!
খড়্গ মুণ্ড বরাভীতি ধারিণী দক্ষিণা।
নৃমুণ্ড-মালিনী কর-কাঞ্চি সুশোভনা!
মুখে অট্ট অট্ট হাস, বিচ্ছুরিত কেশ পাশ,
মহোল্লাস-সমুচ্ছ্বাস তাণ্ডবে মগনা,
পীন পয়োধরা, রামা ভীমা, দিগ্বসনা!
এ নহে সামান্য বামা ভাব বিভূষণা,
কাল হর, কালী এ যে শবশিবাসনা!
শবের বিভূতি ভাল' সজীব সে মহাকাল,
বিস্তারিয়ে যোগজাল করিছে সাধনা,
দুস্তরে নিস্তারা শ্যামা আশ্রিত শরণা ॥

সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

(প্রণাম করণ)

(জানু পাতিয়া বসিয়া করযোড়ে)

প্রাগ্দেহস্থো যদাসং তব চরণ যুগং
নাশ্রিতো নার্চ্চিতোঽহং।
তেনাদ্যেঽকীর্ত্তি বর্গৈ র্জঠরজ দহনৈ
র্বাধ্যমানো বলিষ্ঠৈঃ।
স্থিত্বা জন্মান্তরে নো পুনরিহ ভবিতা
ক্বাশ্রয়ঃ কাপি সেবা।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিত বদনে,
কামরূপে করালে ॥

(প্রণাম করণ)

(সহসা দস্যুবেশে জ্ঞানের প্রবেশ।)

জ্ঞান। ওহো কি বিকটাকারা কালা কি ভীষণা!
পলকে ত্রিলোক যেন গ্রাসিছে দারুণা!
জানি না কি গুণে তার
মুগ্ধ হয় ত্রিসংসার,
করে কালী নাম সার ভজনা সাধনা।
করুণা স্নেহ-মমতা-বর্জ্জিতা, শ্রীহীনা!

সাধক। কে বলে রে শ্যামা মারে ভীষণা দারুণা?
কালিকা যে কল্পতরু, করুণা-বরুণা!

জ্ঞান। দয়া কোথা হৃদে তার?
কিবা চিহ্ন দেবতার?
জীবনের ধর্ম্ম যার সৃষ্টির নাশনা।
কেন বা শ্মশানে বাস অস্বর্গ্য বাসনা!

সাধক। দিও না মায়েরে ভাই দিও নাকো গঞ্জনা,
ভক্তি ভরে কর সদা শ্যামাপদ বন্দনা।
স্নেহ, দয়া বিতরিতে,
স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জিতে,

কে আছে রে ত্রিজগতে মার মত বল না?
সৃষ্টি নাশা. মূর্ত্তি মার সৃষ্টি রক্ষা বাসনা ॥
একান্ত ধিয়াও মারে হ'য়ে শান্ত সুমনা,
মর্ম্ম দানে মর্ম্ম ধর' হ'ও না রে দুর্ম্মনা,
সর্ব্বাশ্রয়া সর্ব্বাধারা,
শূন্যে শূন্যা নিরাধারা,
সর্ব্বার্থ সাধিনী সারা নহে ত' সাধারণা,
চরাচর নরামর মা সৃজন কারণা ॥
সুখের ভিখারী জীব অতৃপ্ত বাসনা,
ভীষণ শ্মশান বাস কে করে প্রার্থনা?
ত্রিলোক ঈশ্বরী শ্যামা,
ত্রিলোক বিলোকে বামা,
তাই বিলাইয়ে রামা নিঃস্বার্থ জীবনা.
আপনি শ্মশান বাসে আনন্দে মগনা ॥
হেন স্বার্থ শূন্য চিত্ত এত' স্নেহ করুণা,
বিশ্বভরা ভালবাসা কার এত' বল না?
শিক্ষা দিতে জীবে তাই,
শ্মশানে শ্যামার ঠাঁই,
কি কর সংসার ছাই 'আমি' তুমি' ত্যজ'না!
চরমে সমান সব সাক্ষ্য তার দেখ' না ॥
রাজা, প্রজা, প্রভু, ভৃত্য হেথা ভেদ রহে না।
এমন প্রশান্ত বায়ু স্বর্গধামে বহে না ॥

(গাহিতে গাহিতে পাগল বেশে কর্ম্মফলের প্রবেশ।)

কর্ম্মফল। (জ্ঞানের প্রতি)
(কেন) পাক্ মেরে ডুব্ খেলে।
(মিছে) নাকে কাণে জল ঢোকালে ॥
সুস্থ শরীর ব্যস্ত ক'রে, জেদের ভরে, (ও বুদ্ধিবীর!)
(কেন) "আধ্ কপালে" রোগ জোটালে ॥
জোয়ার ভাঁটা নাই এ গাঙে, এক টানা বয় দুকুল ভেঙে,
নাভে হ'তে জলে নেমে মান খোয়ালে। (বুদ্ধিবীর!)

(বঁধু) যাও হে চ'লে আপন তালে।
(বঁধু) দাওগে' কাটী আপন ডালে॥ (প্রস্থান)

জ্ঞান। কেন তবে শান্ত শশী.
ভালে বন্দী দিবানিশি?
অঙ্গ হ'তে অগ্নি রাশি বরষিছে অঙ্গনা!
সুজন শাসনা, রুষ্টা, স্বার্থ শুধু সাধনা॥

সাধক। স্বার্থ নহে, নহে ক্রোধ, অর্থই জান'না,
সদর্থে কদর্থ করি কৃতার্থ ভেব' না।
অজ্ঞান তিমিরে ভরা,
রসাতল স্বর্গ ধরা,
মহাদেবী জ্ঞানাকরা আলোকভবনা,
শ্রীঅঙ্গে জ্ঞানাগ্নি কিবা জ্বলিছে দেখনা॥
চরাচর প্রতিভাত হ'তেছে বিভায়,
অন্তর বাহির তমঃ বিদূরিছে তায়॥
কোন মুখে তুমি মা'রে,
রুষ্টা বল' বারে বারে?
যে পুণ্য আলোকাধারে জীব মাত্রে হায়,
দৃষ্টি শক্তি লাভ হেরে আঁখি যথা ধায়।
প্রভাকর,—প্রভাকর শ্যামাঙ্গ প্রভায়.
শান্তকর,—শান্তকর, বহ্নি জ্বালাময়॥
ঊর্দ্ধ গগনেতে বসি
রূপ বিভা পরকাশি,
গর্ব্ব ভরে বলে শশী বাতুলের প্রায়,
"আমা সম রূপবান্ নাহিক কোথায়"॥
দর্পহরা ঘোরা তারা শুনি সে কথায়,
ভ্রূভঙ্গে হাসিয়া জ্ঞান দিল চন্দ্রমায়। (ওহে)
বারতা কি কব তাঁর,
হৃদয় বিভব সার,
শান্তি-সুধা-পারাবার মথিয়া ত্বরায়।
অকলঙ্ক কোটি শশী উদ্ভাবিল হায়॥

মাতৃ-কর-পদ-নখে ছুটিল সে শশিদল,
আধা-ভালে বসি প্রভা ছড়াইছে সুবিমল।
ত্রিলোক আলোকা ভালা,
তাই আধশশিভালা;
হেরি এ শশীর মেলা খ-শশী হ'ল' বিকল,
হিংসায় মাখিল কালী, চুর্ণ তায় দর্প বল।

জ্ঞান। হিংসায় তোমার কালী কাল' ওহে দুর্ম্মনা।
পরশ্রী কাতরা, তাই ঘনা. নীলবরণা॥

সাধক। এ নীলের কি রহস্য,
কি বলিব' হে বয়স্য?
জগৎ নীলার বশ্য "কা কস্য" তা' ক'র না।
নীলা কেন মহাদেবী তত্ত্ব তার ধর' না!
সুত-হিততরে মাতা কত সহে যাতনা,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার নীলাতেই দেখ'না!
গরলের বর্ণ নীল. (ওহে)
মাতৃ অঙ্গে মাখা নীল,
পাপ-বিষে এ নিখিল বিশ্ব ভরা জান' না?
সে গরল পানে মাতা হ'ল নীল বরণা॥
সমুদ্রের হলাহল নীল কণ্ঠ কণ্ঠে রয়,
উগ্রতায় সে গরল তুচ্ছ এর তুলনায়।
মরে তায় জর জরে, (ওহে)
এ গরলে মরামরে,
জর্জ্জরিত হয় যে রে নাহি ত্রাণ বিধাতায়,
জীর্ণ করে কালী এরে, ভোলা কণ্ঠে রাখে তায়॥
(গাহিতে গাহিতে কর্ম্মফলের প্রবেশ।)
ভুল ভেবেছ' কালী কালো। (ও ভাই)
মায়ের রূপের ছটায় জগৎ আলো॥
কোন্ বিধাতায় গড়্ত' বিশ্ব কালী যদি হ'ত কালো!
কোন্ গোলোকে বোসে বিষ্ণু ত্রিলোক-পালক হ'ত বল'॥
দেবাদিদেব কোন্ ত্রিশূলী ধরিত' প্রলয় তাল,

(তা'রা) অন্ধ হ'য়ে অন্ধকূপে, থাকৃতো ডুবে চিরকাল ॥
কালো কিসে কালীর বরণ,
কত রংবেরঙের ছুট্‌ছে আলো।
ঐ রূপের ভাব্‌না ভেবে ভেবে,
পাগ্‌লা ভোলা জ্যান্তে ম'লো ॥
সাধে কিহে জগৎ জুড়ে
(বলে) কালী ভালোর ভালোর ভাল'
(যার) নাম স্মরণে পলায় শমন,
(হয়) অন্তরে বাহিরে আলো ॥

(প্রস্থান)।

জ্ঞান। কত গুণ গাবে তুমি আর দোষ ঢেক'না,
কালী কালী ব'লে আর কর্‌বে বিষ ঢেল'না।
দুই নেত্র সবাকার,
তিন নেত্র কালিকার,
ক্রুর দৃষ্টি করি সার করে ধরা শ্রীহীনা।
নেত্রানলে ত্রিভুবন দগ্ধ হ'ল দেখ'না!

সাধক। অন্ধ তুমি আঁখি থেকে, তাই পাও দেখিতে,
মায়ের নয়নানলে ত্রিভুবন জ্বলিতে।
নহিলে দেখিতে তবে,
শান্তি প্রাণা শ্যামা ভবে,
ত্রিনয়না হ'ল,- জীবে ত্রিতাপেতে তারিতে,
ভীষণ ত্রিতাপানল ত্রিনয়নে শোষিতে ॥
শান্তিময়ী মা'র প্রাণে তাহাতেও শান্তি নাই, (ওহে)
গুণে বদ্ধ হেরে জীবে ক্ষুব্ধা পুনঃ মা সদাই।
কি হবে কি হবে হায়,
বদ্ধ কিসে মুক্তি পায়,
কিসে এই ঘোর দায় এড়াইবে ভেবে তাই,—
সত্ত্ব-রজঃ-তমো গুণে নেত্রানলে করে ছাই ॥

জ্ঞান। নিষ্ঠুরা, হৃদয়হীনা, দুষ্টা কালী পাষাণী,
পিশাচী, কঠিনা, অহো ভ্রষ্টমতি ঈশানী।

বল দেখি কোন্ প্রাণে,
বালকে বধিয়া প্রাণে,
জননী হইয়া কাণে রাখে স'র্ব্ব নাশিনী ?
সোহাগে কুণ্ডল যেন প'রেছে সোহাগিনী ?

সাধক। বায়সে কি বুঝে কভু বসন্তের মহিমা ?
বুঝে কি মূষিকে কিবা মুক্তাহার গরিমা ?
দুলায়ে কুণ্ডল ছলে,
ও শব শিশু যুগলে,
রাখে বাঁধি শ্রুতি মূলে সাধে কিহে শ্যামা মা ?
ওদের করিতে ক্ষমা ক্ষেমঙ্করী অক্ষমা ॥
সর্ব্বনাশা কাম ক্রোধ, ও দুটিরে চেন'না ?
দুর্দ্দান্ত চপল কত তত্ত্ব তার জান' না ?
ভোগৈশ্বর্য্য পরিহরি,
জীবনান্ত পণ করি,
ইষ্ট পদ হৃদে ধরি করে যেই সাধনা,—
পরা মুক্তি লাভে তারে করে ওরা বঞ্চনা ॥
কুটিল প্রণয়ে তারে বারে বারে মুগ্ধ করি,
যমালয়ে তুলে দেয় এই দুই বিশ্ব অরি ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য ব'লে,
বধি তাই এ যুগলে,
রাখে বাঁধি শ্রুতিমূলে শ্যামা ভক্ত হিত ধরি,
এ কুণ্ডল পরিধানে ধরে নাম "শুভঙ্করী ॥"

জ্ঞান। করাল বদনা কেন হুঙ্কারা সে দক্ষিণা ?

সাধক। রক্ষণে সুদক্ষা ব'লে মা আমার "দক্ষিণা।"
ভবে জন্ম হবে যার
মরণ নিশ্চয় তার,
জন্মিবে সে আবার কর্ম্ম-ফল ঘোচেনা,
দণ্ডদাতা যম তার বিন্দুমাত্র মোছে না ॥
দক্ষিণে কালিকা করি শমনেরে স্থাপনা,
ভীক্ষ্ণ দৃষ্টি করে তারে, হ'য়ে দক্ষ আননা।

ন্যায় ধর্ম্মে সদা তারে
হুঙ্কারে সংযত করে,
"হুঙ্কারা" বলি কালীরে, তাই কালী "দক্ষিণা,"
শমন দমনে হ'ল, মা "করাল বদনা ॥"

(গাহিতে গাহিতে কর্ম্মফলের প্রবেশ।)

কর্ম্মফল। রবিতে কি আঁধার আছে শশী কি বিষ উগরে ?
ইক্ষুদণ্ড নিপীড়নে সতত সুরস ঝরে।
ভানুতাপে শতদল,
কভুনা হয় বিকল,
বিকাশে মুখ কমল, অমল অমৃতে ভ'রে ॥
বেগময় বাত্যা হেরি
অন্তরে কভু না ডরি,
তুফানে তারে বিদূরি' রত্নাকরে রত্ন হরে ॥

(প্রস্থান)।

জ্ঞান। যত কেন বল তুমি, তবু কালী নিষ্ঠুরা।
ঘোর দংষ্ট্রা নরমুণ্ড চিবাইছে কর্ব্বুরা,
নরমুণ্ড মালা পরে,
কর কাঞ্চি কটী'পরে,
নররক্ত পান তরে লোলজিহ্বা বিধুরা।
রক্ত স্রোতে ভেসে গেল সুন্দরী বসুন্ধরা ॥

সাধক। পূর্ণিমায় অমানিশা ভ্রান্তজন গণনা,
সুধাস্বাদে প্রবঞ্চিত শকুনির রসনা ॥
অহঙ্কার রক্ষোনাশি,
গ্রাসিছে দশনে পিষি',
বিকট দশনা ভাষি' তাই ভাই বোঝ'না।
রাক্ষসী বলিয়া মা'রে কেন কর ঘোষণা ?
ইন্দ্রিয়-বিষয়-দৈত্য, অধর্ম্মের পৃতনা।
ঘোর অত্যাচারী তা'রা জীবে দেয় যাতনা,
মহানন্দে মাতোয়ারা,
ঊর্দ্ধ করে নাচে তা'রা,

সে দুরন্ত শিরোহারা শ্যামা বিশ্ব শরণা।
করমালা কাঞ্চিছলে কটীতটে লগনা ॥
এ দুষ্ট দলনে কালী হ'ল সৃষ্টি রক্ষণা,
হেন শক্তি চরাচরে কেবা ধরে বল না ?
পাছে দুষ্ট রক্ত ধারা,
পড়ি দুষ্ট হয় ধরা,
তা' ভেবে দুর্গতি হরা হ'ল লোল রসনা।
দুষ্ট রক্ত পানে তাই মহাদেবী উন্মনা ॥
করাল কবলে পশে রক্ত স্রোতঃ অবিরল,
উছলিয়ে আসে কত সৃক্ক বেয়ে অনর্গল।
দেবীপদে পড়ি তা'রা,
হইয়ে অমৃত ধারা,
পুত করে বসুন্ধরা,—তুচ্ছ স্বর্গ, সুরদল।
বসুধা সাধনা বিনা দেয় জীবে মুক্তিফল ॥

জ্ঞান। জানি না, কি চোখে হায় কালিকায় দেখেছ',
অর্থ, দারা, সুত ভুলে কালী নামে মেতে'ছ।
(ওহে) কুল নারী, এলোকেশা,
অসি করা, ভীম বেশা,
সচঞ্চলা, অট্টহাসা, কবে কোথা শুনেছ ?
তাণ্ডবে মগনা বামা, দৃষ্টি কোথা করেছ ?

সাধক। অমৃত বালক ভাষা, উন্মাদের জল্পনা,
অমৃত দুর্জ্জন বাক্য গুণে দোষ ঘোষণা।
পিশাচী মায়া রাক্ষসী,
জীব-শিবে সদা বসি,
ভ্রান্তপথে বলীয়সা করে জী'বে চালনা।
শিরোকেশ ক'রে মাতা করে তারে ছলনা ॥
কবরী না বাঁধি তারে এলায়ে দিয়াছে হায়,
কেশ রূপা মায়ারাণী ভাবিল ঘুচিল দায়।
অবশেষে বুঝিল সে,—
বাঁধা,—মা'র শিরো কেশে,

এবে মুক্ত লভে কিসে ভেবে নাহি কূল পায়,
নিরুপায় হ'য়ে তবে মাতৃপদ পানে ধায়॥
পবন সাধিল বাদ—,দিল ছাই সে আশায়,
শূন্যেতে আছাড়ি তারে জর্জ্জরিল তাড়নায়!
কেশ পাশ শূন্যে পড়ি,
গায়ে গায়ে জড়াজড়ি,
করে কত হুড়াহুড়ি ঘটিল কি ঘোর দায়,
মহামায়া ফাঁদে প'ড়ে কাঁদে মায়া যাতনায়॥
চিদ্রূপা সে মুক্তকেশী অট্টহাস হাসি ভবে,
"মাভৈ স্মাভৈঃ" ভাষি' সাবধান করে জীবে।
অধর্ম্মের মুণ্ড কাটি,
বাম করে ধরে আঁটী,
ঊর্দ্ধে খড়্গ পরিপাটী প্রতিষ্ঠিছে শান্তি ভবে।
অভয়-বর বিতরে দক্ষিণ করপল্লবে॥
দুষ্কৃতে নাশিয়া শিষ্টে পালিছেন যতনে।
স্থাপিছেন মহাধর্ম্ম মাতা তিন ভুবনে॥
চা'র কর তা'রি সাক্ষ্য,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ,
বিশ্ব সনে করে সখ্য, বিপক্ষ সে কেমনে?
ভীমা ব'লে মা'রে তুমি নিন্দ কোন পরাণে?
কত কব' মা'র কথা,—কি দিব রে তুলনা?
অতুলা শ্যামারে তাই তুলা করে ভজনা।
বিনাশি' বিশ্বের অরি,
আনন্দে নাচে শঙ্করী,
সসাগরা ধরা গিরি নাচে কিবা দেখ'না।
মাতৃভাবে পূর্ণ বিশ্ব, 'মা' 'মা' ব'লে নাচ'না॥

(গাহিতে গাহিতে কর্ম্মফলের প্রবেশ)

কর্ম্মফল। আপনা ভুলে বাহু তুলে নাচ' 'মা' 'মা' ব'লে।
নাচ্‌ছে গগন, নাচ্‌ছে পবন,
(ঐ) নাচ্‌ছে সাগর হেলে দুলে।

হেরে মায়ের নাচের ব্যাপার,
ধরলে তুমি ভাবের বিকার,
ভাব্‌টিপ্‌নিটে বুঝ্‌লে কি তার? (ওহে)
(মিছে) জ্ঞানও না আর ছলে বলে॥
পেটের ছেলের প্রাণ বাঁচা'তে,
প্রাণে কি প্রাণে রয় গো মা'তে?
এমনি কোরে পাগল হ'তে
হয় যে মাকে সকল ফেলে॥
ছেলের মত ছেলে যে জন,
মায়ের ভাবে সদাই মগন,
সেও ত' পাগল মায়ের মতন,
(ওহে) আম গাছে কি আমড়া ফলে॥

(প্রস্থান)

জ্ঞান। বিকৃত,—প্রলাপী তুই ওরে দুষ্ট নরাধম!
উগারিছ মুখে তাই এ হেন বিষ বিষম॥
রে ঘর্ব্বর! না ভাবিছ,
কি বলিতে কি বলিছ,—
ভ্রমে পাপী না বুঝিছ করিছ কি মহাভ্রম,
ফেরু হয়ে প্রকাশিছ সিংহ সম পরাক্রম?
ছাড়্‌ মূঢ় "কালী" কথা, বলি তোর হিত তরে।
নতুবা বধিব প্রাণে নিশ্চয় জেন অন্তরে।
দুই দণ্ড অবসর,
দিনু তোরে অতঃপর,
কর্ত্তব্য বুঝিয়া কর আত্মরক্ষা এ দুস্তরে।
বৃক্ষকাণ্ডে রহ বাঁধা কর্ম্মফল শিরে ধ'রে॥

(সাধককে শ্মশানস্থ রজ্জু দ্বারা বৃক্ষকাণ্ডে বন্ধন পূর্ব্বক প্রস্থান।)

ক্রমশঃ

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়োগে।

ছায়ানট—একতালা।

(১)

বাঙ্গালী যে যায়
মৃত্যু পথে হায়!
পাঁচকড়ি! কোথা চলিলে!
ভাষার হুংকারে
বক্তৃতা ঝংকারে
তারে না ফিরায়ে যাইলে!

(২)

ধর্ম্মের সেবায়
দেশের সেবায়
জ্ঞানের সেবায় আছিলে,
সম্পাদক বীর
দীন বাঙ্গালীর
কেমনে সে সবে ভুলিলে?

(৩)

রহস্যেতে স্থির
রাজনীতি ধীর
তব সম নেতা না মিলে
সর্ব্ববিধ কাজে
দারিদ্র্যের মাঝে
উৎসর্গি জীবন যাপিলে॥

(৪)

অমরাতে রও
যাও পাঁচু! যাও
শান্তি সে লভহ নিশ্চলে।
পাইলে হেথা যত
ভবের দুঃখ শত
অমৃত হোক তত সে স্থলে॥*

---

* এই গানটি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে" ৺পাঁচকড়ির শোক সভায় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার রায় B. A. মহাশয় গান করেন। (কাশী) বারানসীর "সাহিত্য পরিষদে" ও কসবা লাইব্রেরীতেও গীত হইয়া ছিল।

মেঘের অভিসার।

লেখিকা,—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ।

অনন্ত আকাশ যেন একটা অসীম পথ। ঘনীভূত অন্ধকারে রাত্রি যখন ছেয়ে যায় তখন ঐ আকাশ পথকে মনে হয় যেন একটা সুগভীর বন, এত সুগভীর যে, তার মাঝ দিয়ে যাওয়া অতি কষ্টকর ব্যাপার। আমার রাতে যখন প্রকৃতি সুপ্তিগত থাকে, তখন ঐ আকাশবনের ভেতর থেকে কিসের একটা গভীর আর্ত্তনাদ ওঠে, মনে হয় যেন কে জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে মনের ব্যথায় সেই গভীর বনে করুণসুরে কেঁদে বেড়াচ্ছে; আর হুহুশ্বাসে উত্তপ্ত বাতাস বয়ে যায়, সেই সঙ্গে মনে হয় যেন কে মূর্চ্ছাগত হয়ে ঐ আকাশবনের এক পাশ থেকে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌চে। হঠাৎ হৃদয় যখন এই করুণশ্বাসে ও আর্ত্তনাদে চম্‌কে ওঠে, তখন আকাশবনের দিকে চোক চেয়ে দেখি। দেখি—বনের মাঝে অসংখ্য উজ্জ্বল তারার ফুল ফুটে রয়েচে, মেঘ নিবিড় বনের ভেতর ঘুরে ঘুরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে, হাতে ঐ তারার ফুলের একগাছি মালা।

তখন মনে হয় মেঘ যেন তার কোন প্রেয়সীর সন্ধানে এই নিশুতা রজনীতে অভিসারে বেরিয়েছে। বেরিয়েছে বটে,—কিন্তু তাকে ত খুঁজে পাচ্ছে না। তাই এই না পাওয়ার দরুণই সে আজ উদ্দাম হাহাকারে প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতন দুর্দ্দান্ত প্রতাপে দৌড়া দৌড়ি কর্‌চে; হাতে তারার মালাছড়া রয়েচে বটে—কিন্তু ভোর হতে না হতেই তা শুকিয়ে যায়, সে হৃদয় জ্বালায় তাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, নতুন ফুল আবার গাঁথে; কিন্তু নতুন ফুল এখন পাবে কোথা, গেঁথেই বা সে কি করবে? যার জন্যে সে গাঁথচে তাকে যদি সে ভোরের আলোয় দেখ্‌তে পায়, আর যদি সেই তারার হার পরিয়ে দেয়, তাহলে তখন সব প্রকৃতিই তা দেখ্‌তে পাবে। আলোকে গহন আলোকিত হয়, সবই তখন স্পষ্ট দেখা যায়, অনন্তা ক্ষৌণী তখন জেগে ওঠে—মেঘের আর ফুলের মালা গলায় দেওয়া হয় না। গহনের ফুল শুকিয়ে ঝরে যায়, সৌন্দর্য্য তার কিছুই থাকে না, তখন সে যন্ত্রণোৎপীড়িত হয়ে অশ্রুতে চক্ষু যুগল ভরিয়ে ফেলে, মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে,—এই অশ্রু অতি সন্তপ্ত, ভীষণ উল্কার মতন, আর এই দীর্ঘ নিশ্বাস কল্পান্তকালের সর্ব্বগ্রাসী বহ্নির সমান।

প্রতিরাত্রিতেই সে এই ভাবে ফুল তোলে, তাতে মালা গাঁথে, উন্মাদের মতন তাই নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়, আবার ভোর হতে না হতেই শোকে তাপে মুহ্যমান হয়ে মালাগাছি দূরে ছিঁড়ে ফেলে দেয়; যাবার সময় সে ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করে আর আর্ত্তনাদে বজ্রবৎ বেগে কোথায় উধাও হয়, তার ঠিক ঠিকানা পাওয়া যায় না।

নিবিড় রাতে যখন সে আসে তখন তার প্রাণ ভরা আনন্দ, নীরবে চুপে চুপে যখন ফুল তুলে মালা গাঁথে তখন তার দর্শনাশায় ও মালা পরাতে অতীব হর্ষাগ্রহ জন্মে; কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফের্‌বার সময় ঠিক তার উল্টো—ঠিক বিপরীত। আশায় তার মুখে কোমল হাসি, হৃদয়ে সরস ভালবাসা, প্রাণ বীণায় সুমধুর সুর; আর তার যাওয়ায়—হাসির বদলে রুদ্র রোদন, ভালবাসার বদলে বিরস রক্তস্রোত, আর বিপঞ্চীতে বিড়ম্বিত নিক্কণ ঢেউ। আসাতে চারিভিতে দেখে সে ত্রিদিবের আলোক; যাবার সময়ে—ত্রিযামা নরকের তিমিরাপন্ন। আসবার সময় ফুলেদের রম্যতা সরসতা, যাবার সময় কঠিনতা নীরসতা।

আর কত বল্‌ব—সে ব্যর্থ প্রেমিক—সে ব্যর্থ প্রেমিক—ব্যর্থ প্রেমিকেরই মত ঘনঘোর কালিমায় যামিনী যাপন করে। তার প্রেমিকার সাথে দেখা হয় না। প্রেমিকা যে তার কোথায়, এই ব্যাকুল সন্ধানেই সে কত যুগযুগান্তর ধরে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্চে—পাঁতি পাঁতি খুঁজচে—দেখা মিলে না—মালা গাঁথা ছেড়াই হয়, পরানো হয় না।

যতদিন না সে তার প্রেমিকার সঙ্গে আবার মিলিত হয়, ততদিন সে এই ভাবেই ঘুরতে থাকবে, এই ভাবেই মনপোরা ব্যর্থতা থাকবে, এই ভাবেই মালা গাঁথবে ছিঁড়বে, এই ভাবেই অশ্রুসম্বরণ করতে না পেরে আকাশময় পথে পথে জ্বলনের চাপে অশ্রুবিসর্জ্জন করবে, এই ভাবেই মৃদুমধু নিক্কণে তন্ত্রী রণিবে আর তার ছিঁড়ে ভেঙ্গে যাবে।

কত আর বল্‌ব, যেদিন দেখব মেঘ প্রেমিকার দর্শন লাভ করেচে, সেদিন থেকে,—সেই মুহূর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গেই মেঘের উন্মাদনা আর দেখতে পাব না—নিশ্বাসের পরশ লাগবে না—অশ্রুকণা ঝরবে না।

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌ টনিক বা

য্যান্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১॥০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১।০ মাত্র।

গোল্‌ড নার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Foamula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রীতিমাখান

সুন্দর মুখখানি

কিসে হয় ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একাধারে পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৵০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী-ব্যাধিতে-অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ॥৵০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

২৯শ, বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩০, [১২শ, সংখ্যা

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	বর্ষসূচী		
২।	ভক্তি ও কর্ম্ম	শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্য এম, এ,	৩৫৩
৩।	বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য ও বাঙ্গালীর রুচি	...	৩৫৭
৪।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৬১
৫।	শ্যামা-মা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	৩৬৭
৬।	বে'	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	৩৭৮
৭।	সমালোচনা	... ...	৩৮০

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত 13-7-24

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৭॥০, গ্রোস ৭৪৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

এলোমেলো হয়ে যাবে

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "ফিজীশিয়ান"

টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

২৯শ বর্ষ, ১৩৩০

ঊনত্রিংশভাগ—ঊনত্রিংশ বর্ষ।

(১৩৩০ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৩৩০ সালের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
জন্মভূমি-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

Printed by N. Dutta at the
"JANMABHUMI PRESS."
39, Manick Bose's Ghat Street,
CALCUTTA.
1924.

বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।] [ডাঃ মাঃ ছয় আনা।

ঊনত্রিংশ বর্ষের সূচীপত্র।

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
১।	অন্ধকার	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	১৫৪
২।	অকাট্যপণ	„ শ্যামাচরণ বিশ্বাস	২২৬
৩।	আবেশ (অদ্য)	ডাঃ „ নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	৬৩
৪।	আবাহনী (পদ্য)	... ...	
৫।	আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব	কবিরাজ „ রাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ	২৩৩
৬।	কে তুমি (পদ্য)	„ গোপীনাথ দাস	৩০
৭।	কাব্যে সংযম	„ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,	৩১৩
৮।	কুড়ানো মাণিক	„ অক্ষয়কুমার রায়	২৮৯
৯।	গীত	„ গোপীনাথ দাস	২৮৯
১০।	ছোট পাখী	„ কমলাকান্ত বসু	২৪৯
১১।	ধোপানী	„ কালীপদ মুখোপাধ্যায়	১৯৮
১২।	ন্যায় ও বৈশেষিক	„ পঞ্চানন তর্কতীর্থ	৬৫
১৩।	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়োগে	...	৩৫০
১৪।	পয়লা আষাঢ়	„ জীবঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	২৭৬
১৫।	প্রভাতী	ডাঃ „ নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	২৬৯
১৬।	প্রার্থনা	„ ফজলরহমান খাঁ জি, টি,	১৬০
১৭।	প্রাপ্তি স্বীকার	... ...	২৮৮
১৮।	ফুল্লরা	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৩৩

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
১৯।	বিমান	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৫৭
২০।	বিমাতা (গল্প)	...	১০২, ১৫৫, ১৮৪
২১।	ব্রাহ্মণকুমারের সিদ্ধি	„ হরিদাস ব্রহ্মচারি	১৯৩
২২।	বীণার তার	„ জীবঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	১৩
২৩।	বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ	... ...	১২২
২৪।	বিদ্যাপতি	„ পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	১২৯
২৫।	বাঙ্গালীর মেয়ে	„ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৮১
২৬।	বিবিধ প্রসঙ্গ	...	১৯০, ২৫২
২৭।	বিশ্বেদেব বাদ	„ মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ	২৯৮
২৮।	বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য ও বাঙ্গালীর রুচি।	...	৫৫৭
২৯।	বে'	ডাঃ „ নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	৩৭৮
৩০।	ভক্তের মান	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১১৮
৩১।	ভক্ত প্রেমদাস	„ শ্যামাচরণ বিশ্বাস	১৬১
৩২।	ভক্তি ও কর্ম্ম	„ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ,	৩৫৩
৩৩।	ভোজন প্রণালী	„ চণ্ডীচরণ ঘোষাল	২০৩
৩৪।	মহাকবি কালীদাস	শ্রীমতী আশাদেবী	১০২
৩৫।	মৃত্যুর জন্ম	„ প্রতিভাদেবী	৮৩
৩৬।	মেঘের অভিসার	„ শৈলরাণী বসু বি. এ,	৩৫১
৩৭।	লীলাময়	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	১৭৫
৩৮।	শ্যামা-মা	পণ্ডিত „ শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	৯৩, ২০৯, ৩০৭, ৩৩১, ৩৬৭
৩৯।	শেষ স্মৃতি	ডাঃ „ নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	২৪৭
৪০।	স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সমস্যা	„ দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	১
৪১।	সাধক-কমলাকান্ত	„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৪, ৮৬, ৯৭, ১৪৫, ১৭৭, ২১৪, ২২৫, ২৭০, ২৯৩, ৩২৬, ৩৬১
৪২।	হৃদয়	„ শ্যামাচরণ বিশ্বাস	৭৯

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
৪৩।	সমর্পণ	শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস	২৫১
৪৪।	স্বর্গীয় জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	...	৩১৮
৪৫।	সমালোচনা		৩১,৬৪,৯৬,১২৭,১৯২,২২৪,২৫৬,২৮৭,৩২০,৩৮০
৪৬।	হিন্দুধর্ম্ম ও অনুদারতা	,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	৩২১

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

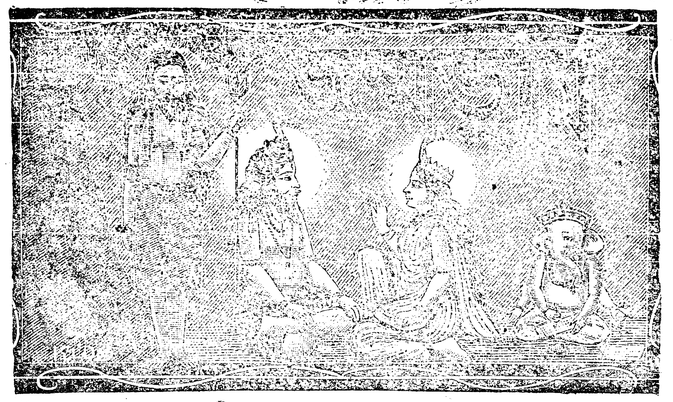

২৯শ, বর্ষ। } ১৩৩০ সাল, চৈত্র। { ১২শ, সংখ্যা।

ভক্তি ও কর্ম্ম।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

বিষয়টা যত বড়, বুদ্ধিটা ততই ছোট, আমার জ্ঞান তদপেক্ষা অল্প : সুতরাং আমি যাহা বলিব, তাহাতে আপনারা দর্শনের দর্শন পাইবেন না, কেবলমাত্র অজ্ঞান তিমিরান্ধ মানবের অশিক্ষিত মনের দুই একটা সহজ ভাব সহজ কথায় ব্যক্ত হইবে,—আপনাদিগকে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিতেছি, সেজন্য নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছি, "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি" "উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈ্য, ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ইত্যাদি। হে মানব, যদি কমলার কৃপা লাভ করিতে চাও, তবে উদ্যোগী হও, কেন না,

* কসবা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভায় পঠিত।

দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা কাপুরুষের লক্ষণ। শুধু মনে মনে ইচ্ছা করিলেই কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায় না, সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে উদ্যমের প্রয়োজন, যেমন নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগ আপনি আসিয়া প্রবেশ করে না। প্রতীচ্য নীতিশাস্ত্রেও এই ধরণের কথা আছে "God helps the who help them selves"—নিজেরা সচেষ্ট না হইলে ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না। উক্ত নীতির সমর্থক একটি গল্পও প্রচলিত আছে। এক দিন এক গাড়োয়ানের গাড়ীর চাকা কাদায় ডুবিয়া যায়, গাড়োয়ান কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কাতরকণ্ঠে বিপত্তারণ হার্কিউলিস্‌কে ডাকিতে থাকে। হার্কিউলিস ছদ্মবেশে আসিয়া তাহাকে উপদেশ দেন যে, বিপদে পড়িয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিয়া হার্কিউলিস্‌কে ডাকিলে কোন ফল হইবে না, চাকায় কাঁধ দিয়া ঠেলিতে হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে হার্কিউলিস্‌কে ডাকিতে হইবে, তবেই তিনি আসিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। গাড়োয়ান তাহাই করিল, করিয়া বিপন্মুক্ত হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নীতিশাস্ত্রের মূলমন্ত্র একই—স্বাবলম্বনই সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়।

কিন্তু সেদিন শ্রীশ্রী৺ রামকৃষ্ণ দেবের একটি গল্প পড়িয়া মনে বড় খট্‌কা লাগিল। গল্পটি এই :—একদা জনৈক ভক্তিমান্ পথে যাইতে যাইতে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। বৈকুণ্ঠবিহারী নারায়ণ তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য বৈকুণ্ঠ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার তিনি স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া লক্ষ্মী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু একি রকম?" নারায়ণ উত্তর করিলেন, "আমার ভক্ত বিপদে পড়িয়াছে, জানিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যাইতেছিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, সে আত্মরক্ষার্থ লোষ্ট্র উত্তোলন করিতেছে, তখন আর আমার যাইবার কোন প্রয়োজন রহিল না। যে নিজের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আমাতে আত্মসমর্পণ করে, আমি তাহারই সাহায্যার্থ ছুটিয়া যাই। কিন্তু যে নিজের কৃতিত্বে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে, এই অহঙ্কার মনে মনে পোষণ করে, তাহাকে সাহায্য করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।" একি কথা। ইহা যে পূর্ব্বোক্ত স্বাবলম্বন নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এই নীতি অনুসারে চলিতে গেলে আত্মশক্তিতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হারাইতে হইবে; তাহার ফলে আমাদের মনুষ্যত্ব একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে না কি? ভগবানকে স্মরণ করিয়া চুপ

করিয়া বসিয়া থাকিব, নিজেরা কিছুই করিব না, এই কথাই যদি সার কথা হয়, তাহা হইলে উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ এ নীতির সার্থকতা কোথায়? এ বিরোধের মীমাংসা হইবে কিরূপে?

এমনও হইতে পারে না যে, যাহারা ভগবদ্ভক্ত তাহাদের পক্ষে স্বীয় চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ নীতি, আর যাহারা ভগবদ্ভক্ত নহে, তাহাদের পক্ষে স্বাবলম্বন নীতিই শ্রেষ্ঠ নীতি। হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্রে তিথিনক্ষত্র, বারবেলা, কালবেলাদি বিচার করিয়া যাত্রাদি শুভকর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা আছে, অতএব হিন্দু যদি সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধ আচরণ করে, তাহা হইলে তাহার অমঙ্গল হইবে, কিন্তু অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রে ঠিক সেই রূপ ব্যবস্থা নাই, অতএব তাহারা দিনক্ষণ না মানিয়া কার্যকর্ম্ম করিলেও তাহাদের কোন অমঙ্গল হইবে না, এ কথা নিতান্ত ছেলেমানুষের কথা নহে কি? যাহা চিরন্তন সত্য, তাহা রামের পক্ষে যেমন শ্যামের পক্ষেও তেমনই, হিন্দুর পক্ষে যেমন মুসলমানের পক্ষেও তেমনই, আস্তিকের পক্ষে যেমন নাস্তিকের পক্ষেও তেমনই। তবে এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি নীতি কিরূপে এতদিন ধরিয়া নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছে?

বাস্তবিক ভক্তি ও কর্ম্মে বিরোধ, ইহা কি কখনও সম্ভব? যে ভগবদ্ভক্ত সে কর্ম্মী হইতে পারিবে না, আবার যে কর্ম্মী, তাহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির স্ফূরণ হইবে না ও সে ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারিবে না, এ কথা কি বিশ্বাস্য? তবে আমরা এরূপ বিরোধ দর্শন করি কেন? তাহার কারণ, আমরা মোহান্ধ এবং অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা। যাঁহারা জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা নয়নের মোহ-তিমিরাবরণ অপসারিত করিয়া দেখার মত দেখিতে জানেন তাঁহারা ঠিক দেখিতে পাইবেন যে, ভক্তি ও কর্ম্ম আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধ নহে, কেন না, এতদুভয়ই ভগবৎকৃপা লাভের মার্গ। তবে 'কর্ম্ম' জিনিষটীর ঠিক অর্থ ধরা একটু কঠিন। কিং কর্ম্ম কর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। 'গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।' আমরা সংসার মায়ায় আবদ্ধ, সংসারী জীব আমরা সাধারণতঃ কর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা প্রকৃতপক্ষে অকর্ম্ম, সুতরাং ভগবদ্ভক্তি স্ফুরণের তথা ভগবৎকৃপালাভের পরিপন্থী। সেরূপ কর্ম্ম ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্ম যাহা, তাহা ত্যাগ করিতে কেহই পরামর্শ দিবে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন, "সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ, আবার তিনিই অর্জ্জুনকে যুদ্ধ

করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিয়াছেন। আসল কথা হইতেছে এই যে, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত এবং কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, তাহাই সৎকর্ম্ম বা প্রকৃত কর্ম্ম। এরূপ কর্ম্মে কর্ত্তার অহংজ্ঞান—অর্থাৎ আমিই এ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা এবং আমিই ফলভোগী এই জ্ঞান—থাকে না; ইহার মূলমন্ত্র 'গীতা'তেই আছে, "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্। সাধুগণ এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এবং "তয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি" এই সদ্ভাবে ভাবিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং কর্ম্মশেষে এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু বলিয়া কর্ম্মফল শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করেন। ইতর—অর্থাৎ অসাধু—লোকে অহংজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া এবং ষোল আনার উপর আঠার আনা ফলাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কর্ম্ম করে,তাই তাহাদের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না; এবং সেই জন্যই বোধ হয় শ্রীশ্রী৺ রামকৃষ্ণ দেবের উপরি উক্ত গল্পে শ্রীভগবানের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে যে, যে নিজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, ভগবান্ তাহার সহায় হয়েন না। নতুবা, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিলে ভগবানের কৃপালাভ করা যাইবে না, এ কথা বাতুলেও বলিতে পারে না। সুতরাং 'সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগ' বা কর্ম্ম সন্ন্যাসের অর্থ নিশ্চেষ্টতা নহে, কেবলমাত্র অহমিকাত্যাগ ও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন।

আমরা মুখে 'ভগবান্ ভগবান্' করিয়া ভগবদ্ভক্তির বড়াই করিয়া বেড়াই, কিন্তু কাযে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি দেখাইতে পারি কি? সম্পদে ত ভগবানের নামও করি না—কেন না তাহা হইলে আমাদের প্রেষ্টীজ্ নষ্ট হইয়া যাইবে! যখন আমরা মহাসমারোহে সুসজ্জিত তরণী সাগরে ভাসাইয়া দিই, তখন নিজ নিজ লোকবল ও অর্থবলে মত্ত হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া যাই, কিন্তু যখন গ্রহ-বৈগুণ্যে 'হা'লে পানি পায় না; তখন ডাকি "ঠাকুর রক্ষা কর!" কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিলে পুরুষকারের জয়গান করি, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে দৈবকে দোষ দিই, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই, অথবা ভগবানের নামে কলঙ্ক অর্পণ করি। বিপদে পড়িলে ভগবান্‌কে ডাকি, কিন্তু আন্তরিকতা এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত নয়; কেন না, সে অবস্থাতেও নিজেদের বাহাদুরী দেখাইবার স্পৃহা হৃদয় হইতে চলিয়া যায় না; দৈবী শক্তি ও মানুষী শক্তি, যুগপৎ এই উভয় শক্তির সাহায্যে বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করিলে দৈবী শক্তিটার সম্বন্ধে কোন উচ্যবাচ্য

না করিয়া বড়গলা করিয়া মানুষী শক্তিটারই প্রচার করিয়া বেড়াই। বিপদ্ কাটিলে ত কথাই নাই—ভগবান্ বলিয়া একজন যে আছেন, তাহাও ভুলিয়া যাই। সুতরাং ভগবান্‌কে ডাকা আজকাল আমাদের নিকট একটা ব্যবসাদারীতে পরিণত হইয়াছে! রঙ্গমঞ্চে নট যেমন প্রয়োজনমত সাজগোজ করিয়া কাহারও ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া লম্বা লম্বা বক্তৃতা করে, কিন্তু সে বক্তৃতায় তাহার প্রাণের কথা একটিও থাকে না,—সেইরূপ আমাদেরও ভগবান্‌কে ডাকা একটা প্রাণহীন অভিনয় মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; এরূপ ব্যবসাদারী করিয়া কি বিশ্বপিতাকে ভুলান যায়? যতদিন আমাদের মধ্যে এই অহংজ্ঞান, এই দুই দুই ভাব থাকিবে, ততদিন আমরা কর্ম্মের ভিতর দিয়া ভক্তি ও মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। যে দিন আমাদের এই দ্বিধা ও অবিশ্বাস ঘুচিয়া যাইবে, যে দিন ভগবানের নাম স্মরণমাত্রে আমাদের সকল অহঙ্কার ভক্তি অশ্রুতে ডুবাইয়া দিয়া তাঁহারই চরণে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব, যে দিন মনে প্রাণে আমাদের বিশ্বকবির সুরে সুর মিলাইয়া গায়িতে পারিব——

"আমাকে যেন না করি প্রচার আমার আপন কাজে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমার জীবন মাঝে" সেই দিন বুঝিতে পারিব, ভক্তি ও কর্ম্মে কোন বিরোধ নাই, কেন না ও দুইটাই মোক্ষলাভের উপায়।

বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্য ও বাঙ্গালীর রুচি।

আজ মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে আমরা অনেক প্রকারে আমাদের মনোভাব সাধারণের নিকট জ্ঞাপন করিতেছি। কেবল যে মুদ্রাযন্ত্রের নিকট আমাদের অভাব অভিযোগাদি প্রকাশার্থ ঋণী তাহা নহে, মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচারে আমরা নানা প্রকার সংবাদ পত্রের সহিত পরিচিত হইতে সক্ষম হইয়াছি ও হইতেছি। সংবাদপত্র ভিন্ন বহু গ্রন্থও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। স্থূলতঃ মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রসারে আমরা অল্পায়াসে অনেক তথ্য মুদ্রিতাকারে প্রাপ্ত হইতেছি। আজ মুদ্রাযন্ত্র প্রায় সহর ব্যতীত সুদূর মফঃস্বলেও বেশ আবাস

গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে বলিতে পারেন কি, এই যে বহুল মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার ও তদ্বারা মুদ্রিত গ্রন্থ ও সংবাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি আমরা বাঙ্গালী জাতী আমাদের পক্ষে বিশেষ শুভ সাধক হইয়াছে কি না?

এই কথাগুলি আলোচনা করিতে গেলে সেই প্রাচীন যুগের কথা মনে পড়ে। যখন মুদ্রাযন্ত্র অভাবে লেখকের লিখিত বিষয় গুলি কেবল পুঁথিতেই পরিণত থাকিত, আর সাধারণের রুচিকর হইলে তাহা গায়কগণ কর্ত্তৃক কথা কীর্ত্তনাদি আকারে গীত হইত। এই গীতানুশীলন দ্বারা সর্ব্বজন মধ্যে তাহার প্রচার কার্য্য সমাধা হইত. যাহার ফল—চণ্ডীর গান, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদির কথা। এই সকল কার্য্যের জন্য বহু গায়কশ্রেণী বর্ত্তমান ছিল। এই গান দ্বারা একাধারে সঙ্গীত চর্চ্চা, ভাবের বিকাশ ও গ্রন্থ প্রতিপাদ্য সারাংশ সাধারণকে সহজভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইত। শ্রোতা তাহার ভাব ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহা প্রচারে আত্ম নিয়োগ করিতেন। সে প্রচার ফলে আজ কত যুগ যুগান্তের প্রচলিত রীতিনীতি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। এই যে, প্রচার কার্য্য (organition Systism) তাহা আজ বিবিধ সংবাদ পত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে এবং জন সাধারণ গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয় মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আপনার গন্তব্য পথের নির্দ্ধারণ করিতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এ বিধি বড়ই সুন্দর।

অনুসন্ধান করিলে অনেকেই দেখিবেন, সহরের প্রত্যেক ক্ষুদ্রায়তন পথেই এমন স্থান নাই একটী মুদ্রাযন্ত্র অধিকারী আপনার মুদ্রণ কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত না আছেন। এক্ষণে বলিতে পরেন কি, এই মুদ্রাযন্ত্রের ও মুদ্রিত পুস্তকাদি আমাদের জীবন অভিনয়ের পক্ষে কতদূর উৎকর্ষ সাধন করিতেছে?

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, এখন হাটে বাজারে নানা রং বিরংয়ের মুদ্রিত গ্রন্থ ও সংবাদ পত্রাদি বিক্রীত হইতেছে; এই যে মুদ্রিত সংবাদপত্রাদি তাহাতে কি এবং কয়টী মানব জীবনে শিখিবার ব্যাপার মুদ্রিত হয়? আমার মনে হয়, এই প্রকার প্রচার কখনই সকলের প্রীতিপ্রদ নহে।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে আমরা যে আশার আবাহন করিয়াছিলাম—তাহা আজ গরলে পরিণত হইয়াছে! দেশে সংবাদ পত্র ও নানাপ্রকার মুদ্রিত গ্রন্থের অভাব নাই, কিন্তু তাহার ভিতর আছে কি? সংবাদ পত্রগুলি ত অধিকাংশ রং চং খোস গল্প, নাটকাদি পূর্ণ, গ্রন্থগুলিও নানা চাকচিক্যের আবরণে মণ্ডিত কিন্তু তাহা বাঙ্গালীর দশার মত নহে কি? সংসারে অভাব অভিযোগের

তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত কিন্তু পথে বাহির হইতে গেলেই সাজসজ্জার আড়ম্বর না হইলেই মর্য্যাদার লাঘব হয়, কেমন নহে কি? কিন্তু কে বলিবে, নিরন্ন বাঙ্গালীর এ আড়ম্বর কতদূর স্থায়ী? দাসাবৃত্তি যাহার জীবনের সার—পরান্ন ভোজন যাহার সম্বল, তাহার এ আড়ম্বর কতদিন চলিবে? আজ দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রকাণ্ড বিপনী বসিয়াছে—খরস্রোতা নদীর ন্যায় বহু সংবাদ পত্রাদি বিপুল বিক্রমে আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়া চলিতেছে; কিন্তু পরিণাম ভাবিয়াছেন কি? একি আশা মরীচিকা নহে? পূজনীয় বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির পর হইতে কয়খানি গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যাসরে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? সংবাদ পত্র তাহার ত কথাই নাই, জীবন মৃত্যু তালিকায় শিশুর অকাল লীলাবসানের মত কতই জন্ম পরিগ্রহের সঙ্গে বা পরে তাহার অস্তিত্ব বিলোপ হইয়াছে বা হইতেছে তাহার কে সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবে? কেন এমন হয় বা হইতেছে? কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—নিজবাস ভূমে পরবাসী হলে, নিজ ধনরত্ন পর হাতে দিলে, এ পরিণাম হইবে না ত কি! আমরা ব্যবসা বুঝিনা কিন্তু পরের লাভ দেখিলে তখনই তাহা নকল করিয়া রাতারাতি ধনবান হইতে চাহি। একি দুরাশা নহে? ফলে—এ কুল ও কুল দুকুল হারাইয়া "অন্ন চিন্তা চমৎকার" হয়! হায় রে, নকল প্রিয় জাতি!

এ কথাতে হয় ত অনেকেই অসন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, উন্নতির মূল কেবল আত্ম রক্ষায়—বঞ্চনায় নহে। এস্থলে আত্ম রক্ষা কেবল নিজ শরীর বা পরিবার রক্ষা নহে—জাতী ও সমাজ রক্ষা! যেখানে জাতির উন্নতি, সমাজের উন্নতির পথ পরিষ্কার করে, যেখানে ব্যবসায়ে লাভ আছে, আত্ম মর্য্যাদা আছে, আত্ম তৃপ্তি বা শান্তি আছে—এতব্যতীত সমস্তই আকাশ কুসুম।

এই যে এত মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রিত গ্রন্থ ও সংবাদ পত্রাদি ইহা হইতে আমরা কি সুফল লাভ করিতেছি? পাঠক পাঠিকা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আমরা ছিলাম স্বধর্ম্ম পরায়ণ আত্ম মর্য্যাদাশীল জাতী, আর বহু সংবাদ পত্রাদি প্রচলনে আমরা সুসভ্য বিলাস পরায়ণ রঙ্গ রসচ্ছোদিত খোস গল্প সেবাব্রত মনোহর আকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্য! যেখানে আচার ব্যবহারে, আহার বিহারে, উন্নতি অবনতিতে. আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা সেখানে কি আমাদের স্বাতন্ত্রতা রক্ষিত হয় নাই? তখন আর সে পূর্ব্ব গৌরবোদীপ্ত জাতী কোথায়? সে যে স্বতন্ত্র মনুষ্য!

হায়, আজ আমাদের এ বিষম দুর্দ্দিনেও আমরা আমাদের চিনিলাম না যে আমরা কাহার সন্তান, কোন পূত রক্তধারা আমাদের ধমনীতে প্রবাহমান, এই যে সংবাদ পত্রের খোস গল্প, নাটক, উপন্যাস প্রচারার্থ রাশি রাশি বিজ্ঞাপন প্রচার, এ সমস্ত কেন? এই হর্‌রার ঢেউ কি আমাদের ন্যায় বুভুক্ষু বাঙ্গালী জাতির শোভা পায়? অত বড় ফরাসী জাতী তাহারও এ নূতনতর আমোদের কি পরিণাম হইল—এ সকলও এ দেশবাসী দেখিতে পান না? এই সকল বাহ্যাড়ম্বর গ্রথিত করিয়া যে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশ, সুচিক্কণ চারু কলেবরে পুস্তক মণ্ডিত করিয়া আপনার জাতীকে উশৃঙ্খল করিয়া ফেলা এ সকল কি বাঙ্গালীর আত্মোন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়? গ্রন্থ প্রকাশক, সংবাদপত্র পরিচালক ও বঙ্গ সাহিত্যিকগণ কি এ বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিবেন না?

আমাদের দেশের এ রুচি বিকারের কারণ কি? পুস্তকালয়গুলি পর্য্যন্ত ঐরূপ নাটক, উপন্যাস, খোসগল্প গুজবের পুস্তকে পরিপূর্ণ। সংবাদপত্র প্রকাশক, গ্রন্থকাররা স্ব স্ব পত্র ও গ্রন্থাদি প্রকাশের পূর্ব্বে এ সংবাদ আড়ম্বরের সহিত বিজ্ঞাপনে প্রচার করেন—ইহা কোন মহা উপকার সাধন কল্পে সাধিত হইয়া থাকে তাহা কেহ বলিবেন কি? হয় ত বলিবেন, লোকের রুচি এই দিকে যখন তখন অন্য রকমে উপায় কি, সর্ব্বস্বান্ত হওয়া? কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—বিকারের রোগী আকণ্ঠ জল পান করিতে চাহিলে তাহা দেওয়া হয় কি. উচিত কি? যদি বা বৈদেশিক গ্রন্থ সকল আমাদের সাধের সরোবরকে কলুষিত করিতে চাহিতেছে, তথাপি কি আমরা এমনি বলহীন যে, তাহার মূলোচ্ছেদে অক্ষম? এ প্রবৃত্তির ধারা পরিবর্ত্তন করিতে কি আমরা সমর্থ নহি? যদি না পারি, আমাদের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে কেমন করিয়া, ইহা ভাবিয়া দেখা কি বাঙ্গালী জাতীর কর্ত্তব্য নহে? যেস্থলে আপনার ভ্রাতা ভগ্নি আত্মীয় স্বজনের দেশের মর্য্যাদার লাঘব হইল সে স্থলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোথায়? অসার উপন্যাস, গল্প গুজবে আজ দেশ ধ্বংসের পথে জাতীর চরিত্র হীন হইতে বসিয়াছে—ইহা কি আমাদের দেখিবার বিষয় নহে?

আমাদের মনে হয়, মুদ্রাযন্ত্রের যেমন সংপ্রসারণ হইয়াছে তেমনি আমাদের গ্রন্থকার সংবাদপত্র প্রকাশকগণ দেশের জাতীয় চরিত্র রক্ষা ও আত্ম মর্য্যাদা রক্ষা দ্বারা যদি লাভবান হইতে চাহেন, তবে দেশের বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস, বাণিজ্য ও ধর্ম্মালোচনায় স্ব স্ব মস্তিষ্ক নিয়োগ করুন, তদ্বারা বিজ্ঞা-

নিক হিসাবে স্মৃতি মেধা শক্তির বৃদ্ধি হইবে, আলোচ্য বিষয় বিক্রয় লব্ধ অর্থে লাভবান হইবেন—অপিচ দেশ ও অসার রং তামাসার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। মান রাখিবেন এ জন্মভূমি ধন ও শান্তির আগার, স্বেচ্ছাচার এ দেশের নহে—ইহাতে জাতী ও দেশ উৎসন্ন যাইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী দুর্গারাণী দেবী।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অমানিশি, ঘোর অন্ধকার, নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত সুন্দর দৃষ্ট হইতেছেনা; দিবসের দৃশ্য স্মরণ করিয়া প্রকৃতি পুঞ্জের অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়। শীতকাল, আকাশ নির্ম্মল নহে, কিঞ্চিৎ ঘন ঘটার আবির্ভাব হইয়াছে। দুই একটী নক্ষত্র মেঘের কোলে ম্লান মুখে দৃষ্ট হইতেছে, লোকালয় নীরব। মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষী, শিবা ও সারসের গম্ভীর শব্দ শ্রুত হইতেছে, তাহাও কচ্চিৎ! সাধক, কেনারাম ও বিশু দেবীসিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে জপ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কেনারাম কহিলেন, "নিবিড় অন্ধকার, দীপ ভিন্ন দেবীর মন্দির গমনে আপনার বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা।" সাধক কহিলেন, "দেখুস, ধর্ম্মকর্ম্ম অতি গোপনে করিতে হয়, দীপ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা অন্ধকারেই গমন করিব ও যথাসাধ্য সমুদয় কর্ম্ম গোপনে রাখিব।" বিশু কহিল, "আমরা দেবীর মন্দিরে জপ কর্ব্বার কথা সকলের কাছে বলেছি, আজকার ব্যাপার কিছুই গোপন কর্ত্তে পার্ব্বেন না, ঠাকুর! এ অন্ধকারে যেতে পার্ব্বে না, আমি ঠাকুরকে কাঁদে করে নিয়ে যাব।" সাধক কহিলেন, "বিশু! যখন তখন তুমি ঐ কথাই বল, আমাকে কাঁদে করিয়া লইয়া বেড়াইতে তোমার বড় আনন্দ হয়।" বিশু করযোড়ে কহিলেন, "ঠাকুর এ কথা ঠিক! আপনার

পা দুখানি আমি বুকের মাঝে ধল্লে আমার বুক ঠাণ্ডা হয়। ঐ পাপে আমার পাঁজর পোড়া, আপনার পায়ের এমনি গুণ, একবার বুকে ছোঁয়ালে মাত্র সব জ্বালা যায়, তাই অনেক দিন সময় সময় আপনার পা টিপবার জন্য আমি ব্যাকুল হই।" কেনারাম কহিলেন, "আল পথ, অন্ধকার রাত্রি, ঠাকুরকে কাঁদে করিয়া যাওয়া হইবে না, তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা, হাত পা ভাঙ্গিতে পারে।" ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন, "তাতা হইলে বিশুর ভালই হয়। সর্ব্বদা আমাকে কাঁদে করিয়া লইয়া বেড়ায়, কোলে পিঠে করা ভালবাসার লক্ষণ, বিশু নিজের ছোট ছোট ছেলেদিগকে কোলে পিঠে করিয়া বেড়াইত, এখন তাহার সেই ভালবাসা আমার উপর পড়িয়াছে। দেখ বিশু, তুমি আমার অপেক্ষা তোমার মা কালীকে ভাল বাসিবে, তাঁকে বুকের মাঝে সর্ব্বদা রাখিয়া সব জ্বালা ভুলিবে।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! চাষা নিজের প্রাণ চেয়ে আবাদ করা ফসল গুলিকে ভাল বাসে, আবার দেখুন, যার সাহায্যে ফসল হয়, সেই বলদ গুলিকেও বড় ভালবাসে; ভাল করে খাওয়ায়, গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। আপনার দয়া না হলে কি আমার এ ভাব হত। আমি মানুষ মেরে বেড়াতাম। সাধক মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "শুন হে আমি বিশুর বলদ, বিশু এবার আমাকে তাহার চাষের কার্য্যে নিযুক্ত করিবে।" বিশু করযোড়ে ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, "ঠাকুর আমার অন্তর জমীতে অনেক ঘাস পাতা জন্মেছিল, তোমার তীক্ষ্ণ কথা কোদালি সে সব তুলে ফেলে দিয়ে কালী নাম বীজ পুতে দিয়েছে। এখন তোমার দয়া হলেই সে বীজে গাছ হবে, ফলও ধর্ব্বে।" কেনারাম কহিলেন, "বিশু উত্তম কথা বলিয়াছেন। আমি দিন দিন বিশুর বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। হীরক প্রস্তরও কয়লার সহিত থাকে জহুরীর হস্তে পড়িলেই তাহার স্বরূপত্ব প্রকাশ হয়। আপনার নিকট আসিয়া বিশুর অন্তরের উজ্জ্বলত্ব দিন দিন বিকাশ হইতেছে।" সাধক কহিলেন, "যামিনীর প্রথম যাম অতীত হইয়াছে, আর এখানে অবস্থান করিয়া বৃথা সময় অতি বাহিত করা উচিত নহে। চল আমরা নিঃশব্দে দেবীর মন্দিরে গমন করি!" ইহা কহিয়া সাধক বিশু ও কেনারামের সহিত দেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দেবীর মন্দিরে মধ্যে মধ্যে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া অবস্থান করিতেন। নিত্য কোন ব্যক্তিই তথায় অবস্থান করিতেন না। মন্দিরটি গ্রামের প্রান্তভাগে অতি নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত, নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা বৃন্তে পরিবৃত। প্রবাদ আছে, সাধক কেনারাম ও বিশু দেবীর মন্দির

প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র সিংহ গর্জ্জনের ন্যায় মন্দির মধ্য হইতে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। কেনারাম ও বিশু মুচ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। নির্ভীক হৃদয় সাধক দণ্ডায়মান থাকিয়া করজোড়ে কহিলেন, "ভীমা ভয়ঙ্করী শরণাগত কিঙ্করে অভয় দান কর" ইহা কহিয় উর্চ্চৈস্বরে গাহিলেন,—

এলে বুঝি দয়াময়ী হইয়া কঠিন,
চরণে ত্যজিত তনু আজি শুভ দিন।
তনু দিয়া তরে কত শত ক্রিয়াহীন॥

ইহা কহিয়া দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মা জীবের পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই, কিন্তু তুমি ত জান তোমার কিঙ্কর মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয় করে না, তুমিই মৃত্যু! মা তুমি প্রসন্ন নয়নে চাও, মা তুমি অভয়া বরদা, তুমি বিশ্বজননী, জননী কি সন্তানকে এতাদৃশ ভয় দেখান। নিশ্চয়ই ইহা কোন বিঘ্ন কারক জীবের কর্ম্ম। আমি বলিতেছি, আমি বিনয়ের সহিত বলিতেছি —"অপসর্পন্তু তে ভূতা, যে ভূতা বিঘ্ন কারক।" কে তুমি পরিচয় দাও, তুমি যখন এই পবিত্র স্থান আশ্রয় করিয়া আছ, তখন তোমার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না, তাই তোমাকে পুনর্ব্বার বিনয়ের সহিত কহিতেছি, শান্তিভাব অবলম্বন কর, আমাদিগকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে দাও। যদি তুমি শান্তিভাব অবলম্বন না কর, এই আমি কালী নামের ডঙ্কা দিয়া মন্দিরের দ্বারোৎঘাটন করিতে চলিলাম, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে আমাকে বাধা দাও।" এই বলিয়া সাধক দেবীর মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র আকাশ বাণী হইল, "কমল! আমি তোমার সাহসে সুখী হইয়াছি। আমি জানি তুমি শৈশব হইতে নির্ভীক। তুমি বিশুদ্ধ আত্মা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। জন্মান্তরে তোমার তপস্যাও বিস্তর।" অশরীরীর এই কথা শুনিয়া সাধক ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কে তুমি? তুমি কি আমার সাহায্যার্থে দেবীর ইচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছ? তুমি কি কোন দেবতা? না এই পবিত্র স্থান রক্ষক অশরীরী আত্মা? মহাকাল ভৈরবের আজ্ঞানুবর্ত্তী। কে তুমি? কৃপা করিয়া আমার পরিচয় দাও। তুমি যখন এই পবিত্র স্থান অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছ তখন তোমাকে কোন বিঘ্ন কারক আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।" অশরীরী কহিলেন, "কমল! আমি তোমার মন্ত্রদাতা গুরু। কমল! অম্বিকার নিকট সেই ক্ষুদ্র তটিনী, তাহার তীরবর্ত্তী সেই শ্মশান, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ, তোমার

বৃক্ষতলে গমন, তোমার শ্মশানের দিকে দৃষ্টি, কাপালিক বেশী আমার দর্শন, তোমার কর্ণে আমার মন্ত্র প্রদান, তোমার স্মরণ হইতেছে।" অশরীরী এই কথা শুনিয়া সাধক রোমাঞ্চিত হইয়া কহিলেন, "কি! আপনি আমার গুরু! সেই মন্ত্র দাতা, সেই পরম সুহৃদ, সেই জীবন সর্ব্বস্ব। তবে কেন সন্তানকে বঞ্চনা করিতেছেন? সেই জটাজুট শিরে, শশীকলা সদৃশ ত্রিপুণ্ডক কপালে, স্মেরাননে, হাড়মালা গলে, নরকপাল করে, ধৃতি চর্ম্ম পরিধানে, ভস্মরঞ্জিত দেহে, সেই বেশে একবার আমার সম্মুখে উপস্থিত হউন। আমি পুনর্ব্বার আপনার সেই মনোমোহন রূপ দর্শন করিয়া জীবন শীতল করি, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি, চরণ স্পর্শ করিয়া পবিত্র হই, প্রাণের কথা বলিয়া প্রাণ জুড়াই। প্রভো! গুরো! স্বামিন! সে আজ কতদিন। আমি আশৈশব সেই মূর্ত্তি স্মরণ, সেই মন্ত্র ধ্যান করিয়া জীবনে পরমাশান্তি লাভ করিতেছি। যদি আপনি আমার সেই অমূল্য নিধি, তবে একবার সেই বেশে আমার সম্মুখে আসুন। চিরানুগত কিঙ্করকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করুন।" অশরীরী কহিলেন, "আমি পূর্ব্বে যে বেশে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলাম, এখন সেই রক্তমাংসময় দেহে তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিব না। যদিও তোমার দেহ পবিত্র, নরদেহ আমাদের অঙ্গস্পর্শ করিলে আমাদিগকে অধোগামী হইতে হয়। তুমি তখন বালক ছিলে, আমি জানিতাম, তুমি নিশ্চয় আমার অঙ্গস্পর্শ করিবে না, কিন্তু তুমি এখন প্রাণের ব্যাকুলতা বশতঃ হয় ত আমার অঙ্গস্পর্শ করিবে।" সাধক কহিলেন, "যদি আপনার অঙ্গস্পর্শে আপনি অপবিত্র হন আমি স্বীকার করিতেছি, আমি আপনার অঙ্গস্পর্শ করিব না, যদি আপনি আমার সংসারারণ্য তারণ হন, একবার সেই বেশে আমাকে দর্শন দেন। ইহা কহিয়া সাধক তুষ্টিভাব অবলম্বন করিলে এক মহাজ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কাপালিক বেশে প্রসন্ন বদনে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সাধক দেখিবা মাত্র প্রেম ও ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে সাষ্টাঙ্গে ভূমে পতিত হইলেন, তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কাপালিক বেশী কহিলেন, "কমল! উঠ।" সাধক উঠিলেন, জানু পাতিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "দেব! আপনি কে? আপনি কোন স্থান পবিত্র করিতেছেন। আমার স্মরণ আছে, আপনি বলিয়াছিলেন, আপনি আমার সহিত সময়ে সাক্ষাৎ করিবেন। আজ ত্রিশ বৎসরের অধিককাল পরে আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম। কাপালিক কহিলেন, "কমল! আমাকে দিক্‌পাল বলিয়া জানিবে, প্রকৃতির

ইচ্ছায় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হেতু তোমাকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলাম। শোন বৎস! তুমিও দেহান্তে আমাদিগের ন্যায় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবে। তোমার জন্মগ্রহণে বিশেষত্ব আছে। সকল ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ প্রকৃতির ইচ্ছায় হইয়া থাকে। তান্ত্রিক ক্রিয়া সকলে ব্যাভিচার উৎপন্ন হইলে অনেকে সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে লাগিল। সেই সময় অলৌকিক ক্ষমতা লইয়া শ্রীচৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র মুক্তির উপায় এই উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই সহজ পথ সাধারণ সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য পথাবলম্বী সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মের শাখারূপে গৃহিত হইল। বঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইল। পরে শ্রীচৈতন্য দেব প্রসূত ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইলে বেদধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য নামও ক্রিয়া উভয়েই মুক্তির সোপান এই উপদেশ প্রচারার্থ প্রকৃতির ইচ্ছায় সঙ্গীত দ্বারা চিত্ত বিমোহনের অসাধারণ শক্তি লইয়া রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহান্তে মাতৃভাবের উপাসনার স্রোত অপ্রতিহত রাখিবার জন্য মহামায়ার ইচ্ছায় তুমিও জন্মগ্রহণ করিয়াছ। বৎস, নিজ কর্ম্ম সম্পন্ন কর। লোক শিক্ষাই তোমার কর্ম্ম। সঙ্গীত দ্বারা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই বিমোহিত হয়। সঙ্গীত উপাসনায় একাগ্রতা সহজে আইসে, সেই জন্য সঙ্গীত দ্বারা চিত্ত বিনোদনের শক্তি লইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি যোগী, তোমার চিত্তশুদ্ধি আছে, চিত্তশুদ্ধির জন্য ক্রিয়া কলাপের কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। তোমার আত্মা কর্ম্মকাণ্ডের বহির্ভূত হইয়াছে। এই স্থানে সিদ্ধাসনে বসিয়া যপ করিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি নিজ কর্ত্তব্য সাধন জন্য গমন কর। কাপালিকের এই কথা শুনিয়া সাধক কহিলেন, "আপনার বাক্যই এই দুর্গম সংসারারণ্য অতিক্রম করিবার মহা অস্ত্র। মায়া মোহ প্রভৃতি কণ্টক জাল ছেদনের তীক্ষ্ণ তরবার। কাম ক্রোধাদি হিংস্র জন্তুগণকে প্রতাড়িত করিবার বজ্রবাণ স্বরূপ। আমি শৈশব কাল হইতে আপনার বাক্য যপ ও আপনার মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকি। আমি স্থান বিচার, কাল বিচার, লোক বিচার, না করিয়া মহামায়ার গুণগান করিয়া ত্রিতাপ তাপিত তনুকে শীতল করি। আমি সর্ব্বদা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী। আমি এই স্থানে যপ সাধনা করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলাম। দেব আমার অনুগামী এই দুই জন আমার প্রিয়। উহারা পরম উৎসাহে অদ্য এখানে আসিয়াছেন, অকৃতকার্য্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে

ক্ষুণ্ণ হইবেন। অতএব দেব জিজ্ঞাসা করি, অন্তর্যামী কেনারাম ও বিশু অত্রস্থ যোগাসনে বসিবার উপযুক্ত কিনা?” অশরীরী কহিলেন, “কেনারাম সংযমী ও সাধক, তিনি অত্রস্থ যোগাসনে বসিবার উপযুক্ত, কিন্তু বিশুর এখনও চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। শব সাধনা দ্বারা তাহার চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। সাধক শিবরাম স্বামীর সমাধির বামপদ সন্নিকটে সিদ্ধাসন আছে। দেবীর যেখানে দক্ষিণ পদ স্থাপিত হইয়াছে, তুমি সেই স্থান সমাধির কেন্দ্র ধরিয়া সিদ্ধাসন নির্দ্দেশ করিবে। অদ্য অমানিশি, কেনারামকে যোগাসন নির্দ্দেশ করিয়া যপ করিতে দাও, বিশুর শ্মশান সাধনা অভ্যাস করা উচিত। দেবীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী শ্মশানে তাহাকে যপ করিতে শিক্ষা দাও। বিশু ও কেনারাম জন্মান্তরে ধর্ম্মরাজ্যে জগতের অনেক হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইবেন।” ইহা কহিয়া কাপালিক বেশী অদৃশ্য হইলেন। সাধক আকুল হৃদয়ে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া গলদশ্রু নয়নে সাষ্টাঙ্গে অদৃশ্য গুরুর চরণে প্রণাম করিলেন। দেবীর মন্দিরের দ্বারোৎঘাটন করিয়া করযোড়ে ব্যাকুল নয়নে দেবীর পানে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “ইচ্ছাময়ী! অতি শরণাগত কিঙ্করকে লইয়া কতই খেলা করিতেছ? কখন ব্যাধের হস্তে পাতিত করিয়া জীবনের ভয় দেখাইতেছ, কখন ঐশ্বর্য্য সম্পদ সমাকীর্ণ রাজসভায় লইয়া রাজরাজেশ্বরী বেশে মৃদু মধু হাসা করিতেছ, কখনও বা আলোকসামান্য রূপ লাবণ্য সম্পন্ন স্বর্গ দূতের সহিত সমাগমে আমার হৃদয়াশ্রিত বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করিতেছ। মা! আর কতদিন এই ভাবে রাখিবে।” এই বলিয়া সাধক সেই নিশীথ সময়ে দেবীর সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন,—

মানব দেহ পেয়ে ছিলাম ভবে, তোমার তনু তোমারে সঁপিলাম,
যা কর জননী আমি অবসর লইলাম।
অনিত্য সংসার সুখ, তাহে হইলাম বৈমুখ,
মান, অপমান, দুঃখ দূরে তেয়াগিলাম॥
কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর,
ভাবিয়া চরণাম্বুজে শরণ লইলাম॥

(ক্রমশঃ)

শ্যামা-মা।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—প্রান্তর।

(বিবেকের প্রবেশ।)

বিবেক। নিশি যদি না হ'ত তামসী,
কে করিত রবির আদর?
দুখে যদি না থাকিত জ্বালা,
কে করিত সুখের সম্মান?
এই দুঃখ, এই সুখ, এ আঁধার,
এই সে আলোক,
ক্ষণস্থায়ী অবনী মাঝারে।
কালচক্রে, আবর্ত্তিত হ'তেছে নিয়ত।
এ দুঃখ বারিধি হ'তে পাইতে নিস্তার'
নাহি জানি কি সুখের আশে,
অহরহ ভ্রমে জীব আকুল পরাণে?
অশনে, বসনে, পুত্র, দারা, ধনে,—
কিসে গৃহ পূর্ণ রহে ভেবে,
এ সংসার সতত অধীর।
এই সুখ, এই শান্তি ভ্রান্তির আধার,
নির্ব্বাপিত নিমেষে আলোক।
বিষম-বিষাদ সিন্ধু উথলে আবার।
অন্ধকারে পূর্ণ দিশাচয়!
কিন্তু হায়,—যে সুখের নাহিক বিরাম,
সেই সুখ আশে,—

ধায় যদি জীবের অন্তর,—
ধন্য তার জনম জীবন।
সংসারের নশ্বর বিষাদ,
ভীষণ বিপদ রাশি,
কভু তারে নারে টলাইতে।
সাক্ষ্য তার—সাধক সুজন।
নিদারুণ মায়ার তাড়ণে অটল,—অচল,
নিত্য সুখ সসম্মানে পূজিবে সুধীরে
জ্ঞানসহ রণে বিকাশিছে বীরত্ব বিশাল।
দেখি এবে পরিণাম কিবা

(প্রস্থান)

(গাহিতে গাহিতে আনন্দ ভৈরবীর প্রবেশ।)

গীত।

"হাস" সুখে হাস' লো প্রকৃতি
হরষ লহরী তুলে।
রঙ্গে হাস তরুলতা রাজি
সাজিয়ে বিকচ ফুলে।
সুধীর সমীরে তুলিয়া সুতান,
গাহরে পাপিয়া তাঁহারি সুগান,
যাহার প্রেমে পূরিত পরাণ,
রয়েছি আপনা ভুলে॥
ভূধর সাগর গগন পবন,
তাঁরি নামগুণ গাহ অনুক্ষণ,
প্রতিধ্বনি তানে গাও ত্রিভুবন,
কালী প্রেমরসে গ'লে॥
ঢল ঢল তানে ওলো প্রবাহিনি!
গাও কলস্বরে দিবস যামিনী,
"জয় জয় সেই কালী কুণ্ডলিনী,"
গাও প্রেমে হেলে দুলে॥

(প্রস্থান)

(কর্ম্মফলের প্রবেশ।)

কর্ম্মফল। হাঁ হাঁ বাবা! যেমন পাহাড়ে চাপান, তেমনি ফুঁয়ে ওড়ানো উতোর! যেমন ছোবল, তেমনি ঝাড়ন। ঠিক্ যেন তক্ষক আর ধন্বন্তরী। বলিহারী বাবাজী জ্ঞান ঠাকুরের বাক্যি হোরে গেছে! আর কিছু না পেয়ে, শেষটা কিনা বাবাজীকে দড়ি দড়া দিয়ে বেঁধে রেখে পালাল! বাবা,—মায়া বেটীর চালে যখন তরী বাঞ্চাল হয় নি,—তখন জ্ঞান ঠাকুরের বুজরুকিতে আর বেশী কি কিছু হ'তে পারে? তবে ঠাকুর পালাবার লোক নয়। কোথাও আড়ালে ব'সে বোধ হয় কিছু নতুন চাপান গোড়্‌ছে। আরে বাবা,—"মন চাঙ্গা তো শিয়রে গঙ্গা।" মোটের উপর ওতোরের বহর দেখে বোধ হ'চ্ছে যে, তরী ঘাটে লাগো লাগো হ'য়েছে। হ্যা দ্যাখ,—"ভেতর জলের কমল কলি উঠল যদি ঠেলে, ঝড় বাতাসে ডোবে কি সে? নাচে হেলে দুলে। বাবা! এখন যত রগড়া দেবে ততই মধু, মধু। চরণ রে চলিলাট। চলিলাট।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—শ্মশান।

(বদ্ধদশায় সাধক দণ্ডায়মান।)

গীত।

সাধক। "কত দুখ আর সব' বায়েবার
বল' বল' বল' জননি আমার!
আরত' সহেনা বন্ধন যাতনা,
'মা' 'মা' ব'লে তাই ডাকি অনিবার।"

(অলক্ষিত ভাবে জ্ঞানের প্রবেশ।)

জ্ঞান। (স্বগতঃ) আশ্চর্য্য সাধনা শক্তি!
ভক্তিমাখা শিরায় শিরায়!
ইষ্টদেবে অটল বিশ্বাস!

সাধক। (গীত) যদি এ জগতে যাতনা সহিতে,
পাঠায়েছ' মোরে শুধু মা কাঁদিতে,
সে শুভ বাসনা ওগো শবাসনা
পূর্ণ হোক্ শিবে আজি মা তোমার।

জ্ঞান। (স্বগতঃ) রজ্জুগ্রন্থি হ'তেছে শিথিল,
আশ্চর্য্য কি তায়!
অন্তরে বাহিরে যেই হেরে ইষ্টদেবে
তুচ্ছ তার রজ্জুর বন্ধন;
ঘোর ভব পাশে,—
পরামুক্তি লভে সেই সাধক সুজন।

সাধক। (গীত) বিশ্ব জ্বালা এসে,
জ্বালাক্ আমারে,
ক্ষতি নাহি তায়,
না ডরি তাহারে;
তোমারে না ভুলি,
কৃপাময়ি কালি!
এই ভিক্ষা শুধু চাই মা!
যাতনা সহিতে, দেহ শক্তি চিতে
মা বলিতে যেন ঝরে
আঁখিধার॥

জ্ঞান। (স্বগতঃ) খুলে গেল রজ্জুর বন্ধন,
মহাজনে কি পরীক্ষা করিব এখন,
তবু করি কর্ত্তব্য পালন।
(প্রকাশ্যে) একি একি নীচাশয়!
রজ্জুগ্রন্থি করিয়া মোচন,
প্রাণ-ভয়ে পলাও কোথায়?

সাধক। একি কথা কহ মহাশয়!
বদ্ধ আমি কেমনে খুলিব,
দৃঢ় তব রজ্জুর বন্ধন?
জন-শূন্য এ ঘোর শ্মশানে,

মা বিনে কে করিবে গো বন্ধন মোচন?
অপার করুনাময়ী,—
কালী মোরে নিস্তারিল আজি।
কোথা যাব' মা'রে ছেড়ে আর?

জ্ঞান। পাষাণী কালীর কথা ব'লনাক আর।
কি শক্তি পাষাণে,—
করে মুক্ত রজ্জুর বন্ধন?
উন্মত্তের প্রলাপ তোমার।

সাধক। আপনি উন্মাদ তুমি, তাই বল কালীরে পাষাণী।
কোমলতা মাখা মা'র প্রাণ,
পাষাণের ছায়া কভু,
না পরশে তায়।

জ্ঞান। লাজ-হীনা নারী কালী ছি ছি ছি দিগ্বসনা,
তনয়ের পাশে তার কি ব্যাপার দেখ'না।
তাহে পীনোন্নত স্তনী,
কামে যেন উন্মাদিনী,
একি ভাব বল শুনি ভাল ব'লে বুঝিনা।
প্রকাশ্যে বীভৎস দৃশ্য দুষ্য বই জানিনা॥

সাধক। রসনা সংযত কর মা'য়ে দোষ দিও না।
অকলঙ্ক শশী মা'রে কলঙ্কিনী ভেব না।
হাসি পায় শুনি কথা,
মাথা নাই মাথা ব্যথা,
তুমি ভাই! থাক' কোথা বলত' হে ঠিকানা?
তার পরে বল' মা'রে শ্যামা লজ্জাহীনা॥
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড উদরে রহে যার ত্রিসংসার,
তুমি কি একটী অণু গণ্য নহ মাঝে তার?
বল তবে কারে হেরে
মা আমার লজ্জা করে?
উলঙ্গিনী বলে মা'রে কে আছে বাহিরে মা'র?
বসন যোগায় কেরে পরিমাণ করি সার?

সত্য যাহা মুক্ত তাহা সেত' ঢাকা থাকে না ;
সত্যরূপা মহাকালী সে যে বিরাবরণা।
তুমি মা'র ইচ্ছা বশে
কর্ম্ম ভূমি ভবে ব'সে,
বল যদি মোহাবেশে শ্যামামা'রে দিথ্যসনা,
মহিমার সীমা মা'র তাতেও ত পাবে না॥
তন্ত্র যন্ত্র মন্ত্র বেদ বিজ্ঞানের আন'না,
মা'র মহিমার সীমা কে করেছে নিশানা ?
লীলাময়ী করি সার,
উলঙ্গিনী মা আমার,
অবিরাম ত্রিসংসার প্রসবেতে উন্মনা,—
বসন পরিতে কোথা অবসর বল না ?
তনয়ের পাশে তায় লজ্জা কিবা জানিনা,
বৃদ্ধ ছার থাক্ যুবা শিশু সুতে গণি না।
অসংখ্য সন্ততি মা'র,
পয়োপূর্ণ স্তন ভার,
তাই পীনোন্নতাকার পিও সুধা পিওনা ?
হ'য়ে মদানন্দময় মা বলিয়ে ডাকনা॥

(কর্ম্মফলের প্রবেশ ও গীত।)

(জ্ঞানের প্রতি)

"সাদা কথায় বল প্রভু ! কোন্ দেশে বসতি কর ?
(তুমি) বাপের নামেই দাও পরিচয়,
মায়ের নামটা নাইবা ধর।
শূন্যে, গাছে, জলে, স্থলে,
কি অনলে, কি অনিলে,
(তুমি) কোথায় থাক' কি কৌশলে,
কি খেয়ে কুঁদুনি কর ?
বাড়ের উপর রেখে মাথা,
কার তোরে হে কইছ' কথা,
ব্যক্ত কর সে গুপ্ত কথা,

(তুমি) মা বিনে কার শক্তি ধর ?
উল্‌টে পাল্‌টে ছল্‌টা ধরে,
কোর্‌লে কোঁদল রাৎটা ভ'রে,
বল দেখি খেয়াল ক'য়ে,
(এখন) বর বড় কি ক'নে বড় ?

(প্রস্থান)

জ্ঞান। সতীর পরম গুরু পতি এই জগতে,
দাঁড়াইয়ে কেন কালী সে পতির বুকেতে ?

সাধক। মহাশক্তি লীলাবতী,
অনাদ্যা সে শ্যামা সতী,
সে যে পরমা প্রকৃতি ভিন্ন নহে শিবেতে,
পরম পুরুষ শিব,—অভিন্ন সে শ্যামাতে।
এ বিশ্ব রচনা সেই প্রকৃতির মহালীলা,
সৃষ্টি স্থিতি লয় ল'য়ে মহাদেবী করে খেলা,
কি বিরিঞ্চি কি শ্রীধর,
কিবা হর, যোগেশ্বর,
সবাই পুরুষ পর, মূল তার সেই লীলা,
প্রকৃতি পুরুষ মিছে সাধে এই বিশ্ব-লীলা,—
ব্রহ্মরূপা মহাকালী ব্রহ্ম ব্রহ্ম হরিহর,
প্রকৃতি পুরুষ তাই ভিন্ন নহে পরস্পর,
তিনে তিন গুণ ধরে,
আত্ম ভূলি পরস্পরে,
তিন কার্য্য তিনে করে যেন রে কালী কিঙ্কর,
একে তিন, তিনে এক, তিনে তিন গুণ ধর॥
বিরিঞ্চির সৃষ্টি কার্য্য, পালক মুরলি ধর,
প্রলয়ের কর্ত্তা হর, শিব ভোলা মহেশ্বর ;
কিন্তু শক্তি বিনা ওরে,
কিবা কার্য্য কেবা করে ?
শক্তি বিনা জড় যে রে চতুর্ম্মুখ হরিহর !
মায়ের মহিমা হেরি মুগ্ধ তারা অতঃপর॥

কহে সবে সবিস্ময়ে কি কার্য্য আমরা করি,—
সর্ব্বকার্য্য সাধে কালী, মোরা শুধু নামধারী।
রুদ্র আত্ম গ্লানি ভরে,
কহে শুন উর্চ্চৈঃস্বরে,—
বিশ্বের প্রলয় তরে ছার প্রাণ আমি ধরি,—
অনন্ত করুণাময়ী অপূর্ব্বা সে শুভঙ্করী॥
জগতে জননি যার স্নেহ দয়া শূন্য প্রাণ,
জন্মমাত্রে মৃত্যু তারে কেন নাহি দিল স্থান?
বলিতে বলিতে ভব,
হেরি মাতৃময় ভব,
তেজি তথা স্ববিভব মাতৃমূর্ত্তি করি ধ্যান,—
'মা' 'মা' ব'লে কালী পদে করে আত্মবলি দান॥
শিব তথা শব হ'য়ে হৃদি দিয়ে প'ড়ে রয়,
শিব শক্তি যুক্ত হ'য়ে হ'ল বিশ্ব দীপ্তিময়?

(কর্ম্মফলের প্রবেশ ও গীত।)

"ঠাকুর গো পায়ে পড়ি (ও ঠাকুর)
(এই) পাকা সোণায় পোড় দিওনা।
লাভে হ'তে' আগুন তাতে,
হবে তোমার চোক্‌টী কাণা॥
চন্দন ঘষিলে পরে, সুবাস ছোটে দেশান্তরে,
ঘনে কি ভাঙ্গ আবরে?
(এই) আঁখি ঢাকে মেঘের থালা॥
হৃদিপদ্ম যার ফুটেছে, জ্ঞানাতীত সে হ'য়েছে,
জ্ঞান তোমায় অজ্ঞান ক'রেছে,
(এই) শিব সমিস্যের গেছে জানা॥

(প্রস্থান)

জ্ঞান। আলো হেরে পুলকিত,
শ্যামাগত তব চিত,
কিন্তু একি বীপরিত, হেরি দৃশ্য বিষময়,
শিবাসনে, শিবা সনে আত্মরত কেও রয়?

সাধক। কি মহান্ মর্ম্ম এর কি বলিব হে তোমায়,
বচন না সরে মুখে, ভাবে প্রাণ গ'লে যায়,
ত্রিলোকে ছুটিল আলো,
কোটী শশী বিভাতিল,
অতর্কিতে উদ্ভাবিল সব হৃদে গুণময়,—
অভিন্ন সে প্রকৃতিতে মহাকাল মহাশয়॥
প্রকৃতির মহালীলা কে করিবে বর্ণনা?
বিধি, হরি, হর হারে করিবারে ধারণা।
দেবীতত্ত্বে হ'য়ে মত্ত,
সঁপি তায় আত্ম সত্ত,
মহাকাল মহাভক্ত করে শক্তি-সাধনা।
অমৃত গরল তাহে ভাবে দুষ্ট দুর্ম্মনা॥
তৃপ্ত হ'য়ে মহাকালী মহাকালে দিল বর,
"সত্য ধর্ম্ম ত্রিসংসারেতে রক্ষা কর গুণাকর!
অধর্ম্মে সংহার করি,
অজ্ঞানে জ্ঞান বিতরি,
ঢাল সদা শান্তি বারি চিদানন্দ জ্ঞানাকর!
হউক আনন্দময় এ লীলায় চরাচর॥

(সহসা জ্ঞানের নিজমূর্ত্তি ধারণ। দিব্যালোক প্রকাশ।)

জ্ঞান। ধন্য তুমি হে সাধক! শ্যামা গত তব প্রাণ,
ধন্য ধরা কোলে ধরি তোমা সম সুসন্তান;
শ্যামারে চিনেছ' তুমি,—
শ্যামা সার জন্মভূমি,
এ সংসার কর্ম্মভূমি নহে তব যোগ্য স্থান,
অন্তে শ্যামা পদোপ্রান্তে হবে তব সুখ-স্থান॥

(সাধকের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করণ।)

সাধক। গীত।
(আমার) আর্জ্জি ধর মা এলোকেশী!
(আমি) খাট্‌তে আর পারিনা বেশী॥
দেশে দেশে বদ্‌লী ক'রে মা,

(আমায়) রাখ্‌লি কোরে ঘোর বিদেশী,
(এখন) দাও মা ছুটী ঘরের ছেলে
ঘরে গিয়ে হই স্বদেশী ॥
রিপুছটা বড়ই ঠ্যাঁটা সদাই করে রেষারেষি,
দশেন্দ্রিয় দস্যুদলে মা (আমায়) টান্‌ছে দিয়ে গলায় ফাঁসি।
উপরি পাওনা চুলোয় গেছে মা
(এখন) গেঁটের কড়ি যাচ্ছে খসি ॥
তাতে আবার পঞ্চভূতে,
চোক্ রাঙায়ে আসে রুষি ॥
ভবের ভাব দেখে মন্ বিগড়ে গেছে মা!
(এখন) কোন রূপে মান বাঁচায়ে,
দেশে গেলেই হই মা খুসী ॥
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী,"
(এই) শাস্ত্র কথা অস্ত্র হয়ে,
বিদ্‌ছে বুকে দিবানিশি ॥
ইতি ক'রে এ কিঙ্করে
বলে নয়ন জলে ভাসি,
(আমার) আর্জ্জি ধ'রে আপিল মেরে
ডিক্রী দেমা ত্রিলোকেশী ॥ (প্রণাম করণ)

(সহসা দিব্যালোক প্রকাশ ও কালী মূর্ত্তির সজীবতা প্রকাশ)

শ্যামা-মা। ধন্য তুমি হে সাধক ভক্তকুল গরিমা!
সার্থক জীবন তব পবিত্রতা প্রতিমা।
জ্ঞান পাশে নররায়,
আজি তুমি পরীক্ষায়,
প্রকাশিলে এ ধরায় শ্যামা ভক্তি অসীমা।
পাবে তায় চিরশান্তি, মাখা স্বর্গ সুষমা ॥
অবশ্য লভিবে তুমি ইষ্টসিদ্ধি চরমা।
বিশ্বধামে প্রতিষ্ঠিত রবে তব মহিমা।
বাছারে সংসারে আর,
জন্ম না হবে তোমার,

পাবে ইষ্টসিদ্ধি সার লভি মুক্তি পরমা,
আয় বাছা আয় কোলে আমি তোর শ্যামা-মা ॥

(শ্যামা মূর্ত্তির হস্ত প্রসারণ।)

সাধক। 'মা' 'মা!' (শ্যামার নিকট গমন।)

(কর্ম্মের প্রবেশ ও কর্ম্মের প্রতি জ্ঞান।)

জ্ঞান। নমস্তং কর্ম্মভ্যো বিধিরপি
ন যেভ্যঃ প্রভবতি।

কর্ম্ম। নহি জ্ঞানেন সদৃশং
পবিত্র মিহ বিদ্যতে।
নমস্তে,— নমস্তে!

জ্ঞান। নমস্তে,— নমস্তে।

(কর্ম্মফলের প্রবেশ।)

কর্ম্মফল। মাগো! তোমার মহিমা অনন্ত! তোমার এই কর্ম্মও অনন্ত; তোমার এই জ্ঞানও অনন্ত; আর তোমাগত প্রাণ এই সাধকের সাধনাও অনন্ত! আর আমার এই খস্‌ড়ার ষোল আনা হিসেব নিকেষও অনন্ত! শাস্ত্রে বলে,—
'কর্ম্ম কর' হবে জ্ঞান,
পাবে মুক্তি ধন,
মধু পাবে?
সহ্য কর মৌমাছি দংশন ॥
সত্য সত্যই আগুনের পোড় না খেলে সোণা কখনই পাকা হয়
না। মুক্তকেশি! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

(গাহিতে গাহিতে বিবেক, মায়া, প্রমথগণ ও যোগিনীগণের প্রবেশ ও শ্যামা মা ও সাধককে বেষ্টন পূর্ব্বক সকলের গীত।)

কে তোমার অন্ত জানে অনন্ত রূপিনী তারা।
বেদ বেদান্ত ভ্রান্ত হ'ল, অশান্ত আপনা হারা ॥
শিবে দিয়ে পদতরী,
নাম ধ'রেছ 'শুভঙ্করী!'

(তোমার) এ রহস্য বুঝতে নারি,
তাইতে ডাকি পরাৎপরা ॥
লীলাময়ী তুমি তারা,—
লীলায় তোমার জগৎ ঘেরা।
(তুমি) আপ্‌না হ'তে গ'ড়ে আপন,
লীলার ছলে দেখাও ধরা ॥
রবি শশী গ্রহ তারা,
তোমারি প্রতিমা তারা !
হরি হর বিধি বর,
অভেদ্ তোমার লীলার ধারা ॥
পুনশ্চ ভূয়োদপি শ্যামে !
প্রণমামি হবরমে !
(যেন) চরণ ছাড়া ক'রনা মা !
(এই) শরণেতে সারাৎসারা ॥

যবনিকা পতন।

ইতি শ্যামা-মা গীতিনাট্য সমাপ্ত ॥

বে'।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

ও বর !
বলি পাড়া ভরে ঘরে ঘরে
এ শুনতে পাচ্ছি কি ?
তুমি বাছাই করা ফুলের তোড়া
আন্‌তে যাচ্ছ কি ?
ফুলের তোড়া কাঁটায় ঘেরা
বিপদ বড় ভারি।

দে'খ যেন ফির্‌তে হয় না।
জানে প্রাণে মরি ॥
তুমি হ'লে ডাঙ্গার জীব
(তোমার) ডাঙ্গার ফুলই ভালো।
কেন মিছে মৃণাল তরে
মনের আগুন জ্বালো ॥
সে যে টলমল ঢল ঢল
দ'খিণ বাতাস সয় না।
দেখো তোমার উষ্ণশ্বাসে
(তার) পরাণ যেন যায় না ॥
অথ প্রণয় প্রসঙ্গ বিধি—
মৃণাল যখন কাছে এসে
দুলিয়ে গ্রীবা রঙ্গ রসে,
চাওনিতে তোর পরাণ চুষে—
বল্‌বে তোমায় হেসে হেসে ॥
তুমি মম—
হাতক দরপণ মাথক ফুল
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার
দেহক সরবস গেহক সার
তখন—
আহ্লাদে প্রাণ আট খানা
ধরে প্রিয়ার হাত খানা
বলো তুমি রঙ্গ করে
বিলিয়ে গলা মিহি সুরে
তুহু মম মন
তুহু মম প্রাণ ॥
তুহু মম জ্ঞান
তুহু মম ধ্যান ॥
আধারি রাতে
রোস্‌নি হামারি।

তৃষিত চিতে
বারি হামারি ॥
হৃদয় সরে
পদ্ম হাম্মুরি ॥
এ সখি এ সখি
হাসি তোমারি ॥

সংসারিক কথা—

চলাচলি করো পথে আগে পাছে চেয়ে
নইলে শুকনোর উপর ডুবতে হবে হুচট খেয়ে পায়ে ॥

জীবনের উদ্দেশ্যটা
ভাল করে বুঝে নিয়ো।
স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে
প্রাণ মন সঁপে দিয়ো ॥
ভগবানে লক্ষ্য রেখো
গাঢ় অনুরাগে।
শেষের কথা শেষে হবে
সন্দেশ দাও আগে ॥

সমালোচনা।

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম-গৃহ পঞ্জিকা।—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম, বি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু। দ্বিতীয় বর্ষ ১৩৩১ সাল। এই পঞ্জিকাখানি অভিনব প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পঞ্জিকার প্রায় ৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী পয়ারাদি ছন্দে "হরপার্ব্বতী সংবাদ" আছে; সংবাদের মধ্যে জাতীয় ধর্ম্ম, কর্ম্মানুষ্ঠান, সুখশান্তি স্বাস্থ্যতত্ত্বের পালনীয় উপদেশ সকল এবং ব্যায়াম প্রণালী, মুষ্টিযোগ চিকিৎসা, গৃহস্থের গোপালন, গো চিকিৎসা, নানা-প্রকার কৃষির নিয়ম ও সময় বঙ্গের শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা, কলিকাতার যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়, লোকগণনা, কি উপায় অবলম্বন করিলে জাতীয় জীবনে শারীরিক মানসিক ও আর্থিক উন্নতি হইতে পারে, তাহার উপদেশ এই পঞ্জিকায় সন্নি-বেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্বধর্ম্মানুরাগী গৃহস্থের গৃহে এরূপ পঞ্জিকার সমাদর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।